ভৌতিক গল্পসমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

গল্পসমগ্র

(প্রথম খণ্ড)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬৬

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
এইচ. পি. রায় এ্যাণ্ড কোম্পানী
৭৩/এ আমহার্স্ট রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়

নবনীতা দেব সেন

করকমলেষু—

গল্প

১।	অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ	১
২।	আলো	২০
৩।	বর্ণপরিচয়	৩৫
৪।	লালীর জন্য	৬৯
৫।	তারাচাঁদের হাসি	৬১
৬।	হরিপুরের বিশু	৬৭
৭।	ফাঁদ	৮৩
৮।	ফৌজি জুতো	৯০
৯।	সারমেয় সমাচার	৯৫
১০।	সোনার পিদিম	১১৪
১১।	উলট পুরাণ	১২৯
১২।	বুঢ়াপীরের দরগাতলায়	১৩৬
১৩।	বিভ্রম	১৫০
১৪।	তাসের ঘরের মতো	১৫৯
১৫।	গল্পের গরু	১৭১
১৬।	জুয়াড়ি	১৮১
১৭।	আকারান্ত	১৯৭
১৮।	সাক্ষীবট	২০৩

অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ

অঘ্রাণ মাসের সলকাবেলায় ভাপ-ওঠা স্বাদু ভাত খেয়ে ধনহরি মোড়ল যাবে শালার বাড়ি ধামালিতলা। শালার নাম বনমালী। কবরেজও বটে, গুনিনও বটে। আধিব্যাধির ওষুধ দেয়, আবার ভূতও ছাড়ায়। তবে ধনহরির যাওয়ার কারণ গরু। তিনদিন আগে সোমত্ত বকনাটা নদীর ধারে চরতে গিয়ে পালছাড়া হয়ে নিখোঁজ। মোড়লের মনে সুখ নেই। রাখাল ছোঁড়াটাও ভয়ে বাড়ি ছেড়েছে। ধামালিতলা থেকে চাই কী একটা রাখালও জুটিয়ে আনবে।

আদুরী বেওয়ার পাড়াবেড়নী ধিঙ্গি মেয়েটা বলল, মা গো! ও মা! আমি মাসির বাড়ি যাই?

আদুরী রোদে পা ছড়িয়ে বসে বাসি গুগলির ঝোল মাখানো একমুঠো পান্তা খাচ্ছিল। তাতে ভাতের সংখ্যা কম, এনামেলের খুরির কানায়-কানায় আমানি। পেটের নাড়ি ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাচ্ছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, মাসির বাড়ি যাই। মাসি তোমার আপনজন। মুখে অক্ত উঠে মলে খবর নেয় না!

মেয়েটা মায়ের পিঠের কাছে ধুপ করে বসল। কাঁধ আঁকড়ে আদর দিতে দিতে বলল, ধামালিতলা যাই মা! ধনারি মোড়ল যাচ্ছে। তার সঙ্গে যাই। ও মা, মা গো! দুটো দিনের লেগে যাই—লবান্ন খেয়ে আসি।

আদুরীর মনটা নরম হয়ে গেল। উদাস চোখে আকাশ দেখতে দেখতে বলল, সুরির ঘরে এখন বড় সুখ। আঘুন মাসে ধান উঠেছে। কেনেলের জলে চাষ। খরা-আকাড়া নাই। তা মোড়লমশাই যাচ্ছে?

হুঁ। মেয়ে মিষ্টি হেসে বলল। পুকুরে চান করছিল দেখে বললাম, মোড়ল-মশাই! তোমার জাড় লাগে না গো? মোড়ল বললে, জাড় লাগলে চলবে? এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ধামালিতলা যাব। শেষে বলে কি জানো মা? ও চিরুনী! তোর মাকে শুধোসদিনি, নদীর উদিকে ঘোরাফেরা করে—তো আমার ধলী বকনাটা চোখে পড়েছে নাকি? মা মেয়ে একসঙ্গে খুব হাসতে লাগল। মোড়লের মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থাই বটে। তিনদিন ধরে হুলস্থুল বাধিয়ে বেড়াচ্ছে গরুর খোঁজে। এবার ধামালিতলা যাচ্ছে কেন, সিবাই বোঝে। গুনিন শালা মন্তর পড়ে আঁক কষে বলে দেবে, ধলী বকনাটা

কোথায় আছে—উত্তর, দক্ষিণ, পুব না পশ্চিমে। নাকি ঈশেনকোনায়। কতদূরে কী অবস্থায় আছে, বলবে। বলবে বাঁধা আছে, না চরছে।

হাসির ফাঁকে আদুরী বলল, আর মোছলমানের পেটে গেলে? বলে হাসিটা বাড়িয়ে দিল।

চিরুনীর মন মোড়লের গরুতে নেই। এতক্ষণ ভাপওঠা ভাতগুলো সাবাড় করে মোড়ল উঠে পড়েছে। তার মতো মানুষের দায় পড়েনি যে এ পাড়ায় ডাকতে আসবে দীনদুঃখীর ঘরের মেয়েটাকে। চিরুনী উঠে দাঁড়াল। পরনের ছেঁড়া ময়লা আর আঁটোসাটো এই ফ্রকটা পরে মাসির বাড়ি যাবে? মন খারাপ হয়ে গেল তার। দুবছর আগে পুজোর সময় কষ্টেসিষ্টে মা কিনে দিয়েছিল। এখন আর শরীর আঁটে না। ঠেলে বেরিয়ে আসে বুকদুটো। এ বয়সে তার একটা শাড়ি যে কত দরকার, মা যখন-তখন বলে আর ফোঁসফোঁস করে নাক ঝাড়ে। বলে, তোর বাবা বেঁচে থাকলে এ্যাদ্দিন কত শাড়ি পরে কার ঘর আলো করতিস। তাই বলে চোখ বুজে যেখানে-সেখানে যার-তার গলায় তো তোকে ঝোলাতে পারিনে! দেখি কী হয়।

চিরুনী বলল, তোমার তোলার কাপড়টা দাও না মা! পরে মাসির বাড়ি যাই।

আদুরী দুঃখে হাসল। তোলার কাপড় কিছু না মাঠঘাট নদীখালে ঘুরে এসে ওই পুরনো রঙীন তাঁতের শাড়িটা পরে কাদামাখানো ছেঁড়া থানটুকু ছাড়ে। ওটা এয়োতি-আমলের কাপড়। নিঃশ্বাস ফেলে আদুরী বলল, তাই পর। আর শোন্, ফকখানা গুটিয়ে সঙ্গে নে। মাসির কাছে সাবুনসোডা চাইবি। কেচে নিবি যত্ন করে।

দৌড়ে ঘরে ঢুকে চঞ্চল মেয়েটা ঝটপট সেই ডুরে রঙীন শাড়ি পরে যখন বেরুল, তখন নিজের মেয়েকে দেখে আদুরী বুঝি আর চিনতেই পারে না। এমন সোমত্ত হয়ে গেছে তার মেয়ে! মেঘে-মেঘে বেলা বাড়া একেই বলে তবে। আদুরী মনে-মনে লজ্জা পাচ্ছিল। দু-তিনটে জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল। টাকাকড়িও কিছু দিতে চেয়েছিল। কথা দেয়নি। সব মরে হেজে ওই মোটে একটি। দেখে শুনে গেরস্থ ঘরেই দেবে। বোন সুরি ধামালিতলায় গেরস্থঘরে পড়েই না সুখে বেঁচে আছে। দুবেলা ভাতটা খাচ্ছে দাচ্ছে। আর কী চাই মানুষের?

খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো জুটলে তার এই ছিপছিপে গড়নের মেয়ে একদিন

আরও কী ডাগর হত ভেবেই পায় না আদুরী। হেঞ্চাকলমির শাক কাঁকড়া-গুগলির ঝোল খেয়েই এত। বাবুপাড়ায় কারও ঘরে জন্ম হলে কী ঘটত চিরুনীর, তাই ভেবে আদুরীর মন আঁকুপাঁকু করে ওঠে।

আদুরী কপট রাগ দেখিয়ে বলল, ওই মুখেই মাসির বাড়ি যাচ্ছিস হারামজাদী? রগড়ে মুখখানা অন্তত ধো!

কথা কানে করে কে? ধনহরি মোড়ল এতক্ষণ মাঠের পথে নেমেছে দীঘির পাড় থেকে। ধামালিতলা দূর বটে। ঘোরা সুপথে ন ক্রোশের কম নয়। কিন্তু নাক বরাবর সিধে মাঠবিল ভেঙে হাঁটলে ক্রোশ পাঁচেক। এখন বিলের জল শুকোতে লেগেছে। খাল-কাঁদরও প্রায় শুকনো। আলপথে মিঠে রোদে হাঁটতে ভালোই লাগবে। ক্রোশ দুই বাঁধের ওপর দিয়ে পায়ে চলা পথ আছে। জায়গায়-জায়গায় বাঁধ ভেঙে একটু জলকাদা হবে।

খোলামেলা উঠোনের ধারে এঁটোহাতে দাঁড়িয়ে আদুরী দেখছিল তার মেয়ে পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে। গ্রামের পথে এখন সকালের হলুদ রোদ। ধুলোয় পড়ে আছে ধানের কণা। ঝাঁক বেঁধে চড়ুই পাখি খুঁটে খাচ্ছে। চিরুনী তাদের ফরফর করে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। ছায়ার ভেতর ডুরে রঙীন শাড়ি উধাও হয়ে গেলে একবারের জন্য বুকটা একটু কাঁপল আদুরীর। সোমত্ত মেয়ে যাবে অতদূর পথ একজন ভিনপুরুষের সঙ্গে? মাঠঘাট বিলের পথ! ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হল?

ফের তার মন শান্ত হল। ধনারি মোড়ল বাপের বয়সী। চুলে পাক ধরেছে। সামনে দুটো দাঁত ভাঙা। থলথলে সুখী গতরে থপথপ করে হেঁটে বেড়ায়। জমিজিরেত গরু বাছুর ছাড়া আর কিছু তার মাথায় ঢোকে না। এই যে এখনও ছেলেপুলের মুখ দেখলে না, আঁটকুঁড়ে বাঁজা-বাঁজির সংসার—তবু কি অন্য কিছু ভাবল? ক্ষেত আর গরু ছাড়া ধনারি মোড়ল কিছু বোঝে না। আদুরী ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েটা কদিন ভাতের মুখ দেখে আসুক।

পেছনে ধুপধুপ শব্দ শুনে ধনহরি মোড়ল আলপথে ঘোরে। তার প্রকাণ্ড মুখে পুরু গোঁফ। খুঁটিয়ে কাটা চুল। গায়ে হাফহাতা ফতুয়ার ওপর এণ্ডির চাদর। গোড়ালি থেকে অনেক উঁচু অব্দি পরা খেঁটে ধুতি। কাঁধে একটা মোটা ব্যাগ ঝুলছে। হাতে একটা গাছের ডাল কেটে বানানো যেমন-তেমন

ছোট্ট লাঠি। চিরুনী জানে ওই লাঠিটা গরু খেদানোর কাজে লাগে। তবে আজ পায়ে জুতো পরেছে মোড়ল শালার বাড়ির খাতিরে। চিরুনী জুতোর ভেতর মোড়লের সেই থ্যাবড়া ফাটল ধরা পা আর হাজামজা আঙুলগুলো স্পষ্ট দেখতে পায়। মোড়লমশাই খাঁটি চাষা বটে। মুনিশের চাষ পছন্দ হয় না বলে বার বার ক্ষেতে নেমে লাঙলধরা দেখিয়ে দেয়। এই তো গতকাল ধান কাটার ভঙ্গী শেখাচ্ছিল সে মুনিশদের। তম্বি করে বলছিল, এমনি করে কাস্তে-খানা ধরবি। এমনি করে প্যাঁচ দিবি ধানের গোড়ায়। এই দ্যাখ্, মুঠো কেমন ধরেছি। দেখছিস? চিরুনী ধান কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল মাঠে। এখন তাদের মতো মেয়ের সুদিন। চিরুনীকে দেখে ধনহরি মোড়ল কেমন চোখে তাকিয়েছিল, চিরুনী বোঝে। চুরি করে শামুকের খোলায় কুটুস করে ধানের শিষ কেটে নেয় কুড়ুনীরা। ভাঙা শিষ কুড়োবার ছলে এই এক হাতসাফাই। কিন্তু আঁটকুড়ে মোড়ল, চিরুনী তেমন চুন্নী না। বড় রাগ আর দুঃখ হয়েছিল লোকটার ওপর।

আজ তার ধুপধুপ পায়ের শব্দে পিছু ফিরে সেই চোখে তাকাচ্ছে। এঁড়ে গরুর মতো ঢেলাবেরুনো চোখ। চিরুনী দমে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ভাবে, রাস্তা কি মোড়লের কত্তাবাবার? তুমি চলো, আমিও যাচ্ছি। চিরুনী মনে মনে শক্ত হয়।

কিন্তু ধনহরি মোড়লের মুখে হাসি ফোটে। বড় দুর্লভ এই হাসি। বলে, সত্যি যাবি নাকিন রে মাসির বাড়ি? এঁ্যা?

চিরুনী গুমট মুখে নিচে তাকিয়ে বলে, হুঁ।

তা আয়। ধনহরি মোড়ল পা বাড়ায়। ভালই হল। একা না বোকা। কথায়-কথায় বিশ কোরোশ কখন পায়ের তলায় ফুরিয়ে যায় বুঝলি?

গুন্নুটির মাঠে এখন উত্তরের হাওয়া বইছে। রোদ লি লি করছে দূরের কুয়াশা। দুধারে মাঠের রঙ সোনালী। এখানে-ওখানে মুনিশের সার, কোথাও নির্জন ক্ষেতে এক চাষা সামনে ঝুঁকে ধান কাটছে। কাস্তের পাতে রোদ ঝিলিক দিচ্ছে। খালডোবায় হেঞ্চাকলমির দামে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে কান-কুটোরি পোকা। দুধারে তাকিয়ে-তাকিয়ে ধনহরি মোড়ল হাঁটে আর বুঝি নিজের মনে, কী পেছনের মেয়েটাকেই শুনিয়ে মাঠের কথা বলতে থাকে। তখন ছিল যৌবনকাল। আঘুনমাসটা—তোমার মশাই নবান্ন অব্দি আমাকে মাঠছাড়া করে কে? গোয়ালসুদ্ধ গরুবাছুর হারিয়ে যাক, আর যত ক্ষেতি হোক, এ ধনারি

মাঠছাড়া হবে না। আসলে মাঠের বড় মজা রে! ওই দ্যাখ—দেখতে পাচ্ছিস ভাঁড়ুলে গাছটা—মাথায় শামুকখোল বসে আছে? সেবারে ভাঁড়ুলে-তলায় মানুষখাড়াই ধান। মুনিশদের সঙ্গে আম্মো ধান কাটছি মনের সুখে। হঠাৎ খবর এল, বাবা তুলসীতলায় শুয়েছে। হুঁঃ, তখন এক নেশা মাথায়। কে কার বাবা—কে শুল কোথা তাতে আমার কী? আমি হলাম মাঠের মানুষ।

ধনহরি মোড়ল খ্যা খ্যা করে হাসে। চিরুনী আনমনে বলে, গেলে না মোড়লমশাই?

পরে গেলাম। ধনহরি বলতে থাকে। তবে মরার আগে দেখাটা হল না। আর টাকাকড়ির খবরও বিশেষ জানতে পারলাম না। শেষে, ঘরের মেঝে, উঠোনের উনোন খোঁড়াখুঁড়ি করলাম রেতের বেলায়।

ক্যানে মোড়লমশায়? চিরুনী আস্তে শুধোয়।

ধনহরি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে, টাকাকড়ি। আবার কী? কাকেও বলিস না। তোকেই বলে ফেললাম।

পেলে না? চিরুনী দুপা এগিয়ে এসে বলল। লুকানো টাকার এমন গল্প ভারি রহস্যময়।

নাঃ। বলে ধনহরি দাঁড়ায়। এণ্ডির চাদরটা গুটিয়ে কাঁধে তোলে। ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে। হাওয়া বাঁচিয়ে বিড়ি জ্বেলে ফুঁক ফুঁক করে টেনে বলে, মাঠ আমাকে খেলে। বুঝলি? বলবি, তাহলে মোড়লমশাই, ক্যানে এমন অসময়ে ধামালিতলা যাচ্ছি? যাচ্ছি—মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ধলী বকনাটা আমার ছেলের মতো ছিল রে! তাকে ফিরে না পেলে দেখবি আমি তুলসীতলায় গে শোব।

চিরুনী নরম হয়ে বলল, বালাই ষাট। অমন কথা বলো না বাপু!

ধনহরি মোড়ল ঘুরে বলে, ক্যানে? আমার মরার বয়স হয়নি বুঝি? দেখছিস না চুল পেকে সাদা হয়েছে? এই দেখ দাঁত ভেঙে ফোকলা হয়েছে।

মোড়ল ফের হাসে। চিরুনীও মজা পেয়ে হি হি করে হাসে। মাথার ওপর দিয়ে শনশন করে বালি হাসের ঝাঁক উড়ে যায়। দেখতে দেখতে ধনহরি বলে, শাঁখালার বিল থেকে বেচারীরা চলল হরিণমারার বিলে। শাঁখালায় আজকাল বন্দুকবাজদের বড় উপদ্রব। খালি ফুটুস ফাটুস গুড়ম গাড়ুম! কান পাতলেই শুনতে পাবি!

চিরুনী বলে, ও মোড়ল! তুমি বন্দুক কেনো না ক্যানে বাপু?

ধনহরি গম্ভীর হয়ে বলে, পাখি মারতে নাই। পাপ হয়।

পাপে কী হয় মোড়লমশাই?

মাথার চুল উড়ে যায়। বলে ধনহরি মোড়ল হাঁটতে হাঁটতে আলপথের কিনারায় খুদে কাঁটাঝোপের মাথায় বেগুনি রঙের ফুলগুলোর দিকে আঙুল বাড়ায়। বলে, ছোটবেলায় মধু চুষতাম বুঝলি? তুলে চুষে ছাখ মধু আছে।

জানি। বলে চিরুনী ঝুঁকে পটাপট কয়েকটা ফুল তোলে। চুষে ফেলে দেয়। তারপর বলে, কাঁটা ফুটিয়ে দিলে দেখছ?

ধনহরি বলে, হুঁ। ফুলগুলান বড় দুষ্টু। দেখি, রক্তটক্ত পড়ছে নাকি?

চিরুনী আঙুল দেখায়। রক্তের ফোঁটা জলজল করছে। আঙুলটা চুষতে থাকে সে।

ধনহরি হাসতে হাসতে বলে, ভগবানের পিথিমিতে এই এক নিয়ম। ফুলের মধু খাবে তো কাঁটাটিও সও। ও চিরুনী, তোর মা তোকে আসতে দিলে?

চিরুনী আনমনে বলে, না দিল তো এলাম কী করে?

তুই বলেছিলি মোড়লমশায়ের সঙ্গে আসবি?

হুঁউ।

ধনহরি মোড়ল কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে। তারপর বলে, ছামুতে একটু জল-কাদা হবে। ওই দেখছিস হেজলতলা—ওখানটায় বাঁধ ভেঙে আছে। জুতো গুলান খুলি।

জুতো দুটো খোলে সে। বাঁহাতে নেয়। চিরুনী বুঝতে পারে, মোড়ল-বুড়ো জুতো পরে হাঁটতে পারছে না। হিজলতলা এখনও কিছু দূরে। পরশু হিজলতলার জলকাদাটা হাতড়ে তারা মায়ে-ঝিয়ে মিলে অনেক মাছ ধরেছিল। গুহুটির চারদিকে ছড়ানো মাঠঘাট খালবিলের খবর ধনারি মোড়লের চেয়ে তারা কি কম জানে? তবে ওই কথাটা বেশ নতুন। মোড়লের সঙ্গে তার বাবার মরার সময় দেখা হয়নি। তাই পোঁতা টাকাকড়ির খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাড়ি ফিরে মাকে বলবে চিরুনী। টাকাগুলো তাহলে এখনও পোঁতা আছে।

চিরুনীর গা শিরশির করে। শীতে নয়, উত্তেজনায়। উত্তরের হাওয়াটা বরং রোদে তেতে মিঠে হয়েছে। যত দূরে আসছে গ্রাম থেকে, তত লোক-জন মাঠে কমে যাচ্ছে। এমাঠে এখনও ধান কাটা হয়নি। ভাল পাক ধরেনি শীষে। কোথাও ধানের রঙ এখনও কিছু সবুজ। যেতে যেতে কতবার সেই-

সব ধানক্ষেতের ভেতর বদ্ধ জলে আটকেপড়া মাছের খলবলানি শুনে চঞ্চল হল চিরুনী। মাসির বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে মাছগুলো কি আর থাকবে? শেয়াল আর পাখপাখালি গন্ধে টের পেয়ে যাবে।

ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাঠ বিলের দিকে। চিরুনীর গায়ে শাড়িটা আর বুঝি থাকতে চাইছে না। কখনও আঁচল উড়ে খুলে যাচ্ছে, কখনও জড়িয়ে-মড়িয়ে আঁটো করে ফেলছে। তবু তার মনে শাড়ি পরার সুখ। সুখের ঘোর একটু করে বাড়ছে আর বাড়ছে। কখন ধামালিতলায় মাসির দাওয়ায় রোদে বসে ভাপওঠা নতুন চালের ভাত খাবে। আর এই বিশাল মাঠে গুন্থুটির সেরা এক মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটাও কিছু কম সুখ নয়। ধনারি মোড়ল যে এমন করে মন খুলে তার মতো মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে, হাসাহাসি করবে, এ জন্মে ভাবতে পেরেছিল কি চিরুনী? কেমন করে ফুলগুলো দেখিয়ে মধু চোষার কথাটাও বলে দিল!

এই ঢালু ও নাবাল মাঠের আলপথে দুদিক থেকে ধানের শীষ উপচে এসে পড়েছে। কত শীষ পায়ের তলায় মেড়ে গিয়ে ছড়িয়ে আছে। শালিক পাখিরা খুঁটে খাচ্ছে। লাঠির ডগায় দুধারে সরিয়ে দিয়ে হাঁটছে মোড়লমশাই। এখনও ধান আর ঘাস থেকে রাতের শিশির সবটা শুকিয়ে যায় নি। চিরুনীর দুই পা ভিজে যাচ্ছে। ঘাসের ফুল আর কুটোকাটার সঙ্গে দু একটা পোকামাকড়ও আটকে যাচ্ছে। ঝাড়তে ঝাড়তে হাঁটে সে। ধনারি মোড়ল পেছন ফিরে দেখে বলে, মকুনপুরের বাঁধে উঠলে আর হ্যাঙ্গামা নাই। খটখটে পোস্কের রাস্তা। ও চিরুনী, গেছিস কখনও ওবাগে?

চিরুনী বলে, হুঁউ। সেই সেবার বাবার সঙ্গে গেলাম। মেলা বসেছিল ধামালিতলায়।

তোর বাবা বড় ভাল মানুষ ছিল। ধনহরি ওর বাবা আকালীর গল্প করতে থাকে। আকালীর মতো খাটিয়ে মুনিশ আর পৃথিবীতে জন্ম নেবে না। আকালী মাটি চিনত। মাটির মানুষ ছিল। ওর গায়ে মাটির গন্ধ ছিল।...তোর তখন জন্মো হয় নি চিরুনী। গুন্থুটির বিলে বোরোধানের ক্ষেতে জল ছেঁচতে মুনিশ দিয়েছিলাম তিনটে। তোর বাবাও ছিল। রেতের বেলা জোসনা উঠেছে—তখন তোর মা এসে বললে, ও মোড়লমশাই, আমাদের মিনসেকে কোথা রেখে এলে? ভয় হল মনে। পোকামাকড়ে দংশালে নাকি। দুই মুনিশ কখন বাড়ি ফিরেছে, আকালী ফিরল না ক্যানে? গিয়ে দেখি, তখনও

দোন বেয়ে জল ছেঁচছে। বলল, কাজ বাকি রেখে বাড়ি যাবে না আকালী। তো এই রকম মুনিশ ছিল তোর বাবা। বুঝলি কি না? আজকাল মুনিশজন বড় ধড়িবাজ।

চিরুনী চুপ করে থাকে। বাবার কথা তুলে ধনারিবুড়ো মন খারাপ করে দিচ্ছে কেন? আজ তার বড় সুখের দিন। মাসির বাড়ি অঘ্রানের গন্ধমাখা মিঠে ভাত খাবে। ধান পেকে ওঠার দিন থেকেই তার মাথায় খালি মাসির বাড়ির কথা স্বপ্ন হয়ে ভেসেছে। মা তো মাথা কুটলেও বোনের বাড়ি যাবে না। একা কেমন করে যেতে পারত চিরুনী? বড় ভাগ্য ধনারি মোড়লের বকনা গরুটা হারিয়ে গেল।

হিজলতলায় পৌঁছে লাঠি বাড়িয়ে ধনহরি মোড়ল জল মেপে পা বাড়ায়। তারপর ছেলেমানুষের মতো শীতে চমকখাওয়ার ভঙ্গি করে। উঁহু হু হু! কামড়ে দিলে রে কামড়ে দিলে! তখন পুকুরে ডুব দিলাম। এমন ঠাণ্ডা জল হলে মরেই যেতাম। মাঠঘাটের জলটা বেজায় ঠাণ্ডা হয়।

ওপারে একটা ভাঁটগাছের মাথায় কয়েকটা শামুকখোল চুপচাপ বসে আছে। পরশু মায়ের সঙ্গে চিরুনী এখানে এসে পাখিগুলোর পেছনে লেগেছিল। এখন ইচ্ছে করে না। খালি মনে পড়ে, বাবার সঙ্গে যেতে-যেতে এমনি করে সারাপথ কত গল্প শুনত। আর সেই গঙ্গার ঘাটে চাঁপাফুলের বাসছড়ানো মড়ার গল্পটা।

মোড়লও কি জানে সে গল্প? কিংবা কাঁদুনেদীঘির বটতলার সেই পেত্নীর গল্প—আকালীকে বলেছিল, আয়, তোকে বে করি? ও চিরুনী, মাকে যেন বলিস নে—শুনলে…

চিরুনী খিখি করে হেসে ওঠে জলের মধ্যে। ওপারে আলে উঠেছে মোড়ল। ঝটপট কাপড় সামলে লাজুক মুখে বলে, কী রে? হাসলি কেন? আমি বুড়োমানুষ।

লজ্জায় চিরুনী তক্ষুনি কাঠ। কথাটা বুঝতে পেরেছে। চোখের মাথা খেয়ে মোড়লের গতর দেখেছে নাকি সে? পেত্নীর কথা মনে হয়ে এ হাসি। উঠে গিয়ে বলে, মোড়লমশাই, কাঁদুনেদীঘির বটতলায় গেছ কখনও?

অবাক ধনহরি বলে, ক্যানে, ক্যানে?

বাবা একটা পেত্নী দেখেছিল।

ও। আকালী! ধনহরি মোড়ল পা বাড়িয়ে বলে। আকালী বড় গপ্পে মানুষ ছিল। ও পেত্নী দেখবে না তো দেখবে কে?

তুমি দেখনি মোড়লমশাই ?

ধনহরি হাসিমুখে বলে, ভূতপেত্নীর গল্প রেতের বেলা জমে। এখন দিনদুক্কুর বেলা। আয়, পা চালিয়ে আয় দিনি। এমন করে হাঁটলে ধামালিতলা পৌঁছুতে বিকেল গড়িয়ে যাবে।

ধনহরি মোড়ল থপথপ করে হাঁটে। একহাতে লাঠি, আর হাতে জুতো-জোড়া। এণ্ডির চাদর গুটিয়ে কাঁধে তুলছে। হাঁটুঅব্দি ধুতি গুটিয়েছে। পেছন থেকে তাকে লক্ষ্য করে চিরুনী। মোড়লপাড়ার এই সেরা মানুষটার সঙ্গে সে কী ভাগ্যে হাঁটছে। ফের তার সুখ বাজে মনে। কাঁধের পুরুষ্টু ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, কী থাকতে পারে ওর ভেতর ? গুড়-মুড়ি কি ? অনেকদূরের পথ। আসার সময় সেবার মাসি অনেক গুড়মুড়ি দিয়েছিল। বাঁধের রাস্তায় আসতে আসতে বাবা-মেয়ে গাছতলায় বসে পেট ভরে গুড়মুড়ি খেয়েছিল। নোলায় জল আসে চিরুনীর। কাল রাতে গমের আটা গুলে সেদ্ধ করে খেয়েছে মায়ে-ঝিয়ে। গুগলির ঝোল করেছিল। দিনের একটুখানি ভাতে জল ঢেলে সকালের জন্যে রেখেছিল। ভোরে উঠে যেটুকু খেয়েছে, কখন হজম হয়ে গেছে। ভগবান, ধামালিতলাকে শিগগির কাছে এনে দাও। চিরুনী তার মাসির বাড়ির দাওয়ায় বসে ভাপওঠা নতুন ধানের ভাত খাবে।

শীতের ধানের দিনে কত দূর কত গাঁয়ের মাঠে যায় ধানকুড়োনী মেয়েরা। গত শীতে চিরুনীরা মায়ে-ঝিয়ে যতদূর এসেছিল, তাও ছাড়িয়ে যেতে চিরুনীর চমক লাগে। গোপগাঁয়ের মাঠে মোষ চরাচ্ছে জলার ধারে এক যুবজোয়ান রাখাল। মোষের পিঠে বসে হাঁক মেরে বলে, মোড়লমশাই নাকি ? চললে কোথা গো ?

ধনহরি সূর্য আড়াল করে লাঠিসুদ্ধ হাত কপালে তোলে। চিনতে পেরে বলে, মুকুন্দ ! তোর মামার খবর কী ? ভাল তো ?

মুকুন্দ ফ্যাঁচ করে হাসে। ভাল। তা মোড়লমশায়ের পেছুতে উটা কে গো ? লতুন স্যাঙা করলে নাকি ? ই কী করেছ বাপু বুড়োবয়েসে ?

ধনহরি মোড়ল ঘুরে চিরুনীকে দেখে নিয়ে হা হা করে হাসে। তোর খালি ফচকেমি মুকুন্দ ! এটা আমার গাঁসম্পর্কে নাতনী।

ভাল, ভাল। রসিক মুকুন্দ হেঁড়েগলায় মোষ ডাকায়, ধোঃ ধোঃ ! জলার ধারে কাঁড়িঘাসের বন ভেঙে তেজী মোষটা ছোটে। বক তাড়া খেয়ে ওড়ে। মাথার উপর হটিটি পাখি ডাকে, টি টি টি।

চিরুনী রেগে লাল হয়ে চাপা গাল পাড়ে। ধনহরি মোড়ল বলে, বলুক না—বলুক। বলতে দে। মুখে বলছে বৈ তো না। তবে ছোঁড়াটা ওই রকম।

চিরুনী ফোঁসে। বলবে ক্যানে? এঁ্যা? চোখের মাথা খেয়েছে? দেখতে পায় না?

বলুক, বলুক। ছেড়ে দে। ধনহরি সান্ত্বনা দেয়।

চিরুনী বলে, গিয়ে মাকে বলব। মজা দেখিয়ে ছাড়বে।

ধনহরি ওর হাত ধরে টানে। দুগাছি কাচের চুড়ি ঠুনঠুন করে ওঠে। দূর পাগলী মেয়ে! তোর মা এ্যাদ্দূরে কি ঝগড়া করতে আসবে? আর একটা কথা বলি শোন্। মাঠঘাট জায়গায় সব ভালো-মন্দ কথা হাওয়ায় উড়ে যায়। গায়ে লাগতে পারে না। আয় দিকিনি পা ফেলে।

তবু দাঁড়িয়ে থাকে চিরুনী গোঁ করে। ধনহরি পিছিয়ে এসে বলে, অত রাগ করে না। তোর নাম চিরুনী কে রেখেছিল বলদিকিনি? চল্, তুই এবারে আগে আগে চল্।

বলে সে সুর ধরে ছড়া গায়, 'দোল দোল দুলুনি/রাঙা মাথায় চিরুনী/বর আসবে এখুনি…'

বুড়ো মোড়লের গলায় ছড়া শুনে মেয়েটার মনের কুটো ঘুচে যায়। আগে হনহন করে হাঁটতে থাকে। মনটা ভাল হয়ে যায়। ছোটবেলায় নাকি সে মায়ের মুখে এই ছড়া শুনে দুলত আর খিটখিট করে হাসত। তাই তার নামটা চিরুনী হয়ে গিয়েছিল। তার আসল নাম যে সাবিত্রী, তা আর যেন কারুর মনে নেই। শুধু বাবা মাঝে মাঝে সাবি বলে ডাকত। এখন বুঝতে পারে, বাবা বেঁচে থাকলে এতদিনে সে সাবিত্রী হয়েই যেত। চিরুনী নামটা তার তো পছন্দ নয়।

এখন ক্রমে ক্রমে বেলা বেড়েছে। রোদের হলুদ রঙটা ফিকে হতে হতে একটু সাদাটে হয়েছে। তাত বেড়েছে। চার পাশে এখন নতুন দেশের মাঠ। অচেনা মুখ। ধানক্ষেতের মুনিশরা তাকে দেখতে মুখ তুললেই চিরুনী চমকে উঠেছে, এই বুঝি ফের অকথা কুকথা বলে রসিকতা করে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। ধনারি মোড়লকে এরা চেনে না। তবু মোড়ল মাঝে মাঝে থেমে ধানের শীষ, হাওয়া-বাতাস, আর গত বৃষ্টির খবর নিতে ছাড়ছে না। সার নিয়ে কথাবার্তাও বলছে। এখন কিছুক্ষণ ধনহরি মণ্ডল খাঁটি চাষা।

জিরাণ্ডা-হরিপুরের বাঁয়ে পড়ল হরিণমারা বিল। বিলের মাঝ বরাবর উঁচু বাঁধ। বাঁধে উঠে ধনহরি বলল, আর পাক্কি তিনক্রোশের মাথায় ধামালিতলা। এই বাঁধটাই অন্ততপক্ষে ক্রোশ দুই। এবারে আস্তে-সুস্থে হাঁটি আয়। তারপরে একখানে গাছতলায় বসে গুড়মুড়ি খাব। নিচে টলটলে জল। দু' আঁজলা খাব। বাস্!

বলে সে হাওয়া বাঁচিয়ে এতক্ষণে দ্বিতীয়বার বিড়ি জ্বালে। উঁচু বাঁধের দুধারে গাছগাছালি ঝোপঝাড় রয়েছে। দু পাশে আদিগন্ত বিল—সবুজ, ধূসর, কোথাও কালচে। দূর গ্রামরেখা জুড়ে ঘন কুয়াশা লেগে আছে এখনও। জন নেই, মানুষ নেই, বড় নিরিবিলি এই দেশ। চিরুনী ভাবে, মাকে নিয়ে এখানে এলে কত মাছ ধরতে পারত। কত পাটকাঠি কুড়িয়ে নিয়ে যেত। এখানে আসতে পারলে মানুষের অভাব ঘুচে যায়। কত শাক, কত মাছ শামুক ঝিনুক! হরিণমারা বিলের গল্প ফিরে মাকে গিয়ে বলবে সে।

কী রে? কথা বলছিস না যে? ধনহরি মোড়ল শুধোয়। কী হল তোর? ও চিরুনী?

চিরুনীর মুখে হাসি ফোটে। বলে, চিরুনী-চিরুনী কোরো না তো বাপু! আমার নাম সাবিত্তিরি!

সাবিত্তিরি! ধনহরি বিড়ির ধুঁয়ো উড়িয়ে হাসে। ভাল ভাল। তা অমন ঝিম মেরে গেলি যে?

চিরুনী চঞ্চল হয়ে বলে, ও মোড়লমশাই! এদেশের নাম হরিণমারা ক্যানে গো?

ধনহরি বলে, বলছি। বলব। আস্তে সুস্থে হাঁট দিকিনি। সে বড় মজার গল্প।

বাঁধের মাথায় পায়ে চলা একফালি সংকীর্ণ রাস্তা। ধনহরি পাশাপাশি হাঁটে। চিরুনী সরতে গেলে সে সাবধান করে দেয়, কাঁটা! কাঁটা দেখছিস না—কত কাঁটানটের ঝাড়?

হরিণমারা ক্যানে তাই বলো না মোড়লমশাই?

ধনহরি মোড়ল কথকঠাকুরের ভঙ্গীতে মুখ তুলে ভরাট গলায় বলে, সে অনেক কাল আগের কথা। এই বিল তখন বিল ছিল না। ছিল এক গহীন জঙ্গল। বাঘ থাকত। কত জন্তু থাকত। আর থাকত হরিণ। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। রাজা লাট-বেলাট এসে বন্দুকে বাঘ মারে। হরিণ মারে। মারতে মারতে জঙ্গল উজোড় করে দিলে। তো সেবারে এক লাট-

বেলাট না কালেক্টর এসেছেন শিকারে। জঙ্গলে তখন মোটে এক থাকে হরিণ। তাড়া খেয়ে ছুটল সে হরিণ। ছুটল, ছুটল, ছুটল...

চিরুনী দেখল মোড়লমশাই তার কাঁধে একটা হাত রেখেছে। লাঠিটা বগলে সামলেছে। চিরুনী আনমনে বলল, তাপরে ?

হরিণ তো ছুটছেন। ইদিকে এক চাষা পুরুষ জঙ্গল কেটে ক্ষেত করেছেন। কুঁড়ে বেঁধেছেন। নিরিবিলি তিনি সেখানে আছেন। হরিণ গিয়ে তেনার কুঁড়েতে আশ্রয় নিলে। তখন বন্দুকবাজ সাহেব এসে তাকে বললে, কৈ হরিণ ? চাষা বললে, মারলে আমাকেই মারুন। হরিণ পাবেন না।

চিরুনী মুগ্ধ হয়ে বলে, তা'পরে ? ও মোড়লমশাই। তাপরে কী হল ?

ধনহরি মোড়ল বলে, সায়েব তাকেই গুলি মারলে।

মানুষকে ? চিরুনী চোখ বড় করে বলে।

হুঁ, বলছি শোন্ না। ধনহরি রহস্যময় হাসে। যেই না গুলি মেরেছে, দেখে কী—মানুষ কি ? চাষা কৈ ? এটাই তো হরিণ।

মানুষটা হরিণ হয়ে গেল ? আর হরিণটা কী হল মোড়লমশাই ?

হরিণ তখন কুঁড়ে থেকে মানুষ হয়ে বেরিয়ে বললে, আরে রে পাপিষ্ঠ ! আমার হরিণাকে তুই গুলি মারলি ! তোর হাত থেকে বন্দুক খুলবে না। বাস্ ! আর খুলল বন্দুক। কলকেতা যেয়ে হাত দুটো কেটে তবে বন্দুক খুলেছিল ডাক্তারবাবুরা। বুঝলি তো ?

চিরুনী কিছু বুঝতে পারে না। ধনারি মোড়ল তার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে, এরও কিছু বুঝতে পারে না। গল্পটার চেয়ে পেটে খিদের টান বেশি। মোড়ল বলেছে গুড়মুড়ি খাবে গাছতলায়। সেই গাছটা কখন সামনে আসবে, তার প্রতীক্ষায় ধুকুপুকু হাঁটে সে।

ধনহরি বলে, এ বড় কঠিন জায়গা রে চিরুনী ! এখানে কে কোন বেশে আসে-যায়, ঘুরে বেড়ায়, তার নির্ণয় নাই। একবার ধামালিতলা থেকে আসছি। বনমালী বললে, রেতের বেলা যেয়ে কাজ নাই। আমার কি থাকলে চলে ? বেরিয়ে পড়লাম। মাঝ বরাবর এসে দেখি...

থামতে দেখে চিরুনী বলে, কী ?

ঠিক তোর বয়সী একটা মেয়েছেলে আগে আগে হনহন করে হাঁটছে। ধবধবে জোসনা। পষ্ট দেখছি। সঙ্গ ধরার চেষ্টা করছি। পারি না।

চিরুনীর হাসি পেল। ঠোঁট উত্তুরে হাওয়ায় শুকিয়ে চিমসে। ফেটে আছে। ক্লান্তিও এসেছে খিদের সঙ্গে। কষ্টে হেসে বলে, ও মোড়ল! আমি যদি সে হই?

ধনহরি তার কাঁধ সাবধানে টিপে বলে, তবে পরখ করে দেখি। মানুষ, না অমানুষী?

কাতুকুতু লাগছে মোড়লমশাই!

ধনহরি মোড়ল বলে, আহা শোন না গল্পটা! শেষে ছুটতে লাগলাম। তাপরে বেটিকে এমনি করে দু হাতে ধরে ফেললাম।

চিরুনীকে জুতোসুদ্ধ অন্য হাতেও পেঁচিয়ে মোড়লমশাই এত জোরে ধরে যে মেয়েটা হাঁসফাস করে। ছটফট করে নড়ে। ধনহরি হাসতে হাসতে ছেড়ে দিয়ে বলে, বেটি কিন্তু তখন একেবারে বাতাস হয়ে গেছে। বুঝলি?

চিরুনী ছাড়া পেয়েই এগিয়ে গেছে। ধনারি মোড়লের গায়ে এত জোর, সে ভাবতে পারে নি। হবে বৈ কি। ভাতের কষ্ট তো পায় নি আজীবন। তার ওপর কত দুধ-ঘি খেয়েছে। পুকুরে কত বড় বড় মাছ ওর। না ছেলে, না পুলে—অত সব খাদ্য মাগ-ভাতারে সাবাড় করে। চিরুনীর মনে দুঃখ হয়। দুঃখে সে মুখ নিচু করে হাঁটে। কিছুক্ষণের জন্যে গুড়মুড়ি কিংবা মাসির বাড়ির শীতের ধানের ভাপওঠা স্বাদু অন্নের কথাও সে ভুলে যায়। তার চোখে জল এসে যায় ধনহরি মোড়লের সুখের কথা ভেবে।

ধনহরি ডাকে, অ চিরুনী! নাকি সাবিত্তিরি বলব? সাবিত্তিরি!

উঁ?

তখন গুন্নুটির মাঠে ছুটে এসে সঙ্গ ধরলি, হঠাৎ ঘুরে তোকে দেখে আমি চিনতেই পারিনি।

চিরুনী কিছু বলে না। হেঁট হয়ে একটা ঝোপের পাতা ছিঁড়ে কামড়ায়।

বিশ্বেস কর্। চিনতেই পারি নি। ধনহরি ভারি গলায় বলে। আর ছামুতে হেঁটে যাচ্ছিস—মাঝে মাঝে ভরম লাগছে, না জানি এ মেয়েটা কে।..

ধনহরি কোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ফের বলে, গেরস্থ জমিজিরেতওলা ঘরের মেয়ে অনেক আছে বটে। কিন্তুক মুনিশখাটা মানুষের ঘরে এমন সোনা কোথা আছে? দেখি না সংসারে। রোদে সোনা যখন ঝলমল করে, তখন এ বুড়ো চোখে বড় বাজে।

মাথা দোলায় ধনহরি মোড়ল। গলার ভেতর বলতে থাকে, বয়স তো কম হল না। কত দেখলাম। আর তার চেয়ে বড় কথা, এ বিল-বাদাড় নিরিবিলি জায়গায় এসে খালি ভাবি, ই কি মানুষ, না অমানুষী? দিনে তো জোসনা ওঠে নি রে! নাকি উঠেছে?

চিরুনী বলে, ও মোড়ল! অমন করে কথা বলো না বাপু! আমার ভয় লাগে।

ভয়! কিসের ভয় সাবিত্তিরি? ধনহরি একটু হাসে। আমি মানুষ বটি। তবু মনটা কেমন লাগে। কী ভাবি। কী হুলুস্থুলুস মনের ভেতর! শরীলটা বড় ভারি লাগে। ক্যানে এমন লাগে কে জানে!

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে সে বগলের লাঠিটা এতক্ষণে হাতে নেয়। তারপর বলে, ওই গাছটার তলায় বসে আমরা মুড়ি খাব। দুপহর হয়ে এল। খিদে পেয়েছে। তোর পায় নি?

চিরুনী ঘুরে কাতর হেসে বলে, হুঁউ।

সকালে কী খেয়ে বেরিছিস?

চিরুনী আস্তে বলে, পান্তা।...

নিচে হরিণমারা বিলের জলে শালুকপাতার ভেতর ঘুরে ঘুরে খেলছে পানকৌড়ি। দূরে ওড়াউড়ি করছে বালিহাঁসের ঝাঁক। ঝাঁকড়া জামতলায় বাঁকা রোদে এসে খটখটে ন্যাড়া মাটির ওপর শুয়ে আছে। তার চারদিকে ঘন ছায়া। জাম জিয়ালা হিজলের জড়াজড়ি বাঁধের দুধারে। ধনহরি বলে, বড় ভাল জায়গা। সে পা ছড়িয়ে রোদে বসে। লাঠি জুতো যত্ন করে পাশে রাখে। এণ্ডির চাদর কোমরে জড়ায়। তারপর ব্যাগ থেকে ন্যাকড়ার পুঁটুলি বের করে। তার ফুলো চোখ দুটো, তার ভরাট গাল, পুরু গোঁফ ডগমগ করে আহ্লাদে। বলে, দাঁড়িয়ে ক্যানে? আয় ইখেনে আয়। পাশাপাশি বসে দুই জনাতে গুড়মুড়ি খাই। আর ওই দ্যাখ, নামুতে টলটলে জল। ভাল না?

চিরুনী জলটা আড়চোখে দেখে নিয়ে বসে। আঁচল পেতে বলে, কৈ দাও!

পাগলি! ধনহরি হাসে। আজ আমরা এক পথের পথিক। এক ঠাঁই খাই। সঙ্গে খা।

পুঁটুলি খুললে চাপ চাপ সোনালী গুড়ের জমাট পিণ্ড আর লম্বাটে ঝকঝকে সাদা মুড়ি দেখে চিরুনীর ঘোর লাগে। তবু সে দোনামনা করে। মোড়ল-মশাই! একসঙ্গে খাব ক্যানে? আঁচলে দাও।

ওর দুটো চুড়িপরা হাত টেনে পুঁটলির মধ্যে গুঁজে দেয় ধনহরি। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, জাত খেলে যায় না, বললে যায়। আর এই নিরিবিলি ঠাঁই জাতের কথায় কাজ কী মানিক? খা। পেরানে যত চায়, খা।

তারপর নিজের মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বলে, আউৎকুলি ধানের নাম শুনেছিস? সেই ধানের মুড়ি।

গুড়টা বুঝি গত মরসুমের। স্বাদে আপ্লুত মেয়েটা কৃতজ্ঞ চোখে তাকায় মোড়লমশাইয়ের দিকে। মোড়লমশায়ের দু' চোখে অগাধ হাসি। গোঁফ দুলছে। মাঝখানের ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিটকে যাচ্ছে মুড়ির কণা। তার মধ্যে কথাবার্তাও বলছে। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। ক্রমশ চিরুনীর মনে হতে থাকে, মাঠে ঘুরে ঘুরে তার মা যে মাঠের দেবতার কথা বলে, যে দেবতা গরীব-দুঃখী মানুষকে খাদ্য দেয়, পাখপাখালিও যার দয়ায় শস্যদানা খুঁটে খেয়ে বেঁচে থাকে, আজ বড় ভাগ্যে আদ্যিকালের সেই মাঠ-ঠাকুর তার সামনে এসেছে। পরম সুখে তার হৃদয় টলটল করে।

আর ধনহরি মোড়ল বাঁ হাতে তার কাঁধ ধরে টানে। বলে, কাছে বসে খা। কাছে বসে খা!

সেই টানে কৃতজ্ঞ মেয়েটা ধনহরি মোড়লের থলথলে গতরের সঙ্গে সেঁটে যায়। মোড়লের সেই হাতটা তার কাঁধ পেরিয়ে বুকের দিকে নামতে থাকে। মোড়ল ঢোক গিলে বলতে থাকে, লজ্জা করিস না। খা। যত মন চায়, খা।

তার বুকের মাংসের ডেলায় পড়ে মোড়লের থ্যাবড়া হাতের মোটা আঙুল গুলো। মোড়ল ফের বলে, লজ্জা করিস না। খা—যত মন চায়।

চিরুনী একবার ভাবে, সরে বসবে—আবার ভাবে, মোড়লবুড়োর মুড়ি আর গুড়টা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তবু তার মুখে লালচে ছটা ফোটে। লজ্জা-দ্বিধা-শঙ্কা তার বুকের ভেতরটা কাঁপায়। সে সরে বসে না। বাধা দিতে পারে না। যতক্ষণ খাদ্যটা না ফুরোয়, ধনহরি তার শরীর নিয়ে খেলে। তারপর সে ফুলো চোখদুটো ও পুরু ভুরু নাচিয়ে বলে, বেশ ডাগর হয়েছিস সাবিত্তিরি! আমি বুড়ো না হলে তোকে স্যাঙা করে পালিয়ে যেতাম।

চিরুনী আস্তে বলে, ছাড়ো! তারপর দৌড়ে বাঁধ থেকে নেমে যায় জলের ধারে। শুকনো পাটকাঠির পাঁজার ওপর বসে সামনে ঝুঁকে আঁজলাভরে ঠাণ্ডা হিম জল গিলতে থাকে। একটু পরে তার গায়ে ছায়া পড়ে ধনহরি মোড়লের। মোড়ল তার পাশে বসে তেমনি করে জল খায়। বলে, জলটা বড় ভাল।

চিরুনী ঢেকুর তোলে দাঁড়িয়ে। তৃপ্তির চোখে সে হরিণমারা বিলাঞ্চল দেখতে থাকে। দূর ধূসর সীমায় হট্টিট্টি পাখির ডাক শোনে ট্টি ট্টি ট্টি ট্টি ট্টি ট্টি! ফাঁকা জলটার ওপর জল-মাকড়সার ছুটোছুটি দেখতে দেখতে তার মনে হয়, হঠাৎ বয়সটা তার বেড়ে গেছে। মাসির বাড়ির দাওয়ায় বসে শীতের ধানের সুগন্ধ ভাপওঠা ভাতের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সে ডাগর যুবো মেয়েটি হয়ে উঠবে।

আর ধনহরি মোড়ল মুখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে ফের তার কাঁধে হাত রাখে। আস্তে বলে, এবার চল একটুখানি জিরিয়ে নিই। পা দুখানা ধুয়ে বড় আরাম লাগছে। তুই পা ধুলেও পারতিস সাবিত্তিরি। কথায় বলে, কোশ অন্তর ধুয়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

বলে সে হেঁট হয়ে চিরুনীর পা দেখে। বলে, বড় সুন্দর তোর পা। ধো। ধুয়ে নে।

চিরুনী আনমনে বলে, থাক। সে দেখে, মোড়লমশাই ওপর থেকে জুতো-লাঠি তো এনেছেই, তার গুটিয়ে রাখা ফ্রকটাও এনেছে। চিরুনী ফ্রকটা নিতে হাত বাড়ালে ধনহরি হেসে সেটা নিজের ব্যাগে ভরে। তারপর ঢালু ঘাসের ওপর তার কাঁধ ধরে হাঁটতে থাকে। বাঁধের রাস্তায় না উঠে ধনহরি সামনে এগিয়ে শেয়াকুল নাটাবনের কাছে যায়। মিইয়েপড়া ধূসর ও হলুদ ঘাসের ওপর ধুপ করে বসে পড়ে। রোদের আরাম আছে এখানে। চিরুনী বসে বলে ধামালিতলা আর কদ্দূর মোড়লমশাই?

ধনহরি বলে, ধামালিতলা কি পালিয়ে যাচ্ছে? সে এণ্ডির চাদরটা ঘাসে বিছিয়ে নেয়।

চিরুনী বলে, ও কি মোড়লমশাই? তুমি শোবে নাকি গো?

ধনহরি হাসে···আয়, তুইও শো। রোদটা মিষ্টি।

চিরুনী মাথা দোলায়। মুখ ঘুরিয়ে দূরে দৃষ্টিপাত করে। হট্টিট্টি পাখিটা তার মাথার ভেতর ডাকতে থাকে। নাকের ফুটো ফুলে-ফুলে ওঠে। ক্রমে কী এক অজানা ভয়ে তার শরীরটা কাঠ হয়ে যায়।

ধনহরি তার হাত ধরে কাছে টেনে ফিসফিস করে ফের বলে, আয়। শুই!

সে চিরুনীর বুকের মাংসে ফের হাত ঢোকাতে চেষ্টা করে। এবার চিরুনী ছটফট করে বলে, না।

লজ্জা কী? ধনহরি মোড়ল সাপের মতো শব্দ করে। ক্ষেতিটা কী? আমি বুড়োমানুষ! আমি বুড়োমানুষ।

চিরুনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে একটু একটু ফুঁপিয়ে কাঁদে। বার বার বলে, ন্না-ন্না-ন্না।

ধনহরি মোড়লও ছটফট করে বলে, আমার মনে সুখ নাই। শান্তি নাই। সাবিত্তিরি রে। মাথার ঘায়ে আমি কুকুর পাগল। আমাকে একটুখানি শান্তি দে। তোর পায়ে পড়ি সাবিত্তিরি রে!

তারপর সে হাঁফাতে হাঁফাতে চিরুনীর পরনের কাপড়টা টানাটানি করে। চিরুনী চেরা গলায় চেঁচিয়ে কাঁদে—ন্না। কিন্তু ধনহরি মোড়লের গায়ের জোরে সে পারে না। মোড়লের থ্যাবড়া হাতটা তার মুখে পড়ে। মোড়ল সমানে গোঙায়—একটুখানি···এটুকুন···আমি বুড়োমানুষ। সাবিত্তিরি রে, তোর পায়ে পড়ি। এবং ধনহরি তার পায়েই পড়তে যায়।···

এ্যাই শালো!

শীতের রোদে গায়ে ঠাণ্ডাহিম লম্বাটে এক অতর্কিত ছায়া পড়েছে ধনহরি মোড়লের। সে ঝটপট নড়ে বসে। ছিটকে ঘোরে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

এ্যাই বুড়ো শালো!

ঢ্যাঙা উঁচু একটা কালো লোক, পরনে প্রায় কপনির মতো ন্যাকড়া, হাতে একটা কাস্তে—তার মাকুন্দে মুখে সূর্যটা জ্বলছে। তার মাথায় একটা ঘাসের বোঝাও আছে। কাস্তে দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে এবার কাস্তেটা বাড়িয়ে বলে, কেটে বিলের জলে ভাসিয়ে দোব।

চিরুনী ছাড়া পেয়ে শাড়িটা গুছিয়ে পরছে। ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। তাকে দেখে নিয়ে ঘাসকাটা লোকটা ফের বলে, বুড়ো ঢ্যামনা!

ধনহরি গোমড়া মুখে উঠে বসেছে। ঘড়ঘড় করে বলে, সম্পর্কে নাতনি। এটুকুন ঠাট্টাইয়ার্কি করছিলাম। তা তোমার কী বাপু?

চো-ও প! কাস্তে তুলে গর্জায় ঢ্যাঙা ভুতুড়ে চেহারার লোকটা। বলে, বাড়ি কোথা?

ধনহরি দাঁড়িয়ে পায়ে জুতো ভরতে ভরতে বলে, গুন্নুটি। গালমন্দ কোরো না—ভাল হবে না। আমার শালা ধামালিতলার বনমালী!

সে-কথায় কান না করে লোকটা চিরুনীকে বলে, ওগো বাছা। এ বুড়ো-শালার সঙ্গে জুটেছিলে ক্যানে?

চিরুনী ফুঁপিয়ে বলে, আমি মাসির বাড়ি যাব ধামালিতলা। মোড়লমশায় বললে যাবে—তাই।

ধামালিতলায় কে তোমার মাসি? নাম কি মেসোর?

চিরুনী চোখ মুছে বলে, বিন্দাবন।

ও বিন্দাবন! লোকটা লাল চোখে ধনহরিকে দেখে নিয়ে বলে, আর ই লম্পটের সঙ্গে যেও না। যাবে তো এস—আমি থাকি গড্ডাতে। ধামালিতলার পাশের গা। যাবে আমার সঙ্গে? বিন্দাবনের বাড়ি আমি তো যাব না। ঘাস বেচতে যেতে হবে মেদিপুর বাজারে। তবে বউটা আছে ঘরে। সঙ্গে করে রেখে আসবে। যাবে?

চিরুনী মাথা দোলায়। তারপর বুক ফেটে কেঁদে বলে, যাব।

ধনহরি মোড়ল থপথপ করে বাঁধের ওপর উঠে যাচ্ছে। মোষের মতো ঝোপঝাড় ভেঙে। চিরুনী গড্ডা গাঁয়ের ঘাসকাটা লোকটার পেছন পেছন হাঁটে। লোকটা বলে, আমার সঙ্গেতে নির্ভয়ে এস মা-জননী। ভয় রেখো না। তবে কথা কী আমার সঙ্গেতে সুপথ পাবে না। জলকাদা ঝোড়-জঙ্গল ভাঙতে হবে। কষ্ট হবে এট্টুকুন।

লোকটার পিঠে দাদ। এ শীতেও ঘাম জমেছে। ঘাসের কুটো আটকে আছে। পাছার ফাঁক দিয়ে ন্যাকড়ার কপনি বেঁকে গেছে এর দুটো তাল উদোম। দুই ঢ্যাঙা জোরালো পা এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে। চিরুনীর খালি ভুল হয়, এই যেন তার মরা বাপের পেছন দিক। ওই তো সেই রকম দাদ, ঘামে ঘাসের কুটো, পাছার তালদুটোতে ঘষটানো কালো ছোপ। চিরুনী ধরা গলায় বলে, আমার কষ্ট হবে না। আমার কিছু হবে না।

আসলে সে বলতে চায়, এ রকম মাঠঘাট খালবিল বনবাদাড় ভেঙেই তো সে বেড়ে উঠেছে। এ রকম ভাবেই তো তার বাপের পেছন পেছন হেঁটেছে গুন্নুটির বিলের মাটিতে। লোকটার উদ্দেশে তার মাথা কুটতে ইচ্ছে করে, তুমি আমার বাপটা! আমার মরা বাপটা। আবার কতদিন পরে তেমন নির্ভয়ে ও সুখে হাঁটছে চিরুনী।

লোকটা বলে, আমার নাম ভূষণো। গড্ডার ভূষণো। তোমার মেসো বিন্দাবনও আমাকে চেনে। এই তো সেদিন ওর জমিতে ধানকাটার মুনিশ হয়ে খাটলাম। এবার ধামালিতলায় ধানের খবর ভাল।

চিরুনী পাখির গলায় কলকলিয়ে বলতে থাকে, মাসির বাড়ি নতুন ধান উঠেছে তো। তাই মা বললে মাসির বাড়ি যা। নবান করে আয়। নবানের দিন বেউলোর পালা হয় ধামালিতলায়।

হয় বটে। হবে।

আমাদের জমিজিরেত নাই তো। তাই নবান করতে মাসির বাড়ি যাই। আঘুন মাসে নতুন ধান ওঠে। উঠোনে গোবরছড়া দেয় মাসি। আঙা মাটি দিয়ে ঘরের দেয়াল লাল করে। নতুন আতপ চালের আটা গুলে পদ্ম ফুল আঁকে মাসি। মা লক্ষ্মীর পা আঁকে। আমোও সেবার মাসির সঙ্গে এঁকেছিলাম।

তুমি এঁকেছিলে?

ঢোক গিলে শুকনো ঠোঁট চেটে চিরুনী বলে, হুঁউ। তারপরে... বলেই সে চুপ করে যায়। দূরে বাঁধের দিকে তাকায়। লোকটা ঘুরে বলে, কী?

আমার ফক!

ফক?

ফকটা মোড়লমশায়ের বেগে আছে।

থাক্। মাসিকে বললে নতুন ফক কিনে দেবে না?

দেবে।

তাইলে আর কথা কী? ও ফক ছুঁয়ো না।

ফকটা ছেঁড়াখোঁড়া।

তাইলে আর কথা কী? বলে ঘাসকাটা ভূষণো হলুদ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে হাঁটে। তারপর চলার গতি বাড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, একটু-খানি কষ্ট করে পা চালাও মা-জননী। মেদিপুর বাজারে যেতে বেলা হয়ে গেল।

পেছনে পাখির মতো উড়ে চলে মেয়েটা। মাসির বাড়ির রাঙানো দাওয়ায় বসে শীতের ধানের ভাপওঠা সুগন্ধ ভাতের কথাটা তীব্রভাবে আবার মনে পড়ে গেছে।

আলো

হরিমাটির কদমতলায় টাক দাঁড় করিয়ে শিবু রানাকে ইশারায় বলে যায়, দেরি হবে না। রানা বোবা-কালা ছেলে। শিবুর হিসেবে বছর বিশেক বয়স। তাগড়াই চেহারা। আড়াইমণী বস্তা একা ট্রাকের খোলে ওঠাতে-নামাতে একটুও হাঁফায় না। শিবু চলে গেলে সে আপন মনে নিঃশব্দে হাসে।

ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে হেমলতার বাড়ি যেতে যেতে শিবু ঠিকই টের পায় রানা হাসছে। ঘুরে গিয়ে দাবড়ানি দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সময় নেই।

একটেরে হেমলতার বাড়িটা একতলা পুরনো দালান। বারান্দা জুড়ে গ্রিল লাগানো হয়েছে চোরডাকাতের ভয়ে। উঠোনের ধানের মরাই আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হেমলতার কাছে নিজের প্রাণটার দাম বেশি। তার স্বামী তারানাথ ছিল রোগা মানুষ। চল্লিশের আগেই তার শরীরের ভাঙা খাঁচা গলিয়ে প্রাণপাখি আকাশে উড়ে গেছে। হেমলতা কোমরে আঁচল জড়িয়ে জোরালো-ভাবে বেঁচে থাকতে চায়। স্বামীর মতোই সে যথেষ্ট সুদ খায়। তার মরাইয়ের একমণ ধান চাষীর খামার থেকে দেড়মণ হয়ে ফিরে আসে। তারানাথ যে ট্রাকটা লাখটাকায় কিনে রেখে গেছে, সেটার ভাড়ার হিসেবে পাইপয়সা শিবুর কাছে বুঝে নিতে হেমলতা কোমল হয় না। তার কাছে ব্যবসা হল ব্যবসা। ব্যবসার সঙ্গে ভাব-ভালবাসার সম্পর্ক নেই।

এদিন শিবু দেখল, হেমলতার মেজাজ আর চেহারা দুইই কোমল। সরু নকশিপাড় একরঙা ফিকে নীল শাড়ি পরে বারান্দার খাঁচার ভেতর বসে আছে চেয়ারে। শিবুকে দেখে হাসল সে। আহা রে সুখের ময়নাপাখি!

শিবু সোজা বারান্দায় ঢুকে বলে, লোহাপুরে কাল গোটা দিনটা গচ্চা গেছে। টায়ারের অবস্থাও শোচনীয়। রাত ন'টায় গ্যারেজ থেকে বেরোলাম। তখন আর কী করব? থেকে গেলাম বদ্রীদাসের গদিতে।

চৈত্রের সকালবেলায় নিঃঝুম হয়ে আছে চারদিক। কোত্থেকে নিমফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। হেমলতা যেন কিছু শোনে নি, এমন ভঙ্গীতে বলে, বসো। চা-ফা খাবে নাকি?

নাঃ। একটা কথা বলতে এলাম।

গাড়িতে রানা নেই?

আছে।

তাহলে বসো। হেমলতা ওঠে। হাল্কা পায়ে উঠোনে নেমে যায়। তারপর শিবু দেখে, সে সদর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

শিবুর শরীরটা কেমন করে ওঠে। তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। জুলপিতে পাক ধরেছে। এ বয়সে শরীরটা খুব মূল্যবান হয়ে ওঠে নিজের কাছে। ভেবেচিন্তে বাছবিচার করে সে খাটাতে ইচ্ছে করে। সে হাসবার চেষ্টা করে বলে, বতন কোথা গেল ?

বাজারে গেছে। ফিরতে দুপুর হবে।

নেত্যর মা ?

ছুটি নিয়ে মেয়ের বাড়ি গেছে—সেই রূপপুরে।

তাই বলো ! শিবু সিগারেট বের করে।···তা অমন করে দরজা খুলে রেখেছিলে যে ? চোরডাকাত ঢুকতে পারত।

হেমলতা চোখে হেসে বলে, দরজায় দাঁড়িয়ে তোমাকে আসতে দেখছিলাম।

ও। বলে শিবু সিগারেট ধরায়। তার হাত কাঁপছিল। বরাবর কাঁপে।

হেমলতা তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে দেখতে দেখতে বলে, তোমার আজ কী হয়েছে ?

কী হবে ? একটা কথা বলতে এলাম।

আজ আমার কথা শোনার মন নেই।

শিবু সিগারেটের ছাই ঝেড়ে মুখ নামিয়ে বলে, মনের কথা যদি বলো, আমারও নেই। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। মশা ছিল না। কিন্তু চারদিকে বস্তাভর্তি খন্দের গন্ধ। ভাবলাম গাড়িতে গিয়ে শোব। তো রানাকে ওঠানো কঠিন।

হেমলতা আস্তে বলে, এবেলা ঘুমিয়ে যাও। বিছানা করে দিই।

রানা ?

রানা মরুক ! বলে হেমলতা ঘরে ঢুকে যায়।

শিবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানতে টানতে ঘামে। তারানাথের গন্ধ এ বাড়িতে এখনও মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে আসে। সেটা ওই নিমফুলের মতো নয়। ঘাম ও রক্তের কটু গন্ধ। শিবুর বাবা ভরত তারানাথের বাবা ক্ষেত্রনাথের মাহিন্দার ছিল। জমিজমা গরুবাছুর দেখাশোনা করত। প্রয়োজনে বাড়ির জন্য ইঁদারা থেকে জলও তাকে তুলতে হত। খাটতে-খাটতে ভরত যক্ষ্মারোগে মারা পড়ে। ক্ষেত্রনাথ কালীতলায় তার নিজের বাড়িতে রেখে এসেছিল। মাঝে মাঝে গিয়ে দু'চার টাকা দিয়ে আসত। কখনও কয়েকটা

ফল-পাকড়। সে শিবুকেও চেয়েছিল। শিবু বাড়ি পালিয়ে এই রুটে মোটর-গাড়ির ড্রাইভারদের সঙ্গে ঘুরত। তাদের পা টিপে দিত। পাকা চুল তুলত। কেউ-কেউ তাকে রাতবিরেতে জড়িয়ে ধরে শুয়েও থাকত। শিবুর চেহারাটা তখন ভারি নরম আর মেয়েলি ছিল। সেই সব কষ্ট, শারীরিক অপমান আর জলবায়ুর ঘা খেয়ে শিবু পরবর্তী সময়ে খুব পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

এখন শিবু কালীতলায় সব চেয়ে পয়সাওলা লোক। দশ বিঘে ধানী জমি, ছোটখাট পুকুর, একটা জাঁতাকলের মালিক। তারানাথের এই টাকটা শেষপর্যন্ত কিনে নেওয়ার স্বপ্নও দেখে সে। একটু ধৈর্য ধরলে স্বপ্নটা সফল হবে ভেবে হেমলতার খেয়াল বরদাস্ত করতে পিছপা নয়। এখনও সে নিজে ড্রাইভারি করে। এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় মাল পৌঁছে দিয়ে ভাড়া কামায়। ফি-মাসে হেমলতাকে শুধু হাজার চারেক টাকা গুণে দিয়েই খালাস। মেরামত, ডিজেল সব খরচ তার। কিন্তু দৈবাৎ চাইলে হেমলতা ধার হিসেবে হাত উপুড় করে এবং এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে হেমলতা সুদ চায় না।

চায় না, কিন্তু অন্যভাবে উসুল করে তো নেয়ই। শিবুর শরীর। ভাব-ভালবাসার কথা অবান্তর। শিবু ওসব কথা আদপে ভাবে না। তাছাড়া হেমলতা কিছু আহামরি চেহারার মেয়ে নয়। খুব সাবধানে সে যৌবনের দড়ি ধরে একটা মারাত্মক সাঁকো পেরুচ্ছে, তলায় গভীর খাদ। গায়ে-গতরে যতখানি ছিল, তারানাথ—রোগা, কিপটে, সন্দেহপ্রবণ তারানাথ সেটুকু জ্বালিয়ে ছাই করে গিয়েছিলো। সেই ছাই থেকে আবার সবুজ ঘাসের মতো কিছু একটা গজিয়ে উঠেছে হেমলতার শরীরে। তবু শিবুর চোখে তত রঙ ধরে না।

হেমলতার ডাকে শিবুকে যেতে হল। সিগারেট ঘষটে মেঝেয় নিভিয়ে ঘরে ঢুকে সে দেখল বিশাল খাটের পাশে দাঁড়িয়ে হেমলতা আলগোছে চুলটা বেঁধে নিচ্ছে। বলল, ঘুমিয়ে নাও। রান্না চাপাই গে। খেয়েদেয়ে যাবে। রানাকেও ডেকে আনবে'খন।

শিবু বিছানায় তারানাথের সেই গন্ধটা পায়। কিন্তু কী আর করা! পা ঝুলিয়ে বসে বলে, চারটে টায়ার না বদলালে নয়। নৈলে গাড়ি বসে যাবে। কী গাড়ি কিনেছিল মাইরি তারাদা! সেই নতুন থেকে হাল্লাক করে দিলে।

হেমলতা কুলঙ্গীতে লক্ষ্মীর ঝাঁপির তলা থেকে চাবি বের করে। আলমারি খুলে সে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করে ড্রেসিং টেবিলে রাখলে শিবু বোতলটা দেখে বলে, যা ছিল তাই। খাওনি দেখছি।

ঘুম এলে একটু খাই।

মনে তো হয় না।

মাসখানেক আগে ব্র্যাণ্ডির পাঁইটটা শিবু এনে দিয়েছিল। ঘুম হব না বলেই তখন ওষুধ-খাওয়া করে খায়। শিবু বলেছিল, জল মিশিয়ে নিও। প্রথম-প্রথম একটু খারাপ লাগবে। তারপর সয়ে যাবে।

হেমলতা তাকে অবাক করে দিয়েছিল। শিবুর সন্দেহ হত, তারানাথের বউ কোন ঘরের মেয়ে?

শিবু দেখেছে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা সবকিছু ঝটপট শিখে নিতে পারে। হেমলতা কাচের গ্লাসে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে সঠিক পরিমাণে জল মিশিয়ে শিবুকে দেয়। শিবু বলে, তুমি?

আমি কি ঘুমুব নাকি?

শিবু হাসে। তুমি কি ভেবেছ এটা ঘুমের ওষুধ? এ তো মদ।

জানি।

শিবু গেলাস এগিয়ে বলে, তুমি প্রসাদ করে দাও।

হেমলতা আস্তে বলে, বাব্বা। তারপর একচুমুক গিলে খাটের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। শিবুর খাওয়া দেখে। চোখে হাসি।

গেলাস শেষ করে শিবু বলে, খেলাম তো ভাল করেই খাই। দাও…

কিছুক্ষণ পরে হেমলতার বুকের ওপর শুয়ে শিবু বলে, হাজার বিশেক টাকা দেবে?

কী?

চারটে টায়ার বদলাতে হবে। আরও কিছু টুকিটাকি কাজ আছে। মাইরি বলছি।

অত টাকা কোথায় পাব? সেই তিন হাজার তো এখনও শোধ দিলে না।

ওটা ধান বেচে এমাসেই দেব। দর বাড়ার পথ তাকিয়ে আছি।

হেমলতা চোখ বুজে তার পিঠে হাত বোলায়। শিবু টের পায়, আনমনা হাত। একটু পরে হেমলতা চোখ খুলে বলে, শুধু কি টাকার কথা বলতেই আসো তুমি?

না। গাড়িটা যে…

বেচে দাও।

বেচলে লোহালক্কড়ের দামও আসবে না।

আমার মতো ?

যাঃ। কী বলছ ? অনেক দাম তোমার।

সে তো বুঝতেই পারছি।

শিবু তাকে ভালবাসা বোঝাতে থাকে সারা শরীর দিয়ে।...

বেলা গড়িয়ে আট কিলোমিটার রাস্তা আস্তে-সুস্থে গড়াচ্ছিল শিবুর খালি ট্রাক। মনটা তেতো। টায়ার না বদলালে গাড়ি যেকোনো সময় বসে যাবে যেকোনো জায়গায়। পরের লাখটাকা দামের মাল বোঝাই থাকবে। আজকাল রাহাজানি যা বেড়েছে।

কালীতলা দুই রাস্তার চৌমাথায় ছোট্ট গাঁ ছিল। এখন একটা বাজার-মতো হয়েছে। বিদ্যুৎ এসে রাতটা ঝলমলিয়ে তুলছে ক'বছর থেকে। লোড-শেডিংয়ের দৌরাত্ম্য আছে। তখন অন্ধকারে আগের সময় ফিরে আসে। চার-পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। পুরনো বটগাছ ঘন কালো হয়ে পুরনো কথা বলতে থাকে ফিসফিসিয়ে। এটাই ছিল ঠ্যাঙাড়েদের ঘাঁটি—নির্বংশতলা। বড় ভয়ের জায়গা। পরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নাম দেওয়া হয়েছিল কালীতলা।

শিবু জানে, চৌমাথার আনাচে-কানাচে জমি কিনে রেখেছে বড় ব্যবসায়ীরা।

শিবুর শ্বশুর ঘনশ্যাম এসে মেয়ের শিয়রে না দাঁড়ালে শিবুকে ট্রাক ছেড়ে দিতে হত। মাসের মধ্যে আদ্ধেকদিন না বসে গেলে ট্রাকটাও তাকে হাজার বারো ফিমাসে যোগাত। লাল হয়ে যেত শিবু।

তার জাঁতাকলের পাশে ফাঁকা জমিটাতে গাড়ি রেখে শিবু বাড়ির দিকে হাঁটে। রানা এখন চায়ের দোকানে গিয়ে লোকের সঙ্গে নিজের ভাষায় ফক্কুড়ি করবে। ক্যারিকেচার দেখাবে চেনা লোকের। ও খুব জনপ্রিয়।

বাড়ি ঢুকে শিবু হাই তুলে এবং আড়ামোড়া দিয়ে বলল, চান করব।

এই ভিটেতে বাঁকাচোরা মাটির দেওয়ালের মাথায় টুটাফাটা খড়ের চাল ছিল একসময়। খড়গুলো অনেক বর্ষার জল খেয়ে শাদা হয়ে গিয়েছিল। শিবুর মা কঞ্চি হাতে নিয়ে সারাক্ষণ পাখি তাড়াত। বৃষ্টির রাতে শিবুকে তুলে দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদত। শিবুর বাবা ভরত তখন হরিমাটিতে ক্ষেত্রনাথের বাড়ির খড় কাটা ঘরে চটে শুয়ে ঘুমুত। ঘুম কি আসত ? নিশ্চয় না।

এখন একতলা ঝকঝকে দালান তুলেছে শিবু। চারটে ঘর, একটা কিচেন—

ডাইনিং টেবল পর্যন্ত। উঠোনে টিউবেল আর ফুলের গাছ। আড়ালে লোকেরা বলে, তারানাথের পয়সা। কে না জানে, তার বিধবা শিবুর রক্ষিতা। দু' হাত উপুড় করে ভালবাসার দাম মেটায় শিবুকে।

শিবুর বউ কুসুম স্কুল ফাইনাল ফেল করা মেয়ে। বছর দশেকের তফাত বয়সে। শিবু কষ্টেসিষ্টে নাম সই করতে পারে। খিটিমিটি বাধলে বলে, জানই তো আমি মূর্খ ইলিটারেট লোক। শুদ্ধ কথা মুখে আসে না বলেই হাত চলে।

কিন্তু মেয়েমানুষের বড় চাওয়া তো ভাতকাপড়। সে তুমি পুষিয়ে পাচ্ছ। হাজার-হাজার টাকা নাড়াচাড়া করচ—এই তোমার ভাগ্যি। চুপ করে বসে থাকো।...বলে শিবু বেরিয়ে যেত।

কখনও বলত, হুঁ—মেয়েমানুষের আরও একটা জিনিস চাইবার থাকে। সেটা হল খোকাখুকু। কিন্তু সেকি আমার দোষ? তোমার পেটে যদি না সয় আমি কী করব?

তিন-তিনবার পেটে এসে ভ্রূণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা ঘুরে এসে কুসুম এখন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। শিবু জানে না, এখনও দেব-দেবতা বা পীরের থানে যায় কিনা কুসুম। হয়ত যায়। তার কিছু করার নেই।

বেলা পড়ে আসছিল। মাঠের দিকে ফিকে লাল রোদের ছটা খেলছিল। ইটভাটার কাছে শ্বশুরমশাই দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ু হাতে। খিড়কিতে উঁকি মেরে দেখে শিবু ফের বলল, চান করব। শালা। গা ঘিনঘিন করছে সারাটা দিন। কুসুম বলে, হরিমাটিতে চান করে এলেও পারতে।

শিবু খুকখুক করে হাসে।...পারতাম। মাগীকে হাজার বিশেক টাকা চাইতে গিয়েছিলাম। ছট পাততেই দিল না। নেবে তো ডাকাতে লুটেপুটে। ওটা আবার কাকে জোটালে?

একটা অচেনা মেয়ে টিউবেল থেকে জল ভরছে সিমেন্টের চৌবাচ্চায়। ওটাই শিবুর বাথটাব। গলা ডুবিয়ে বসে থাকবে।

কুসুম বলে, জোটালাম। অত করে বলি, নানা জায়গায় ঘোরো—একটা দেখে এনো। খাটতে খাটতে আমার এদিকে হাড়ির হাল।

শিবু দেখছিল। বছর পনের-ষোল বয়স হবে মেয়েটার। সম্ভবত ফ্রক পরে থাকত। কুসুম তাকে নিজের শাড়ি পড়তে দিয়েছে। পরার ভঙ্গিতে অনভ্যাসের গণ্ডগোল ধরা পড়েছে। গোলগাল মুখ, শরীর ঈষৎ চ্যাপ্টা। এসব মেয়েরা যেমন হয়—তেমনি।

শিবু কাছে গিয়ে বলে, কী নাম গো তোমার ?

মেয়েটা অদ্ভুত নির্বিকার মুখ করে আস্তে বলে, আলো।

আলো। শিবু হাসতে হাসতে শার্ট গেঞ্জি, তারপর প্যান্টটা খুলে ফেলে দেয়। আণ্ডারউয়্যার পরা অবস্থায় চৌবাচ্চায় নামে। কুসুম সাবানের কৌটো আর তোয়ালে রেখে বলে, আলো! কেটলিতে জল চাপিয়ে এসেছি। সকালে যেমন করে দেখালাম তেমনি করে চা করবি। যেন তেতো না হয়। আর শোন, দুধটা গরম করে তবে মেশাবি। যেমন করে দেখালাম তখন।

শিবু বলে, উরে বাস! পেয়েই তালিম দিতে শুরু করেছ। কোত্থেকে জোটালে ?

কুসুম চৌবাচ্চার পাড়ে বসে চাপা গলায় বলে, রণ্টুবাবু এসেছিল সাঁইথে থেকে। মাসখানেক রাখল। তারপর রণ্টুবাবুর বউ কাল রাতে ঝাঁটা মেরে বের করে দিয়েছে।

সে কি! চুরিচামারি করেছিল বুঝি ?

কান না করে কুসুম ফিসফিসিয়ে বলে, সারারাত কালীতলায় কাটিয়েছে। ভোরে বাবা গিয়ে দেখেন, বসে আছে ওখানে। বাবার স্বভাব তো জানো ?

শিবু লম্বা চৌবাচ্চার দু'ধারে দুটো হাত রেখে আকাশে মুখ করে বলে, তা এত লুকোছাপা করে বলছ কেন ?

কুসুম একবার ঘুরে আলোকে দেখে নেয়। রান্নাঘরে কেটলির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কুসুম বলে, রণ্টুবাবুর বউ প্রায় দেখত আলোর দিকে রণ্টুবাবু কেমন চোখে তাকায়। কাল রাতে ঘুম ভেঙে দেখে, বাবুমশাই পাশে নেই। আলো থাকে বারান্দায়। রণ্টুবাবু ওর কাছে গিয়ে শুয়ে ছিল নাকি। সত্যিমিথ্যে জানি না—তবে···

শিবু একটু হাসে। ··মেয়েটা চ্যাচামেচি করেনি ? কী যে বলো! অতটুকু মেয়ে—ভয়ে লজ্জায় চুপ করে না থেকে পারে ?

বলা যায় না, হয়তো নিজেরও সায় ছিল।

কুসুম এক খাবলা জল তুলে ওর মুখে মারে। ···ছিল! অতটুকু মেয়ে! লোকটা তার বাপের বয়সী!

শিবু রসিকতার সুরে বলে, রণ্টুবাবুর বউ কী অবস্থায় দেখেছিল দুজনকে ?

রাগ করে কুসুম উঠে যায়। শিবু চৌবাচ্চার ভেতর ব্যাঙের মতো ভেসে থাকে কিছুক্ষণ। দম আটকে এলে চিত হয়। আকাশের দিকে তাকায়।···

অনেকদিন পরে একটা কাজের মেয়ে পেয়ে কুসুম বর্তে গেছে যেন। শিবু জানে, এসব কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেমেয়ের জাতের কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কিন্তু কুসুমের কীভাবে বিশ্বাস হয়ে গেছে, আলো ভাল জাতের মেয়ে। হয়তো সেটা রন্টুবাবুদের দরুন। কুসুমের খবর হল, আলো ওদের বাড়ি রান্নাবান্না করত। সবাইকার পাতে পরিবেশন করত। তখন আর কথা কী? কুসুম তার হাতে রান্নাঘর ছেড়ে দিয়েছে। একটু তফাতে মোড়ায় বসে শুধু ফরমাস।

কিন্তু রানার ব্যাপারে কুসুমের খুঁতখুঁতেমি এখনও যায় নি। তার বিয়ের আগে থেকে রানা শিবুর অনুচর। শিবু তাকে ছোটবেলায় কুড়িয়ে এনেছিল কাঁদির বাসস্ট্যাণ্ড থেকে। হয়তো নিজের জীবনের সঙ্গে কিছু মিল দেখে থাকবে। শিবকে বোঝা কঠিন।

রানাও টের পায়, শিবুর বউ তাকে একটু ছি-ঘেন্না করে। সে উঠোনে বসেই খাওয়া পছন্দ করে। খাওয়ার জায়গায় সে জল ছেটায়। নিজের থালাবাটি গেলাস নিজেই পুকুর থেকে ধুয়ে আনে। যে-ঘরটা শিবু গুদোম হিসেবে ব্যবহার করে, সেই ঘরের তাকে সেগুলো যত্ন করে সাজিয়ে রাখে। তারপর খ্যাবড়া হাতের আঙুলে সিগারেট বাগিয়ে টান দিতে দিতে আপনমনে দোলে। এই এক অভ্যাস।

কদিন পরে শিবু লক্ষ্য করল, আলোকে মেজেঘষে চকচকে করার তালে আছে কুসুম। কিন্তু মেয়েটা সেইরকম নির্বিকার। মানুষ যখন, তখন সে হাসতে পারবে তো! আলো হাসতে পারে না। প্যাটপ্যাট করে কেমন তাকায়। আস্তে কথা বলে—সেও নেহাত দরকারে। নতুন শাড়ি গায়ে জড়িয়ে সে জড়ানো পায়ে কষ্টে হাঁটছে। কুসুম মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।

ট্রাকে যেতে-যেতে রানা আলোর ব্যাপারটা চমৎকার অভিনয় করে দেখাল। শিবু হেসে খুন। তারপর ইশারায় বলল, বিয়ে করবি আলোকে?

রানা কেমন গুম হয়ে গেল। শিবু যতবার ওর দিকে তাকায়, চোখে চোখ পড়লে রানা চোখ নামায়। কিছু বুঝতে পারে না শিবু। এত বছর ধরে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে, তার এই হাবভাবের মানে আঁচ করা যায় না। শিবু খাপ্পা হয়ে বলে, কী? তারপর স্টিয়ারিং থেকে ডান হাতটা তুলে থাপ্পড় দেখায়।

খানিক পরে রানা গোঁফ এবং টাক দেখায়। তারপর অশ্লীল একটা ভঙ্গি করে। তখন শিবু বুঝতে পারে, টেকো এবং গুঁফো একটা লোক—তার মানে রন্টুবাবু যাকে নষ্ট করেছে, তাকে রানা বিয়ে করবে না। শিবু

অবাক হয়ে যায়। বোবা-কালাদেরও তাহলে এই নীতিবোধ আছে? কিন্তু রানা কীভাবে জানল ব্যাপারটা?

শিবুর পক্ষে এ রহস্য বুঝতে দেরি হল না। কালীতলার ছোট্ট বাজার জুড়ে ঘটনাটা জোর রটে গিয়েছিল। কেউ রানাকে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে শিবু কেমন একটা খারাপ গন্ধও পাচ্ছিল। একে তো তার চরিত্রের কিছু বদনাম বরাবর আছে, তার ওপর অমন একটা নষ্ট হওয়া মেয়ে তার বাড়িতে জুটেছে—লোকেরা মুখরোচক খিস্তির সুযোগ পেয়ে গেছে। আজকাল তাকে দেখে লোকেরা মুখ টিপে যে হাসে, তার কারণ তাহলে এই!

শিবু রেগে গেল ভেতর-ভেতর। মেয়েটাকে তাড়াতেই হবে। প্রেম না করুক সে, এ জীবনে অনেক মেয়েমানুষ ভোগ করেছে—তারা আহামরি ধরনের সুন্দরী না হলেও ফেলনা নয়। তবে অনেক পুরুষের মতি টলাতে পারত। তাদের তুলনায় এই ষোল বছরের ঢ্যাপসা বেঢপ নাবালিকা। শিবুর মনে আগুন জ্বলে ধিকিধিকি। লোকেরা এত ছোট এত বাজে মানুষ ভাবে শিবুকে! নাকি সে মুনিশ-মাহিন্দার ভরতের ছেলে বলেই এমন তুচ্ছ জীব এ পৃথিবীতে? তার যেন রুচি থাকতে নেই! হুঁ, সে লেখাপড়া জানে না। কিন্তু কী আছে লেখাপড়ায়? লেখাপড়া-জানা লোকের চেয়ে পৃথিবীর অনেক কিছু সে কি কম বোঝে? লেখাপড়া জেনে হাতে চাকরির দরখাস্ত নিয়ে কারু পেছনে তাকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হত। তা বেড়ায় নি, রক্ত জল করে খেটে পয়সা জমিয়েছে, বুদ্ধিসুদ্ধি কম খাটিয়েছে? তাই তার জমিপুকুর জাঁতাকল হয়েছে। এমন একটা সুন্দর বাড়ি হয়েছে। ভবিষ্যতে সে কালীতলায় একজন বড় আড়তদারও হবে। গদিতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকবে বদ্রীদাসজির মতো। গুদাম থেকে বস্তা এনে মুটেরা তারাজু-কাঁটায় চাপাবে। কয়াল ওজন হাঁকবে সুর ধরে, রাম বাম···রামোকে রাম···দুই দুই···দুয়েকে দুই···তিন তিন···তিনো তিন···

ওদিকে শিবুর ঘানিকলের সামনে ট্রাক থেকে সরষের বস্তা নামবে—সে এক পাহাড়। সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে 'শিবচরণ অয়েল মিল'।

স্পষ্ট দেখতে পায় শিবু। সেই দেখার ওপর ধ্যাবড়া আলকাতরার মতো কলঙ্ক লেপতে চাইছে লোকেরা। ভাবছে, ভরতের ছেলের যে এতসব হয়েছে তা হরিমাটির এক 'রাঁড়ীর' টাকায়। শিবুর ভেতরে এই এক পুরনো জ্বালা—তার ওপর রন্টুবাবুর নষ্টকরা মেয়েটার জন্য ফিসফিস গুজব আগুন চাগিয়ে দিল।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে শিবু কথাটা সরাসরি তুলল কুসুমের কাছে। কুসুম পাশ ফিরে শুয়ে ছিল—ওইরকম থাকে সে। শিবু আস্তে বলে, ওকে কাল চলে যেতে বলো।

কাকে?

তোমার আলোকে।

কুসুম চিত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। বলে, কী বললে?

ঠিক বলছি। শিবু গলার ভেতর বলে। একটা নষ্ট মেয়েকে জায়গা দিয়ে বড্ড কেলেংকারি রটেছে।

কে নষ্ট? আলো? কুসুম বালিশে কনুই রেখে মাথা তুলল। সাপের ফণা তোলার মতো। ···ছিঃ! তুমি না ওর বাপের বয়সী! এসব কথা মুখে বলতে তোমার বাধল না? একটা মা-বাবাহারা অনাথ মেয়ে—মাথা গোঁজার এতটুকু জায়গা নেই। যেখানে যায়, রাক্ষসের পালের নোলা দিয়ে নাল গড়ায়!

আঃ! চুপ করো তো। এত কথার কী আছে? ওকে ভাগিয়ে দাও।

কুসুম অন্ধকারে শিবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হিসহিস করে বলে, বেশ। আলো যাক ওই দোর দিয়ে, আমিও যাই এই দোর দিয়ে।

তার মানেটা কী?

যাব না তো কী করব? এই রোগা শরীরে তোমার সংসারে খেটে মারা পড়বার জন্য জন্মেছিলাম?

আহা। কান্নাকাটির কী আছে? আমি কাজের লোক এনে দেব।

সে তো পনের বছর ধরে শুনছি।

এবার ঠিক এনে দেব। ওকে বিদেয় করো। ভালর জন্য বলছি।

কুসুম ফের কাত হয়ে শোয়। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে শক্তভাবে বলে, না।

শিবু বলে, রানার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে ঘরে রাখা যেত। কিন্তু রানা ওকে বিয়ে করবে না।

দিচ্ছি ওই ভূতের সঙ্গে বিয়ে। জাতের ঠিকঠিকানা নেই···

মানুষের আবার জাত! শিবু বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট নেয়। সিগারেট ধরিয়ে ফের বলে, বেশ। তাহলে আমিই বরং বাড়ি আসা ছেড়ে দেব।

দেবে সে তো ভালই জানি। নেহাত বাবার খাতিরে। তুমি যে একদিন হরিমাটিতে থাকবে, কে না জানে এ কথা? তোমার ভবিষ্যৎ ওই খানকির বাড়িতে বাঁধা। সবাই জানে।

শিবু আস্তে বলে, ছিঃ! আগের মতো সে এত ঝগড়া করতে পারে না বউয়ের সঙ্গে। তার ওপর শ্বশুরমশাই পাশের ঘরে আছেন। ঘনশ্যাম এ বাড়ি আসার পর শিবু একটু সাবধানে মেজাজ করে। ঘনশ্যাম পাঠশালায় মাস্টারি করতেন। জামাইয়ের সংসারের হাল সামলাতে ছুটে এসেছিলেন। শিবু ভবিষ্যতের কথা ভাবতে মন দেয়। কালীতলায় আড়তদার মহাজন হবে। গদিতে ফোমের ম্যাট্রেস শাদা চাদরে ঢাকা। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে বদ্রীদাসজির মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে ফিনফিনে মিলের ধুতি। হাতে কয়েকটা ধাতুবসানো আংটি। খন্দের বস্তা, তেলের পিপে, ঘানিকল, বিশাল তারাজু।

শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, পয়মন্ত মেয়ে। এবার জোর বর্ষা আসবে। কোথায় কী? ধুধু মাঠে লু হাওয়া বয়ে যায় দিনমান। তার মধ্যে কাঁদি থেকে খবর এল কুসুমের দিদি মরণাপন্ন। ইউটেরাসে ক্যান্সার। কলকাতার ডাক্তার জবাব দিয়েছে। ঘনশ্যাম মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই গেলেন।

যাবার সময় কুসুম আলোকে পইপই করে বুঝিয়ে দিয়ে গেল সংসারের খুঁটিনাটি। বাবা কী খেতে ভালবাসে, কতটা ঝাল-ঝোল, সে-সবও। আলো নির্বিকার মুখে বলল, আচ্ছা।

কুসুম ফাঁকিবাজ রাখাল ছোঁড়াটার দুষ্টবুদ্ধিগুলোও ফাঁস করে গেল আলোর কাছে। আর ঘনশ্যাম বলে গেলেন জামাইকে, কালু বড্ড ময়দা চোর। কলে গিয়ে একটু বসে থেকো।

ময়দাকলে রানাকে পাঠায় শিবু। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে গুম হয়ে সিগারেট টানে। আলো কোমরে আঁচল-বেঁধে সংসারে ঘুরে বেড়ায়। পেছনে গোয়ালঘরে গিয়ে রাখালটার সঙ্গে কী সব কথা বলে। ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। শিবু অবাক হয়ে ভাবে, এ কে তার সংসারে খবরদারি করে বেড়াচ্ছে? ভারি অদ্ভুত তো!

মেয়েটাকে এতদিনে খুঁটিয়ে নিরাপদে দেখার সুযোগ পেয়েছে শিবু। কুসুম থাকতে সোজাসুজি তাকাতে কেমন বিব্রত বোধ করত। এখন দেখে, যতটা কুৎসিত ভেবেছিল, ততটা কিন্তু নয়। গোলগাল মুখের গড়ন, সরু নাক। বড়-বড় চোখ, ছোট্ট চিবুক। রঙটা ফর্সা না হলেও চেকন-চাকন। একটা দীপ্তি ঝকঝক করছে—সেটা শিবুর সংসারের সুখের প্রতিফলনও হতে পারে।

শিবুর চোখে ঘোর লাগে। তার বাড়ি সত্যি ঝকমকিয়ে তুলেছে মেয়েটা। ঠোঁট কামড়ে বঁটিতে তরকারি কুটছে গিন্নির মতো। শিবু ডাকে, আলো!

উঁ?

বেশি কিছু ঝামেলা কোরো না। আমার খাওয়া তো দেখেছ।

আলো মাথাটা একটু নাড়ে। দেখেছে।

শিবু একটু হেসে বলে, তুমি এত মুখচোরা কেন গো? কথাবার্তা বলো না কেন?

আলো আপনমনে মুখ নিচু করে ঝিঙের খোসা ছাড়ায়। কিছু বলে না।

সাঁইথেতে কোথায় থাকতে?

একটা বাড়িতে।

চলে এলে কেন?

আলো আস্তে বলে, লোক খারাপ।

খারাপ লোক? রণ্টুবাবুর মতো? হা হা করে হেসে ওঠে শিবু।

আলো কিছু বলে না। পেতলের গামলায় জল ঢেলে তরকারি ধুতে থাকে।

শিবু বলে, আর আমি? আমাকে কেমন লোক মনে হয়?

ভাল।

শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! শিবু আরও জোরে হাসে।

দুপুরে বেশ গিন্নির মতো শিবুকে খেতে দেয় আলো। শিবু তৃপ্তি পাচ্ছে এমন ভঙ্গী করে খায়। খাওয়ার পর যখন ভাতঘুমের জন্য বিছানায় গড়াচ্ছে, কাত হয়ে দেখে, গালে এক হাত রেখে রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে বসেছে আলো। ঢোক গেলার সময় চোখ বুজছে প্রতিবার। এত আস্তে খায় কেন মেয়েটা?

রাতেও সেইরকম। কথা বলার চেষ্টা করেছে শিবু। ওর বাবা-মায়ের কথা জানতে চেয়েছে। কিছু জবাব পায় নি। বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে শিবু। রানার অভ্যাস ট্রাকে শোয়া। বাড়ি নিঝুম। জ্যোৎস্না শাদা হয়ে পড়েছে উঠোনে। ফুলফলের গাছ হাওয়ায় তোলপাড় হচ্ছে। শিবুও।

খাটের তলায় এটাচির ভেতর লুকিয়ে রাখা হুইস্কির পাঁইটটা বের করে সে। অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খায়। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! বিড়বিড় করে বলে শিবু। খিকখিক করে হাসে। তারপর কী এক হিংসায় ফুঁসে ওঠে।

একটু পরে কুসুমের সাজানো সংসার লাথি মেরে ভেঙে ফেলার ভঙ্গিতে টলতে টলতে সে ওঠে।

পাশের ঘরে আলো শোয়। শিবু দরজায় ধাক্কা দিয়ে আস্তে ডাকে, আলো! আলো।

একটু পরে ভেতর থেকে সাড়া আসে ঘুমভাঙা গলায়—কী?

দরজা খোল।

শিবুর মুখের ওপর দরজা খুলে যায়। অমনি শিবু অবাক হয়। আবছা আঁধারে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর গলার ভেতর বলে, বললাম আর খুলে দিলি? তুই তো ভারি অদ্ভুত মেয়ে মাইরি।

আলো চুপ করে থাকে।

কথা বলছিস না যে? আমি বললাম আর তুই দরজা ··আমাকে তোর ভয় করছে না?

না।

করছে না? এই যে আমি এত রাতে তোকে ডাকলাম, তোর ভয় করল না? কেন? কেন করল না বল্! শিবু চৌকাঠ দুধারে আঁকড়ে ধরে ঘরের ভেতর ঝুঁকে পড়ে। তোর মুখ থেকে আগে জবাব শুনে তবে কথা। এই শিবচরণ একজন লম্পট। শিবচরণ একটা শুওরের বাচ্চা। এই শিবচরণকে—ভয় করল না?

আলো আস্তে বলল, আপনি আমার বাবার মতো।

এ্যাই। শিবু চেঁচিয়ে ওঠে, এ্যাই! ঠিক এই কথাটা তোর মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ—বাবার মতো। মতোই বা কেন? আমি তোর বাবা। বাবাকে ভয় করতে নেই বলেই রাত বিরেতে ডাকলাম আর ব্যস! দরজা খুলে দিলি। কেন দিবি না? আলবাৎ দিবি। বাবা ডাকবে আর দরজা খুলবে না মেয়ে—এ কি কথা!

বাবা, আপনি মদ খেয়েছেন।

শিবু কানে নেয় না। রাতের জ্যোৎস্না আর হাওয়া তোলপাড় করে বলে, এই কথাটা শালাশালীদের শোনাতে হবে। কাল বাজারে লোক ডেকে জড়ো করব। তুই সবার সামনে আমাকে বাবা বলে ডাকবি তবে কথা!

আলো তার হাত ধরে টেনে বলে, ঘুমোবেন—চলুন তো! মা বলে গেছে, তোর বাবা যদি বদমাইসি করে, তাকে কষে থাপ্পড় লাগাবি। সত্যি বলছি, আপনি না শুলে···

থাপ্পড় লাগাবি ? হা হা করে হাসতে হাসতে শিবু বসে পড়ে। লাগা থাপ্পড়। এই বেজন্মা শিবুকে যত খুশি থাপ্পড় মার। আমি তোর হাতের মার খেতে খেতে মরে যাই। আমার শালা মরাই উচিত। আমি মাইরি কী ! এ্যাঁ ?

এতদিন পরে মাতাল শিবু মেয়েটার হাসি শোনে। আলো হাসতে হাসতে তাকে টেনে ওঠায়। গায়ে জোর আছে তো মেয়েটার। তাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ঠেলে ফেলে। আছাড় খাওয়ার মতো পড়ে শিবু ককিয়ে ওঠে। তারপর ভাঙা গলায় বলে, এ শিবু আর হরিমাটি যাবে না। গাড়ি চালাবে না। কালীতলায় থিতু হয়ে বসবে। শিবুর বউ জন্মো দিতে পারে নি তো কী হয়েছে। ওই রানাটা আমার ছেলে আর আলোটা আমার মেয়ে।···ওই রানাটা আমার ছেলে আর এই আলোটা আমার মেয়ে। ওই রানাটা আমার ছেলে আর আলোটা···

বিড়বিড় করতে করতে সে থেমে যায়। বুকে হাত চেপে শুয়ে থাকে। আলো আস্তে বলে, ঘুমোন।

দিনচারেক পরে বাড়ি ফেরে কুসুম একা। ঘনশ্যাম বড়মেয়ের মৃত্যুর পর বড় জামাইকে সান্ত্বনা দিতে থেকে গেছেন। কুসুমের মন পড়েছিল নিজের সংসারে। বাড়ি এসেই ধুপধুপ পা ফেলে হন্তদন্ত আলোর কাছে গিয়ে চুপিচুপি বলে, ভালো ছিলিস তো তোরা ? কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো ? বদমাইসি করে নি তো তোর বাবা ?

আলো একটু হাসে।

কুসুমের বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এই প্রথম হাসি দেখছে আলোর মুখে। ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বলে, করেছিল ? তোকে যে বলে গেলাম কষে গালে থাপ্পড় মারবি। ওর মা-মাসি জ্ঞান থাকে না ! বলে গেলাম না হারামজাদী মেয়ে ?

আলো কিছু বলার আগেই ঘর থেকে শিবু ভরাট গলায় ডাকে, মা আলো ! কার সঙ্গে কথা বলছ গো ?

আলো বলে, মা এসেছে।

শিবু বেরিয়ে এসে বলে, খারাপ খবর পরশু সন্ধেয় পেলাম। রমণীদা বললেন। তো ভাবলাম, যাই। কিন্তু মেয়েটা আবার একা থাকবে—যা দিনকাল পড়েছে। কুসুম ভারি গলায় বলে, একবেলার জন্যে গেলেও পারতে। দিদি

তোমাকে দেখতে চেয়েছিল। গাড়ি নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ আর ওইটুকু রাস্তা।

শিবু আড়মোড়া ছেড়ে বলে, গাড়ি ফেরত দিয়েছি। কাঁহাতক আর গচ্চা দেব? আজ দেখলাম ধনেশকে দিয়েছে। মরুক গে!

কুসুম বড় করে শ্বাস ফেলে বলে, রানা কোথায় গেল?

শিবু গলার ভেতর বলে, যতই করো, পর পর। নেমকহারাম। এতটুকুন করে পেলে এত বড়টা করলাম। সঙ্গে নিয়ে বিশ্বেস্ক্যাণ্ড ঘুরে বেড়ালাম। মুখে পেচ্ছাপ করে ধনেশের কাছে গিয়ে জুটল। গাড়িই ওর কাল হবে।

কুসুম বলে, আপদ গেছে। আলোকে দুচোখে দেখতে পারত না ছোঁড়াটা। আলো আসাঅব্দি দেখছি, মুখ ব্যাজার করে খেতে আসছে। এমন করে তাকাচ্ছে ওর দিকে, যেন পায় তো এখুনি গলা টিপে মারে।

হুঁ। আমিও দেখেছি। শিবু অভ্যাসমতো আকাশে মুখ তুলে বলে, যাক্। এখন আমার ভাবনা, কবে আড়ত করে গদির ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসব। শালাদের দেখিয়ে দেব এই শিবুরও দাম আছে। হাজার কুইণ্টাল খন্দের বস্তা, বড় বড় তেলের পিপে, পেল্লায় তারাজু—কয়াল গোঁফে তা দিয়ে হাঁকবে, একো এক···দুইও দুই···তিনো তিন···

হা হা করে হাসে সে। কুসুম আর আলো তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এই লোকটাকে তারা এতদিন দেখেনি। এ এক আলাদা মানুষ।

বর্ণপরিচয়

মফস্বল শহরেও আজকাল ঘরের এত আকাল। বাইরে থেকে এসে কেউ ডেরা পাততে চাইলে তার ভোগান্তির শেষ নেই। সুরজিৎ ক'দিন থেকে পর্ণার পেছনে লেগে আছে। 'দিন না মাসিমা আপনাদের ওই ঘরখানা। খামোকা তালা আটকে ফেলে রেখেছেন। দিলে তো এ বাজারে মাস-মাস কিছু টাকাকড়ি আসে।'

পর্ণা গোড়ার দিকে পাত্তা দেন নি। পরে একদিন বললেন, লোকটা কে, সুরজিৎ?'

'লোকটা!' সুরজিৎ খুব হাসল। 'লোকটা কী বলছেন মাসিমা! আমার বয়সী ছেলে। তবে আমার মতো গবেট নয়, বিদ্বান। হরিমোহন বিদ্যাপীঠে মাস্টারি করতে এসেছে।'

'তোমার বন্ধু বুঝি?'

তা বলতে পারেন। এখানে এসে তারপর চেনাজানা। একটা বাজে মেসে আপাতত আছে। তবে মাসিমা, আমাদের এখানকার মতো তিলেখচ্চর নয়। খুব ভদ্র নিরীহ ধাতের ছেলে। বলেন তো নিয়ে আসব ওবেলা।'

আজকাল এই রকম হয়েছে, পর্ণা জানেন। কম বয়সী ছেলেমেয়েরাই স্কুল-কলেজে মাস্টার হয়ে যাচ্ছে। হিমশ্রী সেদিন তাদের কলেজের এক অধ্যাপিকাকে নিয়ে এসেছিল। পর্ণা দেখে তো অবাক। এই একরত্তি মেয়ে! হিমশ্রী বয়সের তুলনায় একটু এগিয়ে গেছে গায়েগতরে। অধ্যাপিকাকে দেখাচ্ছিল ওর ছোট বোন। কেউ কেউ অবশ্য শরীরে ছোটবেলাকে আটকে রাখতে পারে।

পর্ণা গুম হয়ে ভাবছিলেন। সুরজিৎ বলল, 'কোনো অসুবিধে হবে না মাসিমা! তা ছাড়া, ওঘরের সঙ্গে আপনাদের এই ভেতর-বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ পেছনে। এপাশের দরজা আটকে দিলে একেবারে সেপারেট হয়ে গেল। অমৃতেন্দু পেছনটা দিয়ে যাতায়াত করবে।'

তা ঠিকই। তবু পর্ণা দোনামনা করছিলেন। 'সুরজিৎ, তুমি তো জানো··'

কথা কেড়ে সুরজিৎ বলল, 'জানি, জানি। আপনি ছাড়ুন তো মাসিমা। ওসব একেবারে বোগাস ব্যাপার। আজকাল কেউ মানে নাকি?'

পর্ণা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'তা নয়। তোমার বন্ধুকে কি বলেছ?'

'কী বলব?'

'দয়ালবাবুর ব্যাপারটা।'

সুরজিৎ হোহো করে হাসল একচোট। 'আপনিও যেমন। অমৃতেন্দুর ওসব সুপারস্টিশান একেবারে নেই।'

'না—তুমি বলেছ কিনা?'

'বলিনি মাসিমা। কী দরকার? ওর এখন যা অবস্থা, একটু সেপারেট মাথা গোঁজার জায়গা পেলেই কৃতার্থ হয়ে যায়।'

পর্ণা শক্ত মুখে বললেন, 'উঁহু। তুমি দয়ালবাবুর ব্যাপারটা ওকে বলবে। তারপর যদি রাজি হয়, তখন কথা।'...

সুরজিৎ সেদিন আর এল না। পর্ণা মনে-মনে একটু চটে গেলেন। এ তো জানা কথাই যে ব্যাপারটা শোনার পর কেউ ওঘরে এসে থাকতে চাইবে না। এক বছর ধরে ঘরটা তালা আটকানো রয়েছে। এত যে ঘরের আকাল, কেউ তো এতদিন আসেনি। তার একটাই মানে দাঁড়ায়। কোনো-না-কোনো সূত্রে জানাজানি হয়ে যায় ব্যাপারটা। পাড়ার লোকই নিষেধ করে।

পরদিন সকালে পর্ণার কেমন যেন জেদ, অথবা নেহাত খেয়াল হল, ঘরটা খুলে দেখবেন। অনেক খুঁজেপেতে চাবিটা পাওয়া গেল টেবিলের ড্রয়ারে রাশীকৃত জিনিসের ভেতর। অরীন্দ্রনাথ বড় আগোছাল মানুষ ছিলেন। গুছিয়ে দিতে গেলেই হইচই বাধাতেন। ওঁর টেবিলে বসে হিমশ্রী পড়াশুনা করে। কিন্তু যেমন বাবা ছিলেন, তেমনি তাঁর মেয়ে। ড্রয়ারটা ব্যবহার করে, অথচ অকেজো জিনিসগুলো বের করে ফেলে দেয়নি। কয়েকটা লাইটার, একগাদা কলম, নষ্ট রিস্টওয়াচ গোটা দুই, একগুচ্ছের দোমড়ানো কাগজ, শ্যাওলাধরা কয়েকটা পুরনো মুদ্রাও। তার সঙ্গে হিমশ্রীর কলম, ঘড়ি, ক্রিমের তোবড়ানো টিউব, খুচরো পয়সা, রুমাল এই সব।

যে ঘর দিয়ে ঢোকা যায়, সে ঘরে অব্যবহার্য ভাঙাচোরা আসবাব ঠাসা। খিড়কির দরজা দিয়ে পর্ণা গেলেন। ভাঙা নিচু পাঁচিলে ঘেরা একটুকরো জমিতে আগাছার জঙ্গল গজিয়ে গেছে। দয়ালবাবু ওখানে ফুলবাগান করার চেষ্টায় ছিলেন। সে-সব গাছ ঢাকা পড়েছে আগাছার ভেতর। শুধু কোনার দিকে শিউলিগাছটা ঝাঁকড়া হয়ে মাথা তুলেছে। পর্ণা বিস্ময় ও লোভমেশানো চোখে গাছটা দেখছিলেন। শিউলিফুলে গাছটা ভরে গেছে। সারারাত গন্ধে ম' ম' করে এদিকটা। আগাছা সাফ করে অন্তত সবজিক্ষেত করলে তো দারুণ হত। বাড়ির এই পেছনের কথা ভুলে না গেলেও বড় অবহেলা করা হয়েছে।

হয়তো অবচেতন আতঙ্কে, কিংবা ঘৃণায়। পিছু ফিরে দেখা সব সময় সুখের নয়। তার চেয়ে বড় কথা, আত্মহত্যাকারীকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় জীবিতদের।

তালাটাতে মরচে ধরে জ্যাম হয়ে গেছে বুঝি। পর্ণার হাতে যত ময়লা জমল, তত রক্তের ছোপ। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘেমে যাচ্ছিলেন। চাবি ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে কিছুতেই তালাটা খুলতে পারছিলেন না। সেই সময় হিমশ্রী এসে অবাক হয়ে বলল, 'ও কী মা! ও কী করছ তুমি?'

চমকে উঠেছিলেন পর্ণা। এমন করে সাড়াশব্দ না দিয়ে আসতে আছে? রাগতে গিয়ে একটু নার্ভাস হাসলেন। 'দ্যাখ তো হিমি, খুলতে পারিস নাকি।'

হিমশ্রী কিন্তু খুব সহজে খুলে ফেলল তালাটা। তারপর কপাট ঠেলে দিয়ে নাক ঢেকে সরে দাঁড়াল। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে কী একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। কিংবা মা মেয়ে দুজনকারই মনের ভুল। মানুষ যে ঘরে বাস করতে করতে মরে যায়, সে-ঘরে তার জীবনের গন্ধের মতো মৃত্যুর গন্ধও ছড়িয়ে থাকার কথা। এ কি দয়ালবাবুর মৃত্যুর গন্ধ? হিমশ্রী সন্দিগ্ধ দৃষ্টে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল। পর্ণার মুখে ক্লান্তির ভাবটা শক্ত হয়ে বসে আছে। বাইরে আশ্বিন মাসের উজ্জ্বল রোদ। ঘরের ভেতর চমকে-ওঠা অন্ধকার খানিকটা পিছিয়ে গাঢ় হয়ে আছে। পর্ণা দেখছিলেন দয়ালবাবুর রেখাচিত্র। ঢ্যাঙা, কালো এক মানুষ। শক্ত শরীর। একরাশ এলোমেলো চুল মাথায়। মুখ জুড়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ। যেমন-তেমন ধুতিপাঞ্জাবি-পরা সাদাসিধে এক মানুষ। হিমশ্রী দুষ্টুমি করে বলত, 'দয়ালজেঠু যেন ছবির মানুষ, মা!' নিঃশব্দ, কণ্ঠস্বরহীন প্রকৃতির লোক ছিলেন দয়ালহরি। কিন্তু যখন হাসতেন, সে যেন এক সূর্যোদয়।

হিমশ্রী বলল, 'খুললে কেন, মা?'

পর্ণা জবাব না দিয়ে হঠাৎ জোরালো ভঙ্গীতে ঢুকে গেলেন ঘরে। তারপর অস্বাভাবিক দ্রুততায় তিনটে জানালাই খুলে দিলেন।

ঘরের ভেতরটা আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন। পেছনের দিকে বলে ধুলোময়লা ঢোকে না। আর মৃত্যুর কিছুদিন আগে দয়ালবাবু ফিকে সবুজ রঙ করিয়েছিলেন দেয়ালে। পুরনো বাড়ি বলে জায়গায়-জায়গায় ছোপ ফুটে আছে। দেয়ালে বাল্বটার ওপর মাকড়সার সামান্য জাল ছাদের মাঝখানে শূন্য আংটাতেও একটু ঝুল জমেছে। ওখানে একটা ভাঙাকরা ফ্যান ছিল। সারা রাত অদ্ভুত

শব্দ করত। তার নিচে ছিল দয়ালবাবুর তক্তাপোশে সাদাসিধে একটা বিছানা; দেয়ালের হুকে ছিল একটা বাঁধানো ফোটো। ফোটোতে একগাদা লোকের ভেতর দয়ালবাবু। সেটা অরীন্দ্রনাথ কী করেছিলেন, পর্ণা জানেন না। তক্তাপোশ, বিছানা, কয়েকটা জামাকাপড় ডোমকে দান করেছিলেন। একটা টিনের তোরঙ্গ ছিল যেন। কী হল, পর্ণার মনে নেই। তারপরের দিনগুলো বড় অশান্তিতে কেটেছিল। তাই খুঁটিয়ে কিছু লক্ষ্য করেন নি—মনেও পড়ে না। তোরঙ্গটা পাশের ঘরে আবর্জনার গাদায় চাপা থাকতেও পারে।

পর্ণা অন্যমনস্কভাবে সুইচ টিপেই চমকে উঠলেন। আশ্চর্য লাগল, বাল্বটা জ্বলে উঠেছে দেখে। কানেকশান কেটে দেওয়ার কারণ ছিল না। তবু এমন করে বাতি জ্বলে উঠলে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ঘরে যেন জীবন ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল একমুখ হাসি নিয়ে।

অরীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বলতেন, 'ঘরখানা গঙ্গাজল ঢেলে ধুয়ে ফেলতে হবে।' শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি। এদিকে উনিও আর পা বাড়াতেন না। কেউই না। পর্ণার সেই কথাটা মনে পড়ল। বেরিয়ে এসে একটু হেসে বললেন, 'হিমি, ধুয়ে-টুয়ে সাফ করে ফেললে দারুণ হয়। না রে? এদিকটা বেশ নিরিবিলি। ধর, তুই এসে দিব্যি পড়াশুনা করতে পারিস। আর জঙ্গল সাফ করে ফুলগাছ লাগিয়ে দিলে তো কথাই নেই। খামোকা এমন একটা ভাল ঘর ফেলে রাখার মানে হয় না। কী বলিস?'

হিমশ্রী ভুরু কুঁচকে বলল, 'হুঁ। এ ঘরে আমি খুব আসছি।'

'কেন? ভয় করবে তোর?'

'তুমি এসে থেকো না।' হিমশ্রী হাসতে লাগল। 'দয়ালজেঠুর ভূতের পাল্লায় পড়ে কী হয় দেখবে।'

'ছিঃ। বলতে নেই।'

'পারবে তুমি থাকতে?'

'কেন পারব না?'

'রাত্তিরে।'

'হ্যাঁ, রাত্তিরেও।' মেয়ের সঙ্গে কৌতুকে মেতে উঠলেন পর্ণা। 'আমার ভূত-টুতের ভয় নেই।'

'মানো না! তাই বলো, রাত্রিবেলা কী সব শব্দ শুনতে পাও। ভয়ের চোটে এদিকের জানালাটাও খুলতে পারো না।'

পর্ণা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর দয়ালজেঠুর আত্মা আমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

হিমশ্রী আস্তে বলল, 'দয়ালজেঠু কেন সুইসাইড করেছিল মা?'

পর্ণার মুখের হাসি নিভে গেল। হিমশ্রী এই প্রথম প্রশ্নটা তুলেছে এতকাল পরে। এক বছর হয়ে গেল প্রায়। হিমশ্রী এতদিন এমন প্রশ্ন করেনি। কেন করেনি কে জানে। হয়তো প্রশ্নটা তার মাথায় আসেনি—অথবা মনে মনে একটা জবাব খুঁজে নিয়েছিল। চাপা নিঃশ্বাস ফেলে পর্ণা বললেন, 'কে জানে! তারপর ঘরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যে ঘরে মানুষ আত্মহত্যা করে, সে ঘরটা যেন পৃথিবীর সব ঘরের চেয়ে আলাদা হয়ে যায়। পর হয়ে যায় চিরকালের মতো।...

সুরজিৎ সেদিনই বিকেলে এল। সঙ্গে অমৃতেন্দু। 'হঠাৎ বাইরে যেতে হয়েছিল, মাসিমা! আপনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন...' বলে সে তার বন্ধুর দিকে চোখ নাচিয়ে হাসল।

পর্ণা দেখছিলেন অমৃতেন্দুকে। পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে শ্যামবর্ণ শীর্ণ এক যুবক। চোখ দুটো কেমন শান্ত, ভাসা-ভাসা দৃষ্টিপাত। চেহারার তীক্ষ্ণতা যে আছে, হঠাৎ করে তা ধরা পড়ে না একটু দেরি হয়। কিন্তু কেমন যেন চেনা লাগছিল। হয়তো রাস্তাঘাটে ইতিমধ্যে দেখে থাকবেন।

অমৃতেন্দু বলল, 'সুরজিৎ আমাকে বলেছে। কিন্তু তাতে কী? ব্যাপারটা অন্যদিক থেকে ভেবে দেখা যায়, মাসিমা! এ পৃথিবীতে তো অসংখ্য সাংঘাতিক-সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে, তবু পৃথিবী ছেড়ে মানুষের যাওয়া চলে না।' সে শান্তভাবে একটু হাসল। 'তা ছাড়া, আমরা কেউ জানি না, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে কী ঘটেছে অতীতে। জানি কি মাসিমা? কিংবা ধরুন জানলেন। জেনেও আপনার কী করার আছে?'

পর্ণার ভাল লাগছিল কথাবার্তা শুনে। ছেলেটি বেশ। মুখ নামিয়ে বললেন, 'তোমার আপত্তি না থাকলে—তুমি বলছি, রাগ কোরো না বাবা!'

'না বললেই রাগ করতুম।' অমৃতেন্দু বলল। 'আমি সব ব্যাপারে ফ্র্যাঙ্ক, মাসিমা। ভাড়াটাড়ার ব্যাপারে কিন্তু খোলাখুলি বলবেন।'

পর্ণা মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ তো। আগে ঘর দেখ, পছন্দ হয় নাকি।'

'কী যে বলেন! মাথার ওপর ছাদ থাকলেই হল।'

খিড়কির দরজা দিয়ে ঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন পর্ণা। দরজা সেই সকাল থেকেই হাট করে খোলা ছিল। দুপুরে কাজের মেয়েটিকে বাড়তি পয়সা দিয়ে ধুইয়ে ঝাড়ু দিয়ে সাফ করিয়ে রেখেছিলেন। আলোটাও জ্বেলে দিলেন। অমৃতেন্দু প্রথমে পরিবেশ দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করল। তারপর দরজায় উঁকি মেরেই বলল, 'অপূর্ব! আমার পক্ষে স্বর্গ, মাসিমা!'

পর্ণা একটু হেসে বললেন, 'স্বর্গে কিন্তু জলের অসুবিধা হবে। বাইরে থেকে আনতে হবে কষ্ট করে।'

'আনব। আমি সব কাজ পারি, দেখবেন।'

তারপরই পর্ণা গম্ভীর হলেন। 'বাইরে থেকেই বা আনবে কেন? যদি থাকোই, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাড়িতে টিউবওয়েল আছে। কিন্তু তুমি রেঁধে খাবে, নাকি হোটেলে?' আসলে পর্ণা চাইছিলেন, ও নিক ঘরটা। যা দেয়, দিক না। ক্ষতি কী?

অমৃতেন্দু বলল, 'হোটেলে খাচ্ছি। দেখব যদি রেঁধে খেতে পারি। না পারার কারণ কী? কী বলো, সুরজিৎ?'

সুরজিৎ বলল, 'মাসিমাকে তুমি চিনতে পারছ না। এমন মানুষ কোথাও পাবে না কিন্তু। ও মাসিমা, পেয়িং গেস্ট হয়ে থাক না। আপনারা যা খান, অমৃতেন্দু তাই খাবে। ও তো লাটসায়েব নয়। কী অমৃতেন্দু?'

অমৃতেন্দু তাকাল পর্ণার দিকে। পর্ণা ভাবছিলেন। ছেলেটিকে কেন যেন আপন লাগছে। একটু পরে বললেন, 'হিমিও তো কলেজে যায় দশটা নাগাদ। কাজেই সকাল-সকাল রান্নাটা করতেই হয়। আমার তাতে অসুবিধে হবে না। দুমুঠো চাল ধরিয়ে দেব। কিন্তু তোমার অসুবিধে হতে পারে।'

'কোনো অসুবিধে হবে না। একটা ট্রায়ালও দিতে পারেন।' অমৃতেন্দু হাসল। 'শুধু ফ্র্যাঙ্কলি বলুন, কত দিতে হবে।'

পর্ণা বিব্রত বোধ করছিলেন। সুরজিৎ তা লক্ষ্য করে বলল, 'শোনো। যা বাজারের অবস্থা, সব কনসিডার করে আমার বিচারে অন্তত আড়াইশো টাকা তোমায় দেওয়া উচিত। মাসিমা, কী বলেন? ঘরভাড়া গ্রাস খাওয়া-দাওয়া। কী?'

অমৃতেন্দু বলল, 'দেব।'

পর্ণা বললেন, 'আচ্ছা।'...

আগাম সব টাকা দিয়ে চলে গেল ওরা। টাকাগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন পর্ণা। ঠিক করলেন কি না বুঝতে পারছিলেন না। ছেলেটিকে তো ভালই লাগল। তা ছাড়া, সুরজিৎ ওর জন্য দায়ী রইল। বাড়িতে কোনো পুরুষ-মানুষ নেই বলে কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে থাকতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে। শুধু একটু খুঁতখুঁতেমি এসে দাঁড়াচ্ছে। হিমশ্রীর কারণে। দোষী ঘরটার দোষ খণ্ডাতে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল হয়তো। আগু বাড়িয়ে খাওয়ার কথাটা না তুললেও পারতেন।

তবে ছেলেটিকে সচ্চরিত্র বলেই মনে হয়। খারাপ হলে সুরজিৎ কখনও ওর জন্য এমন তাগিদ দিত না। শেষ পর্যন্ত পর্ণা আশ্বস্ত হলেন। হিমশ্রী কলেজে ছুটির পর রোজই সেই অধ্যাপিকার সঙ্গে সন্ধ্যা অবধি কাটিয়ে আসে। যেদিন দুপুরের পর ক্লাস থাকে না, সেদিন একবার বাড়ি ঘুরে যায়। সন্ধ্যায় ফিরে সব শুনে বাঁকা মুখ করে বলল, 'খামোকা কী সব ঝামেলা জোটাও, বুঝি না। তুমিও অবিকল বাবার মতো। দয়ালজেঠুকে জুটিয়ে শেষে ওই হল।'

পর্ণা হাসতে হাসতে বললেন, 'সবাই তো তোর দয়ালজেঠুর মতো বিবাগী পুরুষ নয়। তুই কি ভাবছিস ও ঘরে যে থাকবে, সেই সুইসাইড করবে?'

'কেলেঙ্কারি হবে, জানো? পাড়ায় মুখ দেখানো যাবে না সেবার-কার মতো।'

পর্ণা কড়া মুখে বললেন, 'হিমি। বাজে বকিস নে তো।'

হিমশ্রী শাড়ি বদলাতে গেল। দয়ালবাবুর আত্মহত্যার পর খানিকটা ঝামেলা হয়েছিল বটে। অরীন্দ্রনাথ সামলে নিয়েছিলেন। ঝামেলা হত না, যদি দয়ালবাবু কাগজে লিখে রাখতেন কিছু। দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা-বাঁকা বড়-বড় হরফে লিখেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

লেখাটা মোছা হয়েছিল পরে। কিন্তু ভালভাবে মোছা হয়েছিল তো? এখন হিমশ্রীর কথার সূত্রে সেটা মনে পড়ে গেল। আজ লক্ষ্য করেননি দেয়ালটা।

তবে এ নিয়ে চিন্তা করার কারণ নেই। অমৃতেন্দু তো দেখেশুনেই

থাকছে। পর্ণা ঘরে ঢুকে বললেন, 'ছেলেটা দুটো সাবজেক্টে এম এ। জানিস হিমি?'

হিমশ্রী চুলে চিরুনি টানতে-টানতে বলল, 'ইশ্। দুর্ধর্ষ পণ্ডিত। তাই বিদ্যাপীঠের খোঁয়াড়ে ঢুকেছে।'

'কী করবে—তেমন কিছু না পেলে? যা চাকরির অবস্থা।'

হিমশ্রী হঠাৎ ফিক করে হাসল। 'একটা রাত্তির থাকলেই টের পাবেন। দয়ালজেঠুর ভূতের পাল্লায় পড়ে দেখবে কী হয়।'

পর্ণা সকালের মতো আস্তে বললেন, 'ছিঃ। বলতে নেই।'

অমৃতেন্দু কিন্তু চমৎকার টিকে গেল। মা ও মেয়ে দুজনেই দুদিক থেকে ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে না। আর হিমশ্রী তো মুখ টিপে হেসে বলত 'দয়ালজেঠুর সঙ্গে লড়িয়ে দিয়েছ ভালো।' পর্ণা রাগ করতেন না একথায়। বলতেন, 'ট্রায়াল দিচ্ছি রে হিমি!' পর্ণার পুরনো হাসিখুশি ভাবটা ফিরে এসেছিল। একটা বছর যা গুমোট পরিবেশ গেছে। দয়ালবাবুর আত্মহত্যার পর অরীন্দ্রনাথের অসুখবিসুখ, তারপর মৃত্যু। দুটোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, আবার ছিলও হয়তো। অরীন্দ্রনাথের মনে একটা গুরুতর ধাক্কা লেগেও থাকতে পারে। কথাটা ভাবতে গেলে পর্ণার মনে হয় যেন আলকাতরা মেখে তুলোর গুদোমে ঢুকেছেন। ঝটপট সামলে নেন নিজেকে।

তবে যেদিন থেকে অমৃতেন্দু ও-ঘরে ঢুকেছিল, প্রথম রাতটা তো ভাল ঘুমুতেই পারে নি পর্ণা। পরের অনেকগুলো রাতও খুব অস্বস্তিতে কাটাতেন। পেছনদিকের জানালা আগে পারতপক্ষে খুলতেন না—রাতে তো নয়ই। অমৃতেন্দু আসার পর সেটা খুলতে শুরু করেন। ভোরবেলা ওই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ওদিকটা দেখতেন। একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় অমৃতেন্দু। সকালে পর্ণা চা দিয়ে আসতেন। তাকে দেখে আশ্বস্ত হতেন। জিগ্যেস করতেন, 'অসুবিধে হয় না তো?' অমৃতেন্দু জোরে মাথা নেড়ে বলত, 'মোটেই না। রাজার মত আছি মাসিমা!'

পর্ণা ভাবতেন, ভাল কিছু জুটলে তো ও চলে যাবেই, কিন্তু ঘরটার দোষ কেটে বাসযোগ্য হয়েছে, এটাই শেষ পর্যন্ত লাভ। এর পর ভাড়াটে জুটতে দেরি

হবে না। আজকালকার দিনে একটা বাড়তি গব। আয়ের কোনো রাস্তা নেই সংসারে। অরীন্দ্রনাথের সঞ্চয় থেকে দুজনেব ছোট্ট সংসার কোনো রকমে চলে যায়।

অমৃতেন্দু বলেছে, সব কাজ পারে। ওকে দেখলে তা মনে হয় না বটে, কিন্তু সত্যি পারে। পেছনদিকটা কী জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল! মাসখানেকের মধ্যে তা সাফ করে ফুলের গাছ পুঁতেছে। বিকেলটা বেশ কাটানো যায় ওখানে। নিচু এক ইঁটের পাঁচিল। জায়গায়-জায়গায় ভাঙাচোরা হয়ে আছে। তাব ওধারে রেলের নয়ানজুলি। তারপর রেলইয়ার্ড। হেমন্তের রাতে গাছপালায় কুয়াশা ঝোলে। বৃষ্টি-সন্ধ্যায় জোনাকি জলে। শান্টিং করতে করতে ইঞ্জিন চেরা গলায় শিস দেয়। দূবের ট্রেনের চাপা শব্দ অনেক বাতে। বাড়ির পেছনের এই সব ব্যাপার পর্ণার জীবনে ফিরতে শুরু করেছিল। এক বছর সামনে তাকিয়ে থাকার পর আবার পিছু ফিরে দেখাব মতো। ছেলেটার খানিকটা যেন দয়ালবাবুর স্বভাবও। কথা বলতে বলতে সেই রকম হঠাৎ চুপ করে যাওয়া, দূরে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে তাকানো, অথবা জ্যোৎস্নায় চুপচাপ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা। ঘরের জানালা থেকে পর্ণা দেখেন, অমৃতেন্দু সাদা হয়ে অত রাতে দাঁড়িয়ে আছে। হিম পড়তে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পরই শিশিরে ঘাস ভিজে চবচবে হয়ে যায়। কিন্তু আর চমকান না পর্ণা। বাগানে রাতবিরেতে যাকেই দেখুন, জানেন সে অমৃতেন্দু। সকালে গিয়ে বলেন, 'অমন করে হিমে দাঁড়িয়ে থাকো। অসুখ করবে যে!' অমৃতেন্দু হাসে। 'আপনি দেখতে পান? আমার ইনসমনিয়া আছে, মাসিমা। বাইরে একটু ঘোবাঘুরি করলে ঠিক হয়ে যায়।'

হিমশ্রী গোড়ায় পাত্তা দেয় নি ওকে। কথাবার্তা বড় একটা বলতে চাইত না। কিন্তু ক্রমশ পর্ণা লক্ষ্য করলেন, হিমশ্রীরও চোখ পড়েছে বাড়ির পেছন-দিকে। ওখানে তারও অনেক স্মৃতি আছে। সেও কি তাঁর মতো নেপথ্যের দিকে হেঁটে যেতে চাইছে? একটু অস্বস্তি হয় পর্ণার। একটা ছোট্ট কণ্টকিত ক্যাকটাসের পেছনে বড় সর্বনাশ লুকিয়ে থাকতে পারে।

কলেজ থেকে ফিরেই হিমশ্রী খিড়কির দরজা খুলে ওদিকে যায়। পর্ণা ঘরের ভেতর থেকে সেই জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারেন। অমৃতেন্দু গুঁড়ি মেরে বসে ঘাস ছেঁড়ে, কিংবা খুরপি দিয়ে মাটি খোঁড়ে। পেছনে হিমশ্রী দাঁড়িয়ে। একটু পরে অমৃতেন্দু টের পেয়ে ঘোরে। হাসে। চোখ জলে যায় পর্ণার।

অবিকল দয়ালবাবুর মতো! চমকানো গলায় একমুখ হেসে বলতেন, 'পর্ণা দেবী, তোমার স্বভাব আততায়ীর মতো।'

একদিন হিমশ্রী হাঁফাতে হাঁফাতে এল 'মা, মা! দয়ালজেঠুর ছাতাটা পাওয়া গেছে। ঘাসের ভেতর পড়ে ছিল। শিক-টিক সব আস্ত আছে। শুধু কাপড়টা পচে গেছে। ইশ! কী ওয়াণ্ডারফুল ডিসকভারি মা! ভাবতে পারো?'

পর্ণা গলার ভেতর বললেন, 'এতে নাচবার কী হল?'

'বাজে বলো না।' হিমশ্রী রেগে গেল। 'একটা স্মৃতিচিহ্ন না? বুড়োদা ওটা রেখে দিল।'

'বুড়োদা?' হেসে ফেললেন পর্ণা। 'ওর ডাকনাম বুঝি বুড়ো? বলে নি তো?'

হিমশ্রীও খুব হাসল। তারপর বলল, 'বুড়োদা দয়ালজেঠুর কথা খুঁটিয়ে এত জানতে চায় কেন মা? যখন যাব, তখনই খালি ওই কথা। কী করত দয়ালজেঠু, কী বলত, ওঁর কোনো জিনিসপত্র আছে নাকি—এই সব। সারাক্ষণ।'

'তুই বুঝি সব বলিস?'

'কেন?' হিমশ্রী মায়ের দিকে অবাক চোখে তাকাল। 'বললে দোষ কী? আমাকে কত আদর করতেন দয়ালজেঠু। আচ্ছা মা, দয়ালজেঠুর কোনো জিনিসপত্র নেই আমাদের ঘরে?'

পর্ণা নিষ্পলক চোখে হিমশ্রীর দিকে তাকিয়ে আস্তে ঘাড় নাড়লেন। বলতে পারলেন না আছে। একটা ছোট্ট তোরঙ্গ অরীন্দ্রনাথ কোথায় যেন রেখেছিলেন। কী আছে ওতে দেখার দরকার মনে করেন নি। পর্ণারও দেখার ইচ্ছে ছিল না। এখন মনে হল, খুঁজে বের করে দেখলে হত।

শীত আসতে আসতে অমৃতেন্দুর লাগানো গাছগুলোতে ফুল ফুটল। মা ও মেয়ের খুব আনন্দ। হিমশ্রী তো হিমভোরে চলে যায় বইখাতা নিয়ে। অমৃতেন্দুর ঘুম ভাঙায়। পর্ণাও প্রায় পেছনে পেছনে আসেন চায়ের ট্রে নিয়ে।

কুয়াশার ভেতর রোদ ফুটতে ফুটতে খোলা চত্বরের মতো একটুকরো বারান্দায় বসে চা খাওয়া হয়। ইদানীং সকাল-সন্ধ্যা এটাই বিলাস। ঠিক আগের দিনের মতো জীবন নিয়ে বাঁচা।

এক রাতে বিছানায় শুয়ে পর্ণা বললেন, 'কী অত কথা বলিস রে তোরা?'

হিমশ্রী একটু চমকে উঠল। 'কখন?'

'সব সময়। কখন আবার?'

হিমশ্রী লেপে মুখ ঢেকে বলল, 'তুমি ভীষণ গোয়েন্দা, জানি।'

পর্ণা কনুই ভর করে উঁচু হলেন। 'দুপুরবেলা অত হাতমুখ নেড়ে কী বোঝাচ্ছিলি ওকে?'

লেপ থেকে মুখ বের করে হিমশ্রী রাগী চোখে তাকাল। 'কী ভেবেছ তুমি? বুড়োদা জিগ্যেস করছিল কেন দয়ালজেঠু স্যুইসাইড করেছিল।'

'কী বললি তুই?'

'যা জানি বললুম।'

'কী জানিস?'

হিমশ্রী পাশ ফিরে বলল, 'বললুম, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। বাবা চড় মেরেছিলেন।'

পর্ণা ভাঙা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'হিমি! তুই ওকে তাই বললি?'

'বলো না মিথ্যে বলেছি?'

'তুই দেখেছিল চড় মারতে?'

'হ্যাঁ। শুধু চড়? ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল বাবা।'

পর্ণা চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'বেশ করেছিল। পরের ঘাড়ে বসে থাকবে—খাবে। আবার কুৎসা গেয়ে বেড়াবে। রাতবিরেতে মাতলামি করবে।'

হিমশ্রী পাশ ফিরে থেকে বলল, 'বাজে বলো না। আমি সব জানি।'

পর্ণা লেপ ঠেলে উঠে বসলেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'কী জানিস? এত যে জানিস-জানিস করছিস, বল কী জানিস, শুনি।'

হিমশ্রী নির্বিকার স্বরে বলল, 'বাবা অনেক টাকা নেয়নি দয়ালজেঠুর কাছে? আমাকে দিয়ে চেয়ে পাঠাত না বাবার কাছে? বাবার হয়ে তুমি বলতে যেতে না দয়ালজেঠুকে? বলো না মিথ্যা বলছি?

পর্ণা ওর মাথায় থাপ্পড় মারলেন। হিমশ্রী ফুঁপিয়ে উঠল। 'হুঁ, সত্যি কথা বললেই মার।'

পর্ণা হাত বাড়িয়ে টেবিলবাতিটা অফ করে দিলেন। তারপর ভারি শরীর টেনে সেই জানালার কাছে গেলেন। জানালাটা খুলে পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে রইলেন। শীতের জ্যোৎস্নায় আর কুয়াশায় ঝিম মেরে আছে প্রকৃতি। অমৃতেন্দুর ঘরে এখনও আলো। দরজা খোলা। একটু পরে হঠাৎ চমকে উঠলেন পর্ণা। সাদা জ্যোৎস্নায় কালো হয়ে যেন দয়ালবাবুই বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ ফেটে জল এল পর্ণার।...

হিমশ্রী আজ ওঠেনি অন্যদিনের মতো। পর্ণার ঘুম হয় নি ভাল। বুঝতে পারছিলেন পেছনদিকটায় ফিরতে গিয়ে ভুল করেছেন। জায়গাটুকু বেচে দিতে হবে। যে কিনবে, সে সব মিশমার করে ঘরবাড়ি তুলবে। ঘরবাড়ির জন্য জায়গাজমির যে আকাল পড়ে গেছে, বেচতে চাইলে কত লোক দৌড়ে এসে সাধাসাধি করবে।

কড়া কথাটা বলার জন্য তৈরি হয়েই গেলেন পর্ণা। হাতে চায়ের পাত্র ছিল না রোজকার মতো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে ডাকলেন। সাড়া এল না। কড়া নাড়লেন। তবু অমৃতেন্দুর সাড়া নেই। অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে পর্ণা দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলেন। দয়ালবাবুর বেলাতেও তো এমনি হয়েছিল! ভেতরে এমনি আলো জ্বলছিল। আবার কি কোন সর্বনাশ ঘটল তাহলে?

কিন্তু অমৃতেন্দু দরজা খুলে দিল। চোখ দুটো লাল। ভিজে দেখাচ্ছে। পর্ণা গম্ভীর মুখে কড়া কথাটা বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। ঘরের ভেতর বাল্বটা জ্বলছে। তারই নিচে ফিকে সবুজ দেয়ালে দয়ালবাবুর হাতের সেই লেখাটা আবার অক্ষরে-অক্ষরে ফুটে বেরিয়েছে: 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

পর্ণা রূঢ় কণ্ঠস্বরে বললেন, 'এ কী করেছ?' তারপর ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কেন করেছ?'

অমৃতেন্দু একটু হাসল। 'বাবার হাতের লেখাটা উদ্ধার করছিলুম মাসিমা।'

'বাবা! দয়ালবাবু তোমার বাবা?' পর্ণা নিঃসাড় হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলেন। অমৃতেন্দুকে তাই এত চেনা লেগেছিল। ওর চলাফেরা, কথাবার্তার ভঙ্গী, তাকানো, খাওয়াদাওয়া। অমৃতেন্দুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকালেন পর্ণা। এতক্ষণে ওই লেখাটার মতো দয়ালহরি ফুটে উঠেছেন ওর চেহারায়। পর্ণা ধরা গলায় বললেন, 'এতদিন বলতে কী হয়েছিল?'

অমৃতেন্দুর আঙুলের দিকে চোখ রেখে বলল, 'বলতে সাহস পাইনি, মাসিমা। বললে কি ঘরটা দিতেন আমাকে? নিশ্চয় দিতেন না।'

পর্ণা চুপ করে থাকলেন। সত্যি তো। দিতেন না। এই ঘরের ভেতর গোপন-গভীর কলঙ্ক আছে। দয়ালবাবুর ছেলেকে সেখানে ঢুকতে দিতে বিবেকেও তো বাধত।

অমৃতেন্দু মুখ তুলে বলল, 'আপনি বসুন মাসিমা।'

পর্ণা এগিয়ে এসে তক্তাপোশের বিছানায় বসলেন। 'দয়ালবাবুর ছেলেটেলে ছিল আমরা জানতুম না। উনি বলেন নি।'

অমৃতেন্দু লেখাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবাকে আমি দেখিনি। কাকার কাছে শুনেছি, রাজনীতি করে বেড়াতেন। ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।'

'তোমার মা?'

'মা আমাকে নিয়ে দাদামশাইয়ের কাছে থাকতেন। আমার ছ' বছর বয়সে মা মারা যান। দাদামশাইও মারা যান। তখন কাকা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'কীভাবে জানলে তোমার বাবা এখানে থাকতেন?'

'জানতুম না। এখানে এসে ঘর খুঁজছিলুম। সুরজিৎ বলল, স্যুই-সাইডকরা ঘরে থাকতে পারব নাকি। বললুম, কেন পারব না? তখন আমাকে ও সব বলল। নাম শুনে ভীষণ চমকে গেলুম। তারপর হিমশ্রীর কাছে...'

পর্ণা দ্রুত বললেন, 'কী শুনেছ হিমির কাছে?'

'মেসোমশাই আর বাবা নাকি একসঙ্গে জেলে ছিলেন। সেই থেকে বন্ধুতা। একই পলিটিক্যাল পার্টির লোকেদের মধ্যে এটা তো স্বাভাবিক। মাসিমা, আমি আরও জানতে চাই বাবার সম্পর্কে। হিমশ্রী তো অনেক কিছু জানে না।'

পর্ণা মুখ নামিয়ে বিছানার চাদরে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে বললেন, 'পরে ওঁরা পার্টি-ফার্টি ছেড়ে দিয়েছিলেন অবশ্য। ব্যবসা করার প্ল্যান করতেন। কিন্তু এসব মানুষ কি ব্যবসা করতে পারে? খালি পাগলামি।'

'বুঝতে পারছি।'

'তুমিও তো দেখছি কম পাগল নও।' পর্ণা একটু হাসলেন। 'রাত জেগে ওসব কেন করেছ?'

'লেখাটা?' অমৃতেন্দুও একটু হাসল। 'হিমশ্রী কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ বলল,

ওখানে বাবার হাতের লেখা আছে নাকি। খুঁজে দেখলুম, ঠিক তাই। একেবারে মোছা যায় নি। হিমশ্রীকে বললুম একটুকরো কাঠকয়লা এনে দিতে। ভীষণ ইচ্ছে করছিল বাবার হাতের লেখা দেখতে। বাবাকে তো কখনও দেখি নি, মাসিমা।'

'তোমার বাবার একটা ছবি ছিল। গ্রুফ ফোটো। কোথাও আছে হয়তো। দেখব খুঁজে।' পর্ণা উঠে দাঁড়ালেন। 'একটা কথা বলি শোনো। ওই লেখাটা মুছে ফেলো। শিগগির এক পোঁচ রঙ করিয়ে দেব বরং। আর…'

পর্ণা কী একটা বলতে গিয়ে ভুলে গেলেন। 'বসো, চা নিয়ে আসি আগে।' বলে বেরিয়ে গেলেন।

হিমশ্রী কুকার জ্বেলে কেটলি চাপিয়ে দিয়েছে। চুল আঁচড়াচ্ছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। পর্ণা ব্যস্তভাবে ঢুকে বললেন, 'ও হিমি, জানিস? অমৃতেন্দু দয়ালবাবুর ছেলে। আমি তো তাজ্জব হয়ে গেলুম শুনে। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না রে।'

'বিশ্বাস না হওয়ার কী আছে? তোমাব তো সবতাতেই লাফালাফি।'

'তোর অবাক লাগছে না?'

'না।'

পর্ণা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে গেলেন। ওব মুখে বিন্দুমাত্র বিস্ময় নেই। নির্বিকার। চুলে চিরুনি চালিয়ে গিট ছাড়াচ্ছে। তারপর আঙুলের ডগায় একটু ক্রিম নিয়ে মুখে ঘষতে ঘষতে বলল, 'কী দেখছ? চায়ের জল ফুটছে না?'

পর্ণা আস্তে বললেন, 'তুই বুঝি জানতিস সব?'

'তোমার মত হইচইয়ের স্বভাব তো আমার নয়।' বলে হিমশ্রী তার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে বই বাছতে থাকল। তারপর কয়েকটা বই আর খাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পর্ণা ভারি একটা নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরে গেলেন। ছেলেটার এখন মন ভাল নেই। এখন গিয়ে হিমির জ্বালাতন করাটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। পর্ণা খুব সময় নিয়ে চা তৈরি করছিলেন। বুক থেকে কী কষ্ট বা সুখ ঠেলে আসছে শুধু। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে আজ।…

লালীর জন্য

'এই ঝোপে লালীর মড়াটা আটকে ছিল।'

দয়াময় এমন করে বলায় আমার খুব খারাপ লাগল। মড়া না বলে শুধু লালী বললেই পারতেন! যারা মরে যায়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে না পারলেও ঘেন্না থাকা উচিত কি? ধরা যাক, লোকটা বা মেয়েটা কিংবা কেউ হাড়জ্বালানী বদমাস ছিল—কিন্তু মরার পর তো আর কিছু করারই রইল না।

আর মৃত্যু, আজও এক রহস্য। মরে গিয়ে কী ঘটে? কেউ ফিরে এসে তো বলার উপায় নেই। অন্তত মৃত্যুর এই রহস্যময়তার খাতিরেও লালী একটা মূল্য দাবি করতে পারে। বিশেষ করে নিজের বাবারই কাছে। ওর বাবা দয়াময় অবশ্য বরাবর নিষ্ঠুর মানুষ বলে প্রসিদ্ধ। কথায় কথায় চাষীদের বেদম ঠ্যাঙান। লালীকেও সারাজীবন ঠেঙিয়ে গেছেন। লালী বলত—এটা বাবার একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থেকে হয়েছে। সত্যি করে কেউ তো এ পৃথিবীতে দয়াময় থাকতে পারে না।

আমি ঝোপটা খুঁটিয়ে দেখছি লক্ষ করে দয়াময় ফের বললেন—সেই বন্যায় সব উপড়ে ভেসে গিয়েছিল, শুধু এটা বাদে। চিনতে পারছ, এটা একটা শ্যাওড়া ঝোপ? খুব শক্ত শেকড়-বাকড়।

ভাগ্যিস শক্ত এর উপড়ে যায়নি, তাহলে লালী এই নদী বেয়ে সোজা গঙ্গায় পড়ত। তবে, গঙ্গায় পড়লে লালীর ভালই হত—সব পাপ ঘুচে মোক্ষ পেত তার আত্মা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার। কেন কে জানে, তার পরমুহূর্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। বললুম—তারপর কী হল?

দয়াময় একটু বাঁকা হেসে বললেন—তারপর কী হয়?

—মানে, ওকে কী অবস্থায় পেয়েছিলেন?

দয়াময় ঝোপটা দেখতে দেখতে বললেন—শকুন বসতে পারেনি, জল ছিল। তবে দুটো শেয়াল ওর নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছিল। আর একটা দাঁড়কাক তনে ঠোঁট ঠুকরে লাং বের করছিল। আরও শুনবে?

—জ্যাঠামশাই কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

দয়াময় নিষ্ঠুর হেসে উঠলেন। —কেন? তোমাদের আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের বোঝাই দায়—এত সেন্টিমেন্টাল। এস, তোমাদের জমিটা দেখিয়ে দিই।

দয়াময়ের কাঁধে এবার বন্দুকটা উঠল। পা বাড়ালেন। কাঁধে কার্তুজের ঝোলাটা নড়ে উঠল। আমার কিন্তু পা ডুবে গেছে শক্ত পলির তলায়, শেকড় গজাচ্ছে, এবং সেই সব সাদা বিন্দু বিন্দু শেকড়ের আঁকুর ভ্রূকুটির মতন আমার শরীর থেকে পৃথিবীর গভীরতা লক্ষ করতে চায়। খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করছিলুম এটা।

দয়াময় ঘুরে বললেন—কী হল?

—কিছু না। বেচারী লালীর কথা মনে পড়ছে।

দয়াময় ফের হাসলেন—তুমি বরাবর ব্রডমাইণ্ডেড আর মডার্ন। জানি। কিন্তু আমি প্রিমিটিভ ধরনের মানুষ। মেয়ের প্রেমিকদের···

বাধা দিয়ে বললুম—ছিঃ! কী বলছেন?

—মাঝে মাঝে আমি খব সরল হয়ে যাই, অমিত! একে সেই প্রিমিটিভ সরলতা বলতে পারো। দেখ, ও যখন বেঁচে ছিল—তোমার বাবার কাছে কথাটা তুলেছিলুম। অরবিন্দ বলেছিল, তা কী করে হয়? এখন অমিত পড়াশোনা করছে। তা ছাড়া, বিয়ের বয়সও তো হয়নি। হুম! তোমার বাবা আরও বলেছিলেন, অমিতের অনেক অ্যামবিসন আছে!

—জ্যাঠামশাই, প্লীজ! ওসব ভুলে যান।

—ভুলেছিলুম তো। তুমি আবার মনে করিয়ে দিলে! চলো, এগোনো যাক।

—আজ থাক বরং। জমি তো উঠে পালাচ্ছে না। কাল যাব বরং।

দয়াময় আমার দিকে কেমন দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—ও, আচ্ছা! তাহলে তুমি বসে-বসে অশ্রুপাত করো। আমি বরং দেখি দুএকটা তিতির পাই নাকি।

বলেই উনি বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন। বিশাল ওই মানুষ, পায়ে গামবুট, কাঁধে বন্দুক ও কার্তুজের ঝোলা, মাথায় টুপি। বাঁয়ে ঘুরে চরে নামলেন। কিছুক্ষণ নদীর তলায় হারিয়ে রইলেন। তারপর ওপারে বাঁধে বিরাট আকাশের গায়ে তাঁকে আবার দেখতে পেলুম। অমন একলা ওঁকে কখনও এর আগে মনে হয়নি। এখন একটু ভয় হল। চারদিকে ওঁর শত্রু। এভাবে একটা বন্দুক নিয়ে কি আত্মরক্ষা করতে পারবেন? এলাকায় তিনজন জোতদার ইতিমধ্যে খুন হয়েছে। উনিও যে-কোনও সময় খুন হতে পারেন। তখন লালীর মা বলবেন, অমিতই ষড়যন্ত্র করে ওঁকে মাঠে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিস বলবে, তাই তো! হঠাৎ এই ছোকরা আচমকা শহর থেকে বাবার সম্পত্তি দেখার ছলে গ্রামে এল এবং···

বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। তারপর বাঁ চোখের কোণ দিয়ে যেন লালীকেই দেখতে পেলুম। —কী অমিত, কেমন আছ?

—তুমি ভাল আছ তো লালী? মৃত্যুর পর জায়গাটা কেমন বল তো? প্রেমিক পেয়েছ কি এখানকার মতো? কথায়-কথায় তাদের সঙ্গে কি শুয়েপড়া এখনও সহজ? লালী, আমি কিন্তু সেদিক থেকে এখনও ব্যর্থ।

—তুমি যে ভীতু! মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতেই পারো না। অথচ, তোমার সারা দেহে তীব্র কামনা পোকার মতন কিলবিল করে। অমিত, তোমাকে তাই পোশাক খুলতে বলেছিলুম, মনে পড়ছে তো? ওই ওখানটায় জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে তুমি আবিষ্কার করেছিলে আমি উলঙ্গ, আর বলেছিলে—এ কী লালী! তোমার শাড়ি কোথায়? আমি বলেছিলুম—কেড়ে নিয়েছে। তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে—কে? কে? তখনই বৃষ্টি আর বাতাস বেড়ে গেল। আমার জবাব তুমি শুনতে পেলে না।

—কী বলেছিলে লালী?

—বলেছিলুম, যে কাড়বার সেই কেড়েছে। এতদিনে আমার সম্পূর্ণতা। এবার তাই ভেসে গেলুম। বিদায়, অমিত! বিদায়!

—আর বলেছিলে, হাসতে হাসতে বলেছিলে, তুমিও প্যান্টটা খুলে ফেল। পারিনি। আমার সাঁতার দিতে অসুবিধা হচ্ছিল। তবু জলের তলায় সভ্যতাকে বাঁচাতে চাইলুম!

—অথচ……

—অথচ কি লালী?

—অথচ পোশাক খুলে ফেললেই কত সহজেই মানুষ সম্পূর্ণতা পায়।

—সে কী লালী, সম্পূর্ণতাটা কী?

—তার নাম স্বাধীনতা।……

স্বাধীনতা! আমার চোয়াল আবার শক্ত হয়ে উঠল। লালী খুব ছেলেবেলা থেকেই তাহলে আমাকে এই স্বাধীনতার দিকে ডেকেছিল। তখন বুঝতুম না। পরেও কোনদিন বুঝিনি! নাটাকাঁটা কুঁচফল শ্যাওড়া-ঝোপের গুহায় ছায়ায় নির্জনে শুয়ে পড়ার মানে আরেক জন্মের দিকে লক্ষ্মীন্দরের মতো ভেসে যাওয়া—শিয়রে বেহুলা। জানতুম না। পদ্ম-শালুক-

ফোটা ঝিলের জলে সেই স্বাধীনতার ডাক ছিল। চৈত্রের নির্জন মাঠে সেই স্বাধীনতার হাওয়া ছিল। নদীর চড়ায় জ্যোৎস্নায় গা এলিয়ে পড়ে থাকত সেই সোনালী রূপোলী স্বাধীনতা। কী বোকা ছিলাম এতদিন!

আমি ভালবাসতুম ব্রিজে শব্দকারী রেলগাড়ি, গলায় নীল রুমাল জড়ানো দাড়িওলা ফায়ারম্যান, পাহাড়ের চূড়ার ওদিকে ব্লাস্ট ফার্নেসের ছটা, সবুজ লাগুমাস্টার গাড়ি, রাতের আকাশে এরোপ্লেন আর গালিভারস ট্রাভেল এক খণ্ড। ভালবাসতুম পুরনো কালের সাহিত্য, কিংবা পিকাসো আর দালির ছবি রবিঠাকুরের কবিতা তেমনি মুরের ভাস্কর্য। ক্লাসিকে-রোমান্টিকে মাখামাখি এক বিরাট সভ্যতাকে জানতুম শ্রেয় ও প্রেয়। সভ্যতার কয়েক হাজার বছর আমার মগজে ঢুকে পড়েছিল।

আর লালী ভালবাসত কুঁচ ফল, বিষাক্ত ধুঁতুল, লালপোকা নীলপোকা নির্জন পলিয়াড়ির পাখি, জ্যোৎস্না রাতে পরীর নাচ, মাঠের বিশালতা।

দুইয়ে কোন মিল ছিল না। আমি শহর থেকে নিয়ে যেতুম জাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্বমূলক গল্প। লালী কুড়িয়ে আনত মাঠের নিঃসঙ্গ চাষা ইবাজ সেখের রূপকথা। লালী গাইত প্রাচীন লোকসঙ্গীত, আমি আওড়াতুম আধুনিক কবিতা। কোনও মিল ছিল না, কোনও মিল।

অথচ লালীকে দয়াময় লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কী বছর দিব্যি আধুনিক মেয়ে সেজে সে মফস্বল শহরের কলেজে বাসে যাতায়াত করত।

একদা লালী নদীর ধারে জামবনে আমাকে বলেছিল—তোর সঙ্গে একটা ভাব দরকার কথা আছে, খুব জরুরি।

বলেছিলুম—কী কথা রে? এক্ষুনি বল্ না।

হঠাৎ চাপা গলায় ও বলেছিল—এখন বলা যাবে না। বলব'খন।

এই ছিল লালীর স্বভাব। কৌতূহলকে ফুটিয়ে দিয়েই নিঃশব্দে হেসে চলে যেত। তখন তাকে মনে হত সবে ফুল ফুটবে এমন টানটান শাখা-প্রশাখার উত্তেজনা দিয়ে সে চলে যাচ্ছে। এবং তার ওই না-বলা কথাটা আমাকে তার-পর কতদিন উত্ত্যক্ত করেছিল বলার নয়। ভাবতুম—কী কথা বলবে লালী? কোনো গুরুতর শরীর-বিষয়ক কি তার আর সব উদ্ভট কথামালার অন্তর্গত? সে কি বলবে তার হাঁটুর নিচে আকর গজাচ্ছে উদ্ভিদের? তার শরীরে কোথাও ফুল ফোটবার ষড়যন্ত্র চলেছে সেই গূঢ় খবর জানাবে?

মাঝে মাঝে ওকে দেখতুম কত সহজে মিশে যাচ্ছে উদ্ভিদের রাজ্যে। জড়িয়ে

পড়ছে দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক সব খেলাধুলায়। কেন যে চলতে চলতে রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল মাঠে এবং দৌড়ুতে শুরু করল দিগন্তের দিকে, বুঝতেই পারতুম না।

ওর কাছে ছিল গভীর অথৈ কোন জলজগতের খবর, যেখানে মানুষেরা মৃত্যুর পর ঝিনুক হয়ে যায়। ও শোনাত, পাহাড়ের ওপর কোথায় আছে ডাকিনার গুহা, যেখানে ঘণ্টা বাজলেই পৃথিবীতে রাত্রি আসে।

লালা একদিন বলেছিল, গ্রামের এই নদীর চড়ায় দেবদূত নেমেছিল। কেমন তার চেহারা? তাও সে বর্ণনা করেছিল। গলার রেশমি রুমাল, নীল চোখ, হলুদ দুই ডানা কাঁধে, লাল টুকটুকে ঠোঁট। আর সেই দেবদূত লালীকে কী একটা ভাল খবর দিয়েই কেটে পড়েছিল। এ খবরটা অনেক পরে বলেছিল লালী। বাড়ি বউদির অর্থাৎ দয়াময়ের ভাইপো সুধাকান্ত—যে সেটেলমেণ্টের বড় অফিসার, তার বউয়ের ছেলে হবে।

এই সুধাকান্ত সারাক্ষণ আমাকে লালীর ব্যাপারে সন্দেহ করত। সে সেই বন্যার পর শহরে চলে গেছে। আর সে গ্রামে আসবে না। কারণ, লালীকে পাহারা দেবার দরকার ফুরিয়ে গেছে। লালীকে সভ্যতার দিকে টানতে তারই কারচুপি ছিল। দয়াময়কে ফুঁসলে বদলে নিয়েছিল। অথচ দয়াময়ের ইচ্ছে ছিল, লালীকে তিনি খাঁটি মেয়েজোতদার করে ছাড়বেন। অল্পস্বল্প লেখাপড়াই সেজন্য যথেষ্ট।

দেখতে দেখতে লালী বড় হল। কিন্তু তবু তার ওই বন্যতা গেল না। সভ্যতাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সে ঘুরে বেড়াত বিষাক্ত ধুঁতুল, লালপোকা, নীল-পোকা, পাখি, প্রজাপতি, কুঁচফলের পৃথিবীতে। আমাদের এই পাড়াগাঁর পাশে কাঁচা রাস্তাটায় ইতিমধ্যে পিচ পড়েছিল। মাঠে বিশাল ফ্রেমে টাঙানো হয়েছিল বিদ্যুতের তার। ফ্রেমের গায়ে লাল ফলকে সাদা মড়ার মাথা ও দুটো আড়াআড়ি হাড় আঁকা ছিল। তাতে নাকি লেখা ছিল . সভ্যতা। অতএব সাবধান!

অবশ্য এ কথা লালীর। আমি পড়তুম : এগারো হাজার ভোল্ট সাবধান। ও পড়ে বলত—সভ্যতা। অতএব সাবধান।

একদিন লালী বলেছিল—কেন আমার পিছনে ঘুরঘুর করিস বল্ তো?

তখন সে নদীর ধারের বাঁধে যেতে যেতে হঠাৎ জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল। আমি তার পিছু ছাড়িনি। জারুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে আমাকে

দয়াময় মাথা নাড়লেন—নাঃ!

লালী বাঁধের দিকে যাচ্ছিল? আমার মধ্যে একটা তীব্র উত্তেজনা জাগল। এক ফাঁকে নিচে নামলুম। কেউ আমাকে কোন প্রশ্নও করল না—কোথায় যাচ্ছি। প্রশ্ন করার এটা সময় নয়।

উঠোনের জল এক-বুক। তীব্র স্রোত ঘুরপাক খাচ্ছে। বেরিয়ে যেতেই রাস্তায় জল বেড়ে গেল। সাঁতার কাটার অভ্যাস ছিল ছেলেবেলা থেকে। নদীর বাঁধের দিকে এগিয়ে গেলুম। চিতসাঁতার দিচ্ছিলুম। স্রোতের সপক্ষে ভেসে যেতে যেতে যখন একটা নিচু জায়গায় পৌঁছলুম, টের পেলুম, বাঁধের এই অংশটাই যা টিকে আছে। জায়গাটা আন্দাজ কুড়ি ফুট-বাই-ছ ফুট এবং লম্বাটে, তার গায়ে অনেক জড়াজড়ি গাছ। তার নিচে ঝোপগুলো ডুবে গেছে। দ্রুত সন্ধ্যা আসছিল। আমি উথাল-পাথাল জলের শব্দের ওপর তার-তীব্র কিছু শব্দ ছুঁড়ে দিলুম—লালী! লালী!

পরক্ষণেই খুব কাছে সাড়া পাওয়া গেল—আছি।

আশ্চর্য! লালী আমার খুব কাছেই একটা হিজল গাছের ছড়ানো ডালে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। ভিজে শাড়িটা গায়ে জড়ানো। শেষ আলোয় ওকে দেখে মনে হল এক প্রাগৈতিহাসিক কোন সত্তা—হয়তো প্রাণী নয়, অন্যকিছু—মানুষের ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—লালী! ওখানে কী করছ?

লালী হাত তুলে ডাকল।—চলে এস অমিত।

শশব্যস্তে গাছে উঠে যেই তার দিকে এগিয়েছি, ও লাফ দিয়ে জলে পড়ল। মুহূর্তের ঝোঁকে আমিও ঝাঁপ দিলুম। ও দ্রুত এগোচ্ছিল। ওকে অনুসরণ করলুম। আর সেই সময় আবার বৃষ্টি নামল। আরও ধূসর হয়ে গেল সব কিছু। তবু মরিয়া হয়ে ওকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ডাকলুম—লালী! এই লালী!

লালী বার বার সাড়া দিয়ে গেল।

স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ হাতে কী একটা শক্ত ঠেকল। অমনি সেটা ধরলুম। মনে হল একটা প্রকাণ্ড লোহার রেলিং। সেটার ওপর পা রেখে উঠে বসলুম। তারপর শুনলুম লালীর কণ্ঠস্বর।—অমিত।

—লালী!

লালীকে রেলিঙের অন্যপ্রান্ত দিয়ে উঠতে দেখলুম। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে

সন্ধ্যার আবছায়ায় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে কাছে এসে বলল—সাঁকোটা উপড়ে গেছে দেখছ? এখানে এসে আটকেছে!

আমরা পাশাপাশি বসে আছি, হঠাৎ লালী বলে উঠল—এই অমিত, আজ তোমাকে সেই পুরনো কথাটা বলব।

আমি ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরেই প্রচণ্ড অবাক হয়ে বললুম—একি লালী! তোমার কাপড়চোপড় কোথায় গেল?

—সাঁতার দেওয়া যায় না। তাই ফেলে দিয়েছি। তুমিও সব ফেলে দাও।

সেই রাতে পৃথিবী আমাদের দুজনকে শোবার মতো একটুও জায়গা দেয়নি। তা পেলে আমরা দুটি প্রাচীন সরীসৃপের মতো অন্ধ ভালবাসায় ঘনীভূত হতে পারতুম।

আমরা সেই বেলিঙে অতিকষ্টে বসে থাকলুম—অনেক অনেকক্ষণ। কথা খুঁজলুম। এবং এক অদ্ভুত বন্য গন্ধে আমাদের শরীরের ভিতরে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কিছু ফুল ফুটল। নাকি আমাদের দুই সভ্যতাবর্জিত নগ্ন শরীর থেকে অজস্র আঁকুর গজাল শেকড়বাকড়ের ষড়যন্ত্রে? তাই তখন দরকার ছিল একটুকরো মাটি। অথচ কোথাও তখন মাটি নেই।

এক সময় বললুম—লালী, তোমার সেই কথাটা?

—হ্যাঁ, কথা।

বলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর খুব আস্তে বলল—কথাটা হয়তো ফুরিয়ে গেছে। নেই আর।

—লালী, হেঁয়ালি করো না।

হঠাৎ সে হেসে উঠল। কথাটা ফুরিয়েছে। তবু কথা আরো থাকে, অমিত। সে কথা শুনতে হলে আরো দূরে যেতে হবে। চলে এস।

সে তক্ষুণি অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপ দিল জলে। চেঁচিয়ে উঠলুম—লালী!

লালীর ডাক শোনা গেল।—চলে এস!

অসম্ভব। এই দুর্যোগে আর ঝাঁপ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। পারলুম না। কাকুতি মিনতি করে ওকে ডাকতে থাকলুম। ও শুধু দূর থেকে দূরে যেতে যেতে বলল—চলে এস!

আমি রাগ উত্তেজনা দুঃখে অস্থির হয়ে বসে থাকলুম। ওই ডাকে সাড়া দিয়ে এগোবার সাহস আর শক্তিও আমার ছিল না।...

এখন বুঝতে পারি, ওই ছিল লালীর মুখে স্বাধীনতার ডাক। যে স্বাধীনতায় অতিক্রান্ত হয় দিনরাত্রি, সূর্য ওঠে, চাঁদ জ্যোৎস্না দেয়, এই ব্রহ্মাণ্ড চলে যেতে থাকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের ভেগা নক্ষত্রের দিকে, বুদ্বুদের মতো প্রসারিত হয় স্পেস, সময় হয়ে ওঠে গতিবান—আর যে স্বাধীনতায় মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদ আসে, ফুল ফোটে, প্রাণীরা জন্ম নেয়, লালী সেই খাঁটি স্বাধীনতাকে জেনেছিল। তার দিকে চলে যাচ্ছিল আমৃত্যু। ওই যাওয়াই তার জীবন।

হায়, সেই স্বাধীনতার ডাক কেউ শোনে, কেউ জানে—অনেকে শোনে না, অনেকেই জানে না! জন্মের পরই ইতিহাস চোখে পরিয়ে দেয় সভ্যতার ঠুলি।

লালী ছিল আমারই স্বাধীনতার টান। আমি ভাসতে পারিনি। সভ্যতায় আছি। পোশাকে কার্পেটে ফুলদানিতে, পিকাসো রবিঠাকুরে।

—এই ঝোপে লালীর মড়াটা আটকে ছিল।

যেন দয়াময় আবার খুব পাশ থেকে কথা বলে উঠলেন। আবার আমি ঝোপটা দেখতে থাকলুম। দেখলুম, কালো বিষ-পিঁপড়ে, লালপোকা, মাকড়সার জাল, ছত্রাক, সাপের খোলস, শ্যাওলা, ভাঙা ডিম, গিরগিটি, সবুজ সাপের ছায়াধূসর স্যাঁতসেঁতে উর্বর পৃথিবীতে আলুথালু চুলে লালী শুয়ে আছে। ভাঁড়ুলে গাছের নিটোল গুঁড়ির মতো খয়েরি দুই উরু, 'শঙ্খের মতন করুণ যোনি'. তার ধূসর দুই স্তনের বোঁটায় হাজার-লক্ষ বছরের মানুষের শৈশব জটিল হরফে লেখা। ফিসফিস করে ডাকলুম—লালী!

আর বাঁধের দিকে পরপর দু'বার শব্দ হল। চমকে উঠে দেখলুম, দয়াময় উড়ন্ত পাখির ঝাঁক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছেন। ঝাঁকটা ভয় পেয়ে আমার মাথার ওপর এসে পড়তেই আমিও ভয়ে মাথা নাড়ালুম। তারপর আড়চোখে দেখি দয়াময় এদিকে বন্দুক তুলছেন। পাখিগুলো দূরে চলে গেল। কাঠ হয়ে বসে আছি। তারপর দয়াময়ের জুতোর শব্দ হল।—এখনও বসে আছ, দেখছি!

—না। ফিরব। আপনি এরই মধ্যে ফিরলেন যে?

—ফিরলুম। তোমাকে একটা কথা বলতে বাকি ছিল।

—বলুন।

—নদীর ধারে সবজিচাষ করত একটা লোক। ওই ওখানটায়। তোমার মনে পড়ে?

—হ্যাঁ। গণেশ রাজবংশী। সে নাকি জ্যোৎস্নায় চরে পরী নামতে দেখেছিল। তার ছেলেকে মনে পড়ে?

—খুউব। কী যেন নাম ছিল—

—সীতু।

—হ্যাঁ, সীতু। পাঠশালায় আমাদের সঙ্গে পড়েছিল।

দয়াময় ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলেন।—সে রাতে লালী কোথায় যাচ্ছিল জানো? সীতুর কাছে।

আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম ওঁর মুখের দিকে।

—সীতুরা থাকত ওখানেই। আর লালী তাদের খবর নিতে যাচ্ছিল। তাছাড়া আর কী বলব?

—কেন?

—বুঝতে পারছ না কেন? দয়াময় জ্বলে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হল। তারপর বললেন—খুব ছেলেবেলা থেকে এটা চলছিল—একটুও তলিয়ে ভাবি নি। ওই শুওরের বাচ্চাটা লালীকে নষ্ট করেছিল। লালীকে সে……

অনেক কষ্ট পাচ্ছেন দয়াময়, তাই কথা আটকে গেল। চোখমুখ লাল হয়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে আবার বললেন—পরে গণেশ বলেছিল আমাকে। লালী বন্যার রাতে ওদের কুঁড়েয় যায়। তখন ছোঁড়াটা ছিল না। রিলিফের নৌকো ডাকতে গিয়েছিল গ্রামের দিকে। ওর বাবা গাছের ডালে বসেছিল। অন্ধকারেও ওর চোখে কিছু এড়ায়নি। ও লালাকে টের পেয়েছিল। খুব বকাবকিও করেছিল। কেন এই দুর্যোগে এভাবে এসেছে? তারপর ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে এ কি সর্বনেশে কীর্তি! তারপর—ঘোড়ার মতো মুখ তুলে হাসলেন দয়াময়।

—তারপর?

—তারপর লালী আবার ভেসে যায়। বুড়ো আর ওকে দেখতে পায়নি।

—তাহলে পথে এই ঝোপের মধ্যে…

কথা কেড়ে দয়াময় বললেন—কী ঘটেছিল আমি জানি না। হয়তো কাপড়ে আটকে গিয়েছিল।

—না। ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিল তখন।

দয়াময় আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকালেন।

—আমার সঙ্গে সন্ধ্যায় ওর দেখা হয়। তারপর ও সাঁতার কেটে ওদিকে চলে গিয়েছিল।

—তুমি জানো, সীতু ছোঁড়াটাকে কী শাস্তি দিয়েছি?

—খুন করেছেন?

—এই ঝোপের তলায় মাটির অনেক নিচে তাকে লালীর জন্যে অপেক্ষা করতে পাঠিয়েছি।

—আর গণেশবুড়ো?

—তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। মাঝে মাঝে তার কাছে যাই, লালীর কথা শুনতে। লালীর আরেকটা জীবন ছিল। ও জানত, আমি জানতুম না।

—আমি একবার যাব বুড়োর কাছে।

—যেও। তবে কষ্ট পাবে। আমি বাবা। হয়তো কষ্ট পাই। হয়তো কষ্ট পেতেই যাই। তুমি কি কষ্ট পেতে চাইবে লালীর জন্য? তোমাকে তো ও ভালই বাসে নি!

বলে দয়াময় কেমন একটু হাসলেন। তারপর কিছু না বলে হনহন করে মাঠের দিকে এগোতে থাকলেন।

তা হলে সীতুর জন্যই লালী……আমার গলায় কী আটকে গেল। তাই নিয়ে গণেশ রাজবংশীর কুঁড়েঘরটার দিকে চললুম। আমি এখন লালীর অন্য জীবনের কথা শুনব, যা আমার আজও শোনা হয়নি। সবুজ তেজী উদ্ভিদের ভেতরে এখন বুড়ো চাষা হাঁটু মুড়ে বসে আছে। আমাকে দেখলে বেরিয়ে এসে ভিজে ধুলোয় ধূসর শরীর ছায়ায় এলিয়ে রেখে ফ্যাকাসে চোখে পৃথিবীর একটা পুরানো গল্প শুরু করবে। সেই গল্পের কোন শেষ নেই। কারণ সেই গল্প লালী নামে এক মেয়ের—যে স্বাধীনতা জেনেছিল।……

তারাচাঁদের হাসি

আমাদের গাঁয়ের তারাচাঁদ চক্রবর্তী একেবারে রাশভারি না হলেও মোটামুটি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁকে বাচালতা করতে কেউ দেখেনি। কথা বলতেন কম। বেশি ঢ্যাঙা হওয়ার দরুন একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতেন। আর একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁর। কারও সঙ্গে কথা বলার সময় চোখদুটো আকাশে তুলে রাখতেন। যেন চোখে-চোখে তাকিয়ে কথা বলতেই পারেন না।

কিন্তু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্যাপারটা ঠিক নয়। চোখে চোখ রাখতেও পারেন তারাচাঁদ। আসলে তাঁর চোখদুটো ট্যারা। একবার দারোগা ও চোরের সামনে দাঁড়িয়ে…

না। তার আগে বলা দরকার তারাচাঁদ আদৌ রসিক মানুষ ছিলেন না এবং তাঁর মুখের হাসির সঙ্গে ডুমুরের ফুলের উপমা দিতে হয়। মজার কথা, এই ডুমুরের ফুল কালেভদ্রে সত্যি-সত্যি ফুটতে দেখা যেত আর হুলুস্থুল বাধিয়ে ছাড়ত। অর্থাৎ তিনি যখন হাসতেন, তখন এমন একটা মারাত্মক হাসি হাসতেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। হাসিটা এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি অব্দি চন্দ্রকলা কিংবা ধনুকের মতো কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে যেত এবং তার সূচনায় ফ্যাঁচ করে একটা নাকঝাড়ার মতো শব্দ। তারপর মুখখানা যা ছিল তাই। সেই রকম গম্ভীর।

তারাচাঁদের এই দুর্লভ হাসি কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছিল। প্রতিটি হাসি কীভাবে যে রহস্য আর প্রচুর জল্পনা-কল্পনার কারণ হত, ভাবা যায় না। হিড়িক পড়ে যেত সারা গাঁয়ে, তারাচাঁদ হাসলেন কেন? সহজে যে মানুষ হাসেন না, তার এমন বিদঘুটে হাসির পিছনে লোকেরা ধরে নিত কোনও-না-কোনও গোপন কেলেঙ্কারি আছেই এবং যাকে দেখে হাসতেন, তার প্রতিক্রিয়া ছিল দেখার মতো। একবার নিজেরই জ্ঞাতিভাই অনাদির বিয়ের পর বউ দেখতে গেলেন তারাচাঁদ। সঙ্গে কিছু উপহারও ছিল। বউকে দেখে বললেন, তুমি মধুপুরের অরুবাবুর মেয়ে গো! তুমি আমাদের কত আপনজন। তারপর ফ্যাঁচ করে সেই বিদঘুটে হাসি। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একান থেকে ওকান অব্দি ঝিলিক। কিন্তু অনাদির বুকে ওটা বাঁকা ছুরিই হল। সে তারাদার পেছন পেছন ঘোরে যখন-তখন। ও তারাদা বলো না গো হাসলে কেন? তারাচাঁদ

ও লাইনে আর যাবারই পাত্র নন। এর ফলটা খুব খারাপ হয়েছিল। অনাদি বউকে তার বাপের বাড়ি রেখে চলে এল তো এলই। বৌকে নিয়ে কত অশান্তি. মামলা মোকদ্দমাও হয়ে গিয়েছিল।

তারাচাঁদ ছিলেন সর্বচর মানুষ। টো টো করে নানা জায়গায় ঘুরতেন। কাজ ও অকাজ দুই-ই তাঁর নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাত। প্রথম জীবনে গাঁয়ের বারোয়ারি দেবী সিংহবাহিনীর পুজোআচ্চা করে মাইনে পেতেন। পোষায় না বলে ছেড়ে দিয়ে একটা পাঠশালা খোলেন নিজের বাড়িতে। চারপাশে পোড়ো ভিটের নিমের জঙ্গল। একা মানুষ। মা বেঁচে থাকতে ষোলো বছর বয়সেই এক বালিকার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বালিকাবধূ সে-আমলের ম্যালেরিয়ায় ভুগে মারা পড়ে। তারপর থেকে তারাচাঁদ একাই থাকতেন। গোটা সাতেক বাচ্চা জুটিয়েছিলেন বাগদিপাড়ার। তারা চেঁচিয়ে স্বরে অ স্বরে আ করত। আর তারাপণ্ডিত খুঁটিতে ঠেস দিয়ে হুঁকো টানতেন।

এও চলেনি। তখন কবরেজিতে নামেন। তখনও ম্যালেরিয়ার যুগ চলেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে কাঠির মতো গলা আর জালার মতো প্রকাণ্ড পেট নিয়ে বিকট ভুতুড়ে চেহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হঠাৎ-হঠাৎ রোদ্দুরে শুয়ে হিহি করে রামকাঁপুনি কাঁপছে। তারাচাঁদ রুগীর সামনে বসে মাটিতে আঁক কাটেন হেলোর ডগা দিয়ে। তারপর একটা কাঁচকলা এককোপে কেটে বলেন, বল্, নাই! রুগী চিঁচিঁ করে বলে, নাই।

আমরা পিঠোপিঠি চার ভাই। চারজনেরই পেটে এচোঁড়ের মতো পিলে। জেলা বোর্ডের হাসপাতাল থেকে বাবা কুইনিন এনে গেলান। কাজ হয় না। শেষে আমাদের নাস্তিক বাবার মতি টলল। তারাচাঁদকে ডাকলেন। সেদিনই আমরা দুষ্ট-চতুষ্টয় এক কীর্তি করে বসেছি। মাঠের পুকুরে পদ্মফুল তুলতে গেছি। বাবা পাল ডাকিয়ে এনে বাড়ির সামনে প্রকাশ্য রাজপথে পাঁচিলের ধারে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। সবাই ন্যাংটা এবং দু'হাতে দুইকান ধরে দাঁড়িয়ে আছি। লোকেরা রাস্তার ওখানটায় এসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চলে যাচ্ছে। হেন সময়ে তারাচাঁদ এলেন পিলে কাটতে।

এসেই দুষ্টচতুষ্টয়ের দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে সেই অঘটনপটিয়সী ক্যাচ হাসিটি হাসলেন।

আজও ভুলিনি। আমৃত্যু ভুলব না ওই হাসি। এখনও তারাচাঁদের সেই হাসিটি দৈবাৎ মনে ভেসে উঠলে লজ্জায় দুঃখে ধরিত্রী দ্বিধা হও গোছের দ্রুত

প্রতিক্রিয়া জর্জরিত করে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাবাচাদকে ক্ষমা করতে পারি না।

হুঁ, সেই দারোগা ও চোরের গল্পটা।

ট্যারা চোখের বিপদ এই। শ্যামের দিকে তাকালে রাম দেখে তার দিকেই চোখ। তো দারোগা ও চোরের সামনে দাঁড়িয়ে তারাচাঁদ তাঁর কিংবদন্তীর হাসিটি হেসেছিলেন। অমনি দারোগা মহাখাপ্পা হয়ে তারাচাঁদকে বেটনের গুঁতো মেরে বসেন। তারাচাঁদ পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করেন। তারপর দ্বিতীয় গুঁতোর কয়েক ইঞ্চি তফাত গিয়ে ছুটে পালান। সে আমলে পাড়াগাঁয়ে জঙ্গল ছিল আনাচেকানাচে। তা ফুঁড়ে তীরের মতো ঢুকে যান। সেপাইরা হন্যে হয়ে এসে জানায়, ভাগলবা শালালোগ। পূর্ণ চৌকিদার ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করে, কালপরশুর মধ্যে আসামীকে থানায় হাজির করব হুজুর। দারোগার রাগ তবু পড়ে না। তখন বেচারা চোর অর্থাৎ গণশা রাজবংশী বেধড়ক মার খায়।

পরে দারোগাবাবু অনেককে বলেছিলেন, না। ব্যাটা বিটলে বামুন আমার দিকে তাকিয়েই হেসেছে। ওসব ট্যারা-ফ্যারা নেহাত চালাকি। আমি বদমাস চরিয়ে খাই, আমাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

শুনেছি, দারোগাবাবুর মনে খুব আঘাত লেগেছিল। মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন অনেকদিন অব্দি।

আরেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

কায়েতপাড়ার একটেরে থাকতেন গোপাল সিঙ্গি। সিঙ্গি দম্পতির ছেলেপুলে হয়নি। মোটামুটি ভাল অবস্থা ছিল। সিঙ্গি মশায়ের স্ত্রী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। সবসময় মুখে হাসিটি লেগেই থাকত। স্কুল থেকে ফেরার সময় শর্টকার্ট করতে ওঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসতাম। রোয়াকে বসে সিঙ্গিমশাই তামাক খেতেন আর সুখেশ্বরী তাঁর পাকা চুল তুলতেন চিমটে দিয়ে। আমাকে দেখলেই মিষ্টি হেসে কাছে ডাকতেন। স্বামীকে বলতেন, দেখছ? ছেলেটাকে আমাদের বামুনকায়েতের ঘরের বলে মনে হয়। ও খোকা একটু দাঁড়াও না বাবা!

তারপর দৌড়ে বাড়ি ঢুকে দুটো মোণ্ডা কিংবা নাড়ু, এনে ওপর থেকে সাবধানে হাতে ফেলে দিতেন।

আসলে আমাদের মুসলিমপাড়ায় সবাই চাষী। আমাদের পরিবারের শিশু। ওরা লেখাপড়াটা জীবনে ক্ষতিকর ভাবত। বলত, দু'কলম শিখলেই তো মামলাবাজ হয়ে যাবে। তাছাড়া বাচ্চারা হাঁটতে শিখলেই কত সাংসারিক কাজে

লাগে। লেখাপড়া শিখে আলসে-বাবু হয়ে যাবে না? তখন কে করবে গরু চরানো বা চাষবাসের কাজ?

যাই হোক, সুখেশ্বরীর ওকথার মানে তখন বুঝতাম না। বুঝলেও একজন সুন্দরী মহিলা, তাঁর মিষ্টি হাসি, তাঁর মাতৃভাব এবং সন্দেশ আমাব কাছে অনেক জরুরী ছিল।

তো এই গোপাল সিঙ্গি হঠাৎ রাতারাতি ওলাওঠায় মারা যান। সকালে উঠোনের তুলসীতলা থেকে যখন তাঁর মড়া ওঠানো হচ্ছে, তারাচাঁদ ব্যস্ত হয়ে হাজির হলেন। শোক প্রকাশ করে বললেন, আহা হা! বড ভাল মানুষ ছিলেন গো! ব্রাহ্মণের প্রতি সদাসর্বদা উপুডহস্ত ছিলেন গো! যখনই এসে দাঁড়িয়েছি তখনই.…

কথা হঠাৎ থামিয়ে তারাচাঁদ চকোত্তি তাকালেন সুখেশ্বরীর দিকে এবং বেমক্কা সেই আকর্ণ বিদঘুটে ফ্যাঁচ হাসিটি হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলেন অভ্যাসমতো।

ব্যাপারটা বাড়িসুদ্ধ লোক দেখেছিল এবং সেটা মৌচাকে ঢিলের কাণ্ড বাধিয়েছিল। পরে তুমুল জল্পনা শুরু হয়ে যায়, তারাঠাকুর সিঙ্গিমশায়েব বিধবাকে দেখে হাসল কেন? কিমিদং? আলবৎ গুহ্যবৃত্তান্ত আছে।

এটা অনেক দূর গডাল ক্রমশ। গুজব রটে গেল, সুখেশ্বরী আসলে স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরেছেন। বিধবাব ওপর জ্ঞাতিদের নির্যাতন শুরু হল। কিন্তু সিঙ্গি তো পুড়ে ছাই। কীভাবে প্রমাণ হবে? এদিকে আইন সুখেশ্বরীর পক্ষে। কারণ স্থাবব অস্থাবর সব সম্পত্তি তাঁর নামে দিয়ে গেছেন সিঙ্গি।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের আমোদগেঁডে বয়স্করা একদিন যুক্তি করে তারাচাঁদকে পাকডাও করলেন। এ রহস্য তাঁকে ফাঁস করতেই হবে। তারাচাঁদ তো অকারণে হাসেন না। ছ্যাবলামির ধাত তাঁব নয়। তাছাডা তিনি সর্বচর মানুষ। সবার হাঁডির খবর নাকি রাখেন।

তাছাডা গোলমাল এখন অনেকটা চুকে গেছে। এখন বললেই বা ক্ষতি কী? সবাই তারাচাঁদকে সাধাসাধি করতে থাকলেন। লোভ দেখালেন। কেউ কেউ শাসালেনও। কিন্তু তারাচাঁদ গম্ভীর। শেষঅব্দি 'এমনি হেসেছি—হাসি এল, তাই হেসেছি' ইত্যাদি বলে কেটে পডলেন। সবাই বেজার হয়ে বসে রইলেন বারোয়ারি বটতলায়।

এসব ঘটনা আমার বড হয়ে শোনা। এইসঙ্গে আরও যা শুনেছিলাম তা

না বললে তারাচাঁদকে নিয়ে এই গল্পের পটভূমি স্পষ্ট হবে না। অবশ্য সে-গল্প খুবই ছোট্ট হবে।

নিমবনের মধ্যে তারাচাঁদের ভিটের কথা আগেই বলেছি। চোতমাসে সারা নিমবন মিঠে নিমফুলের গন্ধে মৌমৌ করত। একদিন তারাচাঁদ উনুনে চাল ফোটাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর গায়ে ছায়া পড়ল। চমকে ঘুরে দেখেন, সুখেশ্বরী। তারাচাঁদ নাকি সেই দারোগার পাল্লায় পড়ার আতঙ্ক কিংবা তারও বেশি আতঙ্কে কাহিল হয়ে যান। বিধবা কায়েতনী শক্ত মুখে সেই হাসির কারণ দাবি করেন। তারাচাঁদ বিব্রত হয়ে 'কিছু না', 'এমনি' ইত্যাদি বলেও রেহাই পান না। সুখেশ্বরী তাঁরই উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত লকড়ি তুলে তাড়া করেন। তারাচাঁদ প্রাণভয়ে ঘরে ঢোকেন।

তারপর কিছু ঘটে থাকবে। তারাচাঁদকে প্রায়ই সুখেশ্বরীর বাড়ি যাতায়াত করতে দেখা গেল। শেষে একদিন তারাচাঁদ নিজের ঘরে ঘুঘু চরতে দিয়ে সিঙ্গি-বাড়ি চলে এলেন। অবিকল গোপাল সিঙ্গির মতো রোয়াকে বসে তিনি হুঁকো খান। তবে তাঁর চুল কুচকুচে কালো। তাই হয়তো সুখেশ্বরীর চিমটে নিয়ে পাকা চুল তোলার উপায় নেই। কিন্তু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকাটি রোজ বিকেলে দেখতে পাই। সন্দেশও পাই।

সে-আমলে গ্রামসমাজে এ অনাচার সহজে মেনে নেওয়া হত না। অনেক হুলুস্থুল চলেছিল। কিন্তু ওঁরা দুজনে সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন। শেষঅব্দি ওঁদের একঘরে করা হয়। তারাচাঁদকে দেখতাম, সাইকেলে করে শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে আনছেন। জমি বরাবর মুসলমান চাষীরা ভাগে আবাদ করত। কাজেই অন্নের কোনো অসুবিধে হত না। বরং ভাগচাষী ফয়েজ সেখ ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। তাকে সবাই ভয় পেত। তাই ওঁদের তেমন ক্ষতি করার হিম্মতও ছিল না কারুর। অবশ্য তারাচাঁদ বড্ড খরুচে স্বভাবের বলে সব জমি শেষ পর্যন্ত ন'কড়া ছ'কড়ায় বিকিয়ে গিয়েছিল। খুব কষ্টেসিষ্টে চলত। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সুখেশ্বরী একটি ছেলের জন্ম দিলেন। কিন্তু শিশুটি জন্মান্ধ। লোকেরা হিড়িক তুলে ধর্মের জয়ঢাক বাজাতে থাকল। স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখতাম, মা তাঁর অন্ধ ছেলেকে কোলে নিয়ে হাত তুলে নিমবনে লেজঝোলা পাখি দেখাচ্ছেন। তারপর আমাকে দেখেই বলে উঠতেন, ওই ছ্যাখ! ওই ছ্যাখ কে আসছে। তোর দাদা রে! তোর মুসলমানপাড়ার দাদা! বল না দাদাকে, একটা পয়সা দাও। জিলিপি কিনে খাই।

কাতুকুতু খেয়ে অন্ধ শিশুর মুখে খিটখিট হাসি সেই প্রথম দেখি। এবং সে-হাসি তারাচাঁদের হাসি নয়।

এবার আমার ছোট্ট গল্পটা বলি।

দেশভাগের বছর। সেদিনই স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করা হবে। তারাচাঁদের ভিটে উজাড় করে ফুলেভরা নিমডাল ভেঙে এনে আমরা স্কুলের গেট সাজিয়েছি। বকুলফুলের মালায় ক্লাসরুম সাজিয়েছি। মর্নিং স্কুল। ক্লাস নাইনে পড়ি। প্রথমে ক্লাস টেনে ঢুকলেন হেডমাস্টারমশাই। হাতে ছুটির রেজিস্টার। জলদগম্ভীর গলায় পড়তে থাকলেন : দা স্কুল শ্যাল রিমেন ক্লোজ ফ্রম...

হঠাৎ অন্যসব ক্লাসের ছেলেরা হইহই করে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। আমরাও দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম গেটে। গেটের ওপাশে রাস্তা। গেট থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়ালুম।

কাঁচা রাস্তা। ধুলোয় ভরা। সেই ধুলোর ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন প্রায় আধ-ন্যাংটো তারাচাঁদ। হাতদুটো বুকের ওপর এবং একগাছি দড়িতে বাঁধা। তাঁর গোড়ালিদুটোও বাঁধা এবং বিচুলির দড়ির ডগা সুখেশ্বরীর হাতে। সুখেশ্বরী তারাচাঁদের ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর আলুথালু বেশ ও চুল। দৃষ্টি নিষ্পলক, দূরগামী, রক্তবর্ণ। তাঁর কোলে অন্ধ ছেলেটাও রয়েছে। রাস্তায় ধুলোয় একটা দীর্ঘ টানা ছাপ রেখে চলেছে তারাচাঁদের শরীর।

এটা যে মড়া, বুঝতে একটু দেরি হল। তারপরই একটা মারাত্মক ভুল হল হয়তো। কারণ সব টের পেয়েও অন্তত কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আমি তারাচাঁদের মুখে সেই বিদঘুটে হাসিটা দেখে ফেললাম।

ট্যারা মানুষ—ঠিক কার দিকে তাকিয়ে হাসল, বোঝা কঠিন। কিন্তু হলফ করে বলছি তারাচাঁদ শেষ হাসিটি হাসলেন। একঘরে ও জাতিচ্যুত এক নারী তাঁর প্রেমিককে নদীর ধারে ফেলতে নিয়ে গেলেন। আর পথে প্রেমিক তারাচাঁদ আমাদের দিকে তাকিয়ে একবার হেসে গেলেন। আমার শরীর শিউরে উঠল। আর তাকাতে পারলাম না।...

এ গল্পের মর‍্যাল কী? সেই উলঙ্গ রাজার গল্প? জানি না।

হরিপুরের বিশু

চন্দ্রকান্ত সকালে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে হঠাৎ বললেন, ওই পোড়ো বাড়িটাতে ভূত আছে জানিস শান্তা? মাঝরাতে হঠাৎ শুনি বেহালা বাজছে। তার মধ্যে আবার বিদঘুটে হাসিও। খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্!

চন্দ্রকান্ত হাসছিলেন না। সবসময় রাশভারি গম্ভীর মানুষ। রসিকতাও গম্ভীর মুখে করেন। সেজ নাতনী শান্তা তাঁর কথা শুনে খিলখিল হেসে বলল, না দাদামশাই। বেহালা নয়, মাউথ অরগ্যান।

ওই হল। চন্দ্রকান্ত বললেন। একটা কিছু বাজছিল তো? তোরাও শুনতে পাস তাহলে।

শান্তা আরও হেসে বলল, ভূত নয় দাদামশাই। ও তো বিশুদা।

সেটা আবার কে?

কণিকা ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, হরিপুরের বিশু। ওকে তুমি দেখনি বাবা। ভারি অদ্ভুত ছেলেটা। হঠাৎ কোত্থেকে এসে চেঁচিয়ে ওঠে, মা! বাবা! এসে গেছি আমি। ধরো, ঘরের ভেতর আছি—চেঁচামেচি শুনে যদি বলি, কে রে? অমনি বিশু বলবে, আবার কে—আমি সেই হরিপুরের বিশু।

চায়ের কাপ হাতে জামাই নন্দলাল বেরোলেন। বললেন, আসলে ওটা একটা হ্যাবিট। ধরুন, এবার আপনার সঙ্গে আলাপ হল। এরপর কোথাও দেখা হলে একমুখ হেসে বলবেই বলবে, চিনতে পারলেন না? আমি সেই হরিপুরের বিশু।

চন্দ্রকান্ত বললেন, ভাল। তা ওই পোড়োবাড়িতে কেন?

চন্দ্রকান্ত আরামকেদারায় বসে আছেন। নন্দলাল শ্বশুরের পায়ের কাছে মোড়া টেনে থামে হেলান দিয়ে বসে বললেন, গতমাসে নবীনবাবু এসে একটা ঘরের চাবি দিয়ে গেছেন। অমু ওখানে গিয়ে থাকে। হাইকোর্টে এতকাল পরে ডিগ্রি পেয়েছেন নবীনবাবু। নিজে এসে বসবাস করে দখল রাখতে অসুবিধে আছে-টাছে আর কী! তাই বিকোয়েস্ট করলেন আমায়। তো···

কণিকা বললেন, গণ্ডগোলের বাড়ি। আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু অমুকে তো জানো। বলল, আমি গিয়ে থাকব। বুঝতেই পারছ, বাড়িতে সেপারেট ঘর নেই যে বন্ধুবান্ধব এলে তাদের বসাবে। ওর তো রাজ্য জুড়ে

বন্ধুবান্ধব আর ওই হরিপুরের বিশু! যখন-তখন এসে একটু অসুবিধায় ফেলত। এইটুকু বারান্দা। অমুর সঙ্গে গাদাগাদি করে এই তক্তপোশটাতে শোওয়া। আবার কুমু এসে পড়লে তো বেচারা করুণ মুখ করে বলত, মা! আমি শুতে চললাম।...কোথায় রে? না—গিরিখুড়োর কাছে। বোঝো কাণ্ড! গিরিকে তুমি চিনবে বাবা! সেই যে পান বেচতে আসে, রোগা-পাতলা করে লোকটা?

চন্দ্রকান্ত বললেন, হুঁ। তা এই বিশুটি কে?

আজ ছুটির দিন। নন্দলালের দশমাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে অফিস যাওয়ার ঝক্কি নেই। লতাকে বাসে চেপে কলেজ যেতে হবে না। শান্তা আর মিতারও স্কুল নেই। বড় মেয়ে মমতার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসেনি পাড়ার মেয়েগুলো। সে প্রতিবন্ধী মেয়ে। জন্ম থেকে একটা হাত আর একটা পা কাঠির মতো সরু। স্থানীয় স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে কলেজে পড়তে যাওয়া সম্ভবই হয়নি। সাইকেল রিকশো করে স্কুলে যাতায়াত করত দীর্ঘ বারোটা বছর। নন্দলালের সংসারটা বড়, আয়ের উৎসটা ছোট। সবে বড়ছেলে কমল কলকাতায় একটা চাকরি পেয়েছে। ছোট ছেলে অমল কোনো-গতিকে বি এ পাস করে এখনও বেকার।

এমন একটা বাড়িতে সাংসারিক আবহাওয়া খুব একটা ভাল থাকার কথা না। তবে মাঝে মাঝে চন্দ্রকান্ত কলকাতা থেকে মেয়েকে দেখতে আসায় আবহাওয়া নির্মল হয়ে ওঠে।

আর ওই কোন এক হরিপুরের বিশু। হঠাৎ কোত্থেকে এসে মেঘ-ঝড়-ঝাপটা কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুচিয়ে দেয়। সারা বাড়ির তখন তার দিকেই মন। গপ্প করে গান গেয়ে মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে ক্যারিকেচার দেখিয়ে হরবোলার ডাক শুনিয়ে জমিয়ে দেয় একেবারে।

আজ ছুটির দিন, তাতে চন্দ্রকান্ত এসেছেন—তার ওপর হরিপুরের বিশু। সবার মনে খুশির আমেজ। বিশুর কথা বলতে গিয়ে কণিকা হেসে আলুথালু হচ্ছিলেন। মেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল দাদামশাইকে।

কণিকা বললেন, বিশু কে—জিগ্যেস করেছ? বিশু কে নয়, তাই বলো।

স্ত্রীর কথায় একটু বিরক্ত হয়ে নন্দলাল বললেন, ওরকম করে বললে উনি কী বুঝবেন? আমি বলছি, শুনুন বাবামশাই। আসলে (এটা নন্দলালের মুদ্রাদোষ) ছেলেটা একটু বাউণ্ডুলে ভবঘুরে টাইপ। বাবা বেঁচে আছে বলে, কিন্তু আমার ধারণা এতেও কিছু গণ্ডগোল আছে।

শান্তা বলে উঠল, বলো না বাবা, বিশুদার বাবার হোটেলের গল্পটা।

নন্দলাল বললেন, সে এক কাণ্ড। বিশু বলত, তার বাবার একটা হোটেল আছে কাঁদিতে। অমুকে তো জানেন। বলল, বেশ। চলো, আমরা ক'জন মিলে খেয়ে আসব তোমার বাবার হোটেলে। তারপর সত্যিসত্যি জনাচার-পাঁচ ছেলে মিলে বিশুর সঙ্গে কাঁদি গেল। হ্যাঁ—হোটেল একটা আছে বটে। সেই হোটেলের মালিককে বিশু বলল, বাবা! এরা আমার বন্ধু। এদের ভাল করে খাইয়ে দাও। তারপর খেলও। খাওয়ার পর ওরা হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়েছে—অমু দেখে কী, বিশু গিয়ে হোটেলওয়ালাকে দাম মেটাচ্ছে। ফিরে এলে অমুরা ওকে চেপে ধরল—কী রে? বাবার হোটেল বললি এবং অতবার বাবা-টাবাও খুব বললি, কিন্তু দাম মেটালি যে? বিশু বলল কী জানেন? বিজনেস! বিজনেসের ব্যাপারে বাবার একটা প্রিন্সিপল্ আছে। ছেলে আছি—আছি। এটা তো বাবার বাড়ি নয়—হোটেল। বিজনেস!

নন্দলাল হোহো করে হাসতে লাগলেন। কণিকাও হাসতে হাসতে বাবার কাঁধের কাছে ইজিচেয়ারের কোনা আঁকড়ে ধরলেন। লতা শান্তা মিতাও হেসে গড়িয়ে পড়ল। তক্তাপোশের কোনায় দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিল মমতা। সেও একটা হাঁটুর কাছে মুখ রেখে ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

শুধু চন্দ্রকান্ত গম্ভীর। বললেন, হুঁ। দেখো আবার কোনো...

শ্বশুরের বক্তব্য আঁচ করে নন্দলাল দ্রুত বললেন, না, না। ওসব ব্যাপারে ঠিক আছে। দু'বছর ধরে তো আসা-যাওয়া করছে। বাড়ির ছেলের মতো মিশছে। আমায় বাবা বলে ডাকে—ওকে বলে মা। আসলে ছেলেটার—বুঝলেন, কোথাও একটা ডেলিকেট পয়েন্ট আছে। একটু স্নেহ-ভালবাসা পেলেই খুশি। তাছাড়া আমার স্বভাব তো আপনি জানেন বাবামশাই! ম্যানওয়াচিং আমার হবি। আমি ওকে ভীষণ স্টাডি করেছি। অত্যন্ত সচ্চরিত্র, বিশ্বাসী।

কণিকা যোগান দিলেন।...লতুদের আপন বোনের মত ভালবাসে। যখনই আসে একগাদা করে সন্দেশ—তোমায় দেখাচ্ছি।

বলে কণিকা ঘর থেকে একটা বড় সাইজের সন্দেশের প্যাকেট নিয়ে এলেন। খুলে দেখিয়ে বললেন, কাল রাত দশটায় এল। তুমি তখন শুয়ে পড়েছ। ওখানে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, বারান্দায় মশারি! তার মানে নিশ্চয় কলকাতার দাদামশায় এসেছেন। অলরাইট মাম্মি, সাইলেন্স! বলে এই

প্যাকেটটা দিল। বলে কি, বর্ধমানের শক্তিগড় থেকে আসছি। শক্তিগড়ের ল্যাংচার নাম শুনেছেন? সেই ফেমাস ল্যাংচা। দাদামশাইকে সবার আগে দেবেন। বললাম, খাবি নে? রাত দশটায় আর খাওয়া বাকি থাকে? বলে অমুর কাছে শুতে চলে গেল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, আমাকে চেনে?

শান্তা বলল, বিশুদা কাকে না চেনে তাই বলুন?

নন্দলাল বললেন, না—আপনার কথা শুনেছে আর কী! এরা সবসময় আপনার গল্প করে তো।

কণিকা প্যাকেটটা মুড়ে বললেন, ওর অনেক গুণ, বাবা। আপদে-বিপদে ওকে দেখলে আমার সাহস হয়। সেবারে মিতুর টাইফয়েড। যায়-যায় অবস্থা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় বইছে। সেই দুর্যোগের মধ্যে বেরিয়ে গেল। কাঁদি থেকে ডাক্তার সোমের মতো লোককে টেনে আনল ছ'মাইল রাস্তা। তখন রাত প্রায় নটা। সমানে ঝড়বাদলা চলেছে।

অবিশ্বাস্য! নন্দলাল বললেন। চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না বাবামশাই! বিশুর ইনফ্লুয়েন্স কতটা ভাবতে পারবেন না। একবার একজায়গায় ডি এম উপস্থিত আছেন। আমি আর সব অফিসাররা আছি। হঠাৎ কোত্থেকে বিশু এসে ডি এমকে বলে কী, চিনতে পারছেন স্যার? আমি সেই হরিপুরের বিশু! ডি এম অবাক। আমি তো মুখ নিচু করেছি। ছেলেটা কি নির্বোধ? তারপর বিশু বলল, মনে থাকার কথা স্যার! সেই যে তারাতলার ফাংশনে আপনি চিফ গেস্ট—আমি মাউথ অর্গান বাজালাম। আপনি রিকোয়েস্ট করলেন, 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটা বাজাতে। আপনি বললেন, অসাধারণ। হাঃ হাঃ হাঃ।

নন্দলাল আবার হাসতে লাগলেন। চন্দ্রকান্ত পূর্ববৎ গম্ভীর। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, ওকে জোটাল কে? অমু?

আবার কে? কণিকা বললেন। এখানে লতুদের স্কুলের ফাংশানে এসেছিল। কোন দিদিমণির সঙ্গে চেনাজানা ছিল।

শান্তা বলল, বড়দিদিমণির সঙ্গে।

কণিকা প্যাকেটটা ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, তখন অমুর সঙ্গে আলাপ হয়। ডেকে এনেছিল।

মিতা বলল, বিশুদা যা ভূতের গল্প জানে! শুনলে আপনারও ভয় করবে

দাদামশাই। বিশুদা এমন ভূতের গল্প বলেছিল, মা বেরুতে পারতেন না ঘর থেকে।

ভেতর থেকে কণিকা হাসি চেপে বললেন, তোদের যত বাড়াবাড়ি।

শান্তা প্রতিবাদ করল। বাজে কথা বোলো না মা! তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে।

লতা বলল, তবে বিশুদার ভূতের সঙ্গে ডায়ালোগটা সত্যি অসাধারণ।

ভেন্ট্রিলিকুইজম। বলে নন্দলাল চায়ের কাপ হাতে উঠে দাঁড়ালেন। বিশু গুণী ছেলে। ওর তুলনা হয় না। ভেরি চার্মিং পারসোনালিটি। আলাপ হলে বুঝবেন।

নন্দলাল উঠোন পেরিয়ে ল্যাট্রিনের দিকে গেলেন। চন্দ্রকান্ত বললেন, হুঁ—বুঝলাম। তো ডাকো তোমাদের হরিপুরের বিশুকে। আলাপ করা যাক।

মিতা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। শান্তা বলল, এখন মোটে সাতটা বাজে। এখন ওদের ওঠাতে পারবে—তাহলেই হয়েছে। ন'টার আগে কিছুতেই উঠবে না।

লতা মুখ টিপে হেসে বলল, আমি ওঠাচ্ছি। তারপর সে উঠোনে নেমে কুয়োতলার চৌবাচ্চা থেকে এক মগ জল নিয়ে বেরিয়ে গেল। মমতা আস্তে বলল, কোনো মানে হয়? রাত জেগে আছে—এখন গিয়ে খামোকা বেচারাকে ডিসটার্ব করবে।

শান্তা দৌড়ে গিয়ে খিড়কির দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, মেজদি! সেদিনকার মতো যেন কানে জল ছেটাবি নে। কানে জল ঢুকে বিশুদা বিপদে পড়বে, আমাদের এনজয় করা হবে না।

কথা শেষ হতে না হতে সদর দরজা দিয়ে বিশুর প্রবেশ ঘটল। গায়ে ফিকে লাল গেঞ্জি, পরনে রঙচটা পাতলুন। বড়-বড় চুল কপাল থেকে সরিয়ে দুচোখ কচলে সোজা চলে এল চন্দ্রকান্তের সামনে। তারপর দাদামশাই বলে দু পা ছুঁয়ে জব্বর এক প্রণাম ঠুকল।

পা সরিয়ে নিয়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, থাক, থাক। তারপর দেখতে থাকলেন বিশুকে।

বিশু হাসিমুখে বলল, আশীর্বাদ করুন দাদামশাই বিশুকে। আপনার জন্য দেড়ঘণ্টা ঘুম লস করে উঠে এলাম।

খিড়কির দরজা দিয়ে লতা বাড়ি ঢুকে বলল, বিশুদা! জলটা তোমার—বুঝতে পারছ?

বিশু বলল, ইয়ার্কি কোরো না লতু। এখন আমার সঙ্গে দাদামশায়ের ইণ্টারভিউ। সিরিয়াস ব্যাপার।

চন্দ্রকান্ত দেখছিলেন বিশুকে। রোদপোড়া তামাটে রঙ, মাঝারি গড়ন, মুখের চেহারাটি মিষ্টি বলা যায়। একটু লাজুক শান্ত চাহনি। চাহনিতে হাসি লেগে আছে। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি আছে মুখে। গড়ন বলিষ্ঠ বলা চলে না, একটু রোগাটে ছাপ আছে—তা সত্ত্বেও কাঠামোর জন্য স্বাস্থ্যবান মনে হয়।

চন্দ্রকান্ত বললেন, হুঁ। তুমিই তাহলে সেই হরিপুরের বিশু। পুরো নামটা কী হে?

বিশু বিনীত ভঙ্গিতে বলল, বিশ্বনাথ রায়, দাদামশাই।

এ তল্লাটে রায়েরা তো সবাই পশ্চিমা বামুন?

আজ্ঞে না। আমাদের হরিপুরের রায়েরা খাঁটি কায়েত-বাচ্চা। বিশু মিতা-শান্তা-লতাদের দেখিয়ে বলল, এই যে দেখছেন ডাকিনী-যোগিনীর দল—এরা যা, আমিও তাই। কথায় বলে না কায়েতে-কায়েতে ঠোকাঠুকি লেগেই থাকে? আমারও সেই দশা। একটু এনজয় করব বলে আসি বটে, এদের অত্যাচারে আর হয়ে ওঠে না।

মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেল। চন্দ্রকান্ত বললেন, তা হরিপুরটা কোথায় হে বিশ্বনাথ?

বলছি। একমিনিট। বলে বিশু চেঁচাল, মা! ও মা! ল্যাংচা! দাদুকে শক্তিগড়ের ফেমাস ল্যাংচা দিয়েছ?

কণিকা বললেন, তোর দাদামশাইকে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ল্যাংচা দেব। ভাবিস না। এখন আলাপ কর। তখন থেকে তোর কথাই হচ্ছিল।

বিশু বলল, হরিপুর আপনি চিনবেন না দাদামশাই। আপনি কলকাতার লোক।

তবু বলো না শুনি! সেটা এই পৃথিবীতেই তো—নাকি অন্য কোনো প্ল্যানেটে?

বিশু সিরিয়াস হয়ে মোড়ায় বসে পড়ল। বলল, আপনি জ্ঞানী লোক বলেই অন্য প্ল্যানেটের কথা তুললেন। আমাদের হরিপুরের কথা বললে এরা আমায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। হরিপুর সত্যি একেবারে অন্যরকম দাদামশাই। সেখানকার মানুষজন আলাদা, সবকিছু আলাদা—সে আপনি না গেলে বুঝবেন

না। সেই ছোটবেলায় হরিপুর ছেড়ে এসেছি—এখন মনে পড়লে ভাবি স্বপ্ন নাকি।

খুব ভাল জায়গা বুঝি ?

আজ্ঞে। বিউটিফুল !

কী সেন্সে ?

সবেতেই। বিশু জোর দিয়ে বলল, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়—কিসে নয় বলুন ? হরিপুরের লোকে ঝগড়াঝাঁটি কী জানে না। গাঁয়ে কেউ কখনও পুলিশ ঢুকতে দেখেনি। সবকিছুতে কপারেশান···

চন্দ্রকান্ত শুধরে দিলেন। কো-অপারেশন। তা না হয় বুঝলাম। কোথায় হরিপুর ?

বিশু হাসল। আপনি কাপাসী চেনেন ?

উঁহু।

ভদ্রখালি বিল্কমাটি এঁড়েদা চেনেন ?

চন্দ্রকান্ত মাথা দোলালেন।

ঢোলাইচণ্ডী গড়বাকুলি লোহাডাঙ্গা ? বিশু তার স্বাভাবিক খ্যাঁক খ্যাঁক হাসিটা হাসল। তাহলে দাদামশাই ? আপনি কেমন করে চিনবেন হরিপুর ?

হার মেনে চন্দ্রকান্ত বললেন, ঠিক আছে বাপু! না হয় নাই চিনলাম। কদ্দূর পড়াশোনা করেছ ?

বিশু গাল চুলকে বলল, বড় লজ্জায় ফেললেন দাদামশাই। এরা আমায় আর পাত্তা দেবে না। এরা আমাকে গ্র্যাজুয়েট মনে করে। আমি বলি নি কিন্তু। জিগ্যেস করুন! এই বিস্কুট, কেক, নিমকি! সত্যি কথাটা বল্ দাদামশাইকে।

চন্দ্রকান্ত একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, বাচালতা ভাল নয় হে!

বিশু গলা চেপে বলল, দাদামশাই, আমি স্কুলফাইনালে দুবার ফেল করেছিলাম।

মেয়েরা হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। শুনেছি। শু-নে-ছি! স্কুল-ফাইনালে ফেল! দুয়ো!

নন্দলাল এতক্ষণে ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়ে বললেন, বিশু! বাবামশাই তলাপাত্রে ছিপ ফেলবেন। হুইলটা কী অবস্থায় আছে জানি নে। চার-ফার

যা সব লাগবে, তোর রেসপনসিবিলিটি। ওনাকে নিয়ে যাবি পুকুরে। ঘাট-ফাট নতুন করে হয়তো করতে হবে। বড্ড দাম হয়েছে।

বিশু সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, তলাপাত্রে? ওতে মাছ আছে? বরং নোনাতলায় বসলে হত।

কণিকা রান্নাঘরের বারান্দা থেকে বললেন, না বাবা! ওই সাতশরিকের গণ্ডগুলে পুকুরে নয়। কে কী বলবে। বরং আপন অন্নে কুকুর রাজা। নিজেদের যা আছে, তাতেই যথেষ্ট।

নন্দলাল বললেন, তলাপাত্রে মাছ আছে বৈকি। সব তো ধরা হয় নি।

বিশু উঠে বলল, আমার রিস্ক। নোনাতলায় বসলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। আমি এক্ষুনি গিয়ে ছোটনবাবু-লোটনবাবু-ঘোতনবাবু তিনভাইকে ম্যানেজ করে আসছি। এ বাবা হরিপুরের বিশু। যমকে যদি বলি, কেটে পড়ো বাবা, পরে এস—সে লেজ গুটিয়ে চলে যাবে দাদামশাই! নোনাতলা দারুণ পুকুর। ভেরি লোনলি—কাম অ্যাণ্ড কোয়াইট প্লেস। পাড়ে বসে সিন-সিনারি দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যাবে। কতরকম পাখপাখালির ডাক শুনবেন।

বলে সে ঘুঘু কোকিল শালিখ এবং টিয়াপাখির ডাক শুনিয়ে দিল। চন্দ্রকান্ত চোখ বড় করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ডাক শুনিয়ে বিশু বলল, তবে দাদামশাই, আমাদের হরিপুরের বড়দীঘির কাছে এসব লাগেই না। চার ফেলার পনের মিনিটের মধ্যে জল বুজকুড়ি কেটে ঘোলা হয়ে যাবে। এ্যাত্তো মোটা-মোটা বুজকুড়ি। ওজন কমপক্ষে ধরুন বিশকিলো। যত ইচ্ছে গেঁথে তুলুন, কেউ আপত্তি করবে না। কেন করবে? হরিপুরে মাছের তো অভাব নেই। বরং আপনার হাতে ছিপ দেখলে লোকে আগ্রহ করে ডেকে নিয়ে যাবে। পুকুরঘাটে বসে চা পাবেন। সিগারেটও পাঠিয়ে দেবে। হরিপুরের লোকের ব্যাপারই আলাদা। হরিপুরের···

কণিকা ধমক দিলেন। থাম দিকি। খুব হয়েছে। মুখ-টুখ ধো গিয়ে। আর অমুকে ওঠা। আর কতক্ষণ ঘুমুবে? খিদেও পায় না তোদের?

বিশু চন্দ্রকান্তের দিকে ঘুরে বলল, আপনি রেডি থাকুন দাদামশাই। দুপুরে খেয়েই নোনাতলায় গিয়ে চুপটি করে বসবেন। আমি ডেকে নিয়ে যাব। কিন্তু সাবধান, ওখানকার মাছ বড় ফিঁচেল।

বিশু লম্বা পায়ে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেলে চন্দ্রকান্ত ছোট্ট একটা হাই তুলে

মুখের সামনে তুড়ি দিয়ে বাজিয়ে বললেন, ছেলেটি ভালই মনে হচ্ছে। একটু বাচাল এই যা। বয়স কত হবে? আন্দাজ···

নন্দলাল বললেন, টোয়েন্টি ফোর-টোর হবে। অমুর সমবয়সী।

কণিকা বললেন, মুখের চেহারা দেখে বয়স বলা কঠিন। এবার বোধ করি অমুর মতো দাড়ি রাখার শখ হয়েছে। আমার তো আরও কম বয়স মনে হয়েছিল প্রথমবার দেখে।

চন্দ্রকান্ত রায় দিলেন। অমুর চেয়ে বড় হবে। ধরো ছাব্বিশ কী সাতাশ।

কণিকা ডাকলেন. লতু! শান্তু! এখানে এস সব। লুচি বেলে দাও।

মমতা তার লাঠিটা হাতে নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠোনে নামছিল। কণিকা দেখতে পেয়ে বললেন, তুই গল্প কর না দাদামশাইয়ের সঙ্গে। তোকে কে কষ্ট করতে বলেছে? এমন ভাবভঙ্গী করে যেন ওকেই সব করাই।

মমতা কুণ্ঠিত মুখে বলল, ওরা বেলতে পারে না। এক্ষুনি বকাবকি করবে তুমি।

কণিকা বললেন, থাম্ তো। শিখতে হবে না ওদের? পরের দোরে গিয়ে খোঁটা খাবে—সেটাই বুঝি ভাল?

চন্দ্রকান্ত সস্নেহে ডাকলেন, মমি! এখানে এস। আমরা গল্প করব।···

দুপুরে চন্দ্রকান্ত খেতে বসেছেন। জামাই নন্দলালও বসেছেন। ওঁরা উঠলে ভাইবোনেরা বসবে বিশুকে নিয়ে। খেতে বসে বিশু যা হাসায়, কণিকা ওত পেতে থাকেন ধমক দেবার জন্য। গলায় ভাত আটকে যাবে বলে।

বিশু নোনাতলায় ঘাট করে চার ফেলে দুলেপাড়ার একটা ছেলেকে বসিয়ে রেখে এসেছে। নৈলে গরুমোষ নামিয়ে কে চার নষ্ট করে দেবে। চন্দ্রকান্তের খাওয়া দেখতে দেখতে বলল, দাদামশাই মোচার ঘণ্ট খেতে ভালবাসেন খেয়াল ছিল না কথাটা। নৈলে দুলেপাড়ায় সেই তো গেলাম—ঝুরনবুড়িকে বললে পেল্লায় মোচা কেটে দিত।

চন্দ্রকান্ত বললেন. তুমি কেমন করে জানলে হে?

জানি। বিশু বলল। আপনি আরও কী খেতে ভালবাসেন তাও জানি।

বলো, শুনি।

বেগুনপোস্তর চচ্চড়ি। পুঁইডাঁটার সঙ্গে ইলিশের মাথা। আতপচালের গুঁড়োর সঙ্গে ধনেপাতার বড়া। তারপর···

কণিকা বললেন, বাড়িতে সবসময় তোমার কথা হয় তো!

বিশু বলল, দাদামশাই, আপনি তো কলুটোলায় পোস্টমাস্টার ছিলেন। নাকের ডগায় চশমা রেখে বসে থাকতেন গম্ভীর মুখে। আরও বলব? একবার ডাকাত ঢুকেছিল। আপনি একজনের ঠ্যাঙ চেপে ধরেছিলেন। তারপর যেই বলেছে ফোঁড়া ফোঁড়া—আপনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আর ডাকাত-ব্যাটা ভোঁ কাট্টা!

চন্দ্রকান্ত হাসি চেপে বললেন, সেই গপ্পটা!

বিশু বলল, দাদামশাইকে যদি আমাদের হরিপুরের ডাঁটা খাওয়াতে পারতাম। ওঃ! সে কী ডাঁটা! অশ্বত্থ গাছ! আর স্বাদের কথা বলতে নেই। শক্তিগড়ের ল্যাংচাকে বলে, তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যায়। ক্ষুধিত পাষাণ দাদামশাই! রবিঠাকুরের।

চন্দ্রকান্ত চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, পড়েছ?

আজ্ঞে—প্রথমে সিনেমায় দেখেছি। তারপর পড়ে নিয়েছি।

তোমাদের হরিপুরে অশ্বত্থগাছের মতো ডাঁটা ফলে। আর কী ফলে হে বিশ্বনাথ?

যা বলবেন—সব।

ওইরকম সাইজ?

আজ্ঞে।

তাহলে তোমার সাইজ এমন কেন?

বিশু লাজুক হেসে বলল, ছোটবেলায় ছেড়ে এসেছি তো। ওখানে থাকলে আপনার মতো পেল্লাই হতাম দাদামশাই।

খাওয়া শেষ হলে চন্দ্রকান্ত আঁচাতে গেলেন। বিশু জল ঢেলে দিতে দৌড়ুল। চন্দ্রকান্ত আপত্তি করলেন না। এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে আবার সার-সার পাত পড়েছে। বিশু এসে গুণতে থাকল। ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ···আর একটা? মা আর একটা?

কণিকা আস্তে বললেন, মমি আমার সঙ্গে খাবে।

বিশু বলল, অসম্ভব। মমিদি! কাম অন। তুমি না বসলে জমবে না।

শান্তা গলা চেপে বলল, বড়দি রাগ করে আছে। মা সকালে বড়দিকে লুচি বেলতে দেয়নি।

সে কী। বিশু উঠে দাঁড়াল।

কণিকা গুম হয়ে বললেন, চুপচাপ খাও তো সব। ওর সবসময় মুখ বেজার আর রাগ। মলে বাঁচি বাবা। এ কী জুটেছে আমার কপালে।

বিশু জিভ কেটে বলল, ছি মা, ছি! আমি ডেকে আনছি।

সে দৌড়ে উঠোন ডিঙিয়ে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলল, ওরে বাবা! ভিস্থবিয়স হয়ে আছে। লাঠি তুলে তাড়া করল। যাক্ গে বাবা, আমাকে আবার এক্ষুনি দাদামশাইকে নিয়ে বেরুতে হবে। সাড়ে বারোটা বেজে গেল। বিস্কুট! কেক! নিমকি! আজ সব চুপচাপ খাও। নো গপ্প।...

নোনাতলার পাড়ে বেঁটে চ্যাপ্টাপাতাওলা গাছের ছায়ায় বসে চন্দ্রকান্ত তারিফ করে বললেন, ভাল জায়গা। কিন্তু চারে মাছ কোথায় হে বিশ্বনাথ?

বিশু পেছনে একটু তফাতে বসেছে। বলল, একটু ধৈর্য ধরতে হবে দাদামশাই! এ কি হরিপুর যে...

সে থেমে গেল। ফাতনাটা হঠাৎ বুজকুড়ির মধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে। বাতাস বন্ধ। স্থির জলের ওপর জল-মাকড়সারা অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। ছিপের ডগায় লাল এক গাঙফড়িঙ এসে বসল। চন্দ্রকান্ত ছিপের হাতল ধরে একটু ঝুঁকলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। ঘোষণা করলেন, চারে কাছিম এসেছে।

বিশু বলল, কক্ষণো না। ওটা অন্তত কেজি পাঁচেক রুই, দাদামশাই!

উঁহু, কাছিম।

বাজি।

চন্দ্রকান্ত ঘুরে বিশুর দিকে তাকালেন। বিশু মুখ টিপে হাসছে। বললেন, তোমার তো স্পর্ধা কম নয় হে, আমার সঙ্গে বাজি ধরতে চাইছ। বেশ, বাজি। বলো কী বাজি ধরবে?

বিশু বলল, দু'কেজি মনোহরা।

সে আবার কী বস্তু?

কাঁদির ফেমাস মনোহরা দাদামশাই! সায়েবদের টুপির মতো দেখতে ভেতরে ক্ষীরের পুর। জিভে পড়লেই গলে যাবে। ইস! বিশু জিভ দিয়ে রস টানার ভঙ্গি করল।

চন্দ্রকান্ত আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, না। আমি ওসব ফালতু জিনিসে নেই। আমার সঙ্গে বাজি ধরতে চেয়েছ—বাজি একটু মোটাসোটাই হবে। এমন বাজি যে হারলে চিরদিন যেন তোমার মনে থেকে যায়।

খিকখিক করে হেসে বিশু বলল, বেশ, তাই।

তুমি হারলে তোমাকে মমতাকে বিয়ে করতে হবে।

বিশুর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। আজ্ঞে?

শুনতে পাও নি? চন্দ্রকান্ত কড়া স্বরে বললেন।

বিশু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কিন্তু আমি যে স্কুলফাইনাল ফেল!

চন্দ্রকান্ত জবাব দিলেন না। ছিপের হাতল ধরে ফের ঝুঁকে গেলেন। ফাতনা একটু নড়েছে।

দাদামশাই! চিড়খাওয়া গলায় বিশু ডাকল। মমি আমায় বিয়ে করবে না। আমি যদি সত্যি সত্যি করতে চাই, তব না। জানেন? আমাদের হরিপুরে একবার একটা মেয়ে···

চন্দ্রকান্ত খ্যাঁচ মারলেন। শূন্য খ্যাঁচ। ফের টোপ গাঁথতে থাকলেন গম্ভীর মুখে।

বিশু একটু হাসল। আচ্ছা দাদামশাই, আপনি যদি হারেন?

বঁড়শি ফেলে চন্দ্রকান্ত ওর দিকে ঘুরে বললেন, তুমিই বলো এবার।

আপনি তো পোস্টালে ছিলেন। বড়-বড় অফিসারের সঙ্গে ভাব। আমাকে একটা পোস্টম্যানের চাকরি পাইয়ে দেবেন। ব্যস! বিশু ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে নরম গলায় ফের বলল, আমার বড় ইচ্ছে করে দাদামশাই, পোস্টম্যান হতে। কেমন বাড়ি-বাড়ি চিঠি বিলি করে বেড়ায়। কেমন একখানা সুন্দর হলদে ব্যাগ। আমাদের হরিপুরে ঋষি পিওন ছিল দাদামশাই। দুপুর বেলা পথঘাট নিঃঝুম। হঠাৎ এসে দোরে ডাকত, চিঠি! লোকে শুনত, ঋষি! হরিপুরে ঋষি মানেই চিঠি, দাদামশাই! বাবা বলতেন, ঋষি কখনও খারাপ খবর আনে না। আমাদের হরিপুরের ব্যাপার তো? আমি ঋষি হব দাদামশাই!

চন্দ্রকান্ত আস্তে বললেন, কেন হে, তোমার তো শুনি কত বড়-বড় লোকের সঙ্গে ভাব!

বিশু লাজুক মুখে বলল, তা আছে। কিন্তু পোস্টম্যানের চাকরি কে দেবে বলুন—আপনি ছাড়া?

পোস্টম্যানের চাকরি খুব কষ্টের।

হরিপুরের বিশুকে কষ্ট দেখাবেন না দাদামশাই। কষ্টের শেষটাও দেখা হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত গলার ভেতর বললেন, আগে বাজি হারি, তবে তো।...

হারজিতের মীমাংসা হতে পারল না। ভাদ্রের বৃষ্টির রকম-সকমই এই। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে এসে কেলেংকারি করল। তারপর আর ছাড়ার নাম নেই। চিকুর হেনে কানে তালা ধরাচ্ছিল মেঘ। এলোমেলো বাতাস বইছিল ঝড়ের মতো। ভিজে জবুথবু হয়ে বাড়ি ফিরেছেন চন্দ্রকান্ত। সন্ধ্যাতেও টিপটিপিয়ে বৃষ্টি ঝরছে। নবীনবাবুর পোড়ো বাড়িতে একটা ঘরে তক্তপোশে চুপ করে বসে আছে বিশু। অমু নেই—কোথায় হয়তো খেলা দেখতে গিয়ে আটকে পড়েছে। বিশু একা।

চন্দ্রকান্তের কথাটা শোনার পর সে পড়েছে অস্বস্তিতে। লজ্জাও কম নয়। বেশ তো এ বাড়ি যাতায়াত করছিল এতদিন—নিঃসংকোচে হাসি-তামাশায় কাটাচ্ছিল। আজ মমতার সামনে যেতেই তার লজ্জা করে। সে তো এমন কথা ভুলেও ভাবে নি।

শান্তা ধুপধুপিয়ে এসে বলল, এম্মা! তুমি এখানে বিশুদা? আলো জ্বালোনি কেন? লণ্ঠনে তেল নেই?

বিশু আস্তে বলল, আছে।

শান্তা চাপা গলায় বলল, তোমায় একটা কথা বলতে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শোনো বিশুদা, দাদামশাই...

সে খিলখিল করে হাসলে বিশু গম্ভীর গলায় বলল, হেসো না তো! সন্ধেবেলা অমন করে হাসতে নেই।

শোনোই না! শান্তা আরও গলা চাপল। দাদামশাই মা আর বাবাকে তোমার সঙ্গে বড়দির বিয়ের কথা বলছিল। মা কালীর দিব্যি বিশুদা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। বাবা মা সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বলেন কী, কথাটা আমরাও ভেবেছি। বলতে পারি নে।—ও বিশুদা, করো না বিয়ে বড়দিকে। ওর খুব কষ্ট, জানো?

বিশু চুপ করে রইল।

শান্তা বলল, বাবা বড়দির একটা চাকরির জন্যেও কত চেষ্টা করলেন খোঁড়া, তার ওপর ডান হাতটাও যদি ভাল থাকত। বাঁহাতে কষ্ট করে লিখে অভ্যাস করেছে। ও বিশুদা, করো না ওকে বিয়ে।

বিশু একটু হাসল। ও. কি রাজি হবে? আমি আজেবাজে ছেলে। চালচুলো নেই। স্কুলফাইনালে দুবার ফেল!

দাদামশাই তোমার চাকরি করে দেবেন বললেন। বড়দির জন্যে বললেন, হ্যাঁ—এতদিন ওর জন্য ভাবিনি। ভাবা উচিত ছিল। তোমরাও বলোনি কিছু। দেখা যাক, যদি ওরও কিছু একটা করে দিতে পারি। ও বিশুদা, করো না বিয়ে!

শান্তা ওকে খামচে অস্থির করে তুলল। বিশু হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা বাবা, করব। বলছি, করব। ছাড়ো।

আমার গা ছুঁয়ে বলো।

শান্তু, আমাদের হরিপুরের লোকে কক্ষনো কথাব খেলাপ করে না।

শান্তা দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ফেব ঘুবে এল।···ও বিশুদা, একটু দাঁড়াও না! ভয় করছে।

বিশু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই এক ভূত। এ ভূত থাকতে আর কোনো ভূত আসবে না। চলো।

আজ বাতে খাওয়ার পর হইচইটা খুব জমাট ধরনেরই হল। চন্দ্রকান্তকে অনেককাল পরে হাসতে দেখা গেল। দারুণ মজার মজার গল্প শুনিয়ে বললেন, কী হে বিশু! এমন গল্প তোমাদের হরিপুরের লোকে জানে?

বিশু আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। মাথা নেড়ে বলল, না দাদামশাই!

কৈ, তোমার সেই বেহালা বাজাও। শুনি!

মেয়েরা কলকলিয়ে উঠল।···বেহালা না, মাউথ অরগ্যান! মাউথ অরগ্যান!

বিশু একটা সুর বাজিয়ে বলল, ঠোঁটটা একটু ফেটে রয়েছে। ঠিকমতো আসছে না।

চন্দ্রকান্ত বললেন, ঠিক আছে। এবার হরবোলার ডাক শোনাও।

মেয়েরা চ্যাঁচামেচি করে বলল, শেয়াল। শেয়াল!

হুঁ, বৃষ্টির রাতে শেয়ালের ডাক মন্দ হবে না। চন্দ্রকান্ত বললেন। হুঁ, শুরু করো!···

শুতে এসে অমু বলল, তোর কী হয়েছে রে? হাঁড়ির মতো মুখ করে আছিস কেন?

বিশু হাই তুলে বলল, কিছু না। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।...

বৃষ্টি ছাড়ে নি। টিপটিপ করে সমানে ঝরছে। বারান্দার তক্তাপোশে মশারির ভেতর শুয়ে চন্দ্রকান্ত ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন। বাইরে গিয়েও বটে, আবার বয়সও একটা কথা, ঘুম সহজে আসতে চায় না। তক্তাপোশের পায়ের দিকে দরজার কাছে মেঝেতে হারিকেন রাখা হয়েছিল দম কমিয়ে। কখন নিভে গেছে। তিনটে কালো-কালো থামের ফ্রেম দিয়ে ঘন অন্ধকার আর গাছপালায় জোনাকি দেখছিলেন চন্দ্রকান্ত। এখানে এসে বরাবর রাত্রিবেলা এরকম অস্বস্তি। ঘুম আসে না।

তারপর কখন একটু তন্দ্রামতো এসেছে, কী একটা শব্দে কেটে গেল। মুখ তুলে মশারির ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। কিছু ঠাহর হল না। আবার খুটখাট্ মচমচ শব্দ। কুকুর নাকি?

শব্দটা এবার উঁচুতে—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোথায়। তাঁর মাথা যেদিকে, সেদিকেই কোথাও শব্দটা হচ্ছে। বুক ধড়াস করে উঠল চন্দ্রকান্তের। নিশ্চয় চোর।

সাহসী বলে নামডাক আছে চন্দ্রকান্তের। চুপচাপ উঠে বসলেন। তারপর মশারি তুলে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, চোর! চোর!

সঙ্গে সঙ্গে কী একটা ধুড়মুড় করে পড়ে গেল কোথায়। চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, ধর্ ধর্! মার্ মার্!

দুটো ঘরেই ঘুম ভেঙে গেল। নন্দলালের গলা শোনা গেল প্রথমে। তারপর লতা-শান্তাদের দুর্বোধ্য চ্যাঁচামেচি এবং জোরালো ধরনের কান্নাকাটি। কণিকা চেরা গলায় ডাকছিলেন, অমু! অমু! বিশু!

চন্দ্রকান্ত গর্জন করে বললেন, আলো! আলো জ্বালো! শিগগির!

নন্দলাল হারিকেন জ্বালার চেষ্টা করছিলেন। বর্ষায় দেশলাই কাঠি স্যাঁৎ-সেঁতে হয়ে গেছে। সেইসময় খিড়কির কাছে পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে পড়ল অমু আর বিশু। অমুর কাছে টর্চ ছিল। বিশুর হাতে একটা আস্ত হুড়কো।

টর্চের আলো সঠিক জায়গায় পড়তেই বাড়িসুদ্ধ লোক থমকে দাঁড়াল—

শেষ থামটার পরে বারান্দার সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে আছে মমতা। কোণঠাসা আহত প্রাণীর ভঙ্গিতে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। কণিকা থাপ্পা হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, চন্দ্রকান্ত হাত তুলে বললেন, চুপ! তারপর নেমে গিয়ে মমতার কাছে বসে পড়লেন।

নন্দলাল হারিকেন জ্বেলেছেন। অনবরত কাশছেন। অমুর টর্চের আলো ঘুরছিল। মমতার ওপর থেকে আলোটা এসে বারান্দার কিনারায় একটা মোড়ার ওপর থামল। তারপর ওপরে উঠল সাবধানে—ওপরে দু'থামের মাঝখানে বারান্দার কড়িকাঠে একটা আংটা আছে। বাড়িতে কাজকর্ম-উৎসবে ওখানেই হ্যাজাগ বা ডেলাইট ঝোলানো হয়। মিস্ত্রিরা বুদ্ধি করেই এসব আংটা আটকাতে ভোলে না বাড়ি তৈরির সময়।

সেই আংটায় দড়িপাকানো শাড়ির একটা দিক ঝুলছিল। এইমাত্র নিচে পড়ে গেল। শান্তা ফিসফিস করে বলে উঠল, বড়দির শাড়ি! কণিকা তার দিকে একবার তাকালেন। চোখ নিষ্পলক লাল। নাসারন্ধ্র স্ফীত।

চন্দ্রকান্ত গলা ঝেড়ে বললেন, একটা শাড়ি দাও। তারপর দুহাতে পাঁজাকোলা করে মমতাকে তুলে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকলেন। ওঘরে চার বোন শোয়। দুটো খাটে টানা বিছানা। বিশাল মশারি।

বৃষ্টিটা থেমে গেছে কখন। রাত নিঝুম হয়ে গেছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে দুজন মানুষ—বাকি দুজন ভেতরে। অমুর টর্চ এতক্ষণে নিবল। হারিকেনের আলোয় জীর্ণ পুরনো বাড়ির ছাদে-ঢাকা বারান্দা হলুদ দেখাচ্ছিল। মৃত মানুষের শরীরের মতো।

সেই গাঢ় স্তব্ধতা ভেঙে ফোঁসফোঁস করে নাক ঝেড়ে ভাঙা গলায় বিশু বলে উঠল, ঠিক এমনি করে একবার আমাদের হরিপুরে···

অমু গর্জন করল, তুই থামবি?

বিশু মুখ নিচু করে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে গেল। তারপর খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

সকালেও বাড়ি তেমনি চুপচাপ। আকাশ কিন্তু পরিষ্কার। টুকরো মেঘ দলছাড়া গরুর মতো ঘুরছে। এই সাতসকালে কোথাও ঘুঘু পাখি ডাকছিল। চন্দ্রকান্ত চা খেতে খেতে কান করে শুনে বললেন, শান্ত! একবার ডাক তো ইয়েকে—ওই যে ছেলেটা। হুঁ—হরিপুরের বিশুকে।

শান্তা মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, কখন চলে গেছে বিশুদা! চা খেয়েও যায় নি।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রকান্ত ওপাশের ঘরে গেলেন। মমতা বালিশে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। চন্দ্রকান্ত পাশে বসে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে ফুঁপিয়ে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাস আর কান্নায় মিশিয়ে বলল, বিশুদার জন্যে না। বিশ্বাস করুন দাদামশাই, বিশুদার জন্যে না। কাল সন্ধ্যায় শান্ত আর মিতু বলাবলি করছিল, বড়দির বিয়ে হবে না তো—তাই যাকে-তাকে ধরে বিয়ে দিচ্ছে। কী জাত কেউ জানে? শুনতে পেয়ে মা বলল, আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচি। দাদামশাই, আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, জানো বিশুদার জন্যে আমি মরতে চাই নি। আপনি বিশ্বাস করুন···

ফাঁদ

রাত অনেক হলে বাগানের দিক থেকে ক্যাঁও ক্যাঁও করে একটা পেঁচা ডেকে ওঠে। মল্লিকদের কুকুরটা সন্দিগ্ধভাবে দু-একবার ডেকেই সপ্রশ্ন চুপ করে যায়। আমি জানি, এইবার তার আসার সময় হয়েছে।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়। লোকজন তত কিছু নেই। ওপরে-নিচে চারটে করে আটটা ঘর। নিচের দুটো ঘরে থাকেন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর তাঁদের মেয়ে শ্রাবন্তী। একটা ঘরে পুরনো আসবাবের আবর্জনা। বাকিটাতে বাড়ির সাবেক আমলের চাকর ষষ্ঠীদাস। তার বয়সও প্রায় সত্তর হয়ে এল। সারারাত খকখক করে কাশে আর একটু শব্দ হলেই ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, যাঃ! যাঃ! আমি জানি, কাকে সে এমন করে তাড়াতে চায়।

ওপরের চারটে ঘরে আমার জীবনযাত্রা। আমার আর শ্রুতির। শ্রুতি বড় ঘুমকাতুরে। সে কিছু টের পায় না। এই যে আমি কাকে এত রাতে দরজা খুলে দিই, কার সঙ্গে কথা বলি, কিছু না। আমার আদরের ভেতর শ্রুতি কখন গভীর ঘুমে এগিয়ে যায়। তার শরীরের শ্বাসপ্রশ্বাস শুনতে শুনতে হঠাৎ চমক ভাঙে প্রাকৃতিক সংকেতের মতো পেঁচার চিৎকার। তারপর বাগানের দিকে শনশন করে ওঠে বাতাস। গাছপালা দুলতে থাকে। পুরনো জানলাটা খটখট করে শব্দ করে। তারপর সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ। সে আসছে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠি। সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ। সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

দরজা খুলে আমি একটু সরে দাঁড়াই। টের পাই তার ঘরে ঢোকা তার শরীরের গন্ধে। গন্ধটা ছেঁড়া ঘাসের মত কিংবা ভিজে মাটির মত, অথবা পাখির বাসার মত ঈষৎ ঝাঁঝাল, সঠিক বলা কঠিন, কারণ তার গন্ধটা যেন খুবই প্রাকৃতিক। হয়তো সে প্রকৃতির খুব ভেতর দিকে চলে গেছে বলেই। জীবজগতের অবচেতনায় এই গন্ধ থাকে কি? বুঝতে পারি না। তার অশরীরী শরীরের কোন গন্ধ থাকার কথা নয়। তাকে প্রশ্ন করলে সে বলে তাই বুঝি? জানি না তো।

তাকে বলি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

সে বলে, আমি তো এরকমই।

না। তুমি এরকম ছিলে না।

সে একটু হাসে। তা ঠিক। ছিলাম না।

কেমন ছিলে সে তো মনে পড়ে তোমার, নাকি পড়ে না?

বোকা। মনে না পড়লে এলাম কেন?

তাহলে তুমি নিজেকে দেখাও। আমারও তো তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

তুমি ভয় পাবে।

তোমাকে আমি ভয় পাব না স্মৃতি। তুমি আমারই অপরাংশ হয়ে ছিলে একসময়।

একটু পরে সে বলে, পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে।

তাহলে থাক।

বরং চলো আমরা বাগানে যাই।...

আমরা বাগানে গিয়ে বসে থাকি। কথা বলি। পুরনো সব কথা...অতীত থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে। দুঃখের কথা। সুখের কথা। কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ষষ্ঠীদাসের ডাক শুনতে পাই। সে লণ্ঠন হাতে আমাকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে। সে বড় ধূর্ত মানুষ। সব টের পায়। আমাকে বকাবকি করে। বলে, ঘুম হয় না তো ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন? এমনি করে হিমে বসে থাকলে যে উল্টে অসুখে পড়বে।...

হতচ্ছাড়া ষষ্ঠীদাসের দৌরাত্ম্যে অবশেষে বাগানে গিয়ে কথা বলা ছাড়তে হল। কিন্তু বুঝতে পারলাম, কেন স্মৃতি ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে চাইত না। শ্রুতিকে ও ঈর্ষা করত। ঘুমন্ত শ্রুতির পাশে গিয়ে দাঁড়ালে আমার খুব ভয় হত। বলতাম, ওখানে কী করছ? এখানে এস। শ্রুতি জেগে যেতে পারে।

জাগলেও তো আমাকে দেখতে পাবে না।

কে জানে! মেয়েরা হয়তো সব টের পায়।

সে হাসত। হুঁ, পায়ই তো! তুমি যখন শ্রুতিকে আদর কর, দূর থেকে টের পাই। মনে হয়, আমার যদি শরীর থাকত!

ওকে মেরে ফেলতে তো?

হুঁ।

এখন পার না?

না।…একটু পরে বলল ফের, আমি আর কিছু পারি না। শুধু যাওয়া-আসা ছাড়া।

মনে হল, ও কাঁদছে। বললাম, ওকে ঈর্ষা কোর না। ও তোমারই সহোদরা।

শোনো!

বলো।

তুমি কাকে বেশি ভালবাস এখন…শ্রুতিকে না আমাকে?

দুজনকেই।

মিথ্যা! আমি তোমার চারঘরের সংসার ঘুরে দেখেছি, এখন যা-যা যেমন হয়ে আছে, আমার সময়ে তেমন কিছুই ছিল না। ওই ড্রেসিং টেবিলটা পর্যন্ত নতুন! আর শ্রুতির কত শাড়ি! কত বিদেশি সেন্ট! কত…

শ্রুতি একটু বিলাসী প্রকৃতির মেয়ে। আর তুমি জান, তুমি ছিলে সাদা-সিধে। সাজতে ভালবাসতে না। টাকাকড়ি খরচ করতে দিতে না। মনে পড়ে, সেবার তোমার জন্য অত সুন্দর একখানা কাঞ্জিভরম কিনে আনলাম! তুমি শ্রুতিকে পরতে দিলে। আর একবার…

হঠাৎ থেমে গেলাম। টের পেলাম। ও নেই। চলে গেছে। এখনকার মত মাথা ভাঙলেও আর ফিরে আসবে না। কোথায় যায় ও? জীবজগতের সীমানা পেরিয়ে প্রকৃতির কোন গভীরতর স্তরে গিয়ে বসে থাকে ও? আমি যদি ওকে অনুসরণ করে যেতে পারতাম সেখানে!…

একরাতে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি থামল না। মধ্যরাতে একটু কমল মাত্র। তারপর তার আসার সংকেত শুনতে পেলাম বাগানের দিকে। দরজা খুলে দিলাম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

সেই মুহূর্তে শ্রুতি জেগে গেল। চমকে ওঠা গলায় বলল, কোথায় গেলে?

এই তো !

অন্ধকারে দরজা খুলে কোথায় যাচ্ছ ?

সে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিল। ভারি হাতে দরজা আটকে দিয়ে বললাম, বৃষ্টি দেখতে যাচ্ছিলাম বারান্দায়।

শ্রুতি একটু চুপ করে থাকার পর বলল, জানলা থেকে দেখা যায় না ?

ছাঁট আসছে যে !

তোমার কী হয়েছে ?

কই, কিছু না।

আমার ধারণা, তুমি সারারাত জেগে থাক।

যাঃ ! কে বলল ?

আমি জানি। তুমি···তোমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না আমার পাশে ? শ্রুতি শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল, কতবার হাত বাড়িয়ে তোমাকে খুঁজি পাই না।

আশ্চর্য ! আমি তো তোমার পাশেই থাকি !

শ্রুতি বালিশে মুখ গুঁজে বলল, কোথায় থাক তুমিই জান।

ওর কাছে এসে পিঠে হাত রেখে বললাম, ঘুমোও।

তুমি ?

আমার ঘুম পাচ্ছে না। আর বৃষ্টিটা কী সুন্দর—শোন !

আমি জানি, কেন ঘুম হয় না তোমার। দিদির কথা মনে পড়ে তো ?

হঠাৎ ওকথা কেন শ্রুতি ?

হাসতে হাসতে বললাম, ছিঃ ! যে মরে গেছে তাকে ঈর্ষা করতে আছে ?

কে মরে গেছে ? দিদি মরে নি। দিব্যি বেঁচে আছে।

পাগল ! কী সব বলছ শ্রুতি ?

শ্রুতি ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বলল, বেঁচে নেই—তোমার মনে ? ষষ্ঠীদা বলে, তুমি রাতে বাগানে গিয়ে বসে থাক—কেন আমি যেতে দিই এমন করে ? কেন বাগানে যাও তুমি ? বল !

ঘুম আসে না।

এত ভাবলে ঘুম তো আসবেই না। শ্রুতি আবার পাশ ফিরে শুল। ফের আস্তে করে বলল, আরও অনেক কথা জানি। বলব না।

কী জানে, সে কিছুতেই বলল না। কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে ছেড়ে দিলাম। মনে হচ্ছিল শ্রুতি কেঁদে ফেলবে—অথবা এক নেপথ্যের কান্না ওকে ভিজিয়ে

দিচ্ছে ভেতর থেকে। অবশ্য খুব শক্ত মেয়ে সে, জানি। স্মৃতির একেবারে উল্টো। সে প্রচণ্ড সাহসী। বেপরোয়া। স্পষ্টভাষী মেয়ে। কিন্তু স্মৃতির মতো জেদি নয়।

পরের রাতে আমার উৎকণ্ঠা ছিল স্মৃতির আসা না টের পেয়ে যায় সে! এ রাতে বৃষ্টি ছিল না। নরম চেহারার একটুকরো চাঁদ ছিল বাগানের মাথায়। পোকামাকড় ডাকছিল বৃষ্টির স্মৃতি নিয়ে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ভিজে গাছপালা আর ঘাসের গন্ধের সঙ্গে মিশে রাতের ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল ঘরে। ভাবছিলাম, কাল রাতে ফিরে গেছে অমন বাধা পেয়ে, আজ কি করে আসবে স্মৃতি?

এল—কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নয়। জানালার ওধারে দাঁড়িয়ে বলল, এসেছি।

এ রাতে কোন প্রাকৃতিক সংকেত শুনলাম না। কোন পূর্বাভাষ না। মল্লিকদের কুকুরটাও বুঝি অগাধ ঘুমে লীন। বললাম, ভেতরে আসছ না কেন?

একটা কথা বলতে এলাম শুধু।

কী কথা?

আমি আর আসব না।

জানালার রড শক্ত করে ধরে বললাম, না। তোমাকে আসতেই হবে—আমি যতদিন বেঁচে আছি। আমার রাতগুলো তোমার জন্যেই রেখেছি, আর দিনগুলোকে শ্রুতির জন্য।

সে একটু হাসল। তুমি বড়লোক মানুষ। তোমার কত খেয়াল!

না, না। খেয়াল নয়। এমনটা হয়ে গেছে—তুমি বুঝতে চেষ্টা কর লক্ষ্মীটি! চিরকাল আমার বরাতটাই এরকম। কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে না আমার। আরও দেখ, আমার সব বাস্তব আর কল্পনাও আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। ওরা দুটো দিকে, মধ্যিখানে আমি। টাগ অফ ওয়ারের নিষ্ঠুর খেলা।

ওসব কথা আমার মাথায় ঢোকে না, আমি যাই!

শোন, শোন! একটা কথা বলে যাও।

কী?

তুমি কেন আর আসবে না? শ্রুতির জন্যই কি?

শ্রুতির জীবন আমার মত নষ্ট হয়ে যাক, তা চাইনে। আমি তার দিদি।

শোন, শ্রুতির বদলে তোমাকেই চাই।

এমনি করে একদিন আমার বদলে শ্রুতিকে চেয়েছিলে, মনে পড়ে? কী? চুপ করে গেলে যে?

আমি অনুতপ্ত। ক্ষমা কর।

দেখ আমি যেখানে আছি, সেখানে ক্ষমা বা অনুতাপ বলে কোন কথা নেই। তোমার মনে পড়ে? ওই খাটে আমি শুয়ে ছিলাম। আমার শ্বাসকষ্ট। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি আর শ্রুতি পাশের ঘরে ছিলে। একটু পরে শ্রুতি এল। ওকে দেখেই চমকে উঠলাম। তার শরীরে তোমার ছাপ পড়েছিল। জলের গ্লাস তার হাতে কাঁপছিল।

তুমি ধাক্কা মেরে গ্লাসটা ফেলে দিলে। শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম···

জানালায় কী করছ?

শ্রুতির চমকেওঠা প্রশ্নে আমিও খুব চমকে উঠলাম। সে টেবিলল্যাম্প জেলে বিছানায় উঠে বসল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আবার তুমি জেগে আছ?

ঘুম আসছে না। দেখ, অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে।

শ্রুতি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে বলল, তুমি চাও, আমিও দিদির মত মরে যাই, তাই না?

আঃ কী বলছ শ্রুতি!

তুমি বুঝি ভাবছ আমি কিছু টের পাই না? শ্রাবন্তীর দিকে এবার তোমার চোখ পড়েছে।

ছিঃ! চুপ কর।

শ্রুতি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। না—চুপ করব না। তুমি চাইছ, আমিও দিদির মত স্যুইসাইড করি, আর তুমি শ্রাবন্তীকে বিয়ে কর।

শ্রুতি! চুপ কর। কী বলছ তুমি? স্মৃতি স্যুইসাইড করেনি।

করেছিল। আমি জানি। শ্রুতি নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বরে বলল। ক্যাপস্যুলটা খেয়ে রিঅ্যাকশান হচ্ছিল, ডাক্তার সেটা বন্ধ করতে বলেছিলেন। দিদির বালিশের তলায় কৌটোটা দেখেছিলাম। কৌটোটা খালি ছিল।

আশ্চর্য। তুমি বলনি! কেন বলনি শ্রুতি?

তুমি কষ্ট পাবে ভেবে। শ্রুতি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল।

তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে সে শুয়ে পড়ল। টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দিল। জানলার বাইরে বাগানের দিকে জ্যোৎস্নার

ভেতর কুয়াশার মত কী একটা দাঁড়িয়ে আছে। স্মৃতিই কি? শ্রুতিকে ডাকলাম, শ্রুতি, শোন!

কী?

শ্রাবস্তীর কথা তোমার মাথায় এল কেন? তার সঙ্গে তো আমার দেখাও হয় না। তেমন কিছু আলাপও নেই। তাছাড়া সে তো তোমার কাছেও আসে না।

বাইরে কী হয় তুমিই জান। সারাদিন কোথায় থাক, কী কর, আমি কি দেখতে যাই?

শ্রুতি, ফুড রিলিফের কাজে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয় আজকাল। অন্যকিছুতে মন দেবার সময় কোথায়?

তুমি লিডার মানুষ। তোমার মনে কত দয়া। এমনি করে সেবার ফ্লাডের সময় তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলে। তখন বুঝিনি, এই বাড়িটা তোমার একটা ফাঁদ।

ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, ঠিক আছে। ওদের চলে যেতে বলব। ওদের এরিয়া থেকে ফ্লাডের জল নেমে গেছে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে শ্রুতি! নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। কাল রাতে তুমি বললে, স্মৃতিকে ভুলতে পারি নি। আজ রাতে বলছ, শ্রাবস্তীর জন্য···

কথা কেড়ে শ্রুতি বলল, তাই ভেবেছিলাম। পরে মনে হয়েছিল, যে মরে গেছে তার পেছনে কেন তুমি ছুটবে? যে বেঁচে আছে রক্তমাংসের শরীরে, তার পেছনে ছোটাই স্বাভাবিক। নয়? বল তুমি।

কিন্তু তুমি তো আছ! তুমি তো জীবিত।

আমি বাসি হয়ে গেছি। দিদিও তোমার কাছে বাসি হয়ে গিয়েছিল। তাই তুমি আমার পেছনে ছুটেছিলে। কিন্তু জেনে রাখ, আমি দিদির মত বোকা নই।

তর্ক করে লাভ নেই। ফেমিনিন লজিক। আমি চুপ করে থাকলাম। শ্রুতিও চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্রুতি আমাকে বাধা দিল না।

বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কতক্ষণ। স্মৃতি কি আর কোনদিন আসবে না কথা বলতে? জ্যোৎস্নায় হেমন্তের গাঢ় কুয়াশা জড়ানো। ঘুম জড়ানো গলায় খুব গভীর থেকে পোকামাকড় গান গাইছে। সামনে শীত—তখন ওরা

আরও গভীরে দীর্ঘ ঘুমের দিকে যাবে। কোথায় সেই প্রাকৃতিক অভ্যন্তর—জঠরের উষ্ণতা যেখানে বাইরের পৃথিবীর হিমকে পৌঁছতে দেয় না? সেখানে কি স্মৃতিও ঘুমোতে চলে গেল জীবজগতের অবচেতনায়?

আমার কষ্টটা বাড়ছিল। স্মৃতিকে আমি ভালবাসতাম। শ্রুতিকেও হয়তো ভালবাসি—চেষ্টা করি। পেরে উঠি না। খালি মনে হয়, শ্রুতি আমার জন্য নয়, আমার সংসারের জন্য। একটি প্রয়োজনীয় ফিলার শ্রুতি। আর স্মৃতি ছিল আমার জন্য—আমার সংসারের বাইরে একটি নিজস্বতার প্রতীক। স্মৃতি, কেন গেলে?

যাই নি। সে ফিসফিস করে বলল। এই তো আছি!

কিন্তু কোথায় আছ? আগের মত কাছে আসছ না কেন?

পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছি ক্রমশ। নিজেকে কুড়িয়ে জড়ো করা যাচ্ছে না।

মনে হল, চারদিকে ঘাস, গাছপালা, পোকামাকড়, শিশির, কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না আর কুয়াশার ভেতর থেকে স্মৃতির শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। সে বলছে, আমি আছি। আমি আছি।

আর চারপাশ থেকে আবছা এক গন্ধ ছেঁড়া ঘাসের পাতা অথবা শেকড়ের, বৃষ্টিভেজা মাটির, জলের, পাখিদের বাসার গন্ধের মতো কটু স্মৃতির দ্বিতীয় জীবনের গন্ধ। প্রকৃতির নিজস্ব গন্ধ।

লণ্ঠনের আলো ফুটে উঠল। দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছিল। ষষ্ঠীদাসের ডাকাডাকি শুনতে পাচ্ছিলাম। সে সব টের পায়।

ফৌজী জুতো

কোনো-কোনো মানুষকে দেখলে জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য জাগে। যেমন বাবুরাম সাহানী। অবাক হয়ে ভাবতাম, লোকটা খৈনি-তামাক বেচেই জীবনটা কাটিয়ে দিল। সেই একই পোশাক, চেহারা, পা ফেলার ভঙ্গী অতিশয় নম্র আচরণ। অথচ দেখতে দেখতে পৃথিবীর কত দ্রুত অবিশ্বাস্য রদবদল ঘটে গেল।

আমাদের এই সীমান্ত এলাকায় তখন প্রায়ই দুদেশের ফৌজী লোকেদের সংঘর্ষ বাধত। উত্তেজনা থমথম করত কিছুদিন। কারফিউ, ফৌজী আনাগোনা,

মাঝে মাঝে পদ্মার দিকে গুলির আওয়াজ। তার মধ্যেও দেখতাম খৈনিওয়ালা বাবুরাম নির্লিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফৌজী ক্যাম্পে গিয়ে খৈনি বেচছে। তার বেলা কারফিউ নেই।

আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় গঙ্গাধর খৈনি খেতেন। বাড়ির সবাই ওঁকে বলতাম গঙ্গাখুড়ো। ঢ্যাঙা সিড়িঙে রাগী চেহারা।

তর্কাতর্কি গালমন্দ করে খৈনি কিনতেন। তবু বাবুরাম হাসিমুখে এসে দরজায় হাঁক দিত নিয়মিত, 'বুঢ়াবাবু, বাবুরাম আসলে-ও-ও!' একজন পরাশ্রিত ব্যর্থ মানুষ গঙ্গাধরের এই সময়টুকু ছিল উত্তেজনা ও সুখের।

লোকের পায়ের দিকে তাকানো আমার স্বভাব নয়। কিন্তু বাবুরামের পায়ের কাঁচাচামড়ায় তৈরি ধ্যাবড়া নাগরাজুতো আমার চোখ টানত। আসলে ওই বিস্ময়। শীতগ্রীষ্মবর্ষা দুটো বিবর্ণ নাগরা থপথপিয়ে হাঁটছে আর হাঁটছে দৃকপাতহীন পরিবর্তনহীন—ক্ষেতখামারে, রাস্তার ধুলোয়, গাঁয়েগঞ্জে, ফৌজী আড্ডায় এবং কিনারায় বহতা ধুধু আদিগন্ত পদ্মা।

বাবুরাম বলত, রাজমহলের ওদিকে নওলপাহাড়ীতে তার জন্ম। গঙ্গাখুড়োর মেজাজ ভাল থাকলে খুব মন দিয়ে নওলপাহাড়ীর গল্প শুনতেন। মুচকি হেসে বলতেন, লেকিন জরু? বাবুরাম বিনীতভাবে বলত, জরুকী ক্যা কাম বুঢ়াবাবু? জরু মানেই ঝামেলা। তাছাড়া একটা মুখের রুটি ঠিকমতো জোটে না, দুটো মুখ হলে তিনটে হবে কালক্রমে চার পাঁচ ছয়ভি হবে। বাবুরাম শ্বাস ফেলে বলত, দশভি হতে পারে। কী দরকার?

কিন্তু সবাই ভাবত, বাবুরামের এটা ওজর। এতকাল খৈনি বেচে ভেতর-ভেতর টাকা জমিয়েছে। লালগোলায় সময়মতো মহাজনের গদি ঘুলে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসবে। বাংলামুল্লুকে এটাই নাকি ওদের ট্রাডিশান।

হঠাৎ একদিন বাবুরামের পায়ে নাগরার বদলে দেখি অবিশ্বাস্য একজোড়া বুটজুতো। গাব্দাগোব্দা ঝকমকে প্রায় আনকোরা বুটজুতো। গঙ্গাখুড়ো চোখ টেরচে দেখে বললেন, 'হুঁ, ভাল করেছ বাবুরাম। হাঁটাহাঁটির পক্ষে জিনিসটা মজবুত।'

বাবুরাম লাজুকে হেসে বলল, 'ফৌজী জুতা বুঢ়াবাবু। নীলামে কিনলাম।'

প্রতিবার সীমান্ত-সংঘর্ষের পর এ ধরনের জিনিসপত্র ক্যাম্প থেকে নীলামে বেচা হত। গঙ্গাখুড়ো সেবারই একটা কম্বল কিনেছিলেন তিন টাকায়। মুড়ি দিয়ে গঞ্জের বাজারে চা খেতে যেতেন প্রতি সন্ধ্যায়। বাবুরামের বুটজুতোর

শতমুখে তারিফ করে বললেন, 'এই এক জোড়াই ছিল বুঝি? দেখতে পেলে নিশ্চয় কিনতাম।'

আমার ছোটভাই ছোটকু বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'আমি বেট রেখে বলছি, ওই বুটে রক্তের ছাপ আছে।'

আমি অবাক। বাবুরাম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। গঙ্গাখুড়ো রুষ্ট হয়ে বললেন, 'মানে?'

'পদ্মার চরে কোন সোলজারের ডেডবডি থেকে খুলে এনেছে।' ছোটকু মুচকি হাসল। 'কম্বলটা কেচে নেবেন।'

বাবুরাম গম্ভীর হয়ে চলে গেল। দুপুরবেলা জানলা থেকে দেখলাম, পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ালে গঙ্গাখুড়ো বসে আছেন। খুঁজে কারণ আবিষ্কার করলাম। ঘাসের ওপর খাকিরঙের কম্বলটা মেলে দেওয়া আছে। হঠাৎ দেখে মনে হবে, শীতের প্রকোপে বিবর্ণ একটুকরো ঘাসেঢাকা মাটি। মানুষের রক্তের প্রতি মানুষের এ কী অদ্ভুত সংস্কার!

ক'দিন পরে বাবুরাম খৈনি বেচতে এল ফের। গঙ্গাখুড়ো কোথায় যেন গিয়েছিলেন। তাঁর হয়ে খৈনিটা আমিই রাখলাম। তারপর লক্ষ্য করলাম, বাবুরাম কী যেন বলবে-বলবে করছে। মুখটা কেমন বিষণ্ণ, থমথমে। বললাম, 'কী বাবুরাম?'

'দাদাবাবু, একটা বাত বলব।'

বাবুরামের কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল—কিন্তু ওর কাছে এই হাসি কোনো যুক্তি নয়। ছোটকুটা যত নষ্টের গোড়া। বাবুরাম বলল, এই ফৌজীজুতো তাকে বৃহৎ ঝামেলায় ফেলেছে। দিনভর কিছু টের পায় না। কিন্তু দিনশেষে যখন গাঁওয়াল করে ফেরে, সুনশান ফাঁকা রাস্তায় জুতোজোড়া যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। তার দুপায়ে টান বাজে। দেমাগ বদলে যেতে থাকে। বিগড়ে যায়। বাবুরামের খালি রাগ হয়, মাথার ভেতর হুহু করে আগুন জ্বলে। ইচ্ছে করে, দিই হারামী দুনিয়াটার মুখে দো-দশ লাথি। আর অচানক পায়ের টান বাজতে বাজতে তাকে করে তোলে টাট্টু ঘোড়া—পায়ের আওয়াজ শুনে টহলদার ফৌজী লোকেরা কাল সন্ধ্যায় খুব ধমকে দিয়েছে।

তার চেয়ে আজীব ঘটনা, রাতে বার বার নিদ টুটে গেছে আর বাবুরাম দেখেছে কী, কোনায় রাখা জুতোর ভেতর পা গলিয়ে যেন এক বন্দুকবাজ ফৌজী আদমি দাঁড়িয়ে তাকে 'হুকুমদার' হাঁকছে। এমন জিনিস সামলানোর হিম্মত

বাবুরামের মতো নাদান আদমির নেই। তো বুঢ়াবাবু হিম্মতওয়ালা আছেন—জিনিস তার খুব পছন্দও বটে। আঢাই রুপেয়ায় কেনা হলেও দু রুপেয়ায় তার আপত্তি নেই।

এসব শুনে হাসতে হাসতে বললাম, 'গঙ্গাখুড়ো আর নেবেন বলে মনে হয় না। কম্বলটার ওপর ওঁর আর তেমন রুচি দেখছি না। বাবুরাম, তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা কর।'

পরদিন দেখি, আমাদের মাহিন্দার গণেশ সেই বুটজোড়া পায়ে দিয়ে থপথপিয়ে ঘুরছে। চোখে হেসে বলল, 'দেড় টাকায় গছিয়ে দিল সাহানী। কী করি? তবে বাবুদা, খুব কাজের জিনিস। মাঠেঘাটে ঘুরতে—তার ওপর রেতের বেলা ধানচুরি ঠেকাতে এর জুড়ি নেই। আওয়াজ শুনেই ক্ষেতে কাস্তে ফেলে চোর পালাবে।'

তারপর গণেশ গণ্ডগোল বাধাল। ক্ষেতের মুনিশ এসে নালিশ করে গণশা মেরেছে। ঘোঁতনবাবু ডাক্তার পর্যন্ত বাবার কাছে ছুটে এলেন—'এই ষণ্ডটাকে সামলান তো মশাই! দিনদুপুরে তারা দেখেছে? ছোটমুখে বড় কথা—যা না হয় তাই বলল একশো লোকের সামনে।' গণেশ একটু তেজী ছোকরা বটে; কিন্তু এমন নালিশ কখনও শোনা যায় নি। ব্যাপারটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছুল যখন গণেশ কেন কে জানে ইবাদত খান কাবুলীর মাথা ফাটিয়ে দিল। পুলিশের হ্যাপা সামলাতে বাবা অস্থির। গণেশ গা ঢাকা দিয়ে রইল কয়েকটা দিন। আর সেই ফাঁকে দেখি, মরাইয়ের তলা থেকে গঙ্গাখুড়ো সেই বুটজোড়া কখন টেনে বের করেছেন। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'নিধিরাম সেপাই! মামদোর পো! বাপের জন্মে জুতো পরেনি—মেজাজ বিগড়ে গেছে মরামানুষের জুতো পরে। ধরাকে সরাজ্ঞান করেছে।

বুটদুটোর ফিতে আলগোছে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন দেখে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি পরবেন নাকি?'

গঙ্গাখুড়ো আরও খাপ্পা হয়ে বললেন, 'চোখ টাটাচ্ছে! মিলিটারি জিনিস পরার হিম্মত আছে যে পরবে!'

বেরিয়ে গেলে ভাবলাম আঁস্তাকুড়ে নয় তো পদ্মার জলে ফেলতে যাচ্ছেন। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল আগের মতো। গণশাও আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এল। জুতোর কথা ভুলেও জিগ্যেস করল না। তাছাড়া গঙ্গাখুড়ো এ ব্যাপারে নির্বাক। তবে গণেশ আগের চেয়ে ভালমানুষ হয়ে গেল দেখে অবাক লাগছিল।

এক বসন্তরাতের জ্যোৎস্নায় পদ্মার ধারে ঘুরতে বেরিয়েছি। হঠাৎ একটু তফাতে বটতলার চটানে কে চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাবাউট টার্ন! তারপর লেফট রাইট···লেফট রাইট···লেফট রাইট এবং ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ নাচের আওয়াজ। ফৌজী লোকদের প্যারেড হচ্ছে বুঝি। কয়েক পা এগিয়ে দেখি, কালো ভূতের মতো এক মূর্তি আপন মনে ওই কাণ্ড করছে। লেফটরাইট হতে হতে বাজখাঁই চিৎকার 'হল্ট'—তারপর হতভম্ব হয়ে গেলাম। গঙ্গাখুড়ো!

বটতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুনলাম, গঙ্গাখুড়ো চাপা গর্জে কাউকে বলছেন, 'আর একপা এগুলেই ফায়ার!' আরও কীসব বলে শাসাতে শুরু করলেন—সামনে কাউকে দেখলাম না। জ্যোৎস্নায় গঙ্গাখুড়ো ছায়ামূর্তি হয়ে খুব দাপা-দাপি করে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যেন ফৌজী কায়দায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

লজ্জা পাবেন ভেবে সামনে গেলাম না। কিন্তু তারপর থেকে গঙ্গাখুড়োর মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। মেজাজ আগেও একটু তিরিক্ষি ছিল। ক্রমশ তা আরও তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছিল। বাড়িতে কানাকানি শুনতাম, গঙ্গাধরের মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। ওঁর বাবারও নাকি তাই ছিল। শেষে পাগল হয়ে মারা যান। আমার সন্দেহ হত, ভুতুড়ে ওই বুটজোড়াই এর পেছনে। কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হত না।

তবু কেন যে অভিশপ্ত জুতোজোড়া গঙ্গাখুড়োর ঘর থেকে চুরি করে পদ্মার জলে ফেলে দিইনি, এখনও আক্ষেপ জাগে। একদিন বাবা গঙ্গাখুড়োর মেজাজী কীর্তিকলাপ বরদাস্ত করতে না পেরে যাচ্ছেতাই অপমান করেন। আর দুপুরে গঙ্গাখুড়ো পদ্মার ধারে সেই বটগাছে ঝুলে পড়েন। পায়ের ঠিক তলায় বুটদুটো রাখা। কেউ নিতে সাহস পায় নি।

শ্মশানকৃত্যের পর জিনিসটা আমিই ফেলতে গেলাম। রাত প্রায় নটা বেজে গেছে দাহ করতে। চাঁদটা সবে পদ্মার মাথায় উঠেছে। হঠাৎ মনে হল, সত্যি এই জুতোদুটো ভুতুড়ে—নাকি নেহাত মনের ভুল আমার, বাবুরাম খৈনিওয়ালার মতো? সে নিরক্ষর মানুষ। আমি লেখাপড়াজানা ছেলে। আমার কেন কুসংস্কার থাকবে? চরে দাঁড়িয়ে জেদ করে জুতোজোড়া পায়ে ঢোকালাম। কিছুক্ষণ বালির ওপর মসমস শব্দ করে হেঁটে বেড়ালাম। জুতোজোড়া আমার পায়েও জুতসই খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু যখন ভাবছি, এ কোন মৃত সৈনিকের জুতো, তখনই বুকটা ধড়াস করে উঠছে। নির্মল জ্যোৎস্নার চরে এই আগ্রাসী ভয়কে কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। অথচ তা আমার

একটা লড়াই মরণপণ। মরীয়া হয়ে উঠছিলাম ক্রমশ। এ লড়াইয়ে আমাকে জিততেই হবে। ধুপ ধুপ শব্দ তুলে চরটার এপ্রান্ত থেকে সে প্রান্ত আমি দাপটে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর টের পেলাম, যেন আমি অন্যের অনুগত——এই হাঁটাহাঁটি, এই লড়াই, কোনো কিছু আমার নয়। ভীত বিপন্ন কোণঠাসা প্রাণীর মতো আমারই মাথার ভেতর আমি গুটিয়ে বসে আছি এবং আমার শরীর অন্যের হুকুম তামিল করছে। লেফট রাইট···লেফট···রাইট···অ্যাবাউট টার্ন এবং লেফট রাইট···লেফট রাইট···আমার হাতে অদৃশ্য রাইফেল। আমার পরনে ফৌজী পোশাক মাথায় ইস্পাতের হেলমেট। আমার সামনে ঘাপটি মেরে এগিয়ে আসছে ফৌজী দুশমন, আমি গুলি না করলেও সে গুলি করবে এবং গুলি করবেই। 'ফায়ার'! আমার সারা শরীরের ভেতর গমগম করে উঠল নিষ্ঠুর চিৎকার 'ফায়ার!'

অমনি পা হড়কে ধপাস করে পড়ে গেলাম এবং জুতোদুটো এক ঝটকায় খুলে জলে ছুড়ে ফেলে দৌড় দিলাম। নিজের স্যাণ্ডেল কোথায় পড়ে রইল, খুঁজে দেখার সাহস ছিল না।

এর কিছুদিন পরে বাবুরাম সাহানী খৈনিওয়ালার পায়ে আমার এই স্যাণ্ডেল দুটো দেখি। কোন মুখে বলি এ দুটো আমার? জিগ্যেস না করলেও বাবুরাম বলল, বাবুদাদা যা ভাবছেন তা নয়। এ জিনিস ফৌজী নয়। এক রাখালছেলের কাছে আঠান্নি দিয়ে কিনে পায়ে পরেছে। জেনেশুনে ফৌজী জিনিস পরার হিম্মত তার নেই।

নেই বলেই বাবুরাম খৈনি বেচে জীবন কাটাবে। আমিও অবশ্য ভাবতে গেলে তাই। তার চেয়ে জোরালো আর কী করব? কী করতে পারলাম এতকাল পরেও?

সারমেয়-সমাচার

সত্যসুন্দর ঘরে ঢুকে বললেন, রসোর কী যেন হয়েছে, বুঝলে নাদু? পার্কে গাছের তলায় বেঞ্চে চুপচাপ শুয়ে আছে। কথা বললুম, জবাব দিল না। আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

ডাক্তার নন্দদুলাল সিংহ ওরফে নাদুসিঙ্গি কড়া নজরে দেখলেন সত্যসুন্দরের কোলে কুচকুচে কালো অ্যালসেসিয়ান বাচ্চা। কুকুরের ওপর অ্যালারজি

আছে নাদুসিঙ্গির। দেখলেই মনে হয়, এই বুঝি গাল চেটে দেবে। বললেন রসোর কথা পরে হচ্ছে। আগে তোমার বীভৎস জীবটিকে সামলাও।

সত্যসুন্দর সোফায় বসে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, নাদু, কুকুর সম্পর্কে তোমার পড়াশুনো দরকার। কুকুর মানুষের চেয়ে প্রখর চেতনাসম্পন্ন প্রাণী দেয়ালের ওপারে যা ঘটছে, তাও টের পায়। অন্ধকারেও তার দৃষ্টি চলে মুহূর্তে শত্রু-মিত্র চেনা-অচেনা আইডেনটিফাই করার দুর্লভ ক্ষমতা তার আছে—যা কিনা তোমার নেই। আরও দেখ নাদু, বিবর্তনের ধাপে ধাপে মানুষ তো কত কিছু হারিয়েছে—কুকুর হারায়নি কিন্তু। সিক্সথ সেন্সের কথাই বলছি। আজ সকালে কী হল শোনো। কলকাতা পুলিশের ডগস্কোয়াড আমাদের পাড়ায় এসেছিল একটা খুনের ব্যাপারে। তো…

শুনব না। নাদুসিঙ্গি প্রতিবাদ করলেন।

সত্যসুন্দর করুণ মুখে বললেন, কেন শুনবে না? বায়োলোজিক্যাল বিষয়।

নাদু ডাক্তার সোজা হয়ে বসে বললেন, আমাকে বায়োলজি বোঝাতে এস না।

ও, তুমি তো ডাক্তার! কাতর ভঙ্গিতে হেসে সত্যসুন্দর সিগারেট বের করলেন। ফের বললেন, তাহলে এর ফিলসফিক্যাল অংশটাই বলি শোনো।

নাদুসিঙ্গি আরও খচে গিয়ে বললেন, দেখ সতু। শুনেছি তুমি নাকি কোন ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর কলেজে কবে ফিলসফি পড়াতে। ফিলসফির মাষ্টার আর ফিলসফার এক জিনিস নয়। ফিলসফি শুনতে হলে শুনব ফিলসফারের কাছে। আলু আর আলুবোখরা! তেলাপোকা আর পাখি!

সত্যসুন্দর মাথা থেকে মাফলার খুলে বেজার হয়ে বললেন, মুশকিলটা হচ্ছে, তুমি ব্রেন বোঝো—ইন্টেলেকট্ বোঝো না। হার্ট চেনো, হৃদয় চেনো না। নাদু, কুকুর যে কত বড় ফিলসফিকাল ব্যাপার, তা বোঝাবার জন্য তোমাকে বিশেষ জ্ঞানী হতে হবে না। মহাভারতের মাত্র মহাপ্রস্থানপর্বে চোখ বুলোনোই যথেষ্ট!

নাদু ডাক্তার বাঁকা হেসে বললেন, বেশ, বেশ। অত যে বোঝো, এখন বলো তো যুধিষ্ঠিরের পেছন পেছন একটা কুকুর যাচ্ছিল কেন?

আহা, সেটাই তো একটা মস্তো তত্ত্ব! সত্যসুন্দর নড়ে উঠলেন।

কচু! নাদুসিঙ্গি বললেন। কুকুর মাংসাশী প্রাণী। যাচ্ছিল মাংসের লোভে।

সত্যসুন্দর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, মাংস!

হ্যাঁ। আবার কী? স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে খানাপিনা করবেন। বিশাল বিশাল বৃষ রান্নাবাড়া হবে। ঋগ্বেদ পড়েছ? উপনিষদ

আওড়ালে চলবে না সতু! বেদ আর বেদাঙ্গ কি এক হল? তোমার ওই কুকুর আর তার ওই লেজ কি এক? ঋগ্বেদ পড়ে দেখ। খালি দীয়তাং ভুজ্যতাং—খানা-পিনার এলাহি কারবার। নাতুসিঙ্গি হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলেন।

এতক্ষণে সত্যসুন্দরের সারমেয় গরগর করে উঠল। মাংসের কথায় নয়, দরজা দিয়ে যজ্ঞেশ্বর ঢুকছিলেন। তাঁর হাতে নকশাদার ছড়ি। ছড়িটি তাঁর আগেই ঘরে এগিয়ে এসেছে। বললেন, কানে এল ঋগ্বেদ-ঋগ্বেদ হচ্ছে। আদার ব্যাপারীরা জাহাজের খবর নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। প্যায়দারা বলছে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।

সত্যসুন্দর খ্যাঁক করে উঠলেন।...থামো! তোমার ওই প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ডবৎ মুণ্ডের মধ্যে এসব জিনিস ঢুকবে না। বলে যাও নাতু। তোমার বক্তব্য শেষ হলে আমি আমার বক্তব্য রাখব।

যজ্ঞেশ্বর একটু দমে গেলেন। সত্যসুন্দর কলেজে মাষ্টারি করতেন। যজ্ঞেশ্বর সে-আমলের ম্যাট্রিক। বললেন, বেশ। নাতুই বলুক। তারপর যা হবার হবে।

নাতুসিঙ্গি বললেন, ঋগ্বেদ আর্যদের ইতিহাস তাদের রাজা ছিলেন ইন্দ্র। সোমরস পান করতেন। গরু-ঘোড়া যা পেতেন, খেতেন আর লুঠপাট করে বেড়াতেন। ওই ছিল আর্যদের স্বভাব। দেখ না, তাদের ইউরোপিয়্যান জেনারেশন কী করছে? পুরো সেই ট্রাডিশন-কালচার বজায় রেখেছে। আমরা কিন্তু রাখিনি।

যজ্ঞেশ্বর ফুট কাটলেন।...কোথাও কোথাও একটু আধটু না রেখেছি, তা নয়।

কোথায় বলো? সত্যসুন্দর জেরা করলেন।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে। খবরের কাগজ পড়ে দেখো।

সত্যসুন্দর আপত্তি করে বললেন, প্রভিন্সিয়ালিজম করো না। ধর্ষণ লুণ্ঠন হত্যাকাণ্ড সর্বত্র মানুষের স্বভাব।

যজ্ঞেশ্বর সত্যসুন্দরের কোলের কুকুরটার দিকে ছড়ি তুলে বললেন, এ মালটি কোথায় জোটালে?

সত্যসুন্দর ছড়ির ডগা সরিয়ে দিয়ে বললেন, তা যা বলছিলাম আমরা, নাতু! কুকুর খুব সামান্য প্রাণী নয়। ঋগ্বেদের কথা বলছিলে। ইন্দ্র পণিদের কাছে দূতী পাঠিয়েছিলেন সরমাকে। সেই সরমার বংশধর হল এই সারমেয়বৃন্দ। অর্থাৎ কুকুর। এদের বিষয়ে একটা সূক্ত পর্যন্ত আছে।

যজ্ঞেশ্বর মুচকি হেসে বললেন, শুকতো? কুকুরের শুকতো? চচ্চড়ি নেই?

সত্যসুন্দর চটে গিয়ে বললেন, অশিক্ষিত অর্বাচীন আর বলে কাকে? কুকুর বিষয়ক সূক্ত! সূক্ত! এস ইউ কে টি এ।

নাদুপিসি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, তা তুমি ইদানীং কুকুর নিয়ে ঘুরছ যে? কুকুর থেকে রোগ ছড়াতে পারে জানো? তোমার হল কী সতু? সারাক্ষণ কুকুর তো ভাল কথা নয়। এই কুকুর কুকুর করতে গিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টরা যাকে বলে ফিক্সেসান—তাই না হয়ে যায়। রসোর নাকি হয়েছে! একেবারে! পাগলামির লক্ষণ।

যজ্ঞেশ্বর জিগ্যেস করলে, কার?

আমাদের রসরাজ গোঁসাইয়ের। সত্যসুন্দর জবাবটা দিলেন। পার্কে দেখলুম শুয়ে আছে—ডাকলুম, সাড়া দিল না। আসলে কী জানো? ওর এই গণ্ডগোলের কারণ ওর দজ্জাল বউ।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, ডিভোর্স করে ফের বিয়ে করুক রসো। ল্যাঠা চুকে যাবে!

এ বয়সে ফের বিয়ে? নাদুডাক্তার বললেন। ওর শরীরে আর আছেটা কী?

সত্যসুন্দর বললেন, নাদু! তুমি খালি শরীরই দেখ। দেখবেই তো। তুমি ডাক্তার কি না। তুমি অপৌরুষেয় গ্রন্থ ঋগ্বেদেও খালি ওই বস্তুটি দেখেছ। আমার কোলের এই কোমল সুন্দর শিশুটিও তোমার চোখে শরীর। অথচ গীতা বলেছেন, বাসাংসি জীর্ণানি এট্‌সেটেরা এট্‌সেটেরা! শরীরের ভেতর ব্রহ্মের অস্তিত্ব তোমার চোখে পড়ে না। ওহে ডাক্তার! শরীর মানে মাংস! মাংসে কী আছে? পচে গলে ভুট হয়। এই জনির মাংসও ভুট হবে। কিন্তু ওর মধ্যে আছেন স্বয়ং ধর্ম। ধর্মরূপী সারমেয়ঃ! ইনি পঞ্চভূতে মিশে যাবার পাত্র নন। পঞ্চভূতে লীন হবে তোমার গিয়ে মাংস-মজ্জা-অস্থিসমূহ। কবরে গিয়ে দেখ না!

যজ্ঞেশ্বর বললেন, সে তো ম্লেচ্ছদের বেলা। আমাদেরটা পুড়ে ভস্ম হয়।

একই কথা। সত্যসুন্দর বললেন। তাই নাদুকে বলছিলুম, মাংসে কিচ্ছু নেই। মাংস কৃমিকীট আর ইতর প্রাণীর ভোজ্য বস্তু!

নাদুবাবু বললেন, সে তো আমারই কথা। ওই দেখ, তোমার সরমা-নন্দনের এক হাত জিভ লোলুপ হয়ে উঠেছে। সাবধান সতু, গাল চাটতে দিও

না। কবে কামড় বসাবে, তখন ঠেলাটি টের পাবে। হাইড্রোফোবিয়া হয়ে মারা যাবে।

সত্যসুন্দর আমতা আমতা করে বললেন, আহা! সে তো পাগলা কুকুরের কামড়ে। জনি পাগল হতে যাবে কেন? একটা থিওরি বলি।

সত্যসুন্দর এবং নাদুসিঙ্গি এক গলায় বললেন, কী, কী?

সচরাচর দেখা যায়, মাংসাশী প্রাণীদের মুখ হাঁ হয় এবং জিভ বেরিয়ে লক লক করে। কিন্তু নিরামিষভোজী প্রাণীদের মুখ বুজে থাকে। কেন ভেবে দেখেছ কি?

অবশ্য পাখিদের বেলায় অতটা না হলেও শকুনের হাঁ করা মুখ দেখেছি। ব্যাপারটা ভাববার মতো। বলে যজ্ঞেশ্বর গলায় জড়ানো চাদর ঢিলে করে দিলেন। সত্যসুন্দর এবং নাদুডাক্তারের মুখে চিন্তার ছাপ। এই সময় গৃহভৃত্য ত্রিলোচন চা এবং প্লেটে পাঁপরকুচি সাজানো ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। পেছনে ডাক্তার-গৃহিণী ইন্দুপ্রভা। ঠোঁট দুখানি পানরসে রাঙা। কাঁচাপাকা চুল ঢেকে একটুখানি আঁচল—নেহাত রীতিরক্ষা। চোখে হেসে বললেন, সটুবাউ, কয়ে পাহহি?

সত্যসুন্দর লাজুক হেসে বললেন, পাবেন, পাবেন। যে-কোনো মুহূর্তে পেয়ে যাবেন—দেখুন না!

সন্দিগ্ধ মুখে নাদুডাক্তার তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বললেন, সতু! ভাল হবে না বলছি। কুকুর রোগ ছড়ায়।

ইন্দুপ্রভা গ্রাহ্য করলেন না। পানের ডাঁড়োর মধ্যেই ফের বললেন, অইকল অমন টাই।

অবিকল এমনি পাবেন। সত্যসুন্দর আশ্বাস দিলেন। হুবহু এরকম।

নাদুসিঙ্গি গুম হয়ে গেলেন। দেয়ালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মোটে পাঁচটা বাজে। ছটায় নিচের তলায় চেম্বারে গিয়ে ঢুকবেন। এটা দোতলার ড্রইং রুম। জানালার বাইরে দিনের আলো কমে এসেছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি শীত থাকার কথা নয়। কিন্তু সদ্য বৃষ্টির পর শীতটা ফিরে এসেছে। বিদায়ের সময় প্রেমিকার পিছু ফিরে তাকানোর মতন।

ঘরের জানালাগুলো বেশ বড় এবং পর্দা সরানো। বাইরে একদিকে বস্তি এলাকা বলে অনেকটা আকাশ হাঁ করে আছে। এসব কারণে ঘরে খানিকটা আলো ছিল এতক্ষণ। এবার কমেছে। ইন্দুপ্রভা জানালায় ঘুরে সবার অলক্ষে

পানের গুঁড়ো বের করে নিচে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর সুইচগুলো টিপে দিলেন। কিন্তু আলো জ্বলল না। লোডশেডিং। বিরক্তমুখে অস্পষ্ট কিছু বললেন। মুখে পান না থাকলেও বোঝা গেল না। ঘরে মুড়মুড় এবং চুক-চুক শব্দ হচ্ছে। কথা বন্ধ।

সত্যসুন্দর জনিকে সস্নেহে মাত্র তিনকুচি পাঁপর খাওয়ালেন। তারপর বললেন, নাদু বলছে, কুকুর মাংসাশী। কিন্তু ওটা অভ্যেস। এই তো দিব্যি পাঁপর খাওয়ালুম। খেল। যা দেব, সব খাবে।

নাদুসিঙ্গি গলার ভেতর বললেন, বদহজম হবে। হড়হড় করে বমি করবে। ঘরদোর নোংরার একশেষ করবে। দুর্গন্ধ ছুটবে। এবং মেথরের জন্যে বস্তিতে গিয়ে লাইন দিতে হবে। দেশের অবস্থা তো জানো না।

আরে না না! সত্যসুন্দর জনির পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন। এ তো দিশী নেড়ির বংশজাত নয়—বিলিতী। এদের স্বভাবই আলাদা। যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি মোলায়েম। মাখনের ডেলা।

নাদুসিঙ্গি প্রতিবাদ করতে গিয়ে থামলেন। ইন্দুপ্রভা তেমনি চোখে হেসে বললেন, কিন্তু কবে পাচ্ছি? যখনই দেখা হয়, বলেন খবর দিয়েছি।

সত্যসুন্দর বললেন, খবর দিই আর না দিই, বললুম তো—যেকোনো মুহূর্তে পাবেন।

ত্রিলোচন একটা হারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল। জনি গরগর করে হয়তো রাগ দেখাল। সত্যসুন্দর হাসতে হাসতে বললেন, মহাকাশযুগের সন্তান কি না? হেরিকেন-টেন জ্বাললেই দেখেছি বড্ড বিরক্ত হয়। তা বুঝলেন বৌঠান? আপনি কুকুর রাখবেন বলছেন বটে, কিন্তু আমার ভয় হয়—আপনার পতি-দেবতাটি পয়জন খাইয়ে মেরে ফেলবে না তো? ওর আলমারিতে পয়জন ঠাসা!

নাদুবাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, সতু!

ইন্দুপ্রভা মিষ্টি হেসে বললেন, আহা! ঠাট্টা করছেন বোঝো না?

সত্যসুন্দর বললেন, করছি বটে ঠাট্টা। কিন্তু ওকে বিশ্বাস নেই। কুকুর ওর চক্ষুশূল!

না, না। ইন্দুপ্রভা স্বামীর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন। আমার মতোই জীবজন্তু ভালবাসে। আমার শাশুড়ীর বড্ড বেড়াল পোষার নেশা ছিল শুনেছি। আমার শ্বশুরমশায়েরও ছিল। মস্তো একটা টেরিয়ার পুষেছিলেন। গাড়িচাপা পড়ে মারা যায় বেচারা। তারপর থেকে এ বাড়ি ফাঁকা হয়ে আছে।

আমার কেবলই ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ওরও লাগে। জিগ্যেস করুন না? ওগো, বলো না!

নাদুবাবু গোঁফের তলায় অনিচ্ছাসত্ত্বে বললেন, হুঁঃ।

লাগবে। লাগবার কথা। যজ্ঞেশ্বর ফুট কাটলেন। একটি মোটে মেয়ে। তাকে মার্কিন মুলুকে পাঠিয়েছ ডাক্তার হতে! এদিকে এখানকার ডাক্তারের নাকি ওখানে দারুণ ডিম্যাণ্ড। আমি সব বুঝি, এটাই বুঝতে পারি না। মিসেস বরং মেয়েকে লিখুন, একটা বিশুদ্ধ অ্যালসেসিয়ান সেখান থেকেই পাঠাক। আর ফাঁকা লাগবে না ইহসংসার। ফুল ফুটবে। পাখি গাইবে। অনেক কিছু হবে। লিখুন মেয়েকে।

সত্যসুন্দর বললেন, পাঠানো কি সহজ কথা? কীভাবে পাঠাবে?

পার্শেল। যজ্ঞেশ্বর বললেন। পোস্টাপিস থেকে নাদু ছাড়িয়ে আনবে।

সত্যসুন্দর হাসিমুখে ইন্দুপ্রভার উদ্দেশে বললেন, লিখুন না বৌঠান! দুটো পাঠাতে লিখুন।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, কাস্টম ডিউটি লাগবে।

দেব। ইন্দুপ্রভা এবং সত্যসুন্দর যুগ্মকণ্ঠে বললেন।

যজ্ঞেশ্বর পরামর্শ দিলেন।...প্যাকিং বাক্সে ফুটো রাখতে বলবেন। অক্সিজেন সাপ্লাই হবে।

সত্যসুন্দর জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ হে জগা! পার্শেল এয়ারমেলে পাঠালে কি সারফেস মেলের ডবল পোস্টাল চার্জ লাগে, না দেড়া লাগে? তুমি তো পোস্টালে ছিলে!

ডবল লাগবে। রিডবল লাগাও বিচিত্র নয়।

সত্যসুন্দর ভেবে বললেন, দেব। লাগুক! কী বলেন, বৌঠান?

যজ্ঞেশ্বর আলো-আঁধারিতে যেন হাসি চাপছিলেন। ইন্দুপ্রভা বললেন, হাসছেন যে যগুবাবু?

না। হাসিনি তো! ভাবছি।

যুবতীর ভঙ্গিতে ইন্দুপ্রভা বললেন, কী ভাবছেন শুনি?

ভাবছি রসোর কথা। যজ্ঞেশ্বর উদাসমুখে বললেন। মানে আমাদের রসরাজ গোস্বামীর কথা। সতু বলল, পার্কে চুপচাপ বসে আছে। ওর সঙ্গে কথা বলে নি।

ইন্দুমতী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, সে কী! কী হয়েছে রসোবাবুর?

মেলানকলিয়ায় ভুগছে বেচারা। শুনেই বুঝেছি, ওটা সেই বিষাদবায়ু।

সত্যসুন্দর শ্বাস ফেলে বললেন, বায়ুটা বৈরাগ্যঘটিতও হতে পারে।

ইন্দুপ্রভা যুগপৎ দুটি মুখ অবলোকন করে আর্তস্বরে বললেন, আহা গো! বেশ তো ছিলেন মানুষটা। কত হাসিখুশি ছিলেন। কত সব মজার মজার গল্প বলতেন। কেন অমন হল?

বলে হঠাৎ গলা খাটো এবং ষড়যন্ত্রসংকুল করলেন। ···যোগসাধনা করতে গিয়ে মাথার ভেতর শিরা ছিঁড়ে যায় নি তো? আমাদের হাবুলদার ওই অবস্থা হয়েছিল, জানেন? ভেলোরে গিয়ে অপারেশন করে তবে সারে।

নাদু ডাক্তার মুখ খুললেন।···হাবুল যোগসাধনা করেছিল কে বলল তোমাকে? ওর হয়েছিল অন্য ব্যাপার। সে তোমরা বুঝবে না। মানুষের শরীরটা ভারি জটিল যন্ত্র। কত রকম···

কথা কেড়ে সত্যসুন্দর বললেন, আঃ! ফের শরীর? কনসাসনেসের প্রাবল্য ঘটলে মানুষ ফিলসফিক্যাল হতে বাধ্য। ব্রেনের নার্ভ তুচ্ছ পার্থিব জড়বস্তু। চৈতন্যের বন্যা যখন কুলকুণ্ডলিনীতে থইথই করে সঞ্চারিত হয়, তখন—হুঁঃ শরীর! রাখো তোমার শরীর! শরীরের তুচ্ছতা উপলব্ধি করেই না সনাতন ভারতবর্ষ আত্মাকে সার করেছে। আত্মানং বিদ্ধি। ওদিকে দেখ, শরীরবাদী জড়বাদী ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থাটা কী? হিপি! দেউলিয়া! আত্মার সন্ধানে ভারতে এসে মাথা ভাঙছে। বোলো না নাদু, আর বোলো না! গীতার বাণী স্মরণ করো—বাসাংসি জীর্ণানি···এট্‌সেটেরা এট্‌সেটেরা।

মুগ্ধদৃষ্টে চেয়ে ইন্দুপ্রভা শুনছিলেন। যজ্ঞেশ্বর মুচকি হেসে বললেন, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! তাহলে আর কী? জীর্ণ বস্ত্রের মতো ঝটপট শরীরখানা খুলে ফেলে পাড়ি জমাও ব্রহ্মলোকে। পড়ে আছ কেন বাত-অম্বল-ডায়াবেটিস নিয়ে? যাও!

সত্যসুন্দর করুণ হয়ে বললেন, যাওয়া তো আমার হাতে নেই রে ভাই!

আছে। ছাদে উঠে ঝাঁপ দাও গে ফুটপাতে। নির্বিকার মুখে যজ্ঞেশ্বর বললেন। বরং হাওড়া ব্রিজে ওঠ গে। কাজটা সহজ হবে। নযতো নাদুর কাছে পটাসিয়াম সাইনাইড চেয়ে নাও!

নাদুসিঙ্গি ক্রূর হেসে বললেন, দেব না। এ বয়সে জেল খাটবার সদিচ্ছা নেই।

ইন্দুপ্রভা আঁতকে উঠেছিলেন। বললেন, কী সব অলুক্ষুণে কথা! বালাই ষাট! মৃত্যু নিয়ে ফাজলেমি করতে নেই।

সত্যসুন্দর চাপা রাগে বললেন, মৃত্যু নয়—আত্মহত্যা নিয়ে ফাজলেমি করা হচ্ছে। বুঝলেন না? দেখ যগু আর যা নিয়ে করবে করো, স্যুইসাইড নিয়ে কক্ষনো না। অবসেসানে পরিণত হলেই কেলেংকারি। সেই যে এক সায়েব ঘুমের মধ্যে গিয়ে বাগানে কোট-প্যাণ্ট পুঁতে রেখে আসত, তেমনি কখন ঘুমের মধ্যে কী করে বসবে। সাবধান! ইট ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস গেম।

এই সময় জনি কীভাবে সত্যসুন্দরের কোল থেকে ছাড়া পেয়ে টুপ করে নামল এবং সোজা ইন্দুপ্রভার পায়ের কাপড়ে দুই ঠ্যাঙ তুলে দিল। নিচে অন্ধকার। সত্যসুন্দরও কথার ঝোঁকে টের পান নি। ইন্দুপ্রভা হাঁটুর কাছে কী একটা ঘটেছে টের পেয়েই কাঁইরে মাঁইরে করে চিলচেঁচানি চেঁচালেন। নাদু কী কী বলে আর্তনাদ করে উঠলেন। ত্রিলোচন এবং নেড়ার মা বোমাপিস্তল নিয়ে ডাকাত ঢুকেছে ভেবে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। যজ্ঞেশ্বর হকচকিয়ে হারিকেনটার দিকে হাত বড়ালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিচে পড়ল। কাচ ভাঙল এবং অন্ধকার। অন্ধকারে সত্যসুন্দরের চাপা গলা শোনা গেল, জনি! জনি!

নাদু সিঙ্গিও এক কাণ্ড করে ফেলেন। চায়ের কাপ-প্লেটসুদ্ধ ট্রে উল্টে গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। বুদ্ধিমান যজ্ঞেশ্বর বিকেলে পকেটে টর্চ নিয়েই বাড়ি থেকে বের হন। আপৎকালে মনে পড়তেই বের করে জ্বাললেন। দেখা গেল, ইন্দুপ্রভা দেয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছেন। জনি তক্ষুনি ফিরে এসে টুপ করে প্রভুর কোলে বসে পড়েছে। চোখদুটো চকচক করছে। মুখটা নিচু। সত্যসুন্দর ছাড়া আর কেউ আদতে বোঝেন নি কী ঘটেছিল। কিন্তু বলে ফেললে কী ঘটবে অনিশ্চিত। তাই চেপে রাখলেন।

আলো দেখে নাদু সিঙ্গি গর্জে বললেন, ত্রিলোচন! আলো!

যজ্ঞেশ্বর হারিকেন তুলে বললেন, সতু! দেশলাই দাও।

হারিকেনটা দিব্যি জ্বলে উঠল আগের মতো। তখন ইন্দুপ্রভার দিকে তাকিয়ে সমব্যথী স্বামী জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছিল বলো তো? আরশোলা-টোলা নাকি?

ইন্দুপ্রভা ভয় পাওয়া মুখে বললেন, না। কেমন যেন নরম অথচ শক্ত—হাঁটুর কাছে।

তাহলে ছুঁচো। নাদু সিঙ্গি বললেন। ওই যে বস্তি। যত ছুঁচো ওখান

থেকে ড্রেনপাইপ বেয়ে ওপরে ওঠে। সারা রাত ব্যাটাদের ছুটোছুটি চলে। বিষে আব কাজ হয় না। রেসিণ্ট্যান্স গ্রো করেছে বডিতে।

যজ্ঞেশ্বর ভুরু কুঁচকে সত্যসুন্দরকে বললেন, তোমার হারামজাদাটা নয় তো?

সত্যসুন্দর রিস্ক নিতে চান না। জোরে মাথা নেড়ে বললেন, যাঃ! দেখছ না? কোল ছেড়ে নড়ার পাত্রই নয়। তাছাড়া জনি হলে বৌঠান বুঝি ভয় পেতেন? বৌঠান কুকুর ভালবাসেন বললেন না?

নাদু ডাক্তার যজ্ঞেশ্বরের হাত থেকে টর্চ নিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার মতো আসবাবপত্রের তলায় ছুঁচো খুঁজতে ব্যস্ত হলেন। ইন্দুপ্রভা সত্যসুন্দরের কথায় আপ্লুত। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে জনির পিঠে আলতো গুঁতোয় আদর দিতে দিতে বললেন, দুষ্টুটা! সোনাটা! ভেলভেলেটা! তুই নোস তো?

জনি মুখ ঘুরিয়ে প্যাটপ্যাট করে দেখছিল ইন্দুপ্রভাকে। সত্যসুন্দর খুশি হয়ে বললেন, খুব ভাল জাতের বাচ্চা বৌঠান। আদর পেলে আর কথা নেই। সারাক্ষণ কোল থেকে নামতে চাইবে না। বুকের ভেতর গুটিসুটি ঘুমোবে। নিন, নিন! কোলে নিয়ে দেখুন!

হামাগুড়ি অবস্থায় নাদু ডাক্তার বাঁয়ে ঘুরে দেয়ালঘড়ি দেখছিলেন, প্রায় ছটা হয়ে এল। সত্যসুন্দরের কথা কানে গেলে ডাইনে ঘুরলেন। অসুরের মতন বড়-বড় চোখ। ইন্দুপ্রভা জনিকে ভয়ে-ভয়ে দুহাতে তুলে বুকে নিলেন—সত্যসুন্দর তাতে প্রচুর সহযোগিতাও করলেন বটে। তারপর ইন্দুপ্রভা জনিকে আদর করতে করতে বললেন, আমাল ছোট্ট খুকুটা। আমাল ছোনাটা ভেল-ভেলেটা। কী খাবে গো? ডুডু, না মাছের ঝোল?

নাদুবাবু উবু হয়ে মেঝেয় বসে গলার ভেতর বললেন, হেগে দেবে। বুঝবে ঠেলা!

না না না না না! জিভ বের করে সত্যসুন্দর প্রতিবাদ করলেন। সময় হলে ক্লিয়ার সিগন্যাল দেবে। ছটফট করবে। নামিয়ে দিলে বাইরে দৌড়ুবে। বুঝলে না? বিলিতী এটিকেট। ও আপনি ভাববেন না বৌঠান!

ইন্দুপ্রভা দুলতে দুলতে আবেগে বললেন, তাহলে অন্তত রাত্তিরটা আমার কাছে থাক না সতুবাবু।

নাদুবাবু সটান উঠে এসে দাঁড়ালেন। সত্যসুন্দর একগাল হেসে বললেন, রাখবেন? তা রাখুন না! কোনো আপত্তি নেই। এমন কী, ইচ্ছে হলে

বরাবর রাখুন! বরং তার বদলে আপনার মেয়েকে লিখে পার্শেলে আমাকে একটা ডালকুত্তা আনিয়ে দেবেন।

ডালকুত্তা! যজ্ঞেশ্বর হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, ডালকুত্তা পুষবে? ডালকুত্তা বাঘের চেয়ে মারাত্মক, তা জানো?

সত্যসুন্দর জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, নাদু সিঙ্গি বললেন, সতু! এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু।

ইন্দুপ্রভা আপন খেয়ালে ডগমগ। পর্দা তুলে ভেতরে চলে গেলেন জনিকে বুকে নিয়ে। অমনি নাদু ডাক্তার গলা চেপে সত্যসুন্দরের মুখের কাছে তর্জনী রেখে গর্জালেন, হিপোক্রিট! মতলববাজ!

সত্যসুন্দর উঠে দাঁড়ালেন। বাঃ! বা রে বাঃ! অমন দামী একটা অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা মুখের একটি কথায় বিনি পয়সায় উপহার দিলুম—আর আমায় বলে হিপোক্রিট! শুনছ যগু?

নাদু সিঙ্গি হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়লেন। উদাস হয়ে বললেন, আমাকে দেখছি আজ ও ঘরেই রাত কাটাতে হবে। সতুটা বড্ড ঝামেলা বাধায়। কেমন মতলব করে এসেছিল—গছিয়ে দিতে।

সত্যসুন্দর দরজার দিকে এগিয়ে বললেন, মহাপুরুষ বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করো নাদু, আখেরে ভাল হবে। জীবে সেবে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। আর নাদু, মহাভারত-টারত করছিলে, অথচ কুকুর যে স্বয়ং ধর্মদেব, তাও জানো না। যা দিনকাল পড়েছে, এখন ধর্মের সেবা করে কাটাও। নৈলে বাঁচোয়া নেই।

সত্যসুন্দর চলে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁকে দরাজ গলায় সম্ভবত ধর্মসঙ্গীত গাইতে শোনা গেল। যজ্ঞেশ্বর বললেন, কী নাদু! চেম্বারে যাবে না আজ? রুগীরা এতক্ষণ খাবি খাচ্ছে যে!

নাদু ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,'যাই! একটু দাঁড়াও। একসঙ্গে নামব।...

কদিন পরে যজ্ঞেশ্বর থলে হাতে বাজারে বেরিয়েছেন। একটু দূর থেকে চোখে পড়ল, ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রসরাজ গোঁসাই। যজ্ঞেশ্বর হন্তদন্ত কাছে গেলেন।

অবাক হয়ে দেখলেন, সত্যসুন্দরের কথাই ঠিক। সেই নাদুসনুদুস চকচকে মূর্তিটি এখন পোড়া গাছ হয়ে গেছে। চোখের তলায় কালির ছোপ। মোটাসোটা নাক শুঁটকো হয়ে গেছে। পরনের কাপড়চোপড় মলিন। উস্কখুস্ক চুল। এ কী দশা হয়েছে রসোর!

যজ্ঞেশ্বরকে দেখেই রসরাজ কিন্তু ফিক করে হাসলেন। অমনি যজ্ঞেশ্বরের বুকের ভেতর ধক করে উঠল। নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে বেচারী। নৈলে এমন করে হাসে কেউ?

যজ্ঞেশ্বর পাগলকে বড় ভয় পান। চোখ পিটপিট করে রসরাজকে দেখতে দেখতে দোনামনা করছিলেন, কথা বলা উচিত হবে কি না—কিন্তু তার আগেই রসরাজ বলে উঠলেন, কী যগু, কেমন আছ?

যজ্ঞেশ্বর সাহস পেয়ে বললেন, খুব ভাল রসো, খুব ভাল। তো তোমার এমন চেহারা হয়ে গেছে কেন? অসুখবিসুখ করেছে নাকি?

রসরাজ খিকখিক করে তেমনি হেসে উঠলেন ফের।

হাসছ কেন রসো? যজ্ঞেশ্বর অবাক হয়ে বললেন। না ভাই, হাসাহাসিটা ভাল নয়—যা দিনকাল পড়েছে। হাসি এখন পেটের ভেতর রাখাই ভাল।

রসরাজ বললেন, যগু! হাসছি—আনন্দে। আনন্দ! আজ আমার চতুর্দিকে আনন্দ।

সন্দিগ্ধভাবে যজ্ঞেশ্বর বললেন, মনে হচ্ছে, তুমি পরমতত্ত্ব লাভ করেছ ভায়া! উপনিষদে সেই যে আছে, না? আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও গেয়ে গেছেন, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে! আনন্দ ভাল জিনিস।

রসরাজ খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন, ধুর ধুর! ওসব বড় বড় কথা ভেবে আমায় আনন্দ হয়নি। ইদানীং কি নাদুসিঙ্গির সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার? দেখলে তুমিও আনন্দ পেতে। কী দুর্ধর্ষ পুরুষ ছিল ওই নাদু! চলে যাও সোজা ওই পার্কে। দেখতে পাবে।

নাদু ডাক্তার? ভাবনায় পড়ে যজ্ঞেশ্বর জিগ্যেস করলেন। পার্কে কী করছে? দাতব্য চিকিৎসা নাকি?

রসরাজ বিরক্ত হলেন। ধুর! খালি কথা বাড়ায়। দেখে এস না স্বচক্ষে।

যজ্ঞেশ্বরও বিরক্ত। বললেন, আহা! আমায় এখন বাজার করতে হবে না? তুমি মুখে বলো। কী হয়েছে ওর?

রসরাজ হাত চিতিয়ে একটা ভঙ্গি করে বললেন, বেঞ্চে চিৎপাত হয়ে আছে। গোঁফে পিঁপড়ে হাঁটছে। নাড়ুর সাড়া নেই। তো দেখে ভারি আনন্দ হল। চুপটি করে দেখে চলে এলুম।

হুঁ, যা ভেবেছিলেন তাই। রসরাজ পাগল হয়ে গেছেন। যজ্ঞেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আসি রসো।

ঘুরে পা বাড়াতেই খপ করে তাঁর কাঁধে ধরে রসরাজ বললেন, আহা! চললে কোথায়? কতদিন পরে দেখাসাক্ষাৎ হল। কত কথা মনে জমে রয়েছে। শুনে যাও যগু।

পরে শুনব'খন। বলে একঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যজ্ঞেশ্বর প্রায় দৌড়ে পালালেন। রসরাজ গালমন্দ করতে থাকলেন আঙুল তুলে। করুক। পাগলে কী না বলে।

সারাটা দিন মন খারাপ হয়ে রইল যজ্ঞেশ্বরের। বিকেলে নাড়ুডাক্তারের বাড়ি গেলেন। রসো নাড়ু সিঙ্গিকে নিয়ে রসিকতা করল কেন? পাগল হয়েছে, হয়েছে। তাই বলে এত উদ্ভট পাগলামির কোনো মানে হয় না। সবকিছুর একটা লিমিট থাকা দরকার। হ্যাঁ, পাগলদেরও লিমিট থাকে। যদি নাই থাকবে, তাহলে তারা গাড়ি চাপা পড়ে না কেন? আত্মহত্যা করে না কেন? কলকাতা শহরে রাস্তাঘাটে এবেলা-ওবেলা আকছার পাগল দেখা যায়। আজ পর্যন্ত তাদের কাউকে কি গাড়ি চাপা পড়তে দেখা গেছে? গাড়ির ঝাঁকের মধ্যে পাগল দেখে তুমি যতই আঁতকে ওঠ, ওদের হুঁশ এদিকে টনটনে। জানে, পাগল বলে সাতখুন মাফ। কেউ চাপা দেবে না। চাপা পড়তে চাইলেও না। কিন্তু সুস্থ মানুষের বেলা গাড়িওলাদের অন্য নিয়ম। ঘ্যাঁচ করে চাপা দিয়ে পালাবে।

তবে ভেবে দেখলে রসো ঠিক রাস্তা ধরেছে। ওর আনন্দ হবে না তো কার হবে? পাগল হয়ে খুন করলে ফাঁসি মাফ। যাকে খুশি গালমন্দ করো, বিবস্ত্র হয়ে রাস্তায় ঘোরো এবং নর্তনকুর্দন করো। কী অঢেল স্বাধীনতা! কী দুর্দান্ত আনন্দ! কথায় বলে না? পাগলের নাকি গোবধেও আনন্দ।

যজ্ঞেশ্বর পাগল নিয়ে ভাবতে ভাবতে আকুল হচ্ছিলেন। সত্যি, ভেবে দেখলে পাগল হবার মতো বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই। দায় নেই, ঝক্কি নেই। জীবন-যন্ত্রণা নেই, সম্ভবত মরণযন্ত্রণাও নেই। মুক্তকচ্ছ স্বাধীন জীবন। খালি আনন্দ আর আনন্দ। হাসিতে আনন্দ প্রকাশ করো। হাসিতে না

কুলোলে কেঁদেও আনন্দ প্রকাশ করো। রসো ঠিকই বলেছে। পাগল না হলে বোঝা যায় না, আনন্দধারা ভুবনে বয়ে যাচ্ছে কুলুকুলরবে।

শুধু একটাই গণ্ডগোল। যজ্ঞেশ্বর এবার ভড়কালেন। পাগল হলে মাঝে মাঝে লোকের প্রহার খেতে হয়। একপাত্র দুধে এটাই এককোঁটা চোনা। দরকার নেই বাবা পাগল হয়ে। যেমন আছি, তেমনি থাকি।

নাদুডাক্তারের বাড়ি অস্বাভাবিক চুপচাপ। ত্রিলোচন দরজা খুলে দিয়ে কেমন গোমড়া মুখে চলে গেল। ডাক্তার আছে? বললেও জবাব দিল না। যজ্ঞেশ্বর ভাবলেন, মেজাজ! আজকাল ভৃত্যদের ব্যাপারস্যাপারই এই। দোতলার সিঁড়ি থেকেই ডাক দিলেন যজ্ঞেশ্বর। নাদু! ও ডাক্তার!

কোনো সাড়া পেলেন না। ওপরের ঘরটা যথারীতি খোলা। ঢুকে কাউকে দেখতে পেলেন না। বাড়ির ভেতর এমন চুপচাপ দেখে একটু অস্বস্তি হল যজ্ঞেশ্বরের। এমন তো হবার কথা না। এখন নাদু সিঙ্গির ড্রয়িংরুমে বন্ধুবান্ধব চেনাজানা কেউ না কেউ থাকারই কথা। রসরাজের কথাটা মাথায় চিড়িক করে উঠল। যজ্ঞেশ্বর ভয়ে-ভয়ে একটু কেসে ভেতরের দরজার উঁকি মেরে ডাকলেন, ডাক্তার! ও ডাক্তার!

চড়া গলায় ইন্দুপ্রভার সাড়া এল, কে?

আমি যজ্ঞেশ্বর, মিসেস সিঙ্গি।

ইন্দুপ্রভাকে দেখা গেল। আলুথালু চুল। ঘষটানো সিঁদুর। ধ্যাবড়া টিপ, এলোমেলো শাড়ি। মুখের চেহারাটি সুবিধের নয়—কেমন যেন চামুণ্ডা ধাঁচের। ভুরু বাঁকা করে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ হানতে থাকলেন।

যজ্ঞেশ্বর ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ইয়ে—ও কোথায়?

কোথায় তা আমি কেমন করে জানব? ইন্দুপ্রভা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন। আপনাদের বন্ধুর খবর আপনারাই রাখেন।

ভারি অভদ্র মেয়েছেলে তো! যজ্ঞেশ্বর চটে গেলেন। কিন্তু সেটা গোপন করাই সঙ্গত মনে করলেন। তুমি অধম। তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? মুখে হাসি এনে বললেন, বেরিয়েছে বুঝি? এখন তো চেম্বারে বসার সময় নয়। তো ইয়ে, আপনার সেই অ্যালসেসিয়ানের খবর কী? মানে—সত্যসুন্দর যেটা সেদিন উপহার দিয়ে গেল? যজ্ঞেশ্বর চোখ নাচালেন।···দেখেই বুঝেছিলুম খুব ভাল জাতের বাচ্চা। মাংস-টাংস খাওয়াচ্ছেন তো? সেদ্ধ করে খাওয়াবেন কিন্তু। সঙ্গে দুএকটুকরো

গাজর দেবেন। প্রচণ্ড ভিটামিন আছে গাজরে। আর একটা জিনিস দেবেন…

ইন্দুপ্রভা হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। এতক্ষণ চোখদুটো ঠিকরে বেরুচ্ছিল—লক্ষণ টের পাননি যজ্ঞেশ্বর।…কার কথা বলছেন যগুবাবু? বাছা কি আর আছে আমার?

যজ্ঞেশ্বর সহানুভূতিতে গলে পড়লেন।…এঁ্যা! নেই? মারা গেছে? আহা হা হা হা! জিভ চুকচুক করতে থাকলেন যজ্ঞেশ্বর।

ইন্দুপ্রভা অতিকষ্টে ভাঙা গলায় বললেন, মারা গেলেও কথা ছিল। চুরি গেছে! রাতে দিব্যি আমার বুকে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম ভেঙে দেখি, নেই। কোথাও নেই। কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম। থানায় খবর দিলুম। কত কাণ্ড করলুম। উহু-হু-হু—মাগো!

বুকে হাত চেপে ককিয়ে উঠলেন ডাক্তার-গিন্নি। যজ্ঞেশ্বর বললেন, সতুর বাড়ি চলে যায়নি তো? অনেকসময় গৃহপালিত প্রাণীরা…

কথা কেড়ে ইন্দুপ্রভা স্ফুরিত নাসারন্ধ্র এবং রোষকষায়িত চক্ষে বলে উঠলেন, সব বুঝি! আপনাদেরই ষড়যন্ত্র! আপনারা ষড়যন্ত্র করে ওকে চুরি করেছেন। আবার চালাকি করে মজা দেখতে এসেছেন। যান। বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।

গতিক বুঝে যজ্ঞেশ্বর কেটে পড়লেন। একটা কুকুরের জন্যে মানুষ—বিশেষ করে মেয়েমানুষ এমন মাথাখারাপ হয়ে যায়, ভাবা যায় না। অপমানটা জোর বেজেছে যজ্ঞেশ্বরের। তাঁর মতো রাশভারি এবং বিজ্ঞজন বলে পরিচিত মানুষকে এমন অভদ্র ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে বলা। পাড়ার অনুষ্ঠানে যাঁকে সভাপতি করে মালা দেওয়া হয়। ক্লাবের যিনি স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট।

চেম্বারের দিকে পা বাড়ালেন যজ্ঞেশ্বর। কম্পাউণ্ডার সুধীরকে জিগ্যেস করবেন ডাক্তার কোথায়। নাতুকে বলতেই হবে, তোমার বউ আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।…

সুধীর মুচকি হেসে বলল, ডাক্তারবাবু? সোজা পার্কে চলে যান? পেয়ে যাবেন। কদিন থেকে উনি ওখানে বসেই প্রেসক্রিপশান লিখছেন। ওখানেই রাত কাটাচ্ছেন। পুলিশ এসে একরাতে গণ্ডগোল বাধিয়েছিল। তবু ওই।

বলো কী! যজ্ঞেশ্বর হতবাক হয়ে গেলেন। কেন?

সুধীর বলল, গিন্নিমা বাড়ি ঢুকতে দিচ্ছেন না যে! কী করবেন বলুন?

বলছেন, কুকুর তুমিই চুরি করে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ। যতক্ষণ না এনে দিচ্ছ, ততক্ষণ তোমার এ বাড়িতে ঠাঁই নেই।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, সর্বনাশ! তা ওহে সুধীর! নাদুর খাওয়াদাওয়া?

লুকিয়ে খাবার দিয়ে আসে ত্রিলোচন। সুধীর বলল। গিন্নিমার চোখে পড়লেই হয়েছে। তবে কি জানেন? ওই অবস্থায় মানুষের খাওয়া রোচে না। ডাক্তারবাবু শুকিয়ে চামচিকেটি হচ্ছেন।

যজ্ঞেশ্বর হনহন করে এগোলেন। রাস্তার বাঁক ঘুরেই পার্ক। ভেতরে ঢুকে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলেন নাদু সিঙ্গিকে। ঝোপের পাশে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন নাদু ডাক্তার। বুকের ওপর স্টেথিসকোপ। একটা হাত কপালে। যজ্ঞেশ্বর ডাকলেন, নাদু! নাদু!

চোখ খুলে নাদুবাবু করুণ হাসলেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। বললেন, রসোর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্তভাবে বললেন। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা…

আহা! রসো কী বলল, তাই বলো আগে।

রসো বলল, সকালে তুমি এখানে একটা বেঞ্চে শুয়ে আছ মড়ার মতো।

ঘুমোচ্ছিলুম। নাদু সিঙ্গি করুণ হাসলেন। উঃ! সত্যসুন্দরটা রসোকে ফাঁসিয়ে শেষে আমাকেও ফাঁসাবে ভাবতে পারিনি। হ্যাঁ—খানিকটা আঁচ করেছিলুম বলতে পারো। সতু যেদিন কুকুর নিয়ে ঢুকল, তুমিও তো ছিলে, স্বচক্ষে দেখলে—আমি প্রবল আপত্তি করেছিলুম।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, কিন্তু প্রব্লেমটা কী?

বোঝনি? কুকুর। দ্যাট ডার্টি কুত্তাকা বাচ্চা! নাদুডাক্তার চাপা গর্জালেন। সারারাত কানের কাছে চেঁচায়। সে কী চেঁচানি রে ভাই। একফোঁটা ঘুমুবার যো নেই। ঘুম না হলে শরীর টেঁকে মানুষের? গতিক দেখে সেদিন শেষ রাতে ব্যাটাকে গিন্নির বুক থেকে তুলে নিয়ে সোজা হাজির হলুম সতুর বাড়ি। ওকে ওর জিনিস ফেরত দিয়ে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিলুম। পাছে আবার আমার বাড়ি কুকুর নিয়ে হাজির হয়, তাই নির্লজ্জের মতো শালাবাঞ্চোত করেছি। তুমুল ঝগড়াঝাঁটি একেবারে। শেষে ওর বউসুদ্ধু পাল্টা খিস্তি জুড়ে দিল। লোক জড়ো হয়ে গেল ভোরবেলা। আমি তো তাই চেয়েছিলুম। কুকুর-কেত্তন যে বড় সাংঘাতিক জিনিস।

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে নাদু সিঙ্গি ফের বললেন, কিন্তু তারপর আমার যা

হবার হল, দেখতেই পাচ্ছ। ইন্দু পণ করেছে কুকুরছাড়া বাড়ি ঢুকলে ওর মরা মুখ দেখব। ও যা জেদী মেয়ে, বলা যায় না কিছু।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, তা সতুর কাছে লোক পাঠিয়ে কুকুরটা এনে দিলেই পারতে।

নাদুবাবু ভেংচি কেটে বললেন, এঁয়ে ডিলেই পাত্তে। বলছ ভাল। তারপর ঘুমের জন্যে আমি ওষুধ খাওয়া ধরি—তারপর রসোর মতন ব্রেনটার বারোটা বাজাই। মেলানকলিয়া—তারপর স্রেফ লুনাটিক!

রসোর কেসটা কী?

একই। আমারটা যা। দা সেম কুকুর-কেত্তন। খিক করে হাসলেন নাদুডাক্তার। তাও তো আমি বাড়ির কাছাকাছি আছি। আর রসোকে দূরে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

রসোর অবস্থা দেখলুম ভয়াবহ।

রসো টু-থার্ড পাগল হয়েছে। আর কিছুদিন ওই অবস্থায় থাকলে বাকি ওয়ান-থার্ড পাগল হয়ে যাবে। ও কী খেত জানো? আফিম। এ কুকুর-কেত্তন থেকে বাঁচতে হলে আফিম ছাড়া বাঁচোয়া ছিল না।

আর তুমি! নিজেরটা ভেবে দেখ নাদু। যজ্ঞেশ্বর মমতাজড়ানো গলায় বললেন।

আমি! ওয়ান-থার্ড হয়েছি বলতে পারো!

তাহলেই দেখ, সতুটা কী পাজি। কুকুর লেলিয়ে বেড়ানো আর কাকে বলে?

নাদুবাবু চোখ নাচিয়ে বললেন, বেড়াচ্ছে কি সাধে? ওর বাড়ি ঝগড়া করতে গিয়েই না বুঝলাম সব।

কী বুঝলে বলো তো? যজ্ঞেশ্বর সাগ্রহে জিগ্যেস করলেন।

দা সেইম কেস। আমার যা, রসোর যা, সতুরও তাই। নাদু ডাক্তার চাপা গলায় বললেন। সতুর ভীষণ কষ্ট। সারারাত বিদঘুটে চেঁচানিতে ঘুমুতে পারে না। তখন মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ছলে কাকেও গছিয়ে দিয়ে আসে। ফিরে গিয়ে বলে, হারিয়ে গেছে। হেন হয়েছে, তেন হয়েছে। ওর বউ কান্নাকাটি করে বটে, কিন্তু রসোর বউ বা আমার বউয়ের মতো তত কড়াধাতের মেয়ে না। নৈলে সতু কবে ফেঁসে যেত। যাই হোক, আমি যখন ফেরত দিতে গেলুম, ওর বউ বলল, আর কক্ষনো চোখের আড়াল করবে না ছোনাকে। ছোনা! দাদু! ভেলভেলেটা!

যাক্ বাবা। যজ্ঞেশ্বর হাঁপ ছাড়লেন। সতুর হাতে না দিলেই বাঁচোয়া।

নাদুডাক্তার বললেন, দেবে না তো। কিন্তু সতু যদি আমাদের লাইন ধরে? চুরি করে?

সর্বনাশ! আঁতকে উঠলেন যজ্ঞেশ্বর। কুকুরের চেঁচানি থেকে বাঁচতে হলে তো চুরি করেই ফের কাউকে গছাতে চাইবে সতু। ওরে বাবা, আবার কার কপাল ভাঙবে?

নাদুসিঙ্গি রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন, আশা করি এবার টের পাচ্ছ, কলকাতার রাস্তাঘাটে ইদানীং পাগলের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কী?

যজ্ঞেশ্বর মনমরা হয়ে গেলেন। বললেন, এখন বুঝতে পারছি, সেদিন এপার্কে সতুকে দেখে রসো কথা বলেনি কেন। ওর কোলে ফের সেই কুকুর দেখে রসো কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এক্সপ্লানেশানটা ঠিক না নাদু?

হাই তুলে নাদু ডাক্তার বললেন, উঠি ভাই। রুগীরা আসার সময় হল। ওই দেখছ অমলতাস গাছতালায় বেঞ্চ। ওটাই এখন আমার চেম্বার। যদ্দিন না পুরো পাগল হচ্ছি, জনসেবা করে যাই। আর একটা কথা।

যজ্ঞেশ্বর তাকালেন।

নাদুডাক্তার বলে গেলেন, সাবধানে থেকো। লক্ষ্য রেখো। কেমন?…

কথাটা কানে বাজছিল যজ্ঞেশ্বরের। হুঁ—সাবধানে থাকতে হবে। সতুর সঙ্গে দেখা হলেই ছলছুতো করে ভীষণ ঝগড়া বাধাতে হবে, যাতে যজ্ঞেশ্বরের বাড়ির ত্রিসীমানা না ঘেঁষে।

কিন্তু বাড়ির দরজায় ঝিমধরা সন্ধ্যার আলোয় সত্যসুন্দরকে দেখে মাথায় বাজ পড়ল।

সত্যসুন্দর একগাল হেসে বললেন, কদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাই এসেছিলুম। তোমার গৃহিণী বললেন বেরিয়েছে।

যজ্ঞেশ্বর বুঝলেন, যা হবার তাই হয়েছে। এবার তাঁর কপাল ভেঙেছে। মাথা ঘুরছে। স্ট্রোক হয়ে গেলেই এখন মঙ্গল। তবু হচ্ছে কই? কিন্তু কসাইয়ের মতো কী নিষ্ঠুর আর ঠাণ্ডা চেহারা সতুর। দেশের শত্রু সবার চোখের সামনে ঘুরছে। অরাজক অবস্থা কাকে বলে তাহলে?

যজ্ঞেশ্বর অতিকষ্টে বোবাধরা গলায় বলতে চেষ্টা করলেন, কু-কু-কু-কু…

সত্যসুন্দর ফ্যাঁচ করে হাসলেন। কুকুর। হুঁ, তোমার আগ্রহ স্বাভাবিক, যগু! দেখ—সেদিন নাতুর বাড়ি থেকে ফিরে মহাভারতের মহাপ্রস্থানপর্বটা ফের খুঁটিয়ে পড়েছিলুম। ওতে ভারতীয় দর্শনের একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। তুমি কি কুকুরের লেজ লক্ষ্য করেছ? ওই! ওই দেখ নেড়িটা যাচ্ছে! দেখে নাও। কী দেখছ? না—লেজের ডগা ঊর্ধ্বগামী। ওটা একটা সিগন্যাল। অ্যান ইটারন্যাল সিগন্যাল টোয়ার্ডস ডিভিনিটি। কুকুরের মুখ অধোগামী কিন্তু লেজ, ঊর্ধ্বগামী। এই ডায়ালেকটিকসটা তোমায় বুঝতে হবে। মুখটা থিসিস, লেজটা অ্যান্টিথিসিস এবং বডিটা সিন্থিসিস।

সত্যসুন্দর উদাত্ত স্বরে বলতে থাকলেন।...অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চাটা আমার মাথায় একটা আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ডগ বার্কস। কুকুর ডাকে। কেন ডাকে? না—ওটাই ডগের ল্যাংগুয়েজ। বাই দা বাই, মজাটা লক্ষ্য করছ যগু? ডগকে উল্টে দিলেই গড হয়ে যায়? তাহলেই দেখ ডগ ইজ ডিভাইন। ডগ ইজ গড অ্যাণ্ড দেয়ারফোর গড ইজ ডগ। লজিক যগু, লজিক এবং ম্যাথমেটিক্স। এ যদি বি হয়, বি তাহলে এ। তাই না? তো যা বলছিলুম, কান করে শোনো।

থক করে কেশে থুথু ফেলে সত্যসুন্দর বললেন, ডগ বার্কস। জনি একটা কুকুর। জনি বার্কস। তার মানে জনির ওটা ভাষা। জনি কিছু বলতে চায়। সারারাত জনি নিজের ভাষায় কথা বলে। আমরা মানুষ। ও-ভাষা বুঝি না বলেই বিরক্ত হই। ঘুম পণ্ড হচ্ছে বলে তুলকালাম করি। কিন্তু সে তো কিছু বলতেই চাইছে। কী বলতে চাইছে? জানো যগু, শেষ পর্যন্ত তাই নিয়ে রিসার্চ শুরু করলুম। রাতের পর রাত—মানে নাতু ফেরত দিয়ে আসার পর থেকে এই নিয়ে কাটাচ্ছি। ফোনেটিকস অনুসারে প্রত্যেকটি ধ্বনি নোট করছি। টেপরেকর্ডারে ধরে রাখছি। ফের তাই নিয়ে বসছি। ভেরি ভেরি ইণ্টারেস্টিং অ্যাণ্ড থ্রিলিং সাবজেক্ট। যেমন ধরো—ঘ্যাঃ! গঃ গব্‌র্‌র্‌...গউ! কিংবা ধরো আউ! ঘঁঃ।

সেই নেড়িটা একটু তফাতে বসে সত্যসুন্দরের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার চাপা একটা শব্দ করে মুখ তুলে বলল, ঘেউ-উ-উ!

সত্যসুন্দর লাফিয়ে উঠলেন। দেখছ? দেখছ? জবাব দিচ্ছে শুনছ? ঘঁঃ! গউ গউ গউ-উ-উ!

যজ্ঞেশ্বর গলা ঝেড়ে বললেন, আসি সতু।

সত্যসুন্দর কান করলেন না। নেড়িটার দিকে সহাস্যে এগিয়ে গেলেন যেন সম্ভাষণের ভঙ্গিতেই। যজ্ঞেশ্বরের কানে এল, সত্যসুন্দর এবার গলা ছেড়ে নেড়ির সঙ্গে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছেন।···

ঘরে ঢুকেই যজ্ঞেশ্বর বললেন, একগ্লাস জল।

গৃহিণী দীপ্তিময়ী জলের গ্লাস দিয়ে বললেন, সতুবাবু এসেছিলেন। ভদ্রলোক কীসব আবোল-তাবোল বলে গেলেন। একবর্ণ বুঝলুম না। হ্যাঁ গো, খোঁজ নিয়ে দেখো তো···আজকাল নেশা-টেশা ধরেছেন নাকি। সেইরকম লাগল।

যজ্ঞেশ্বর আস্তে বললেন, যাক গে বাবা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। খুব বেঁচে গেছি।

সন্দেহাকুল দৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে তাকতে তাকাতে দীপ্তিময়ী নিজের কাজে গেলেন।···

সোনার পিদিম

জনাই ছিল বারিক-ফ্যামিলির পুরাতন ভৃত্য। লম্বা-চওড়া কুচকুচে কালো এক মানুষ। যৌবনে তেমনি তেজী, সাহসী আর চঞ্চল প্রকৃতিরও। বাড়িতে ডাকাত পড়লে তার এসব গুণের পরিচয় পাওয়া যেত। এখন তার বয়স হয়েছে। তাই এমন অবস্থা।

জনাই কিছুদিন থেকে কেমন শান্ত আর উদাস হয়ে উঠেছিল। ঝিম ধরে বসে থাকত। পুরাতন ভৃত্য বলে তাকে দিয়ে খাটাখাটুনির কাজ আর বিশেষ করানো হত না বটে, কিন্তু ছোটখাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ—যেমন ন'বউমা যাবেন পিত্রালয়ে। তাঁকে স্টেশন অব্দি এসকর্ট করা, কিংবা, বুড়োবাবুর দোতলা থেকে নেমে রোয়াকে বসার ইচ্ছে হয়েছে, তাঁকে ধরে নামিয়ে আনা—এসবের দায়িত্ব দেওয়া হত।

জনাই আগের মতো প্রচণ্ড ধরনের খাওয়া-দাওয়াও কমিয়ে দিয়েছিল। তার পাঁজরার হাড় উঁকি দিচ্ছিল। রাতে নাকি ঘুমও বিশেষ হচ্ছিল না। জনাই নিজেই বলত সেকথা। কিন্তু জিগ্যেস করলে একটু হেসে বলত, 'ও কিছু না।'

পুরাতন ভৃত্য। সুতরাং তাকে জোর করে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারবাবু তাকে শুইয়ে বিস্তর টেপাটেপি এবং স্টেথিসকোপ প্রয়োগ ক'রে শেষে অনেক জেরা চালিয়েও কিছু আঁচ করতে পারলেন না। অগত্যা

খিদে ও ঘুমের টনিক লিখে দিলেন। জনাই ওষুধগুলো ঠিকমতো খাচ্ছে কিনা, সেদিকেও নজর রাখতে হল। কিন্তু জনাইয়ের উন্নতি দেখা গেল না।

তখন বাড়ির কর্তা বুড়োবাবু—মন্মথনাথ বারিক তাকে একদিন ডেকে বললেন, 'আসল কথাটা বলদিকি জনাই! তোর হয়েছেটা কী?'

জনাই একটু হেসে বলল, 'কিছুই তো হয়নি বুড়োবাবু!'

'হয়নি তো অমন মড়া হয়ে থাকিস কেন?'

'আজ্ঞে সেটাই তো বুঝতে পারছি নে।'

বুড়োবাবু গম্ভীর মুখে চাপা গলায় বললেন, 'আবার বিয়ে করবি? তাহলে বল্, পাত্রীর খোঁজ করি।'

জনাই তাঁর চেয়েও গম্ভীর হয়ে এবং জিভ কেটে বলল, 'ছি ছি! সে কী কথা বুড়োবাবু! আমার আর বিয়ের বয়স আছে?'

জনাইয়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন। কিন্তু চুলে পাক ধরেনি। কিছুদিন থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। দাড়িও কুচকুচে কালো। প্রথম যৌবনেই তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বারিকবাড়ির এক যুবতী চাকরানীর সঙ্গে। মেয়েটি সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। তারপর বুড়োবাবু তার আবার বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন। জনাইকে রাজি করাতে পারেননি।

জনাইয়ের এ কথা শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে বলব জনাই, তুই ঢঙ করছিস খামোকা।'

জনাই মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি কি করছি? করাচ্ছে আমাকে দিয়ে।'

মন্মথ অবাক হয়ে বললেন, 'করাচ্ছে মানে? কে করাচ্ছে?'

জনাই দুটো চোখের তারা ওপরের দিকে একবার ঠেলে তুলে তক্ষুণি নামিয়ে এনে বলল, 'সে।'

'সে?' মন্মথনাথ এবার হেসে ফেললেন, 'সে মানে—ভগবান তো?'

জনাই দৃষ্টিশূন্য চোখে তাকিয়ে বলল, 'কে জানে! সারাক্ষণ আমাকে বলছে, সাধু হয়ে যা জনাই!'

বুড়োবাবু আরও উচ্চহাস্যে করে বললেন, 'তোর মাথা! ওরে মুখ্যু, সাধু হওয়া কি সহজ কথা?' বলে একটা দোঁহাগোছের হিন্দি প্রবচন আওড়ালেন।

'জটা লোটা কম্বল
ইয়ে হ্যায় সাধুকা সম্বল॥

পেড় গঙ্গা ধুনি
ব্যাস্, হো যাও মহামুনি ॥'

বুড়োবাবু বললেন, 'বুঝলি কথাটা? সাধু হতে গেলে মাথায় চাই জটা, হাতে চাই একটা লোটা আর কাঁধে চাই একটা কম্বল। পেড় গঙ্গা ধুনি। চাই একটা গাছ। যে-সে গাছ নয়, কাছে গঙ্গা থাকা চাই। তারপর চাই গিয়ে ধুনি। ধুনি জ্বেলে বসে ধ্যান করতে হবে। পারবি?'

জনাই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে পারব।'

বুড়োবাবু রেগে গেলেন। 'পারবি? কিন্তু জটা? চিৎপুর থেকে কিনে আনবি বুঝি?'

জনাই নিজের চুলের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে বলল, 'দেখুন বুড়োবাবু, আমার জটা গজাচ্ছে!'

বুড়োবাবুর নজর কম। হাত বাড়িয়ে জনাইয়ের চুলের ভেতর সত্যিসত্যি কড়ে আঙুলের মতো একটুখানি জটা টের পেয়ে চমকে উঠলেন। তারপর গুম হয়ে বললেন, 'তোর যা ইচ্ছে।'...

এর কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা বারিকবাড়িতে চাপা উত্তেজনা এবং সাড়া পড়ে গেল। বুড়োবাবু নিজে থেকে চলাফেরা করতে পারেন না। টের পেয়ে চড়া গলায় ডাকাডাকি করে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। কতক্ষণ পরে এক নাতনী পুঁচকি এসে বলল, 'ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা! দেখবেন আসুন জনাইদা কী করছে!'

মন্মথনাথ আঁতকে উঠে বললেন, 'কী করছে রে?'

'উঠোনে বসে মাথা নাড়ছে খালি। আর কী সব বলছে। মা বলল, জনাই-দাকে ভূতে ধরেছে। তাই ওঝা ডাকতে গেল ছোটকাকু।'

মন্মথনাথ ব্যস্তভাবে বললেন, 'পুঁচকি, আমায় ধরদিকি। আমি নিচে যাব।'

পুঁচকি ঠাকুর্দাকে অনেক কষ্টে ধরে নিচে নামিয়ে আনল। বারান্দার মাথায় একটা একশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বালানো হয়েছে ইতিমধ্যে। একে-একে পাড়া-পড়শীরাও এসে জুটেছে। ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। উঠোনের মধ্যি-খানে বসে জনাই অনবরত মাথাটা দোলাচ্ছে আর কী যেন বলছে।

বুড়োকর্তাকে দেখে ভিড় দুপাশে সরে দাঁড়াল। কে একটা চেয়ার এনে দিল। বুড়োবাবু চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ কান পেতে জনাইয়ের কথা বোঝ-বার চেষ্টা করলেন। জনাইয়ের মুখটা মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে যাচ্ছে এবং চোখের

ঢেলা বেরিয়ে বিকট হয়ে যেন বুড়োবাবুকেই ভয় দেখানোর তাল করছে। একটু ভয় যে বুড়োবাবুর হচ্ছে না, তা নয়। কারণ এ মুহূর্তে আর ওই মাথানাড়া চোখওল্টানো লোকটাকে তাঁর চিরচেনা পুরাতন ভৃত্য বলে মনে হচ্ছে না। ধন্দ লাগছিল বুড়োবাবুর। কেউ যেন কবে থেকে জনাইয়ের মধ্যে ওত পেতে বসে ছিল, হঠাৎ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে এবং সে যেন বা মারাত্মক এক অতিপ্রাকৃত শক্তি। ক্রমশ বুড়োবাবুর ভয়টা বাড়তে থাকল।

জনাইয়ের মুখ দিয়ে যে কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বেরুচ্ছে, সেগুলো দুর্বোধ্য ঠেকল বুড়োবাবুর। শুধু একটা কথা যেন আঁচ করলেন। 'কালীপাট'। সব থাকতে কালীপাটের কথা কেন বলল বুঝতে পারছিলেন না মন্মথনাথ। ইশারায় মেজছেলে শিবনাথকে ডাকলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'শিবু, কালীপাট বলল শুনলি ?'

শিবনাথ প্রাইমারি টিচার। আবার বউয়ের নামে মডিফায়েড রেশনিংয়ের ডিলার। হাস্কিং মেশিন এবং জাঁতাকলও আছে। সে ব্যস্ত মানুষ। ব্যাপারটা তার কাছে বিরক্তিকর। বলল, 'ভূতের ভর উঠলে অমন কত কী বলে! ছেড়ে দিন না। গ্যাদা এসে ভূত ভাগিয়ে দেবে মারের চোটে।'

বুড়োবাবুর মনে খটকা লেগে রইল। ততক্ষণে জনাইয়ের মাথা নাড়া থেমেছে। সামনে ঝুঁকে মাথা লুটিয়ে প্রণামের ভঙ্গীতে বসে আছে। কিন্তু পা দুটো আসন করে গুটোনো রয়েছে। তার পিঠটা একটু একটু কাঁপছে। সেই সময় গ্যাদা বাউরি হাঁক ছেড়ে বাড়ি ঢুকল। 'ব্যোম! কালী-কালী-কালী-করালী! ব্যোম!'

শিব আর কালী দুই দেবদেবীই গ্যাদা বাউরির সহায়। বেঁটে হাড় জির-জিরে গড়নের লোক। বয়স জনাইয়ের কাছাকাছি। তার মাথায় জটা না গজালেও রুক্ষ বড় বড় এক মাথা চুলের অভাব নেই। সে বেশ সেজেগুজেই এসেছে। পরনে লাল এক টুকরো কাপড়। গলায় রীতিমতো রুদ্রাক্ষের মালা। দু-কানে তামার রিং। হাতে অষ্টধাতুর বালা। কপালে দগদগে লাল সিঁদুরের ছোপ। কাঁধে তেল চিটচিটে ছোট্ট একটা থলে ঝুলছে আর হাতে অষ্টাবক্র একটি ছড়ি।

জনাইয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে ফের এক হাঁক মারল, 'ব্যোম! কালী-কালী-কালী করালী! ব্যোম!' তারপর মুচকি হেসে ছড়িটি তুলে জনাইয়ের পিঠে ঠেকিয়ে বলল, 'এই আবাগীর পুত! এই গুখেকোর ব্যাটা! উঠে বস দিকিনি! দুটি কথাবার্তা কই। দেখি তুই কে! হুঁ ওঠ্! ওঠ্!'

আশ্চর্য, জনাই সটান মাথা তুলে বসে লাল চোখে তাকাল তার দিকে। তারপর দাঁত কড়মড় করতে থাকল। উঠোনের ভিড় সেই মূর্তি দেখে কাঠ হয়ে গেল। শুধু প্রাইমারি শিক্ষক শিবু চাপা গলায় বলল, 'ঢঙ!'

গ্যাঁদা জনাইকে তাচ্ছিল্য করে বলল, 'উঁ হুঁ হুঁ! ওতে গ্যাঁদা ভড়কাবে না বাছাধন! আরও কিছু অস্তর থাকে তো শান দাও!'

জনাই ভয়ংকর মূর্তি হয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'যা যা!'

গ্যাঁদার তড়পানি শুরু হল। সে 'তবে রে' বলে থলে থেকে একটা ধুপচি বের করল। ধুপচিতে প্রকাণ্ড একটা নারকেল ছোবড়ার গুটি রেখে বলল, 'বাবুমশাইরা! দেশলাই দিন!' শিবু তাকে দেশলাই দিল। সবাই অবাক চোখে গ্যাঁদার আয়োজন দেখতে থাকল। জনাই তেমনি লাল চোখে তাকিয়ে দাঁত কড়মড় করছে।

একটু তফাতে বসে গ্যাঁদা ওঝা ধুপচিতে ছোবড়াটা জেলে ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে নিল। তারপর কাগজের পুরিয়া থেকে লঙ্কাগুঁড়ো বের করে অট্টহাসি হেসে বলল, 'এই তোর মরণ বাণ! এখনও বলছি—যক্ষ-রক্ষ ভূতপ্রেত যেই হোস, শিগগির চলে যা!'

জনাইয়ের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। তখন গ্যাঁদা ধুপচির আগুনে লঙ্কা গুঁড়ো ছড়ালো। ধোঁয়া উঠতে থাকল। সে ধুপচিটা এগিয়ে নিয়ে গেল জনাইয়ের নাকের কাছে। অমনি জনাই মুখ ঘুরিয়ে গোঁ গোঁ করে বলল, 'জ্বালাতন করো না! পেলয় কাণ্ড হবে।'

গ্যাঁদা আবার অট্টহাসি হাসল। 'পেলয় কাণ্ড হবে! বলেছিস ভাল। কে তুই বল দিকিনি এবার?'

জনাই বিকৃত স্বরে বলল, 'বলব না যা!'

গ্যাঁদা ধুপচিতে লঙ্কা গুঁড়ো ফের ছড়িয়ে ওর মুখের কাছে নিয়ে গেল এবং বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে থাকল। ঝাঁঝালো ধোঁয়ার প্রকোপে ভিড়ের অনেকে খকখক করে কাসতে থাকল। অনেকে নাকমুখে হাত চাপা দিল। জনাই কাসতে কাসতে বলল, 'বলছি, বলছি।'

'হুঁ, বল।'

'আমি কালীপাটের সাধুবাবা।' বলে জনাই খকখক করে কাসতে লাগল।

ভিড় চমকে উঠল। গ্যাঁদাও একটু চমকাল। কিন্তু সেটা গোপন রাখতে গর্জন করে বলল, 'মিথ্যে।'

জনাই পাল্টা গর্জন করল। 'সত্যি? আমি কালীপাটের সাধুবাবা!'

গ্যাঁদা ধুপচি আর ছড়ি বাগিয়ে বলল, 'পেমাণ? পেমাণ দে!'

'পেমাণ আছে নালদীঘির ঈশেন কোণে।'

'কী পেমাণ?'

'পেমাণ আছে অশথ তলায় দ্যাখ গে যা।'

ইতিমধ্যে লোক-সংখ্যা বেড়ে গেছে। উঠোনে তিল ধারণের জায়গা নেই। ওপরের বারান্দা থেকে বুড়োকর্তার বড় ছেলে সুমথনাথ ভূতছাড়ানো দেখছিল। সে নেমে এল এতক্ষণে। তারপর মেজ শিবনাথকে বলল, 'এ যে হাট বসে গেল বাড়ির ভেতর শিবু! চুপচাপ কী দেখছিস!'

শিবু বলল, 'বললেই তো সবাই রাগ করবে। বরং তুমিই দেখ।'

সুমথনাথ রাশভারি বদরাগী মানুষ। তাকে সবাই ভয়-খাতির দুই-ই করে। হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলল, 'কী হচ্ছে কী সব? এটা বাড়ি, না খেলার ময়দান? রুনু, ওদের বল তো চলে যেতে।'

ছোট রুনু মস্তান টাইপ ছেলে। দু-দুবার হায়ারসেকেণ্ডারিতে ফেল করে এখন মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায়। তার অনেক বন্ধু। সে ভিড় হঠাতে শুরু করল। তার বন্ধুরাও নেমে পড়ল। এক মিনিটের মধ্যে উঠোন প্রায় ফাঁকা। শুধু বাড়ির বউঝি, আর রুনুর জনাতিনেক বন্ধু রয়ে গেল। সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

বুড়োকর্তা কান খাড়া করে গ্যাঁদা এবং জনাইয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। তাঁর ঘোলাটে চোখ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল। অশ্বত্থতলায় প্রমাণের ব্যাপারে গ্যাঁদাও চার্জ করে চলেছে অনবরত। কিন্তু জনাই তখন থেকে শুধু ওই এক রা। 'গিয়ে দ্যাখ গে যা!'

গ্যাঁদার লঙ্কাগুঁড়োর পরিমাণ অতি সামান্য। আগের দিন এক জায়গায় ভূতে ধরা মেয়ের পেছনে পঞ্চাশ গ্রাম গুঁড়ো লঙ্কার তিন ভাগই খরচ হয়েছিল। সমস্যা হচ্ছে, মেয়েরা লঙ্কার ঝাঁঝ সইতে অভ্যস্ত। লঙ্কার ফোড়নের ঝাঁঝ বারো মাস তিরিশ দিনই নাকে লাগছে। তাই তাদের ভূতের মোক্ষম ওষুধ হল পিটুনি। পুরুষমানুষদের জব্দ করতে এক চিলতে লঙ্কাগুঁড়োই যথেষ্ট। সেই ভেবে গ্যাঁদা বেশি করে নিয়ে আসেনি। জনাইকে যে ধরেছে, সে বড় ধূর্ত। লঙ্কার স্টক ফুরিয়ে গেছে। জনাইয়ের বার বার ওই হেঁয়ালির দরুন খাপ্পা হয়ে গ্যাঁদা ওঝা হাঁকল, 'বাড়িতে

গুঁড়ো লঙ্কা থাকলে একটুখানি দিন দিকিনি মশাই! এ ব্যাটা বড়ই ধুত্তমি কচ্ছে যে।'

বুড়োবাবু এতক্ষণে মুখ খুললেন। 'গ্যাঁদা, ওকে ভাল করে জিগ্যেস করো তো ও কে।'

গ্যাঁদা জনাইয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। 'অ্যাই! বুড়োকর্তা শুধুচ্ছেন, আরেকবার বল দিকিনি কে তুই? ঠিক-ঠিক বলবি। নৈলে লঙ্কা গুঁড়োর অডার দিয়েছি শুনলি তো?'

জনাই পরিষ্কার বলল, 'আমি কালীপাটের সাধুবাবা।'

বুড়োবাবু গলার ভেতর বলবেন, 'ওকে জিগ্যেস করো গ্যাঁদা ও যদি সত্যি কালীপাটের সাধুবাবা হয়, ও কালীপাট ছেড়ে চলে গিয়েছিল কেন?'

গ্যাঁদা ওঝা কথাটা রিপিট করল। জনাই দুলতে দুলতে বলল, 'আমি কোথাও যাইনি।'

বুড়োবাবু ঘুরে তিন ছেলের দিকে তাকালেন। মেজ এবং ন'ছেলে কলকাতায় থাকে। ছোট রুনু অবশ্য কালীপাটের সাধুবাবার কথা জানেও না। তার তখন জন্মও হয়নি। সুমথ এবং শিবুর মুখ গম্ভীর।

গ্যাঁদা হা হা করে হেসে বলল, 'যাসনি? তবে ছিলিস কোথায়?'

জনাই আবার মাথা দোলাতে শুরু করল। দোলাতে দোলাতে বলল, 'আমি কালীপাটে ছিলাম। কালীপাটে ছিলাম। আমাকে রাত দুপুরে মন্দিরের ভেতর...'

বুড়োকর্তা দ্রুত গ্যাঁদার হাতের ছড়িটা কেড়ে নিয়ে জনাইয়ের মাথায় মারলেন। সুমথ না ধরে ফেললে আরও কয়েক ঘা মারতেন। সুমথের শরীরে শক্তি আছে। ছড়িটা গ্যাঁদাকে ফিরিয়ে দিয়ে জনাইয়ের চুল দুহাতে খামচে ধরল। তারপর ওকে হ্যাঁচকা টানে ওঠাবার চেষ্টা করল।

তখন বুড়োকর্তা সংযত হয়ে বললেন, 'ছেড়ে দে সুমু।'

সুমথ রাগী মুখ করে সরে গেল। জনাই পড়ে গিয়েছিল। একটুও নড়াচড়া নেই আর। বুড়োকর্তা বললেন, 'গ্যাঁদা, বাড়ি যাও। শিবু, গ্যাঁদাকে সিধেপত্র দে। দুটো টাকাও দিস।'

জনাই উঠোনে পড়ে রইল। বুড়োকর্তা আবার দোতলায় গেলেন নাতনীর কাঁধে হাত রেখে। নিচের তলায় কিছুতেই থাকতে চান না। দম আটকে যায় নাকি।

এদিন অনেক রাত অব্দি জানালার পাশে বসে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলেন লালদীঘির দিকে। দীঘির পাড়ে কালীপাট। জঙ্গলের ভেতর জরাজীর্ণ এক মন্দির। বহু কাল থেকে সেখানে পুজোআচ্চা বন্ধ। অবয়বহীন পাথর-প্রতিমাকে পাশের গ্রামের চৌধুরিবাবু নিয়ে গিয়ে নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। সেও বিশ বছর আগের কথা। গত বছর বর্ষায় এক সাধুবাবা হঠাৎ পোড়ো কালীপাটে ডেরা পেতেছিলেন। ভক্ত জুটতে শুরু করেছিল। হঠাৎ এক দিন সাধুবাবাকে মন্দিরের ভেতরে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

জনাই সেই কথাটাই তো বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কেন রাগ হল এবং মেরে বসলেন ওকে, বুড়োবাবু বুঝতে পারছিলেন না। এজন্যই বলে রাগ চণ্ডাল। গ্যাঁদা বাউরি কী বুঝল কে জানে!

আর ওই কথাটারই বা মানে কী? লালদীঘির ঈশাণ কোনে অশ্বত্থ-গাছের তলায় 'প্রমাণ' আছে। কিসের প্রমাণ বলতে চাইছিল জনাই?

প্রথমে অতটা কান করেননি মন্মথনাথ। এখন অনেক রাতে কথাটা তাঁকে পেয়ে বসেছে।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, সত্যি কি জনাইয়ের আত্মাতে সাধুবাবার আত্মা ভর করেছিল? মন্মথনাথ এ রাতে ঘুমুতে পারলেন না।.....

সকালে জনাইয়ের খোঁজ নিলেন বুড়োবাবু।

জনাই আস্তে আস্তে এসে ঘরের মেঝেতে আগের মতো বসল। মুখটা গম্ভীর। বুড়োবাবু একটু হেসে চোখ নাচিয়ে বললেন, 'কী রে সাধুবাবা! কাল হঠাৎ কী হয়েছিল?'

জনাই বলল, 'আজ্ঞে কিছু বুঝতে পারছিনে। শরীরটা বড্ড ব্যথা করছে খালি।'

'মাথায় ব্যথাট্যথা নেই তো?'

জনাই একটু হাসল। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'হুঁ ঝিমঝিম করছে।'

বুড়োবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কাল সন্ধ্যাবেলায় তোর ভর উঠে-ছিল, জানিস?'

জনাই ঘাড় নাড়ল।

'জানিস?'

জনাই মুখ নামিয়ে বলল, 'বউমারা বললেন সব কথা। আমি তো বুঝতেই পারছিনে কেন ওসব কথা বললাম।'

বুড়োবাবু আস্তে বললেন, 'লালদীঘির ঈশান কোণে অশত্থতলার কথা বলছিলি।'

জনাই তাকাল নিষ্পলক চোখে।

'আর মন্দিরের ভেতর সাধুবাবা বলেই থেমে গেলি।' বলে বুড়োকর্তার বিবেকে বাধল। সংশোধন করে বললেন, 'আমি তোকে বলতে দিইনি যা বলতে যাচ্ছিলি।'

জনাই তেমনি তাকিয়ে রইল দৃষ্টিশূন্য চোখে।

বুড়োবাবু কেসে গলা ঝেড়ে বললেন, 'সাধুবাবা যখন মারা যায়, তখন কি তুই পাশে ছিলি?'

জনাই মাথা নেড়ে গলার ভেতর বলল, 'না।'

'তখন অনেক রাত। বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘ ডাকছিল। সাধুবাবার কাছে শাস্ত্র কথা শুনতে শুনতে আটকে পড়েছিলাম। হঠাৎ সাধুবাবা পেট চেপে ধরে ধড়ফড় করতে লাগল। তখন তুই কোথায়?'

জনাই বলল, 'ছাতি আর লণ্ঠন নিয়ে আপনাকে আনতে গেলাম।'

'সে তো অনেক পরে। তখন সাধুবাবা মারা পড়েছে।'

জনাই বলল, 'পুরনো কথা বলে লাভ কী বুড়োবাবু? ছেড়ে দিন।'

'তুই-ই তো কাল সবার সামনে পুরনো কথা তুললি জনাই!'

'বিশ্বাস করুন। আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না।'

'আমার গা ছুঁয়ে বল।'

জনাই দুহাতে বুড়োবাবুর পা ছুঁয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন।'

মন্মথনাথ নিশ্চিত হয়ে বললেন, 'বস্। কথা আছে।'

জনাই একটু চঞ্চল হয়ে বলল, 'এক জায়গায় বসে থাকতে আমার ভাল লাগছে না বুড়োবাবু। খালি বাইরের দিকে মন টানছে। আমাকে আর আটকে রাখবেন না।'

বুড়োকর্তা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর সাধু হওয়া আটকাতে আমি পারব না জনাই। তার ওপর কালীপাটের সাধুবাবা যখন তোকে পেয়ে বসেছে, তখন আর তোর উদ্ধার নেই। ঠিক আছে। যা তোর ইচ্ছে।'

জনাই বেরিয়ে গেল।.....

গ্যাদা বাউরির বউ নেত্যবালা নালদীঘির পাড়ে জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল। পূর্বপাড়ে কালীপাট—সেই পুরনো ভাঙাচোরা মন্দির। সাধুবাবার কুঁড়েঘরের মাটির দেয়াল খাড়া হয়ে আছে। কিন্তু খড়ের চাল বাঁশ সুদ্ধ গরিব-গুরবো কাঠকুড়ুনিরা উপড়ে নিয়ে গেছে খানিকটা করে। নেত্যবালা দেখল সেখানে কেউ বসে আছে।

জষ্টিমাসে কাঠফাটা রোদ্দুর। এখানে ঘন ছায়ায় শিরশির করে বাতাস বইছে। ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। পাখি ডাকছে। নিঝুম নিরিবিলি জায়গা। মন্দিরের পেছনে নিচের দিকটায় শ্মশান। দিন-দুপুরেও গা ছমছম করে এখানে এসে।

সাধুবাবার ন্যাড়া চালাঘরের মেঝেয় আসনপিঁড়ি হয়ে কে বসে আছে দেখে নেত্যবালা এক পা-এক পা করে ঝোপঝাড়ের ভেতর সেদিকে এগিয়ে গেল।

তারপর অবাক হয়ে দেখল, বারিক-বাড়ির সেই জনাই চোখ বুজে বসে আছে। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি গোঁফ। উস্কখুস্ক বড় বড় চুল। খালি গা। পরনে যেমন তেমন এক টুকরো ময়লা কাপড়। নেত্যবালা থ হয়ে গেল।

একটু পরে জনাইয়ের দুলুনি শুরু হল।

নেত্যবালার স্বামী ভূতের ওঝা। সে অন্তত ভূতের ভয় পায়-টায় না। মুখ টিপে হেসে বসে পড়ল নগ্ন মাটিতে। জনাইয়ের বুঝি ভর উঠেছে। বিড়বিড় করে কী বলছে ও। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল নেত্যবালা। প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে জনাইয়ের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বলল, 'আমি কালীপাটের সাধুবাবা। আমি কালীপাটের সাধুবাবা!'

নেত্যবালা চমকে উঠল। তার ভয় করতে লাগল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। সে ঢিপ করে প্রণাম করে ফেলল মাটিতে মাথা লুটিয়ে।

জনাইয়ের মুখ দিয়ে সাধুবাবার আত্মা বলল, 'তুই কে রে এখানে?'

'সাধুবাবা, আমি দুঃখিনী নেত্যবালা।'

'তুই এখানে কী করছিস?'

'পেটের জ্বালায় কাঠকুটো কুড়োতে এসেছি, সাধুবাবা!'

জনাই জোরে মাথা দোলাতে দোলাতে কথা বলছে। চোখের তারা সাদা হয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে। সে গোঁ গোঁ করে বলল, 'ঈশেন কোণায় বাজপড়া অশ্বত্থ-গাছ দেখতে পাচ্ছিস?'

নেত্যবালা অবাক হয়ে গেল। সে খানিকটা দূরে পেছনে শীর্ণ অশ্বত্থগাছটা দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, পাচ্ছি দেখতে ওই তো।'

'অশ্বত্থতলায় মাটি খুঁড়ে ছাখ গে যা।'

নেত্যবালা অবাক হয়ে বলল, 'ক্যানে বাবা? মাটি খুঁড়তে বলছেন ক্যানে গো?'

জনাইরূপী সাধুবাবা মাথা দোলাতে দোলাতে তাকে এবার অশ্লীল গাল দিতে শুরু করল। নেত্যবালা ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে কেটে পড়ল। তার শরীর ভয়ে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল।

বাড়ি ফিরে সে হাঁফাকে হাঁফাতে বলল, 'ওগো! উদিকে এক কাণ্ড দ্যাখ গে।'

গ্যাঁদা বাউরি দুপুরবেলা তাড়ি গিলে দাওয়ায় চিত হয়ে শুয়ে ছিল। নেশার ঘোরে বলল, 'যা যা! ইঁদারা ডিঙেয়ে চলে যা!'

নেশার ঘোরে কোনো মেয়ের ভূতকে হুকুম করছে। নেত্যবালার খামচানিতে শেষে লাল চোখ খুলে বলল, 'কী? ফাড়ছিস ক্যানে? হল কী তুর? শ্যালে ধরেছিল?'

নেত্যবালা কিল তুলে বলল, 'আবার ওই খারাপ কথা? হুঁশ করে শোনো—ইদিকে এক কাণ্ড।'

সে চাপা গলায় ঘটনাটা বর্ণনা করল। শুনতে শুনতে নেশা কেটে গেল গ্যাঁদার। উঠে বসল সে। ফিসফিস করে বলল, 'যেদিন পেথম ভর উঠেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে গেল—বুঝলি? সেদিনও ওই কথা বলেছিল। নালদীঘির ঈশেন কোণায় অশ্বত্থতলায় পেমাণ আছে। কিছু বুইতে পারিনি।'

নেত্যবালা বলল, 'বুইতে তো আমো পাল্লাম না। কী আছে বলো দিকিনি মাটির তলায়?'

'নিচ্চয় আছে কিছু।' গ্যাঁদা হাই তুলল। 'তবে কথাটো চেপে যা। এ বড় গুহ্য কথা মনে হচ্ছে।'...

সেদিন সন্ধ্যার পর ওরা দুজনে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নালদীঘির ঈশান কোণে যেই এসেছে, অমনি অশ্বত্থ গাছটার কাছ থেকে কেউ গর্জন করে বলল, 'কে রে?' কড়মড় করে মুণ্ডু চিবিয়ে খাব। পালা-শিগগির!'

ভড়কে গিয়ে গ্যাঁদা আর তার বউ পড়ি কী মরি করে পালিয়ে এল।...

জনাই কালীপাটে সাধুবাবার ভাঙা ডেরায় কদিন থেকে কাটাচ্ছে। বুড়ো বাবু খবরটা পাওয়ার পর ভাবনায় পড়েছিলেন। শেষে হুকুম দিলেন, 'ঠিক আছে। চাল তুলে ছাউনি করে দাও। থাক ওখানে। জিজ্ঞাসা করো, যদি খেতে চায়, তারও ব্যবস্থা হবে। যা যা বলবে, সব মেনে নিও।'

ভর যখন ওঠে না, তখন জনাই অন্য মানুষ। বারিক বাড়ির পুরাতন ভৃত্য ছিল। সেই ভাবটা কাটাতে পারে না। পাল্কী চেপে বুড়োবাবু একদিন কালী-পাটে এলে জনাই তাঁকে খাতির করে বসাল। এখন তার পুরোপুরি সাধুর চেহারা।

বড়োবাবু চারদিকে দেখতে দেখতে বললেন, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো জনাই?'

'আজ্ঞে না। খুব ভাল আছি।'

'তোর জন্য কমণ্ডলু আনতে বলেছি প্রমথকে কলকাতা থেকে।'

'কী দরকার?'

হাসলেন বুড়োকর্তা। 'আগে দর্শনধারী, পরে গুণ-বিচারি। ও জনাই, গেরুয়া বস্ত্র পরে থাকিস। পাঠিয়ে দেব।'

জনাই বিনীতভাবে বলল, 'একখানা রুদ্রাক্ষ মালার বড় ইচ্ছে, বুড়োবাবু।'

'আনিয়ে দেব'খন।' বুড়োকর্তা ফের একটু হাসলেন। 'স্বপাক খাচ্ছিস দেখছি।'

'আজ্ঞে।'

'খামোকা ঝামেলা করিস কেন? আগের সাধুবাবাকে নরুঠাকুর রান্না করে খাবার দিয়ে যেত। খেতেন।'

জনাই ঘাড় গোঁজ করে বলল, 'কী দরকার?'

'হ্যাঁ রে, সাধু যে হলি, শাস্ত্রকথা বলতে পারবি তো? জানিস কিছু?'

'কিছু কিছু জানি বৈকি।'

'বলিস কী? কোথায় শিখলি?'

'সাধুবাবার কাছে ওঠাবসা করতাম না বুড়োবাবু?'

'হুঁ, করতিস বটে।' একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, 'রাতে তোর ভয় করে না জনাই? শ্মশান জায়গা।'

জনাই হাসল। 'না। ভয় কিসের?'

'কিছু দেখতে-টেখতে পাস?'

'পাই বৈকি।'

চমকে উঠে বুড়োকর্তা বললেন, 'কী দেখতে পাস?'

'অশ্বত্থতলায় রোজ রাতে কেউ না কেউ আসে। তাড়া করি। পালিয়ে যায়।'

'কারা আসে?'

'চিনতে পারি না।'

'কেন আসে বল্‌দিকি?'

'অশ্বত্থতলার মাটি খুঁড়তেই হয়তো আসে।'

'কেন?'

জনাই গুম হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। বুড়োবাবু আবার বললেন, 'কী? বল্ কথাটা!'

জনাই আস্তে বলল, 'সেই সোনার পিদিমটা খুঁজতে আসে।'

বুড়োবাবু চমক গোপন করে নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই কেমন করে জানলি পিদিমের কথা? কে বলল তোকে? সাধুবাবা?'

জনাই মাথা দুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। আবার কে বলবে?'

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে হাঁসফাঁস করে মন্মথনাথ বললেন, 'এ্যাদ্দিন বলিস নি তো! তুই কী—কী নেমকহারাম জনাই! বাড়ির পুরনো লোক তুই। তোকে আপন ছাড়া পর ভাবিনি।'

জনাই মুখ নামিয়ে রইল।

বুড়োকর্তা গলার ভেতর বললেন, 'অশ্বত্থতলায় কোথাও পিদিম ছিল না। সাধুবাবা মরার পর তন্নতন্ন খুঁড়ে দেখা হয়েছিল। সাধুবাবা খামোকা মিথ্যে বলে হয়রান করেছিল, জনাই!'

জনাই একটু হাসল। 'না বুড়োবাবু। তিনি মিথ্যে বলার লোক ছিলেন না। আপনিও সেটা ভাল করে জানেন। মায়ের মন্দিরের ভেতর পিতিমার তলায় পিদিমটা ছিল। তা আজ্ঞে, পেকাণ্ড পিদিম! তিরিশ ভরির কম নয় কো।'

'কে বলল? সাধুবাবা?'

'আবার কে! পিতিমাকে চান করাবার ইচ্ছে হয়েছিল ওনার। তুলতে গিয়ে দ্যাখেন, তলায় ফোকর আর তার মধ্যিখানে পিদিম লুকোনো আছে।'

'তুই দেখেছিস সে-পিদিম?'

'হ্যাঁ।'

'দেখেছিস ?'

জনাই আবার বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে কোথায় গেল সে-পিদিম ?'

জনাই হাসল। 'তা বলব না আজ্ঞে।'

'জনাই, তুই আমাদের বাড়ির লোক। নেমকহারামী করছিস কিন্তু!'

'সাধুবাবা তো আপনাকে বলেছিল, অশ্বত্থতলায় লুকোনো আছে।' জনাই উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গীতে হাসতে লাগল। 'আপনি রেতের বেলা সুমুবাবুকে নিয়ে নিজেই খুঁড়তে এসেছিলেন। সাধুবাবা টের পেয়ে খাঁড়া নিয়ে তাড়া করল আপনাকে।'

বুড়োবাবু চাপা গলায় গজন করলেন, 'তখন তুই কোথায় ছিলি ?'

'কাছাকাছি লুকিয়ে মজা দেখছিলাম। আমাকে তো বিশ্বাস করে বলেন নি কোনো কথা।'

'বুঝতে পারছি। তুই-ই সাধুবাবার কানে তুলে দিতে গিয়েছিলি। তুই এমন গোয়েন্দা তা জানতাম না জনাই!'

'বুড়োবাবু! সাধুবাবার কাছে দীক্ষে নিয়েছিলাম। তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারি। বলুন ?'

'বোঝা যাচ্ছে, পিদিম কোথায় আছে তুই নিশ্চয় জানিস।'

'হুঁউ, জানি।'

'কোথায় আছে ?'

'আছে একখানে। দেবতার পিদিম। কেন লোভ করছেন বুড়োবাবু ? আপনার তো অভাব নেই সংসারে। বয়সও হয়েছে।'

বুড়োবাবু শেষ চেষ্টা করে বললেন, 'পিদিম দেবতার, তা কি জানি না জনাই ? আমার ইচ্ছে মায়ের পিদিম মায়ের মন্দিরেই প্রতিষ্ঠা করি। সেজন্যই তো বলছি তোকে। পিদিম কোথায় সরিয়ে রেখেছিস ?'

জনাই গোঁ ধরে বলল, 'সামনে অমাবস্যার দিন আমিই পিতিষ্ঠা করব। পাঁচগাঁয়ের লোক ডাকব। ধুমধাম করে পুজো হবে। আপনি দয়া করে আর ঝামেলা করবেন না বুড়োবাবু!'

বুড়োবাবু হাঁকলেন, 'কৈ রে পুঁচকি! কোথা গেলি।'

পুঁচকি মনের আনন্দে জঙ্গলে ঘুরছিল। সাড়া দিয়ে বলল, 'যাচ্ছি!'

কাহাররা পাল্কি নিয়ে একটু তফাতে অপেক্ষা করছিল।.....

সন্ধ্যায় ভর ওঠে জনাই সাধুর। ওই সময় আজকাল খুব ভিড় হয়। ঢাক-ঢোলও বাজে। পয়সা পড়ে। লোকে রোগ সারাতে আসে। জনাইয়ের মুখ দিয়ে সাধুবাবার আত্মা আশ্বাস দেন। লালদীঘির পাড়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এই ভিড়। রাত হয়ে যায় ভিড় ভাঙতে।

এদিন সন্ধ্যায় ভরের সময় জনাইরূপী সাধুবাবা এক আশ্চর্য কথা জানালেন। মায়ের পুজোর এক পিদিম ছিল—সোনার পিদিম। সেই পিদিম এখনও মাটির তলায় লুকোনো আছে। আগামী অমাবস্যার দিন তার উদ্ধার হবে।

পাশের গ্রামের চৌধুরিবাবুদের এক আত্মীয় রোগ সারাতে এসেছিলেন। তিনি খবর দিতে ছুটলেন। বোঝা গেল, মায়ের প্রতিমা আবার তাহলে এখানে ফিরিয়ে আনা হবে। সোনার পিদিমে মায়ের আরতি হবে। কালীপাটে আবার আগের দিনগুলি ফিরে আসবে।

অনেক রাতে জনাই তার চালা ঘরে শুয়ে আছে। শ্মশানের দিকে শিয়াল আজকাল আর ডাকে না। কিন্তু পেঁচার ডাক শোনা যায়। জনাই হঠাৎ চমকে উঠল।

তার বুকের ওপর কেউ চেপে বসে তার গলা টিপে ধরল জনাই গোঁ গোঁ করতে থাকল।

আততায়ী হিসহিস করে বলল, 'পিদিম কোথায় আছে?'

জমাইয়ের দম আটকে যাচ্ছিল। কোনো জবাব দিল না।

আততায়ী আবার গর্জে বলল, 'বল্। নৈলে মরবি।'

সাধুবাবার খাবারে বিষ দেওয়া হয়েছিল। সাধুবাবা মারা যায়। মানুষ কী! খানিকটা সোনার জন্য মানুষ এমন হতে পারে! জনাই সেই গভীর দুঃখ বুকে চেপে ঘুরেছে ক'মাস ধরে। এখন গলা টিপে মারা হচ্ছে তাকে। জনাই গোঁ গোঁ করে বলল, 'বলছি, বলছি।'

আততায়ী হাত আলগা করে বলল, 'বল্।'

জনাই চিনতে পারল। 'সুমুবাবু নাকি?'

'চোপ্ শালা! বল!'

'পিদিম আমার পিঠের তলায় পোঁতা আছে।'

জনাই টের পেল, আবার সুমথনাথের হিংস্র মুঠি তার গলায় আঁটো হচ্ছে। সে বিস্ময় প্রকাশের চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না……।

বুড়োকর্তা জেগেই ছিলেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে বললেন, 'কে ?'

'আমি সুমথ।'

'কী হল ?'

'শালা মিথ্যুক। জিনিসটা পাওয়া গেল না।'

বুড়োকর্তা ভাঙা গলায় বললেন, 'জনাই ?'

'সামলে দিয়েছি।'

বুড়োকর্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। 'বাড়ির পুরনো লোক ছিল জনাই! আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে রে সুমু!'

সুমথ ধমক দিল। 'থামুন! রাতদুপুরে আদিখ্যেতা করবেন না তো।'

বুড়োবাবুর কান্না থামল না। সাধুবাবারা বরাবর একজায়গায় থাকেন না। কাজেই জনাই সাধুও চলে গেছে রাতারাতি। হয়তো হিমালয়ের গুহায় তপস্যা করতেই গেছে। সামনে অমাবস্যায় ফিরে এসে মায়ের সোনার পিদিম উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করবে।

তবে সাধুদের ব্যাপার তো! ফিরে আসার কোনো গ্যারান্টি নেই। কালী-পাটের চালাঘর খালি পড়ে থাকবে। তারপর গরিব-গুরবো মেয়েরা আবার একটুকরো করে চালছপ্পর ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শাকসেদ্ধ করে খাবে। সোনার পিদিম লালদীঘির জলের তলায় পাঁকের ভেতর অপেক্ষা করবে। কতকাল পরে তাকে কেউ উদ্ধার করতেও পারে।…

উলটপুরাণ

বনানী ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে বলল, 'এই ছোড়দা। জানিস কী হয়েছে ?'

'কী রে ?' বলে আনমনে তাকালাম ওর দিকে। বনানী হাঁফাচ্ছে। মনে হল খুব দৌড়েই এসেছে কোত্থেকে। খুন খারাপি হতেও পারে। এবং যদি তাও হয়, সে নিশ্চয় একশো কিমি দূরে। কারণ হলফ করে বলতে পারি,

বনানীর নার্ভ তত কড়া নয়। চোর বা পকেটমার ধরা পড়তে দেখলে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে, 'তাহলে কী হবে রে?'

বনানী চাপা গলায় বলল, 'বেদানার বর গোমুখ্যু! একেবারে গোমুখ্যু। নিজের নাম সই করতেও পারে না!'

'কে বল্ তো?'

আমার প্রশ্ন শুনে বনানী তেতোমুখে বলল, 'ফের ন্যাকামি করছিস? বেদানাকে চিনিস নে? হরিদার মেয়ে!'

একটু হেসে বললাম, 'তাই বল। তো ওর বর মানে সেই নাদুস নুদুস চেহারার ভদ্রলোক তো? সেই যে সেদিন……'

বাধা দিয়ে বনানী বলল, 'ব্যাপারটা কীভাবে ধরা পড়ল জানিস? ওদের বাড়ি গিছলাম একটু আগে। আমি আর শর্বরী। শর্বরীর হাতে একটা বই ছিল। বেদানার সঙ্গে কথা বলছি আমরা, হঠাৎ ওর বর ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এল। তারপর জানিস?' বনানী খিলখিল করে হেসে উঠল।

'যা বাবা! হেসেই মারা পড়বি যে!'

বনানী হাসির মধ্যে বলল, 'তারপর দেখি কী বই ওটা বলে শর্বরীর বইটা নিয়ে পাতা ওল্টাল। হঠাৎ দেখি বইটা উল্টো করে ধরে আছে। গম্ভীর হয়ে পড়ার ভান করে বলল কী জানিস? খুব ভাল বই তো। দেবেন একবার পড়তে?'

'যাঃ! বানিয়ে বলছিস!'

'তোর দিব্যি। শর্বরীকে জিগ্যেস করিস।'

'তারপর?'

'আমরা তো হতভম্ভ। আড়চোখে দেখি, বেদানার মুখটা একেবারে লাল। আসছি বলে কেটে পড়ল কোথায়।'

'হুঁ!'

'তারপর?'

শর্বরী গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঠিক আছে। পরে দেব'খন। বলে বইটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বেরুল। আসলে হাসিতে ওর গা ঘুলোচ্ছিল। বাইরে গিয়ে দুজনে হাসতে হাসতে মারা পড়ি আর কী!'

'মারা পড়িস নি দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এবার বেরো। ডিসটার্ব করিস নে।'

বনানী রাগ করে বেরিয়ে গেল। যতটা শক খাব আশা করেছিল, খাইনি দেখে। আসলে ওদের এই আবিষ্কারের অনেক আগেই ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করে বসে আছি। বলিনি এই যা। হরিপদ মুখয্যের জামাই নিছক জামাই নয়, ঘরজামাই। কারণ মেয়ে মোটে একটাই এবং সারাজীবন মহকুমা আদালতে পেশকারী চাকরি করে পয়সাকড়ি ভালই কামিয়েছেন। শহরের এদিকটায় সম্প্রতি ঘরবাড়ি হয়েছে অনেকগুলো। কতকটা কলোনী টাইপ। ছড়ানো-ছিটোনো একটা করে একতলা বাড়ি। চারপাশে অঢেল জায়গা। হরিদাই সবার আগে এখানে বাড়ি করেছিলেন। তারপর বাড়ির শোভা বাড়ানোর মতো চমৎকার সুদর্শন একটি ঘরজামাইও ইদানীং যোগাড় করে ফেলেছেন। যেখানে যান, খালি জামাইয়ের গল্প। হরিদার ভাষায় 'তিনটে পেপারে এম.এ।'

লোকের চোখ দেখেই নাকি বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষিত-অশিক্ষত ধরা পড়ে, কোথায় পড়েছিলাম বলতে পারব না। কিন্তু আমার ধারণা এ এক ব্রহ্মজ্ঞান। কিছুদিন আগে হরিদার জামাই আমার এই ব্রহ্মজ্ঞানের পাল্লায় পড়েছিলেন, নেহাত হরিদার মুখ চেয়ে এবং চক্ষুলজ্জায় পড়ে বলিনি কাকেও।

আসছিলাম ট্রেনে। কামরায় তত কিছু ভিড় ছিল না। পথে একটা জংশন পড়ল। আমার উল্টোদিকে নাদুস নাদুস ফর্সা গ্রাম্য চেহারার এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি যে-কোনও সংখ্যা হতে পারে। এমন মাকুন্দে এবং বেবিফেস দেখে বয়সের ভুল হয়েই থাকে। তো হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হকারের কাছে একটা ইংরেজি কাগজ কিনলেন।

ইংরেজি কাগজ কেনাটা কিছু নয়। কিন্তু কাগজটা উল্টো করে ধরে পড়ার ভান করাটাই গণ্ডগোল বাধাল। আমি তো অবাক। আশে পাশে আরও কজনও দেখি মুখ এবং চোখ টিপে আড়ালে হাসাহাসি করছেন। একজন তো বলেই ফেললেন, 'কী দাদা? আজকের বড় খবর কী দেখছেন?'

ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেছে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। হুঁ ভদ্রলোকের চোখ দুটোই বলে দিচ্ছে বিদ্যেবুদ্ধির খবর। গাঁয়ের চাষাভুষোর চোখ একেবারে। চাউনিতে ভোঁতা ভাব। কেমন ধোঁয়াটে আর নির্বাক। মানুষের চোখও তো কথা বলে। স্বীকার করতেই হবে, এমন অবোধ অপোগণ্ড চোখ আমি চাক্ষুষ করিনি কদাচ।

ভাগ্যিস কামরায় তত ডেঁপো কেউ ছিল না। তেমন ছেলেছোকরাও না। থাকলে লোকটার প্রচুর খোয়ার হত। তবে যিনি খবর জিগ্যেস করছিলেন তিনিই কিছুটা খোঁচাতে ছাড়লেন না। আসলে আমরা ততক্ষণে মনে মনে ধরেই নিয়েছি এ ব্যাটা এক ঘুঘু। ঠকের রাজা। তাই ঠিক-ঠিকানা শেষে গন্তব্য এবং নামধাম নিয়ে পড়লেন প্রশ্নকারী। লোকটা আশ্চর্য বেহায়া বলতে হয়। হাসি মুখেই জানিয়ে দিল সে বনবিহারী চক্কোত্তি। যাচ্ছে বহরমপুর। না সেখানে বাড়ি নয়। শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরের নাম হরিপদ মুখুয্যে।

তখন আমি হইচই করে বলেছিলাম, 'কী মুশকিল! আপনি হরিদার জামাই!? তাই বলুন। গিছলেন কোথা? কলকাতা? একা কেন?'

হরিপদ মুখুয্যে এপাড়ায় সবার দাদা। বাবাকেও শুনেছি হরিদা বলতে। রোগা ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। তাঁর মেয়ে আমার বোন বনানীর সঙ্গে কলেজে পড়ত। ওকে দেখেছি। পাড়ার মেয়ে বলে নিশ্চয় অসংখ্যবার দেখেছি, কথাও বলে থাকব—কিন্তু কেন কে জানে, এই দেখা বা জানাশোনাটা তেমন স্পষ্ট নয়। বনানীর অনেক বন্ধুই তো আছে। তাদের প্রত্যেককে আমার যেমন চেনা নেই, জানা নেই—এও তেমনি। নিশ্চয় বেদানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

কিন্তু হরিদা যে বলে বেড়িয়েছেন তার জামাই তিনটে সাবজেক্টে এম এ? নিশ্চয় একটা গুরুতর ঠকবাজী হয়েছে। শুধু অবাক লাগে হরিদার মতো ঘোড়েল মানুষ কার পাল্লার পড়ে এই গণ্ডগোলটি করে ফেললেন? উল্টো করে ইংরেজি কাগজপড়া লোককে দেখলে যেন নিজের মধ্যে কী এক অহঙ্কার হুহু করে আঁচ দিতে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্য এই দু মাসেও হরিদা ব্যাপারটা টের পেলেন না? নিশ্চয় পেয়েছেন এবং মনে মনে পস্তে শেষটা চেপে গেছেন। ভাগ্যের মার বলে মেনে নিয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু কষ্ট হয় বেদানা বেচারীর কথা ভাবলে। পরে বনানীকে জিগ্যেস করেছিলাম, বেদানার প্রতিক্রিয়াটা কী? বনানী জিভ কেটে বলেছিল, 'ভ্যাট! কী যে বলিস? ওকে এসব জিগ্যেস করা যায় নাকি? বোঝাই তো যায় রে বাবা, বেচারী চুপ-চাপ মেনে নিয়েছে।'

বলেছিলাম, 'দেখবি একদিন বোমা ফাটবে। এ যুগটা যে অন্য রকম। মেয়েরা আজকাল কত কনসাস।'

বনানী চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'তুই মেয়েদের বুঝিস? মেলা বকিসনে তো।'

'ছাখ বনি, আগের যুগে মেয়েরা যে কোনও একটা পুরুষমানুষ পেলেই…'

'শাট আপ! আমি তোর ছাত্রী নই।' বলে বনানী কেটে পড়েছিল।

কিন্তু আমার মাথায় খালি বেদানার চিন্তা। শুধু গোমুখ্য হলেও কথা ছিল, লোকটা যে ঠক। উল্টোদিকে ইংরেজি কাগজ পড়ে! সুতরাং বোঝাই যায়, নিতান্ত নির্বোধ ঠক।…

আমাদের পাড়ার নিচেই গঙ্গা। এখন বারো মাস জলে ভরা। ফরাক্কা থেকে জল আসছে। বিকেলবেলা একবার গঙ্গার ধারে ঘুরে আসা ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস। সেদিন একটু দূর থেকে দেখি, হরিদার জামাই বনবিহারী লাটু-বাবুদের বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ওভাবে কারও বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকাটা সন্দেহজনক। লক্ষ্য রাখলাম। একটু পরে দেখি সে নীচু পাঁচিলের কাছে এগিয়ে গেল। তারপরই কী একটা ঘটল। সে সাঁৎ করে পিছিয়ে এসে হন হন করে চলতে শুরু করল। কুকুরের চেঁচামেচি শোনা গেল এতক্ষণে। হুঁ, কুকুরের ভয়েই পিঠটান দিয়েছে বনবিহারী।

কিন্তু এ যে দেখছি, শুধু ঠক নয়। চোরও বটে। চুরির মতলব না থাকলে এই সন্ধ্যাবেলা অমন করে কেউ পাঁচিল ডিঙোতে যায়? খুব খারাপই লাগল ব্যাপারটা।

কদিন পরে সত্যি একটা কেলেঙ্কারি ঘটে গেল। রাত তখন প্রায় দশটা-সওয়া দশটা হবে। আমাদের বাড়ির সামনে এক টুকরো সব্জি ক্ষেত আর ফুল বাগিচা আছে। সবুজ লনে পায়চারি করছি। সবে চাঁদটাও উঠেছে। হাল্কা জ্যোৎস্নায় নিঃঝুম পাড়াটা পাড়াগাঁয়ের মতোই দেখাচ্ছে। এখনও রাস্তায় আলো আসেনি। জ্যোৎস্নায় কারা দুজন রাস্তায় জাপটাজাপটি করছে। চোখে পড়তেই শিউরে উঠলাম। খুনোখুনি হচ্ছে নাকি? গেটের মাথায় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি। ঘন ছায়া পড়েছে। জীবনে কখনও স্বচক্ষে খুনো-খুনি দেখিনি এবং এখন সেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটছে ধরে নিয়েই কাঁপা কাঁপা শরীরে ওত পাতলাম।

তারপর অবাক হয়ে দেখি লড়াইটা বেধেছে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে। স্ত্রীলোকটি পুরুষটিকে জাপটে ধরে আছে। আর পুরুষটি

নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। কিমিদং? এতকাল এ পাড়ায় এসেছি, এমন নাটক তো দেখিনি। চাপা গলায় দুজনই হাঁসফাঁস করে সংলাপ আওড়াচ্ছে।

'আঃ! কী হচ্ছে। ছাড়ো না। এক্ষুনি আসছি বলছি! আঃ দেখ দেখ…'

'না। তুমি চলে যাচ্ছ। কেন? কী করেছি আমি?'

'কী মুশকিল। এক্ষুণি কে-দেখে ফেলবে যে! আহা, ছি ছি…'

'দেখুক। কেন তুমি এমন করে চলে যাবে? কেন? কেন?'

'মাইরি তোমার দিব্যি। চলে যাইনি, চলে যাইনি! একটু ঘুরে-টুরে আসি…'

'বেশ। তাহলে আমিও যাব।'

'পাগল? না—না। ছাড়ো! এক্ষুনি আসছি। মাইরি, তোমার দিব্যি। বিশ্বাস করো!'

তারপরই দেখলুম পুরুষটি ছিটকে বেরিয়ে গুলতির মতো বাঁই করে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্ত্রীলোকটি চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে উল্টো দিকে চলে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কী? রাস্তায় গিয়ে দেখলাম স্ত্রীলোকটি হন হন করে এগিয়ে যে বাড়ির গেট খুলে ঢুকল, সেটি হরিপদ মুখুয্যের 'মাধুরী ভিলা'। আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না! বেদানা ও বনবিহারী!

উল্টো করে ইংরেজি কাগজ পড়া নির্বোধ বদমাসটার মধ্যে হরিদার গ্রাজুয়েট মেয়ে কী এমন বস্তু পেল রে বাবা, যে রাতদুপুরে এমন করে রাস্তায় জাপটা-জাপটি করে গেল! এই উইমেনস লিবের যুগেও।

মিনিট পাঁচেক কেটেছে বড় জোর, হঠাৎ কোথায় একটা চেঁচামেচি হইহল্লা শোনা গেল। চমকে উঠলাম। তারপরই দেখলাম কে ঘোড়ার মতো দৌড়ে এসে আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল, 'এই! এই। প্লীজ ওদের বলবেন না ভাই! আমি এখানে লুকোচ্ছি।'

বলেই সে আমার জবাবের পরোয়া না করে গেটের ভেতর ঢুকে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। লোকেরা হইহই করে দৌড়ে আসছে। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাবার পর মনে পড়ল, লোকটা হরিদার জামাই বন-বিহারী। রাগ হল যত, তত করুণাও। গোমুখ্যু নির্বোধ আর কাকে বলে? এখন ধরিয়ে দিলে তো মেরে তক্তা বানাবে। খালি বেদানা আর হরিদার কথা ভেবে সামলে নিলাম। ডাকলাম, 'ও মশাই! ঝোপে পোকামাকড় থাকতে পারে। বেরিয়ে আসুন!'

বনবিহারী ফিসফিস করে বলল, 'লাইন ক্লিয়ার ?'

'হ্যাঁ। বেরিয়ে পড়ুন।'

'আপনার ঘরে কিছুক্ষণ থাকব। কেমন ?'

'আচ্ছা।'

আমার ঘরে ঢুকে বনবিহারী আগে নিজের পাজামা-পাঞ্জাবি খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর চমকানো গলায় বলল, 'দরজা বন্ধ করুন! দরজা বন্ধ করুন!'

দরজা বন্ধ করে হাসি ও ভর্ৎসনা মিশিয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কী ? লাটু-বাবুদের বাড়ি ঢুকেছিলেন বুঝি ?'

বনবিহারী আরামে বসে পকেটে হাত ভরল। মুখের নির্বোধ হাসি। সেই ঘোলাটে অবোধ চাউনি চোখে। পকেট থেকে প্রকাণ্ড দুটো পাকা পেয়ারা বের করে বলল, 'খাবেন নাকি ?' তারপর নিজে একটায় কামড় বসাল।

বললাম, 'পেয়ারা কোথায় পেলেন ?'

বনবিহারী চতুর হেসে চোখ নাচিয়ে বলল, 'ওই যে ওদের বাগানে। আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেতুম!'

'আপনি পেয়ারা চুরি করতে গিয়েছিলেন ? অ্যাঁ!'

বনবিহারী খিকখিক করে হাসতে লাগল। তাহলে লোকটা শুধু ঠক নয়, নির্বোধ তো বটেই, এবং সাক্ষাৎ পাগল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ফর্সা সুন্দর চেহারা, নাদুসনুদুস গড়ন, দেখতে রীতিমতো জেন্টলম্যান—অথচ···

হঠাৎ বনবিহারী আমার বইয়ের র‍্যাক থেকে বাঁ হাতে একটা বই টেনে নিল। তারপর তাচ্ছিল্য করে পাতা উল্টে পড়ার ভান করল। সেই উল্টো করে ধরা বই! আর চুপ করে থাকা গেল না। হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনার বুঝি উল্টো করে পড়া অভ্যেস ? সেদিনও ট্রেনে দেখছিলাম উল্টো করে ইংরেজি কাগজ পড়ছেন।'

বনবিহারী নির্বিকার মুখে মাথা নেড়ে বলল 'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'কিন্তু এতে কী লাভ ?'

'একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি অনেক দিন থেকে। আমার ধারণা উল্টো করে পড়লে প্রত্যেকটি হরফের এযাবৎ অজানা চরিত্র বেরিয়ে আসে।' বনবিহারী আমাকে আরও অবাক করে বলতে থাকল। 'জানেন তো ? সঙ্গীতে যেমন অশ্রুত ধ্বনি থাকে, এও তাই। বলে সে মার্লো পন্টি নামে মনোবিজ্ঞানীর বিখ্যাত বইটা থেকে উল্টোভাবে গড়গড় করে পড়ে চলল। আমি তখন আকাশ

থেকে পড়ে হাড়গোড়ভাঙা দ হয়ে গেছি। হুঁ, হরিপদ মুখুয্যে জামাইয়ের চোখ দেখে ঠকেছি। যাক্ গে। বললাম, 'কিন্তু পেয়ারা চুরিও কি কোনও এক্সপেরিমেণ্ট ?'

বনবিহারী লাজুক হেসে বলল, 'হুঁউ। ব্যাপারটা হল, রোজ গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই, আর পেয়ারাগুলো দেখে ভাবি, পেয়ারা তো বাজারে কেনা যায়। কিন্তু সে হল সিধে দিক। বরং উল্টো করে বই পড়ার মতো উল্টো দিকে—অর্থাৎ ...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'বুঝেছি। এবং কেন ঘরজামাই হয়েছেন, তাও বুঝে গেছি। পেয়ারাটাও উল্টো দিকে খাচ্ছেন।'

বনবিহারী বোঁটার দিকে পেয়ারাকে কামড়ে উল্টো করে ধরা বইটা গম্ভীর-ভাবে পড়তে পড়তে আনমনে বলল, 'এটাই বেদানাকে মশাই বোঝানো যায় না।'

বুঢ়াপীরের দরগাতলায়

বুঢ়াপীরের নির্জন দরগাতলায় একটা কাঠবেড়ালি শুকনো পাতা উল্টে সরু দাঁতে কুরকুর করে কী যেন চিবিয়ে খায়। গাছপালার মাথায় একটা ঘুঘু চুপিসাড়ে ডাকতে থাকে ঘুঘুনীকে। শুকনো ঘাসের মাথায় বসে এক ঘাসফড়িং কিড়কিড় করে গান গায়। একটা আনমনা ছোট্ট ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এইসব দেখে কিছু ভাবে। ভেবে কুল পায় না।

হঠাৎ পাশের পিচরাস্তায় চলে যায় মোটরগাড়ি। ছেলেটা তার পেছনে দৌড়ে যায় কিছু দূর। তারপর ফিরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, বাবা, ও বাবা! ই গন্দ কিসের—এত মিষ্টি গন্দ বাবা ?

ভাঙা দেউড়ির পাশ থেকে তার বাবা বলে, গন্দ ? পেঠরুলের—আবার কিসের ?

পেঠরুল কী বাবা ?

উ হল ইঞ্জিনের ত্যাল।

ইঞ্জিন কী বাবা ? বুলো না, ইঞ্জিন কী ? তখনও ছেলেটা নাক উঁচু করে পোড়া তেলের গন্ধ শোঁকে।

এইরকম একশো কথা সারাক্ষণ। ছেলেটা আবার হঠাৎ ছুটে যায় গাছ-গাছালির ভেতরে। সুর ধরে এতোলবেতোল কী সব আওড়ায়। নিচু ডাল থেকে ঝাঁপ দিয়ে ঝালঝুল্লো খেলতে খেলতে চেঁচায়, হো হো ধত্তে পাল্লে না! হো হো ধত্তে পালে না!

তার বাবা হাঁক দেয়, কার সঙ্গে খেলছিস বাছা? জুড়িটা কে তুর শুনি? সে একটু হেসে ফের বলে, মনিষ্যি না বাউর?

বাউর মানে কুবাতাস। বুঢ়াপীরের দরগাতলায় এইসব কুবাতাস এসে ঘুরঘুর করে। মৃত বুঢ়াপীর টের পেলে তাড়া করেন। গাছগাছালি জুড়ে তখন প্রচণ্ড তোলপাড়। ছেলেটা এইসব গল্প শুনেও ভয় পায় না। আপনমনে খেলে বেড়ায়। কখনও ছুটে এসে বাপকে সাধে, সেই ছড়াটা বুলো না বাবা! তিন-দিনকার গাজোলে…

তার বাবা অন্ধ বেন্দাবন হাত পেতে বসে আছে দরগাতলায় দিনমান। পীরবাবার আর মাহাত্ম্য নেই। কদাচিৎ ভক্তজন এসে সিন্নিটা দেয়। লোবান-কাঠিটা জ্বালে। বেন্দাবন ধরা গলায় বলে, বুঢ়াপীরের দয়া লাগে অন্ধকে একটা-দুটো পয়সা। ভিক্ষে চাইতে এখনও বড় লজ্জা। বেরৎ খাটিয়ে মানুষ ছিল সে। কী করে চোখ দুটো গেল। চুপি চুপি হাত পাততে আসে গাঁয়ের বাইরে এই দরগাতলায়।

বুলো না বাবা—তিনদিনকার গাজোলে…ছেলেটা বাপের পিঠ ঠেস দিয়ে সরু আঙুলে খামচায়।

বেন্দাবন আওড়ায়, 'তিনদিনকার গাজোলে
মহিষ মরে হেজোলে
টিকটিকিটা বাতায়
উকুন মরে মাথায়…'

পিটিরপিটির চেয়ে ছেঁড়াপেণ্টুলপরা ছেলে বলে, মরে ক্যানে বাবা?

বেন্দাবন বুঝিয়ে দেয়। গাজোল হল টানা বিষ্টি। টোপাচ্ছে আর টোপাচ্ছে। গেরস্থর ধান শুকোয় না। গরু-বাছুর চরতে পায় না। পাখপাখালি নিরাচ্চয়। শ্বাস ছেড়ে বেন্দাবন বলে, বেষম খিদে। খিদেয় শুকিয়ে মরে যায় সবাই।

সেই ছড়াটা বুলো না বাবা! উকুন বিনে…

বেন্দাবন একটু হেসে বলে 'উকুন বিনেবক বিয়াকুল গাছন্যাড়া টিয়া কানা।' ইটা ধন্দ।

ধন্দ কী বাবা ?

বেন্দাবন নড়ি তুলে কপট তাড়া করে। ছেলেটা দুধের দাঁতে হাসতে হাসতে পালিয়ে যায়। কতক্ষণ পরে বাবার সঙ্গে ফক্কুড়ি করতে আসে। পিঠের দিকে পায়ের শব্দ তোলে। মুখে মিটিরমিটির হাসি। অন্ধ বেন্দাবন হাত বাড়িয়ে বলে, বুঢ়াপীরের দয়া লাগে ···

অমনি ছেলেটা খিটখিট করে হেসে ওঠে। বাবার চোখের সামনে আঙুল নেড়ে বলে, বলোদিকিনি কটা ?

এবার বেন্দাবন সত্যি রেগে যায়। নড়ি তুলে চেঁচায়, চোপ শালার ছেলে ! অন্ধর সঙ্গে ফক্কুড়ি ?

ছেলেটা বুঝতে পারে এটা ঠিক হয় নি। দৌড়ে চলে যায় গাছপালার ভেতর। কতক্ষণ আর তার সাড়াশব্দ নেই। অভিমানে বেন্দাবন চুপ করে বসে থাকে। সে তো জন্মোকাল থেকে কানা নয়। গত বছরও মাঠে মুনিশ খেটেছে। ফসল পাহারার কাজও করেছে। রাতবিরেতে এই বিশাল মাঠের একদিক থেকে অন্যদিকে ভেসে বেড়িয়েছে তার 'জাগালি'হাঁক—হেই হো-ও-ও ! সেই শক্ত মানুষ—এখন বুঢ়াপীরের দরগাতলায় হাত পেতে বসে থাকতে বড় লজ্জা করে।

ছেলেটার সাড়া না পেয়ে তার বুক ধড়াস করে ওঠে। রাগ করে গাঁয়ে চলে গেল নাকি ? তাহলে দিনশেষে কে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বাড়িতে ? ওর মায়ের যা মেজাজ, যত মেজাজ, তত নিদয়া। বলবে, মিনসে মরুক। শেষ-মেশ বড় ছেলেটা যদি গেরস্থবাড়ি থেকে ফেরে, অন্ধ বাবাকে দরগাতলা থেকে নিয়ে যেতে রাত হয়ে যাবে। আর সারাপথ একশো খিস্তি।

হাতের নড়ি এই ছেলেটা মেজ। বাকি ছেলেটা ও মেয়েটার হাঁটি-হাঁটি অবস্থা। তাদের সঙ্গে নিয়ে সুখেশ্বরী সারাদিন বিলে-খালে ঘোরে।

বেন্দাবন উদ্বেগে আনচান করে। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করে ছেলেটার গতিবিধি। নিঝুম নিরিবিলি দরগাতলায় পাখপাখালি আর ঝিঁঝিপোকা ডাকে। চৈত্রের দমকা হাওয়া শব্দ করে। তারপর শুনতে পায়, কাঠবেড়ালির সঙ্গে কথা বলছে তার হাতের নড়ি ছেলেটা। বেন্দাবন একটু হাসে। গলা চড়িয়ে ডাক দেয়, নেম্মল রে ! বাপ নেম্মলা !

দুপুর গড়িয়ে গেলে সে পা টিপেটিপে বাবার কাছে ফেরে। তার গায়ের গন্ধ টের পায় বেন্দাবন। মিষ্টি হেসে ডাকে, আয় !

ছেলেটা আস্তে বলে, খিদে।

বেন্দাবন হাত তুলে বিলের দিকটা আন্দাজ করে বলে, ছাখধিনি বাছা, তুর মাজননাকে দেখা যায় নাকি? তার মানে, সুখেশ্বরী খালবিল ঢুঁড়ে যে খাদ্য আনবে, তার প্রত্যাশা। এই বুঢ়াপীরেব দরগার আর সে মাহাত্ম্য নেই। কদাচিৎ দূরের কোনো ভক্ত দৈবাৎ এসে পড়ে। কিছু পয়সা পেলে বেন্দাবন ছেলেকে গাঁযে পাঠায়। বামুনবুড়ি চিড়েমুড়িটা বেচে। কিনে এনে দুজনে খায়। পাশের পুকুরে জলটাও ভাল।

ছেলেব জবাব না পেয়ে বেন্দাবন তাকে ভোলাতে গুনগুন করে ছড়া বলে,

'হেঙ্কাকলমি লকলক করে
রাজার ছেলে পংখি মারে
মারুক পংখি শুকাক বিল
সোনার কৌটো রুপোর খিল··

ছেলেটা খিদে ভুলে যায়। পাখির গলায় বলে, সেই ছড়াটা বুলো না বাবা। 'ধুল্লোউড়িব মাঠে বে ভাই ওদ ঝংঝং করে/পানের সখাব সঙ্গে দেখা বেলা দুপ্পহবে।'

বেন্দাবন সুর ধরে ধুলোউড়ির মাঠের পাঁচালি গাইতে থাকে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে চলে যেতে থাকে একটা-করে দীর্ঘ-দীর্ঘ দিন। বুঢ়াপীরের জনহীন দরগাতলায় দুটি মানুষ খেলা করে এবং খেলা করে।···

এক মেঘলা দিনের দুপুরে এল টাপরদেওয়া গরুর গাড়ি। গাড়ির সামনে গাড়োয়ান আর তার পিছনে টুপিপরা এক হাজিসায়েব। টাপরের ভেতর তাঁর বিবিজান। আওয়াজ পেয়ে অন্ধ বেন্দাবন বলি বলে, পীরবাবার দযা লাগে, অন্ধকে একটা দুটো পয়সা। গাড়োয়ান গাড়ির জোয়াল থেকে বলদ দুটো খুলে চাকাব সঙ্গে বাঁধে। হাজিসাহেব দরগাতলার দিকে এগিয়ে যান। বিবিজান টাপরের পর্দা সরিয়ে বেন্দাবনকে দেখেই একটু শরমে পড়েছেন। গাড়োয়ান বলদ দুটোকে জাবনা দিতে দিতে বলে, অন্ধ মানুষ মাজান। আব কেউ কোথা নেই। আপুনি দরগায় যান। নিশ্চিন্তে চলে যান।

খাঁচার পাখির মতো বাইরের দুনিয়ায় নড়বড়ে পায়ে হেঁটে বিবিজান অন্ধ বেন্দাবনের অনেকটা তফাত দিয়ে পীরবাবার কবরে পৌছান। তাঁর হাতে

একগোছা লোবানকাঠি। একঠোঙা বাতাসা মুড়কি আর পাটালি। সাতটা ক্ষুদে মাটির ঘোড়া।

তখন হাজিসায়েব দরগার পেছনে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে এনামেলের বদনা। দুপুরের 'জোহর' নমাজের সময় হয়েছে। কিন্তু ঘাটের নিচে ঘন থকথকে কাদা। ওজুর জন্য একবদনা জল পাওয়াই সমস্যা! গাড়োয়ানকে ডাকবেন বলে ঘুরেই দেখতে পান বেন্দাবনের ছেলেটাকে।

একটা কাঠবেড়ালি শুকনো পাতা সরিয়ে সরু দাঁতে কুরকুর করে কিছু খাচ্ছে। ছেলেটা কোমরে দুহাত রেখে নিষ্পলক চোখে তাই দেখছে। গাছের ফাঁক দিয়ে উপচে এসে পড়েছে মেঘে ঢাকা সূর্যের আশ্চর্য এক আলো তার শরীরে। এই নিরিবিলি দরগাতলায় শান্ত গম্ভীর এক বালককে দেখতে দেখতে হাজিসায়েব শ্বাস ছেড়ে বলেন, হে পরোয়ারদিগার!

আর এই কথায় ছেলেটার চমক ভাঙে। লম্বাচওড়া জামা ও টুপিপরা সাদা দাড়িওলা মানুষটির দিকে সে অবাক হয়ে তাকায়।

হাজিসায়েব একটু হেসে হাত তুলে ডাকেন, এই বাবা ছেলে! শোনোদিকিনি একটুকুন! ছেলেটা ইতস্তত করছে দেখে ফের বলেন, ডর কিসের বাবা? কাছে এস। এক বদনা পানি তুলে দাওদিকিনি—বড্ড পাঁক।

বেন্দাবনের ছেলে তবু তাকিয়ে থাকে। এমন মানুষ সে কখনও দেখেনি।

হাজিসায়েব তাঁর বিশাল জামার পকেট থেকে একটা চকচকে মুদ্রা বের করে বলেন, বখশিশ পাবি বাছা! দে দিকিনি একবদনা পানি এনে। নমাজের অক্ত চলে গেল বুঝি।

পয়সার লোভে ছেলেটা আড়ষ্ট পায়ে কাছে যায়। তারপর বদনাটা নিয়ে ঘাটে নামে। সে অনেকখানি কাদা ভেঙে জলে নামে। হাজিসায়েব পাড়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ করেন, আরও তফাতে মানিক! আর একটুকুন তফাতে যাও। হুঁ—এবারে বদনা ডোবাও। হুঁ—ব্যস, ব্যস! তিনি খিকখিক করে হাসেন। কমজোর বাচ্চা। ওইটুকু বদনা বইতেই জান নিকলে যাচ্ছে। বলেন, দেখিস বাপ! গিরে যায় না পানিটুকু! হুঁশিয়ার!

টলতে টলতে পাঁক পেরোয় বেন্দাবনের ছেলে। হাজিসায়েব তার হাত থেকে বদনাটা নিয়ে বলেন, শরীলে একরত্তি জোর নেই বাছা! হুঁ—দেখেই মালুম হচ্ছে বটে।

দশপয়সাটা পেয়েও ছেলেটা চলে যায় না। মানুষটার কথাবার্তা হাবভাব খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। হাজিসায়েব হাঁটু দুমড়ে বসে ওজু করেন। তারপর টুপিটা খুলে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফের মাথায় পরেন। তারপর কয়েকপা এগিয়ে শুকনো ঘাসের ওপর নমাজে দাঁড়ান।

যতক্ষণ না নমাজ শেষ হয়, ছেলেটা পিটিরপিটির তাকিয়ে থাকে। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখে, মানুষটা মুখের সামনে দুটো হাত তুলে বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। এমন ঘটনা বেন্দাবনের ছেলে কখনও দেখেনি। এই দরগাতলার ভক্তদের মানতকরা সে দেখেছে। কিন্তু তাঁরা কেউ কেঁদেছিল বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া এই মানুষটা দরগার ঢিবিটার সামনে কান্নাকাটি করলেও কথা ছিল।

তার হাসি পায়। হাজিসায়েব নমাজ শেষ করে পা বাড়ালে সে মিটিরমিটির হেসে সাহস করে বলে, কাঁদছ ক্যানে গো লোকটা?

হাজিসায়েব অমায়িক মানুষ। দুঃখের মধ্যেও একটু হেসে ফেলেন নাদান বাচ্চার প্রশ্ন শুনে। বলেন, কাঁদছি সোনা! দুনিয়ায় যার দুঃখুকষ্ট আছে, সেই কাঁদে। তা হ্যাঁ রে বাছা, তুই ইখেনে কী করছিস?

বেন্দাবনের ছেলে বলে, কিছু লয়।

হাজিসায়েব হো হো করে হাসেন।...খুব পাকা ছেলে! বলে কিছু লয়' কথা থাকিস তুই?

হুই গাঁয়ে।

নাম কী তোর?

নেম্মল।

ও। হাজিসায়েব একটু হকচকিয়ে যান। হিঁদুর ছেলের হাতের পানিতে ওজু করেছেন! খোদাতালার গোঁসা হবে না তো? আনমনে বলেন, নেম্মল। তা হ্যাঁ বাপ নেম্মল, বাড়িতে আর কে আছে তোর?

ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে তাঁর। দরগার দিকে হাঁটতে থাকেন। ছেলেটাও একটু তফাত রেখে হাঁটে। বলে, উই যে আমার বাব'।

ওই অন্ধ তোর বাপ?

হুঁ।

পীরের কবরে লোবানকাঠি ধরাতে হিমসিম খাচ্ছেন বিবিজান। হাজিসায়েব হস্তদন্ত এগিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। মেঘলা গুমোট বিকেলে হাওয়া বইছে

না। লোবানকাঠিগুলো জ্বলে উঠেছে। ঝাঁঝাল মিঠে গন্ধ ছড়াচ্ছে। বেন্দাবনের ছেলে তাকিয়ে আছে। এক ঠোঙা মাহুতে মিষ্টান্ন দেখে তার দুহাত তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে।

হাজিসায়েব আর বিবিজান এবার টুটাফাটা কবরের উত্তরশিয়রে ঠোঙাটা আর ঘোড়াগুলো রেখে দুহাত তুলে প্রার্থনা করেন। তারপর ছেলেটাকে নিরাশ করে ঠোঙাটা তুলে নেন। হাজিসায়েব বলেন, ওই অন্ধ আর তার ব্যাটার হাতে একটুকুন দেওয়া দরকার। ফিরে যেয়ে এগুলান বিলোতে হবে। কৈ, ওঠ দিকিনি এবারে। খাওয়াদাওয়াটা চুকিয়ে ফেলি।

দুঃখে অভিমানে ছেলেটা বাবার কাছে ছুটে গেছে তখন। ফিসফিসিয়ে ঘটনাটা বর্ণনা করতে থাকে।

বিবিজান গাড়ির সামনে বসেছেন। বলদদুটো তখনও জাবনা খাচ্ছে। গাড়োয়ান বালতি হাতে পুকুরে জল আনতে গেল। হাজিসায়েব বেন্দাবনের কাছে গিয়ে বলেন, কৈ! ধরোদিকিনি সিন্নিটুকুন।

বেন্দাবন সেটুকু নিয়ে মাথায় ঠেকায়। একটু হেসে বলে, ছেলের কাছে শুনে মোনে লয় কী, আপুনি হাজিসায়েব বটেন।

ঠিক ধরেছ মানিক। হাজিসায়েব ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলেন।···তুমার ব্যাটাটা খুব বুদ্ধিমান। এই একটাই বুঝি?

আজ্ঞে না। অকারণ আবেগে আপ্লুত বেন্দাবন বলে, আরও তিনটে আছে হাজিসায়েব!

হাজিসায়েব তার হাতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, তুমার হাতখানা বাপু খাটিয়ে মানুষের। আহা, অন্ধ হয়ে তুমার ই কী অবস্থা ছাখোদিকিনি! খোদা কার ওপর কখন নারাজ হন।

বেন্দাবন দুঃখে বলে, ভিখ চাইতে লজ্জা করে হাজিসায়েব! চোখ দুটো থাকলে খেটে খেতাম!

খাটুনিরও অভাব দেশে। হাজিসায়েব বলেন, বছরটা একরকম বর্ষাই না তেমন। আমাদের উদিকে ক্যানাল বলে তাও দুটি ঘরে উঠেছে। তুমাদের ইদিকে দেখি জলা মাঠ।

শ্বাস ফেলে বেন্দাবন বলে, তাইলেই বুঝুন হাজিসায়েব!

হাজিসায়েব হঠাৎ ওর ছেলের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসেন।···ওই

যাঃ! তোকে সিন্নি দিলাম কৈ বাপ? লে লে, তুইও লে। কৈ, হাত পাতদিকিনি! কী হল মানিক! শরম ক্যানে এত?

ছেলেটা হাত পাতে না টের পায় বেন্দাবন। জোর করে তার হাত টেনে আনে। অগত্যা ছোট্ট হাতে সে একটা বাতাসা, একটু মুড়কি আর আধখানি পাটালি নেয়। হাজিসায়েব ফের বেন্দাবনের হাতের তারিফ করেন। ...ছ্যাখো দিকিনি ই কী অবস্থা মানুষের! খাটিয়ে পুরুষের হাত। শুধু দুটি চোখের অভাবে সেই হাত ভিখ মাঙে। না জানি কত ভুঁইক্ষেত ওই হাতে আবাদ করেছ সোনা! কত বাঁজা মাটির ভোল ফিরিয়েছ। খোদার দুনিয়াটাকে ওই হাতখানি দিয়ে যত্ন করে সাজিয়েছে। সেই হাত! হাজি-সায়েব জিব চুকচুক করে। দুঃখ প্রকাশ করেন। ফের শত মুখে প্রশংসা করেন দুই রূপকার হাতের। আর সেই প্রশংসায় বেন্দাবন আবেগে ছটফট করে। এমন কথা তাকে কেউ এপর্যন্ত বলে নি। ধরা গলায় বলে, হাজিসায়েবের বাড়ি কতি গো? বড় ভালমানুষ বটে আপুনি মাশাই।

হাজিসায়েব বলেন, বাড়ি সেই রূপপুর-কাঁকসে।

নাম শুনেছি বটে। বড় সুখী গাঁ আপনাদের। বেন্দাবন একটু ইতস্তত করে বলে, একটা কথা বলি—ভয়ে কী লির্ভয়ে?

বলো মানিক! হাজিসায়েব আশ্বস্ত করেন। মানুষ মানুষকে কথা বলবে, তার ভয় কিসের?

কিসের মানত দিলেন, জানতে ইচ্ছে করে।

হাজিসায়েব শুকনো হাসেন। ...সেকথা পরে। তুমার নাম কী বাছা?

আজ্ঞে, বেন্দাবন।

বেন্দাবন? হাজিসায়েব আবার হাসেন। তো বেন্দাবন, খোদা-ভগমানের কাণ্ডখানা ছ্যাখো! ওই তুমার শরীল। এই আমার শরীল। শরীলে-শরীলে কত তফাত!

ক্যানে হাজিসায়েব?

লয়? হাজিসায়েব আরও জোরে হাসেন। তুমি চারজনার বাপ। আর আমার ঘরে পুষতে পালতে একটুনও নাই। অত জমিজিরেত, তিনখানা হাল ঘরে। নসিবটা ছ্যাখো বেন্দাবন!

বেন্দাবন আস্তে বলে, বুঝিছি। দয়া হবে পীরবাবার।

দেখি। মোন মানে না বলে তো এলাম। ...দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাজিসায়েব উঠে যান গাড়ির কাছে।

বেন্দাবন ফিসফিস করে ছেলেকে বলে, বড় ভালমানুষ। যা না, পয়সা চাইলে দেবে। দেরি করিসনে।

ছেলেটা কুড়মুড় করে সিন্নি চিবোয়। বলে, আমাকে দিয়েছে। তুমি চাইলে না ক্যান?

লজ্জা হল। অতক্ষণ দুঃখের কথা বললে লোকটা।

ছেলেটা হঠাৎ বলে, উর অনেক পয়সা বাবা?

হুঁ, বুঝলি নে? বেন্দাবন চুপিচুপি বলে। ঘরে ছেলেপুলে নাই, খাওয়াবে কাকে? তুই যা না আবার। চাইলেই দেবে।...

গাড়ির সামনে বসে বিবিজান এনামেলের পাত্র খুলেছেন। পরটা হালুয়া এনেছেন সঙ্গে। মানত করে এখন খাওয়া-দাওয়া হবে। উপোসে পেট জ্বলছে দুটো মানুষের। পরটা ছিঁড়ে বিবিজান বেন্দাবনের ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন।...বড় সোন্দর ছেলেটা গো! ওই কানা লোকটার ব্যাটা বুঝি?

হুঁ। আবার কার?

এট্টু ডাকো না ছেলেটাকে।

ক্যানে?

দানাপানি খায়নি বুঝি। কেমন কষ্ট লাগে দেখে' ডাকো না গো ছেলেটাকে!

হাজিসায়েব টের পান, বিবিজানেরও মনে ধরেছে ছেলেটাকে। হাত তুলে ডাক দেন, হেই বাপ! কী যেন নামটা তোর—হুঁ ওরে নেম্মল! ইদিকে আয় সোনা!

বিবিজান বলে, ছেলেটার বড় শরম! আহা!

বেন্দাবন তার ছেলের পাঁজরে খামচি কেটে ধমকায়। যা শিগগিরি। পয়সা পাবি। খালি হাঁকোৎপনা তুর!

ছেলেটা এক পা দুপা করে এগিয়ে যায়। বিবিজান মিষ্টি হেসে বলেন, কাছে আয় বাপু।

হাজিসায়েব গলা চড়িয়ে অন্ধের উদ্দেশে বলেন, বেন্দাবন! খোদা-ভগমানের দুনিয়ায় খাদ্যর কুনো জাত নাই। আছে কি? তুমার ছেলেটাকে কিঞ্চিৎ হালুয়া পরটা দিই?

বেন্দাবন তৎক্ষণাৎ সায় দেয়। দেন হাজিসায়েব! জাতের কথা যদি বুলেন, তাহলে শুনুন ডাকপুরুষের বচন: জাত—খেলে যায় না, বুললে যায়।

তবে তুমো খাও হে বেন্দাবন!

বেন্দাবন, দাঁত বের করে আনন্দে। হাজিসায়েব একটা পরোটায় হালুয়া সাজিয়ে তার হাতে দিয়ে যান। ক্ষুধার্ত অন্ধ ব্যাকুলতায় চিবুতে থাকে। মশলার গন্ধমাখা হালুয়া তাকে এক অচেনা দেশের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। সেখানে বড় সুখশান্তি। ক্যানেলের জলে মাঠ সবুজ হয়ে থাকে। শুনেছে বটে রূপপুর-কাঁকসার নাম। কোথায় কতদূরে সবিশেষ জানে না বেন্দাবন।

বিবিজান ছেলেটার হাতে হালুয়াপরটা দিয়ে বলেন, সামনে বসে খাও বাছা। শরম কোরো না। এই ছাখো, আমরাও খাই, তুম্মো খাও।

গাড়োয়ান বালতি ভরে জল এনেছে পুকুর থেকে। হাজিসায়েব তাকেও হালুয়াপরটা দিলে সে গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে খেতে থাকে। নিঝুম বুড়াপীরের দরগাতলায় পাঁচজন মানুষ এবং দুটি গরু আহারে লিপ্ত থাকে কিছুক্ষণ।···

খাওয়া শেষ হলে বেন্দাবনকে নড়ি ধরে পুকুরে নিয়ে যায় ছেলেটা। বাবা জল খেয়ে ঘাটের মাথায় দাঁড়ালে সে দূর থেকে জল ছিটিয়ে দেয়। পায়ের পাঁক ধোবার চেষ্টা করে বেন্দাবন। তারপর বলে, ওই হল আর কী।

দরগাতলায় আগের জায়গায় তাকে বসিয়ে রেখে ছেলেটা ফের খেলতে ঢোকে গাছপালার ভেতর। পেটটা ডাগর হয়েছে। মুখে টলমল করছে তৃপ্তি। কাঠবেড়ালির পেছনে ছোটাছুটি করে বেড়ায় সে। আপনমনে ছড়া গাইতে থাকে।

'নামুপাড়ার নামুতে কাঁদর
মাগীরা মোড়লী করে
মিন্সেরা বাঁদর···

বিবিজান এখন গাছতলায় আড়ালে দাঁড়িয়ে চুলে কাঁকুই দিচ্ছেন। কান করে শোনেন। মুখ টিপে হাসেন। হাজিসায়েবও ছেলেটার দিকে লক্ষ রেখেছেন। আনমনে হেঁটে তার কাছে গিয়ে বলেন, বাপ, তোর গলাখানা যেন কাঁসি।

ছেলেটা লাফ দিয়ে একটা নিচু ডালে ওঠে। ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে চেঁচায়, হো হো ধত্তে পাল্লে না! হাজিসায়েব ভাবেন, খেলাটা বুঝি তাঁরই

সঙ্গে। বয়স্ক, গুরুভার তাঁর সুখী-শরীর। হা হা করে হেসে তাড়া করেন তাকে। ছেলেটা রগড় বোঝে। ফের গাছে উঠে তরতর করে মগডালে চড়ে। হো হো ধত্তে পাল্লে না! ধত্তে পাল্লে না! সুর ধরে চেঁচাতে থাকে সে।

হাজিসায়েব বলেন, ঘাট মানছি বাপ! আয় ইবারে পাগলা-ছাগলা খেলি। হাজিসায়েব খেলার বুলি বলেন, সুরে।

'···ছাগলা রে পাগলা তোর ছাগলা কতি চরে?'

বেন্দাবনের ছেলে এ খেলা জানে। তরতরিয়ে নামতে নামতে জবাব দেয়, 'ডিঙডিঙে লগরে।'

'খায় কী?'

'লতাপাতা-আ-আ।'

'হাগে কী'?

'বকছ্যারানি-ই-ই।'

'মোতে কী?'

'কলুর ঘানি-ই-ই!'

হাত বাড়িয়ে হাজিসায়েব বলেন, ইর্‌র্‌র্‌র্‌ নাক ড্যাঙাড্যাঙ ড্যাডাং ড্যাং/ তোর ঠ্যাং তোর বাপের ঠ্যাং!

ছেলেটা খেলার টানে তাঁর হাত দুটো ধরে। দুজনে কয়েকপাক ঘুরে খেলা শেষ করে। হাজিসায়েব হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন, আমি কি তোর সঙ্গেতে পারি বাপ? বুঢা মানুষ!

বেন্দাবনের ছেলে বলে, তুমি ছড়া জানো না গো?

না সোনা রে।

আমার বাবা জানে। শুনবে তো চলো।

তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় বেন্দাবনের কাছে। 'ও বাবা! সেই ছড়াটা বুলো না! 'ধুল্লোউড়ির মাটে রে ভাই ওদ ঝং ঝং করে··

হাজিসায়েব বলেন, বেন্দাবন! তুমার ব্যাটা আমাকে বড় মায়ায় ফেললে রে! ই কী দায় ছ্যাখোদিকিনি।

বেন্দাবন মুখ তুলে নিঃশব্দে হাসে।

বেন্দাবন!

আজ্ঞে হাজিসায়েব!

তুমার ছেলেটাকে দাও। পেলেপুষে মানুষ করি।

বেন্দাবন অন্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

আমার ঘরে ব্যাটা নাই বেন্দাবন। যার ব্যাটা নাই, তার কী আছে? তুমার ছেলেটা দাও।

বেন্দাবন কী বলবে ভেবে পায় না। একটু পরে বলে, দত্তক লিবেন হাজিসায়েব?

হাজিসায়েব মাথা দোলান। আমার ধম্মেতে দত্তক নাই বেন্দাবন। তবে কথা কী, সব সম্পত্তি ছেলেটার নামে দানপত্র করব। তাতে আটকাবে না। বুঝলে তো? আর ভেবে দ্যাখো বেন্দাবন, ছেলেকে গেরস্থবাড়ি তো থোয় লোকে। জানবে এও তেমনি।

বেন্দাবনের হাত কাঁপে। আমতা হেসে বলে, সে তো মাইনেকড়িটা বছরে পায় লোকে। আমি কী পাব?

হাজিসায়েব পকেট থেকে টাকা বের করে তার হাতে গুঁজে দেন। ··পাঁচ-খানা দশটাকার নোট। তুমি মধ্যে মাঝে যাবে বেন্দাবন। যেয়ে দেখে আসবে ব্যাটাকে। টাকাকড়ি লিয়ে আসবে। চিন্তা কিসের?

বেন্দাবন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, ছেলে কি যেতে চাইবে? ওকে শুধোন আগে।

হাজিসায়েব ছেলেটাকে দুহাতে কাছে টেনে বলেন, যাবি না বাপ আমাদের বাড়ি? ভাল-ভাল খেতে পাবি। পরতে পাবি। যাবি না তুই?

কৃতজ্ঞ ছেলেটা চুপ করে থাকে। লোভাটে চোখে দুটি বয়স্ক মানুষের দিকে পালাক্রমে তাকায়। আর বেন্দাবন চাপা গলায় বলে, ভাল থাকবি। চলে যা নেম্মল! গেরস্থবাড়ি তো তুকে তুর দাদার মতন থাকতেই হত—না কী? রূপপুর কাঁকসা বড় জায়গা। এনারাও বড়লোক। চলে যা।···

গরুর গাড়িটা চলে গেলে কতক্ষণ আচ্ছন্নভাবে বসে থাকে বেন্দাবন। চাকার শব্দ মিলিয়ে যায় দূরে। তারপর তার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। সুখেশ্বরী কী বলবে?

আর অবাক কাণ্ড, ছেলেটাও হঠাৎ কেমন পর হয়ে গেল! এতটুকু আপত্তি পর্যন্ত করল না! অন্ধের নড়িটা! বেন্দাবন ফোঁসফোঁস করে নাক ঝাড়ে। তারপর

সাবধানে কোমরের কাছে টাকাগুলো ছুঁয়ে দেখে। ভাবে, বেচে তো দিই নি। গেরস্থবাড়ি রাখতেই হত—নেহাত কদিন আগে আর পরে বলে কথা। ছেলেটা ভালই থাকবে। শুধু গাঁয়ের কাউকে না বললেই হল যে মোছলমানের বাড়ি আছে।

সন্ধ্যাঅব্দি বসে থাকে বেন্দাবন ইচ্ছে করেই। দরগাতলায় আঁধার ঘনায়। পোকামাকড় ডাকতে শুরু করে। তার কতক্ষণ পরে গাঁয়ের দিক থেকে তার বড় ছেলের ডাক ভেসে আসে। বেন্দাবন চেঁচিয়ে সাড়া দেয়।

বড় ছেলে রাগ দেখিয়ে বলে, নেম্মলাকে ইবারে কুপিয়ে কাটব।

ভেবেছে, অন্য দিনের মতো বাবাকে ফেলে পালিয়েছে। বেন্দাবন কিছু ফাঁস করে না। বলে, যাক না বাপু। চেঁচাস নে। চলদিকিনি চুপচাপ।

বাড়ি ফিরে সে গুম হয়ে বসে থাকে। সুখেশ্বরী উঠোনের উনোনে রান্না করছিল। সেও বলে, নামুনে আসুক বাড়ি। কেটে খাব আজ।

তবু বেন্দাবন কিছু ফাঁস করে না। রাত বাড়ে। অন্ধকারেই অভ্যাসমতো নক্ষত্রের আলোয় খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে। মায়ের মন। সুখেশ্বরী ঘর বার করে খালি। গলা চড়িয়ে ডাকে, নেম্মলা রে! নেম্মলা-আ-আ!

ছেলেটা না খেয়ে আছে সারাটা দিন। সেই সাতসকালে একবাটি আমানি খেয়েছিল—পান্তাভাতের জল। পীরবাবার কাছে আজ কি কোনো ভক্ত এসেছিল? এসে থাকলে একটুকুন সিন্নিও জুটেছে। নৈলে ঠা ঠা উপোস। সুখেশ্বরীর চোখে জল ছপছপ করে। ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ফের পাড়া মাথায় করতে যায়, নেম্মল রে! ও বাবা নেম্মলা-আ-আ!

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলে বেন্দাবন বলে, থানে ভক্ত এসেছিল। চিন্তা কোরো না নেম্মলার মা। বলে খিকখিক করে হাসে। আমাদের বাপব্যাটার খ্যাঁটখানা আজ ভালমতনই হয়েছে, বুঝলে?

সুখেশ্বরী একথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে বলে, ক্যানে ঝগড়া হল? মেরেছিলে উকে?

হুঁ। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বেন্দাবন জবাব দেয়।··· তুমার ছেলে। তুমি বুঝলে না? খ্যাঁট ভালমতন হলেই তেজ বাড়ে। আছে কোথাও লুকিয়ে পাড়ার ভেতর।

এমন যে কোনোবার না হয়েছে, তা নয়। বিন্দেবুড়ির কাছে, নয়তো ভোম্বল মোড়লের খামার বাড়িতে পরদেশী মুনিশদের কাছে রূপকথা শুনতে

শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোরবেলা চোখের পিচুটি মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরেছে। গালমন্দ খেয়েছে মায়ের কাছে। তারপর আমানি খেয়ে হাসিমুখে বাবার নড়িটা ধরেছে। বুঢ়াপীরের দরগাতলার দিকে যেতে যেতে বলেছে, আজ সেই ধুল্লো-উড়ির ছড়াটা শিখিয়ে দিও না বাবা। 'ধুল্লোউড়ির মাঠে রে ভাই ওদ ঝং ঝং করে···

ভাঙা ঘর ও দাওয়া জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে রইল পাঁচটা ছোট-বড় মানুষ। বেন্দাবনের চোখে আজ ঘুম নেই। কোমরে পঞ্চাশটে টাকা এবং রূপপুর-কাঁকসার এক গেরস্থবাড়ির ভবিষ্যৎ—অবিকল দেখতে পায়, তিনখানা হালের জমিজিরেত মাঠজোড়া আদিগন্ত। সবুজ শস্যে আশ্বিনের হাওয়া খেলছে। ওই তার ছেলে, খবরদারি করে বেড়াচ্ছে মুনিশমাহিন্দারের ওপর। ছেলের মুখটা ভোম্বল মোড়লের ব্যাটা হরেনের মতো ঝকমকে। হাতের ঘড়িটা চিকমিক করছে। বেন্দাবন মনে মনে বলে, আমাকে শুধু একখানা কম্বল কিনে দিস বাবা। আর কিছু না। কম্বলখানা গায়ে দিয়ে তুর খামারে বসে থাকব।

সেই শস্যভরা খামারে বসে অন্ধ বেন্দাবন প্রাণ খুলে ধুল্লোউড়ি মাঠের ছড়া গাইবে।

শেষরাতে ঘুমটা এল। আজ ঘুমটাও ছিল খুব ঘন। সেই ঘুম হঠাৎ ভাঙল সুখেশ্বরীর ধাক্কা খেয়ে। কুয়াশার ফাঁক দিয়ে রোদের ছটা ফুটছে চাপচাপ। চৈত্রের শেষরাতে প্রচণ্ড হিম পড়ে। ছেঁড়া চটখানা গায়ে জড়ানো ছিল। সরে গেছে কখন। সুখেশ্বরী তার পাশে বসে তাকে খামচে ধরেছে। ঝাঁকুনি দিচ্ছে। বেন্দাবন বলে, কী, কী গো? মাচ্ছ ক্যানো খামোকো?

ট্যাকা? সুখেশ্বরী হাঁসফাঁস করে বলতে থাকে। ও মিনসে! এতগুলো ট্যাকা ক্যানে তুমার? কতি পেলে এত ট্যাকা?

বেন্দাবন অন্ধ মুখের দাঁত বের করে বলে, চুপ! চুপ! বুলছি, এট্টু, চুপ কর দিকিন।

ঘুমের ঘোরে কোমরে জড়ানো টাকাগুলো খসে পড়েছে। গিঁট দিয়ে রাখলেই ভাল হত। বেন্দাবন এই টাকা দিয়ে বিড়ির পাতা মসলা কিনে বিড়ি বাঁধবে। সে ছিল বেরং খাটিয়ে মানুষ। হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে বড় লজ্জা বলেই না বুঢ়াপীরের দরগাতলার নিরিবিলি গিয়ে বসে থাকত। সে বলে, চুপ চুপ! তুর ছেলের কপাল ফিরেছে।

সুখেশ্বরী তাকে খামচায়। কিল মারে। হুহু করে কেঁদে বলে, বেচে দিয়েছে আমার ছেলেটাকে! কতি বেচলে? কোন মুখপোড়ার কাছে বেচলে? ছেলে বেচে খেলে নিব্বংশ! ড্যাকরা! হাভেতে! সে বুক ফেটে কাঁদতে থাকে।

বেন্দাবন বোঝাতে চেষ্টা করে। গেরস্থবাড়ি রাখাল রাখতেই হত ছেলেটাকে। তাই রেখেছে ধরতে গেলে। হলই বা মোছলমান। অন্নের কি জাত আছে?

রূপপুর-কাঁকসার হাজিসায়েবের বৃত্তান্ত কান করে শুনতে থাকে সুখেশ্বরী চোখে জল নিয়ে।

বড়াপীরের দরগাতলায় নিরিবিলি বসে বিড়ি বাঁধে বেন্দাবন। সেঁকার যোগাড় করা কঠিন। অন্ধ মানুষ। কয়লা চাই। লোহার জাল চাই। কত হাঙ্গামা। তবে কাঁচা বিড়ির খদ্দের জোটে তার। রাখালবাগাল, মাঠের চাষা, পথিকজন কেনে। সুনসান নিঝুম এই জায়গাটা খুব ভেতর থেকে টানে বেন্দাবনকে। সুখেশ্বরী বিলেবাদাড়ে যাবার মুখে তাকে দরগাতলায় বসিয়ে রেখে যায়। সন্ধ্যার আগে ফিরে বাড়ি নিয়ে যায় সোয়ামীকে। অন্নের সুরাহা হয়েছে যৎকিঞ্চিৎ।

মায়ের মন মাসটা যেতে না যেতে আনচান করে উঠেছিল। ছেলেটাকে দেখতে যায় রূপপুর-কাঁকসা। একে-ওকে শুধিয়ে তল্লাস করে সে পাঁচক্রোশ রাস্তা হেঁটে একদিন চলে গেল। বাচ্চাদুটো বেন্দাবনের কাছে বসে রইল। বেন্দাবন তাদের ছড়া শোনায়। তারা কি বোঝে কিছু? নেম্মল হলে খিট-খিট করে হেসে বলত, ইবারে সেই ছড়াটা বুলো না বাবা! 'খিলিখিলি পান বানাল্যাম তাথে দিলাম সুপারি। ওগো কন্যে, আর কোরো না মোন ভারি।'

সন্ধ্যার মুখে ফিরে এল সুখেশ্বরী মুখ চুন করে। তারপর ডাক ছেড়ে কেঁদে বলে, কুন আখান্তরে বেসজ্জন দিয়েছ গো বুকের ধোনটাকে আমার! ই কী সব্বনাশ করেছ তুমি!

বেন্দাবন অবাক হয়ে বলে, ক্যানে?

ওগো, উপপুর-কাঁকসেতে নাই কুনো হাজিসায়েব। আমাদের হেঁদুর গাঁ। একজনাও মোছলমান নাই।

নাই ! বেন্দাবনের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

না ! চিলেচেঁচানি চেঁচায় সুখেশ্বরী। তারপর হিংস্র হাতে বেন্দাবনের বিড়িবাঁধা কুলোয় টান মারে। বাচ্চাদুটোও হকচকিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। সন্ধ্যার দরগাতলা তোলপাড় করে সুখেশ্বরী সোয়ামীকে মারতে থাকে।

বেন্দাবন চুপচাপ পাথরের মতো এই ঝড়জল শিলাবৃষ্টি শরীরে নেয়।

রাক্ষুসী মূর্তিতে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটা। বাচ্চাদুটোকে হ্যাঁচকা টানে ওঠায়। একটা কোলে নেয়, অন্যটার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় গাঁয়ের দিকে। বলে, থাকো লিদয়া বাটপাড় ইখেনে বসে।

বেন্দাবন কান পেতে শোনে, হিপিয়ে হিপিয়ে কান্না মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। সে মুখ তুলে বসে থাকে চুপচাপ। হাজিসায়েব সেজে এক ছেলেধরা এসেছিল। তার এমন সুন্দর ছেলেটা চুরি করে নিয়ে গেল। বাবা বড়াপীর ! ইয়ার বিচের হবে না তুমার দরগায় ? তুমি সাক্ষী। আমার অন্ধের হাতের নড়িটা। পাখির গলায় কথা কইত। তুমার দরগাতলায় খেলে বেড়াত সারাটা দিন। সুর ধরে গাইত। পীরবাবা, সাক্ষী রইলে তুমি।

হাজিসায়েব কেন নিজের গাঁয়ের নামটা লুকিয়েছে, বেন্দাবন কিছুতেই বুঝতে পারে না।

রাত বাড়তে বাড়তে বেন্দাবন চঞ্চল হল। বিড়িবাঁধা কুলো, পাতা-মসলা, বাঁধা বিড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে কোথায় সে জানে না। গলা চড়িয়ে গাঁয়ের দিকে ঘুরে সে ডাকতে লাগল, বেমল ! বেমলা রে !

কতক্ষণ পরে সাড়া আসে।···চোওপ শালো ! ফাড়িস না। গলা টিপে দিব তুর।

বেমল লণ্ঠন হাতে আসছে বাপের কাছে। হাজার হোক, জন্মদাতা বাপ। বিড়ির পয়সায় একটু তেলও জুটছে সংসারে। ফাটা কাচের লণ্ঠনটা কাজে লাগছে রাতবিরেতে। এদিকে বছর শেষ হয়ে গেরস্থবাড়ি রাখালীর দরুন দেড়-কুড়ি টাকাও হাতে এসেছে। বেন্দাবনের বাড়িতে কিছু সুখ ইদানীং। শুধু ওই ছেলেটার জন্য বুক টনটন করে।

তবে এখন তো তাকে মড়া বলেই গণ্য করা ভাল। সুখেশ্বরী উনোনের পাশে বসে পা দুটো ছড়িয়ে তার জন্য মড়াকান্না কাঁদে। বেন্দাবন ধরা গলায় বলে, কেঁদো না। বেঁচেবর্তে থাকলে একদিন বড় হবে। সব মোনে

পড়বে। ত্যাখন···সে হঠাৎ চুপ করে যায়। সে ভাবে, একটা কিছু ঘটবে তখন।

তারপর আবার একটা করে সকাল আসে। বেন্দাবনকে দরগাতলায় বসিয়ে রেখে যায় সুখেশ্বরী। অন্ধ বেন্দাবন পা ছড়িয়ে বসে বিড়ি বাঁধে। বাসমোটর যায় পীরের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে। সে ভাবে, হঠাৎ কোনো একদিন এক বাস-মোটর এখানে কিছুক্ষণ থামবে। আর সেই বাসমোটর থেকে নামবে তার ছেলে। পরনে সুন্দর পোশাক। শরীলে জলজলে স্বাস্থ্য। হাতে থাকবে মোড়লের ব্যাটার মতো হাতঘড়ি। সে তার জমিজিরেতের গল্প শোনাবে। শেষে বলবে, তুমাদের লিতে এলাম বাবা।

বেন্দাবন বলবে, তা কি হয়? মোছলমানের বাড়ি।

ছেলেটা বলবে, অন্নের জাত লাই। তবে কথা কী, আলাদা বাড়ি বানিয়ে দিব তুমাদের। বছরসন খাইখোরাকিটা দিব। ভাগে ভুঁইক্ষেতটা দিব দাদাকে। চষবে-কাটবে।

বেন্দাবন হেসে বলবে, ধুর পাগলা! কতি যাব গাঁ ছেড়ে? মধ্যেমাঝে আসিস। বাপ মাকে দেখা দিয়ে যাস। তাইলেই হল।···

বুঢ়াপীরের দরগাতলায় কাঠবেড়ালিটা শুকনো পাতায় নখের আঁচড় কাটছে শুনতে পায় অন্ধ বেন্দাবন। গাছের ডালে ঘুঘু পাখিটা ঘুম-ঘুম স্বরে ডাকতে থাকে। শুকনো ঘাসের মাথায় বসে ঘাসফড়িংটা কিরকির করে গান গায়। রাস্তার ওপর ঘূর্ণিহাওয়া ফরফর করে ওঠে। অভ্যাসে রোদজ্বলা মাঠের দিকে ব্যস্ত চাষার মতো এগিয়ে চলে মৃত মানুষজন। বেন্দাবন মুখ তুলে বসে থাকে। ছেলেটা থাকলে কী করত এখন। সারা দরগাতলা ছুটোছুটি করে এসে বলত, সেই ছড়াটা বলো না বাবা! ধুল্লোউড়ির মাঠে রে ভাই ওদ ঝং ঝং করে···

অন্ধ দু চোখের কোনায় জলের ফোঁটা নিয়ে বেন্দাবন বুঢ়াপীরের দরগা-তলায় বিড়ি বাঁধে। তার পেছনে এক অদৃশ্য বালক দিনমান আপনমনে খেলে বেড়ায়। তার গায়ের গন্ধ ভেসে থাকে বাতাসে।

বেন্দাবন ঠিকই টের পায়। শ্বাস টেনে বুঢ়াপীরের উদ্দেশে বলে, সাক্ষী থেকো বাবা। আমার অন্ধের নড়িটাকে দেখো। সুহালে রেখো তাকে, যেখানেই থাক।···

বিভ্রম

ঘুরে ফিরে বনবাসীর একই কথা, যতক্ষণ গন্ধহরির আবির্ভাব। 'ই কী ঝামেলা দেখদিকিনি মনোদা!' গন্ধহরি মুচকি-মুচকি হেসে সায় দিচ্ছিল বটে, তার কানও ঝালাপালা। নেহাত বনবাসী তার মতো লোককে খাতির করছে, চা দিয়েছে, বিস্কুটও দিয়েছে এবং তার মতো তুচ্ছ লোকের সঙ্গে ঘরোয়া সমিস্যে নিয়ে কথাবার্তা বলছে, তাই।

নৈলে চারপাশে এই রঙঝলোমলো মেলা, দোকানপাট, নাগিন বাঁশির সুর, পাঁপরভাজার গন্ধ, আর দীঘির পাড়ে এতক্ষণ খাঁচায় বন্দী সিংহটার ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল, তাঁবুর পেছনে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে গন্ধহরির কতবার গায়ে কাঁটা দিত। বনবাসী তাকে নড়তে দিচ্ছে না। এত খাতিরের পর নড়বেই বা কোন মুখে? গন্ধহরির বড়ই চক্ষুলজ্জা।

বনবাসীর দোকানটা তেমন কিছু না। তিনদিকে চট আর ওপরে একখানা রিলিফের তেরপল। যৎসামান্য মনোহারি জিনিসপত্তর—চুড়ি, ফুলেল তেল, আয়না-চিরুনি-সেফটিপিন, ফিতে, চুলের কাঁটা এই সব। তাহলেও সে গন্ধহরির বিবেচনায় এই ঝলোমলো রঙের বাজারে এক রাজা। পা ছড়িয়ে বসে আছে টাটের পাশে। ঘোমটাপরা বউ, নিলাজ কুমারী, ঝগড়াটে বুড়ি, খদ্দেরের রকম-সকম দেখে গন্ধহরিরও একটা অভিজ্ঞতা হল বটে। সে একানড়ে খাটিয়ে মানুষ। খাটুনি না পেলে বিলখাল বনবাদাড়ে মাথা ভেঙে খাদ্য টুঁড়ে আনে। মেলায় আসার কপাল নয়। এত রকমের মানুষামি এক জায়গায় বসে দেখা! মেলার মানুষ যে অন্য মানুষ, তাও সত্যি।

খালি হাতে পৃথিবী ঘোরা যায়, মেলায় আসা চলে না। এ হল গে বিকিকিনির জায়গা। এসে পড়লেই কিনতে হয়। দরকার থাক বা না থাক, না কিনলে মনে কষ্ট বাজে। সেই চৈত্রের গোড়ায় শুরু হয়েছে ঈশানপুরে এই শ্যামাচাঁদের মেলা। এখন প্রায় ভাঙার মুখে এসে গেছে। গন্ধহরির পৌঁছুতে এত দেরি হয়ে গেল। আজ কপালগুণে ছোটবাবুর খামারের উঠোন পিটিয়ে এবং গোবরজলে নিকিয়ে পেটপুরে অন্ন এবং একটা মুদ্রালাভ হয়েছে। গন্ধহরির বিশ্বাস, টাকাটা রুপোরই। কাগুজে টাকা হলে গন্ধহরির মনে এখন সুখ থাকত না।

বিকেলে মেলায় ছুটে আসার পর গন্ধহরির মাথাখারাপ হবার যোগাড়। কী কিনবে? কিনতে গিয়ে নাড়াচাড়া করে পিছিয়ে এসেছে। মনে খালি টানা-

পোড়েন, মতি অস্থির। চিরুনি কিনতে গেলে মনে হয়, আয়না কেনাই ভাল। আয়না কিনতে একটুকরো সাবুনের গোপন লোভে বুকের ভেতর রক্ত নাচে। আবার লজ্জা পায় গন্ধহরি। বিহ্বল অন্যমনস্কতায় মাতালের মতো ভিড়ে ঘোরে। কা কিনবে ঠিক করতে পারে না। পাওয়া যায় নাকি এই রঙের বাজারে এমন কোনো আশ্চর্য সুন্দর চিরস্থায়ী জিনিস, যা এক টাকায় কেনা যায়? বার বার কোমরে গুঁজে রাখা মুদ্রাটা ছুঁয়ে দেখছে আর শিউরে উঠেছে উত্তেজনায়। সার্কাসের তাঁবুর দরজায় গিয়ে সিংহ দেখার ইচ্ছেয় সে দাঁড়িয়ে থেকেছে। সিংহ সে কখনও দেখেনি। এলাকার খুব কম লোকেই দেখেছে। ক্ষেতে নিড়ান দিতে দিতে ছোটবেলায় মামা যোগীবরের কাছে শুনেছিল, 'সিঙ্গির ডাকে লিঙ্গি খসে যায়। বড় বেভাংকার জন্তু!' মাঠঘাটের ওই মানুষেরা কখনও সিঙ্গি দেখে নি। সবাই অবাক হয়েছিল সে-কথা শুনে।

গন্ধহরি সার্কাসের দরজা থেকেও ফিরে এসেছে দোনামনা করে। টাকাটা খরচ করে পুরুষের 'লিঙ্গি-খসানো সিঙ্গির ডাকে' পোষাবে কিনা বুঝে উঠতে পারে নি। তারপর ঘুরতে ঘুরতে বনবাসীর এই টাটে হাজির। ক্লান্ত গন্ধহরি একটু বসে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছিল।

কিন্তু বনবাসীর ওই ধুয়ো শুরু হয়েছে, 'ই কী ঝামেলা দেখদিকিনি গনোদা।' কোনায় জড়োসড়ো বসে ঠোঙা থেকে জিলিপি তুলে খাচ্ছে বনবাসীর বউয়ের শেষ প্রসব। মুখের চারপাশে রস জবজব করছে। নাক থেকে সিকনি ঝরছে। চোখের তলায় কাজলধোয়া কালির ছোপ। 'ওই দুধের বালককে সঙ্গে লিয়ে কেউ আসে?' বনবাসী বলল। 'দেখ না, মেলায় আলো জ্বলবে আর অমনি ঢুলনি শুরু হবে। তাকে লিয়ে তেপান্তর পাড়ি দেবে রেতের বেলা। কী সাওস দেখছ?'

গন্ধহরি মাথা ঘামাচ্ছিল। কিছু বুঝতে পারছিল না। একটু পরে বুঝল। ডোরাকাটা লালহলুদ আনকোরা শাড়ি পরে গন্ধহরির চোখ ঝলসে দিয়ে যখন কেউ হন্তদন্ত এসে বলল, 'বারো আনা টিকিট। কৈ জামাইদা, শিগগিরি করে দাও দিকিনি।' তারপর বনবাসীর জিলিপিভুক বংশধরের দিকে চোখ কটমটালো। 'এই ছোঁড়া ঢুলবি না তো? আমি বাবা কাউকে কোলে কত্তে পারব না বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।'

বনবাসী চোখ তুলল। 'বারো আনা! আবার ওরও লাগবে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভেংচি কাটল বনবাসীর শালী। তার সঙ্গে চোখের ঝিলিক আর ঠোঁটের কোনায় এককুচি বাঁকা হাসি। 'নিজে তো টাট ছেড়ে নড়তে পারবেন না বাবুমশায়! ছেলেটাকেও···! হুঁ, এমন হাডকেপ্পন কে জানত বাবা? মুখে তো একশোবার, যেও যেন—যাবে যেন, সার্কেসের বাজি দেখাব!' তারপর অকারণ হাই তুলে উদাস চোখে মেলা দেখতে দেখতে বলল, 'আগেই বুঝেছিলাম বাবা। ক্যানে যে মত্তে এলাম এমন করে।'

গতিক বুঝে বনবাসী চটের তলা থেকে পয়সা গুনে একগাল হেসে বলল, 'তুমি মাইরি মেয়ে বটো একখানা? এই লাও। আর শোনো, গনোদাকে আটকে রাখলাম। হেরিকেন দেবে। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

বনবাসীর শালী গন্ধহরির দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই গন্ধহরি ঘা খেয়ে চুড়ি দেখতে থাকল। ই কী চোখের দিষ্টি! ই কী নাকমুখের গড়ন! কপালের লাল টিপখানা কী আগুনজ্বলা জ্বলছে দাউদাউ! মাঠের মানুষ গন্ধহরির মেঠো আত্মা হঠকারী চৈতালী ঘূর্ণির ভেতর শুকনো পাতার মতো ভেসে যাচ্ছে। এই দিনশেষে ঈশানপুরের মেলায় খামোকা এত উপহার। মানুষজন, পাঁপরভাজার গন্ধ, তালপাতার পাখির চিৎকার, নাগিনবাঁশির সুর জড়াজড়ি একাকার হতে হতে পুরুষের লিঙ্গি-খসানো সিঙ্গির গর্জন মুহুর্মুহু। গন্ধহরি ফোঁস করে গরম শ্বাস ছাড়ল।

এত বয়স হল গন্ধহরির। এখনও নারীসঙ্গ হয়নি। মামাতো ভাইদের বাড়ির দাওয়াই মাথাগুঁজে রাত কাটায়। কে তাকে মেয়ে দেবে? তার চেহারা গড়ন-পেটনও এমন কিছু আহামরি নয় যে নির্জন মাঠঘাটে কুড়িয়ে পাবে দৈবাৎ কোনো পোড়াকপালা মাঠকুড়োনি যুবতীর মন। বরং তাকে দেখলেই যেন দূরের দিকে পিছলে যায়। কিছু কি আছে গন্ধহরির দুই চোখে?

বনবাসী বলল, 'বিড়ি খাও গনোদা। আবার চা ইচ্ছে হলে বোলো। মেলায়-খেলায় বারো মাস বাস। ওই এক নেশা আমার—চা। একটুকুন চা পেলেই হল, আর কিছু চাই নে।'

বনবাসীর শালী লালহলুদ ডোরাকাটা শাড়ি পরে বাচ্চাটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। চালচলন যেন হরিণের পালে এক বাঘিনী। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছে। শাড়ি একটু উপরে উঠে গেছে। দুই চিকন গোলগাল আলতাপরা পায়ের গুঠাপড়া খালি চোখে পড়ে। দিনশেষের ধূসর আলোয় অসংখ্য পায়ের ভেতর ওই একজোড়া দেখনশিরি পা। উঠছে

আর পড়ছে। পড়ছে আর উঠছে। মেলার বুক মাড়িয়ে যাচ্ছে আর যাচ্ছে চিরটা কাল—যখন বুড়ো হতে হতে গন্ধহরি মরে যাবে, তখনই ওই দেখনশিরি আলতারাঙা দুটো চিকন পায়ের ওঠাপড়া দেখতে পাবে, এই মতো মনে হয়।

গন্ধহরি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলল, 'বউ এল না ক্যানে হে বানা?'

বনবাসী আবার সমিস্যে আনলো, 'সেও উদিকে ঝামেলা, গনোদা! উয়ার ব্যামোর শ্যাষ নাইকো। কোনোগতিকে বেঁচে আছে। তো গনোদা, বউয়ের কাছে পড়ে থাকলে তো টাট চলবে না।' বনবাসী বিষণ্ণ হাসল। 'মেলা বাদ গেলে খাব কী? তাই মেয়েটাকে খবর পাঠিয়ে আনলাম।'

'তুমার শালীকে?' গন্ধহরি একটু হাসল। 'ভালই বরঞ্চ। দিদির সেবা-যত্নটা করবে।'

'করে স্বগ্‌গে তুলবে। যা টেঁটিয়া মেয়ে। দেখলে তো! হরিপুরে বিয়ে হয়েছিল। সোয়ামীকে হাড়জ্বালান জ্বালিয়ে চলে এসেছে। সেও আর লিয়ে যায় না। কথা কী, সুখ চেয়ে শান্তি ভাল—তার চেয়ে গাছতলা ভাল। তুমি ভালই আছ গনোদা!'

গন্ধহরি মুচকি হেসে বলল, 'তা আছি।'

একদঙ্গল বউ ঝি এল ঝাঁপিয়ে। বনবাসী ব্যস্ত হয়ে উঠল। গন্ধহরি উস্‌খুস্ করছিল। টাকাটা আবার কুটকুট করছে কোমরের কাছে। কী কিনি কী কিনি ছটফটানিটা আবার চাউর হয়েছে মনের ভেতর। সে উঠে দাঁড়াল। বনবাসী খদ্দেরের ভিড়ে চাপা পড়েছে। ভেতর থেকে টের পেয়ে বলল, 'ঘুরবে তো ঘুরে এস। যেন চলে যেও না একলা-একলি। তাহলে ওরা যেতে পারবে না। এখানে থাকবে কোথা?'

তা ঠিক। এই ঘুপচি দোকানে জিনিসপত্তর সরিয়ে দুজন মানুষ শোবার ঠাঁই হবে না। তাও পুরুষ মানুষ হলে কথা ছিল। মেয়েমানুষ। গন্ধহরি বুঝল সমিস্যেটা আসলে কী। শালী মেলায় জামাইদার টাটে রাত কাটিয়ে গেলে বউয়ের কাছে ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকতেই পারে। গন্ধহরি ভিড়ের ভেতর মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

দেখতে দেখতে কখন আলো জ্বলেছে মেলায়। এখন মেলার রূপ ভিন্ন। রাতের রহস্য ঘিরে ধরেছে বাঁজাডাঙায় শ্যামচাঁদের মন্দির চত্বরে চৈত্রমাসের এই

রঙ্গঝলোমলো সমাবেশকে। গন্ধহরি মনে মনে পস্তায়। বারো আনা খরচ করে সেও ঢুকতে পারত সার্কেসের তাঁবুতে। কী এক গণ্ডগোল ঘটেছে মেলায় আসার পর। মন থিতু করতে পারছে না। সে দীঘির ধারে গিয়ে তাঁবুর পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সিংহের ডাক শোনার অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। আবার ফিরল ভিড়ে। তারপর কী এক ইচ্ছার ঘোরে কিনে ফেলল এক বাকসো সিগারেট, একটা দেশলাই। মেলার বুঝি এই রীতি। যত কেনে, তত কেনার নেশা পেয়ে বসে। কিনল সে একঠোঙা জিলিপি। বাকি পয়সায় কিনে ফেলল হঠকারিতায় দুখিলি পান। একখিলি মুখে গুঁজল। অপরখিলি গামছার খুঁটে বাঁধল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিহ্বল গন্ধহরি নিজের পানরাঙা মুখ দেখতে থাকল। এলোমেলো চুল ঠিক করল। ভাবল, বনবাসীর কাছে ধারে একটা চিরুনি চাইবে কি? তার শালীকে আজ অন্ধকার রাতের মাঠ পেরিয়ে গাঁয়ে পৌঁছে দেবে। বনবাসী কি দেবে এক একটা চিরুনি—ধারে?

গন্ধহরি আয়নায় নিজেকে বড় সুন্দর দেখল আজ। চিরুনিটা আগে কেন যে ছাই কিনল না! কী সহজে টাকাটা তার কেড়ে নিল শ্যামাচাঁদের মেলা, অবিশ্বাস্য লাগে। নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। এ মেলার যেন রাক্ষুসে হাঁ। সবস্ব গিলে খেতে চায়—রক্ত জল করা পয়সাকড়ি, যখের ধন। বনবাসীর দোকানের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ লজ্জায় পড়ে গেল গন্ধহরি। সে মাঠঘাটের মানুষ। চিরুনি ধারে চাইলে কী ভাববে বনবাসী? আর তার মুখে পানের রঙ! তার গামছায় বাঁধা সিগারেট-দেশলাই! বিব্রত হয়ে গন্ধহরি গেল কেষ্টযাত্রার আসরে। মুগ্ধ হয়ে গান শুনতে লাগল। 'কী কিনি কী কিনি বলে খঞ্জনী বাজে। রাই কিনি কী কৃষ্ণ কিনি—খঞ্জনী বাজে।' গন্ধহরির পানরাঙা দাঁত থেকে হাসি ঝলমল করছিল। ঠিকই বলেছে বাপু! সেও তো সমিস্যে বটে। সিগারেট ধরিয়ে সুখে চোঁ চোঁ করে টানতে থাকে সে।...

এত ভাল আসরের গান মেলা ছাড়া শোনা যায় না। আসর ভাঙার মুখে যুগলমিলন গাইতে উঠেছে দোহারকি আর খোলবাজিয়েরা। মধ্যিখানে রাধাকৃষ্ণ। গন্ধহরির গা বাজল। দেরি হয়ে গেল বড্ড! বনবাসীর শালী এতক্ষণ মুখ চুন করে বুঝি বসে আছে। গন্ধহরি হন্তদন্ত পা বাড়াল।

মধ্যরাতে মেলায় এখন ঈষৎ ঝিমুনি। ভিড় কমছে। কোনো-কোনো দোকানে এরই মধ্যে ঝাঁপ পড়ে গেছে। শুধু চায়ের দোকানের বেঞ্চে কয়েকটা করে লোক। বনবাসী তার নির্জন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কোমর সোজা

করতে করতে নক্ষত্র দেখছিল। গন্ধহরি এসে বলল, 'গান শুনতে গিয়ে দেরি হল একটুকুন।'

বনবাসী বাঁকা মুখে বলল, 'তুমার এই স্বভাবের জন্যে মাইরি কত কষ্ট! এত করে বললাম তখন। ইদিকে রাত বাড়ছে। আর কতক্ষণ বসে থাকবে একবার ভাবোদিকিনি! চলে গেল।'

গন্ধহরি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'কার সঙ্গে পাঠালে?'

'উ মেয়ে কি কারুর সঙ্গর ধার ধারে? ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। বইতে পারবে না বলে একা হেরিকেন নিয়ে বেরুল। পথে পেয়ে যাবে কাউকে না কাউকে। কিন্তু হাজার হলেও মেয়ে তো বটে। উঠন্ত বয়েস।'

গন্ধহরি আস্তে বলল, 'কতক্ষণ গেল?'

'এই তো একটুখানি আগে। এখনও হয় তো মাঠে নামে নি।' বনবাসী ব্যস্তভাবে বলল। 'পা চালিয়ে যাও দিকিনি। পেয়ে যাবে। একলা-দোকলা মেয়েমানুষ। রাতবিরেতে মাঠের পথ। থাকলই বা হেরিকেনের আলো।'

কী সাহস ওই মেয়ের! টাটু ঘোড়ার মতো দৌড়ুচ্ছিল গন্ধহরি। দীঘির পাড় দিয়ে যাবার সময় সে প্রকৃতই সিংহের গর্জন শুনতে পেল। কিন্তু গ্রাহ্য করল না। তার দৃষ্টি অন্ধকার মাঠের দিকে। দূরে একটা আলো। আলোটা দুলছে। হারিয়ে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে। কালো বিশাল পর্দার ওপব একবিন্দু আশ্চর্য আলো টলটল করছে। এত বাড় ভাল নয় মেয়েমানুষের। গন্ধহরি ধুকুরধুকুর ছোটে। সে মাঠচরা মানুষ। আলপথে অন্ধকারে হাঁটতে তার পা ভুল করে না। কত অন্ধকারে সে মাঠে হেঁটেছে। কিন্তু এ অসম্ভব গোলমেলে রাত আর তার অন্ধকারে হাওয়ায় চারপাশে ফিসফিস কানাকানি। আকাশও নক্ষত্রের চোখে তাকিয়ে আছে গন্ধহরির দিকে। কী হয়, কী হয় উত্তেজনা। আলোটা স্থির হয়ে আছে এবং সে ছুটে চলেছে আলোর দিকে, নাকি সে দাঁড়িয়েই আছে এবং আলোটা দৌড়ুচ্ছে? কিছু বুঝতে পারে না গন্ধহরি। দূরত্বটা কিছুতে কমছে না। গন্ধহরি হাঁপায়। কতকাল ধরে এই পরিশ্রম, কত দিন মাস বছর আজন্ম এরকম অন্ধকার রাতের মাঠে ছোটাছুটি, হিসেব করতে পারে না। দূরের আলোর গায়ে নকশার মতো এক জোড়া নিটোল আলতাপরা পা। স্পষ্ট দেখতে পায় গন্ধহরি।

সে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ডাকে, 'হেই--ই-ই-ই!' জনহীন রাতের মাঠে চৈত্রের হাওয়ায় সেই ডাক ফিরে এসে তারই ওপর যন্ত্রণার মতো আছড়ে পড়ে। দুটো দেখনশিরি আলতাপরা পা ডোরাকাটা বাঘিনী শাড়ির নিচে ঝলমলিয়ে ওঠে মুহুর্মুহু। মাঠের মানুষটির ঠোঁটে পানের রস শুকিয়ে চড়চড় করে। গলা শুকিয়ে যায়। আচ্ছন্ন চোখে গন্ধহরি শুধু দূরের আলোর পটে আঁকা দুই পা রাঙা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। আবার দম নিয়ে সে প্রকৃত সিংহের মতো গর্জন করে, 'হই-ই-ই-ই!' আবার সেই চিৎকার চাবুকের মতো তার ওপর ফিরে এসে আছড়ে পড়ে। রাগে দুঃখে গন্ধহরি ছটফট করে।

কতক্ষণ পরে সে চমকে ওঠে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আলোটা নেই। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে ভুলে যায় সে। আলোটা আর ফোটে না। কিছুতেই ফোটে না। গন্ধহরির আটকানো শ্বাসটা শব্দ করে বেরিয়ে যায়। মাথার ভেতর একটা ঝিনুনি আর চোখভরা অন্ধকার নিয়ে সে খুব আস্তে পা বাড়ায়। তাহলে কি একটা ভুল আলোর পেছনে সে এত বড় একটা মাঠে ছুটোছুটি করছিল? তার গা ছমছম করে। ভুল, না ঠিক? এখনও কি দূরের অন্ধকারে দুই আলতা রাঙা পায়ের ওঠাপড়া শেষ হয়নি?

গামছায় বাঁধা খিলি পান আর সিগারেট দেশলাই একবার আলতো হাতে ছোঁয় গন্ধহরি। জালিপির ঠোঙাটাও টিপে দেখে। খেয়ে দেয়ে পানটা মুখে পুরে একটা সিগারেট ধরাবে। বছরে এই একটা রাত বৈ তো নয়। সুখে দুঃখে গন্ধহরি গায়ে ফেরে।

তাসের ঘরের মতো

দীপক মিত্র

যদ্দূর দৌড়েছি, দু পাশে কোন দরজা খোলা দেখিনি। কোন জানালাও না। কোন লোক না। থমথমে অন্ধকার। ভিজে রাস্তা। শহরে আচমকা ব্ল্যাক আউট যেন। এবং এত স্তব্ধতাও ভারি অস্বাভাবিক। যদিও রাত দশটা বেজে গেছে এবং পিছনের দিকে সাংঘাতিক কিছু সদ্য ঘটেছে, এই শহরটাকে ভয় পাইয়ে দিতে বা রুদ্ধবাক করতে তা মোটেও বেশি নয়। উত্তরোত্তর মানুষের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ছে, মাথার ঘিলু শক্ত হচ্ছে, এবং রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবুরা থলে হাতে পটলের দরাদরি করছেন—জুতোর নিচে টাটকা রক্ত। আর, রক্তের কোন ভাষা নেই।……

পিছনে দূরে—বেশ কিছুটা দূরে পায়ের শব্দ শুনে আরও জোরে দৌড়তে থাকলুম। জানি, এখন চেঁচিয়ে মাথা ভাঙলেও কোন দরজা খোলা হবে না কিংবা কোন জানালা খুলে কেউ মুখ বাড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবে না। সবাই এ দুঃসময়ে কাছিমের মতো নিজের খোলের ভিতর ঢুকে পড়েছে এবং জীব-বিজ্ঞানে পড়েছি, কাছিমের কোন কণ্ঠস্বর নেই।

শহরের এদিকটা আমার পুরো অচেনা। দৌড়তে-দৌড়তে একটা মজার ব্যাপার টের পেলুম। বড়াই করে বলা হয় যে, অধুনা পৃথিবীর স্থলজলঅন্তরীক্ষে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই, যেখানে মানুষ না গেছে! কিন্তু কী আশ্চর্য, এখনও এ পৃথিবী দূরের কথা এই শহরটায় অনেক জায়গা আছে যেখানে আজও আমার পা পড়েনি—যা আজও আমার কাছে অনাবিষ্কৃত! মানুষ নিয়ে বড়াইয়ে কা আসে-যায়। আমি—সাতাশ বছরের দুর্দান্ত যুবক দীপক মিত্র, আমি যে এখনও কত জায়গা দেখিনি সেখানে যাইনি, এবং কত কিছু অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে আমার কাছে—এবং এই দুর্ধর্ষ উত্তেজনাময় জীবন, বিপদসংকুল, যে-কোন মুহূর্তে আমি বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যেতে পারি—যার জন্যে ইস্পাতের ছোট্ট একটি টুকরোই যথেষ্ট, এবং হায় আমার ব্যর্থ সাতাশটি বছর। পৃথিবী ও জীবনেব অনেকখানি উন্মোচিত হবার আগে আমাকে পুড়িয়ে ফেলা হবে কিংবা ফেলে দেওয়া হবে জলে, শকুন কুকুর কাকেব খাদ্য হিসেবে নির্বাচিত—হায় সুন্দর স্বাদু ফলের কোয়ার মতো আমার শরীর আমার যৌবন, আমার মন।···

সেইজন্যেই তো আমি পালাচ্ছিলুম। আমার সারা শরীর যৌবন এবং মন তাদের নিজ নিজ ভাষায় চিৎকার করছিল, পালিয়ে বেঁচে থাকো. পালিয়ে বেঁচে থাকো।

টের পাচ্ছিলুম, ওরা এখনও আমার আশা ছাড়েনি। আমাকে খতম না করতে পারলে ওদের স্বস্তি নেই। ওরা সমানে আমাকে অনুসরণ করছে। এবং আজ এই বিপদের রাতে শহরটাও আশ্চর্যরকম বদলে গেছে—সভ্যতার সাজানো বাগান হয়ে পড়েছে প্রাক্-ইতিহাসের জমজমাট অরণ্য। সব স্কাইস্ক্র্যাপার তাদের আলখেল্লা ত্রস্তে খুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল গাছ। এবং সব রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবু হামাগুড়ি দিতে দিতে অন্ধকারে সেই আদিমতম স্বর্গীয় গাছটার গোড়া খুঁজছে—যার ফল খেয়ে মনুষ্যজাতির অশেষ দুর্গতি, ওঁদের হাতে আজ সেই প্যাকেটে মোড়া ছোট ছোট তিনটি কুঠার—যার একটির বিজ্ঞাপিত দাম মাত্র পাঁচ পয়সা!

এইবার সামনে একটা তেরাস্তা পাওয়া গেল। ডাইনে না বাঁয়ে যাবো—কয়েক মুহূর্তের ইতস্তত করা—তারপর বিচ্ছিরি আওয়াজে কান কালা হয়ে গেল। ওরা আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে। আশ্চর্য, স্প্লিন্টারের জোনাকিজ্বলা দেখবার জন্যে বার বার এদিক-ওদিক ঘাড় ঘোরাচ্ছিলুম। বিপদের সময়ও আমাদের নির্বোধ শিশুত্ব ঠিক কাজ করে যায়।

পরক্ষণেই একলাফে বাঁ দিকে চলে গেলুম। তারপর উঁচুতে একটু আলো চোখে পড়ল। একটা জানালা খুলে কোন দুঃসাহসী মুখ—আবদ্ধ একটা গরিলা যেন রডে নাক ঘষছে। বাড়িটা সুনসান। গেটের ওপর চাপ-বাঁধা লতাপাতার ছাউনি। কী ফুলের গন্ধ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মগজে ঢুকে যাচ্ছিল। বুকসমান উঁচু গেটের কপাট পেরিয়ে যখন ওপারে ভিতরে পৌঁছলুম, কিছু নিরাপত্তার স্বস্তি এল। তারপর মনে হল, সচরাচর এসব বাড়িতে কুকুর থাকে। বাইরে ফলকে লেখা থাকে : কুকুর আছে, সাবধান। কিন্তু ভেতরে ঢুকেও যখন কোন ক্রুদ্ধ গর্জন শুনছিনে, তখন নিঃসন্দেহে এ বাড়িতে কোন কুকুর নেই। কিংবা থাকলেও, এখন সেটা ঘরবন্দী।

কয়েকটা মিনিট একটু জিরিয়ে নিলুম। বাইরে আর কোন আওয়াজ নেই। ওরা সম্ভবত অন্য অন্য গলিতে ছুটোছুটি করে আমাকে খুঁজছে। খুঁজুক, আপাতত আমি কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত। ওপারের খোলা জানালার আবছা আলোয় ভিতরটা দেখে নিলুম। এক চিলতে লন—দু পাশে কিছু, গাছপালা।-ফুলবাগিচা। আর অন্ধকার এই বিপজ্জনক এলাকায় দুঃসময়ে হাসনাহানার সাহস! দুঃসাহস! রাগে বিরক্তিতে মেজাজ খারাপ হল। এটা ঠিক নয়, এসব ঠিক নয়। ইচ্ছে করল শহরের তাবৎ ফুলগাছকে থাপ্পড় মেরে বলি, চুপ করো! পাখিদের ধমকাই, খবরদার এসো না! প্রেমিক প্রেমিকাদের শাসাই। স্বামীস্ত্রীদের পাশাপাশি শুতে নিষেধ করি। এবং কারিগরগণ নিপাত যাও··· এনজিনিয়ারগণ হাত ওঠাও, বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্রাম করো।

সেই সময় দূরে কোথাও বুম বুম আওয়াজ হল ফের। ঘর বাড়ি কেঁপে উঠল। গাড়ির ঘর্ঘর গোঁ গোঁ গর্জন শোনা গেল। প্রচণ্ড উজ্জ্বল আলোর ঝলক এসে ফের অন্ধকারে মিশে গেল বাইরে। পুলিস নির্ঘাত! এতক্ষণে পুলিস এসে গেছে!

এক লাফে সরে এলুম। সামনে চওড়া সিঁড়ি। বেড়ার গড়নের বড় দরজাটা খোলা। তার মানে এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। বেওয়ারিশ সম্পত্তির মতো। সিঁড়ির

মুখের দরজাটা, রামবাবু ভাবেন শ্যামবাবু আটকে দেবেন—শ্যামবাবু ভাবেন যদুবাবু এবং দারোয়ান যদি বা থাকে সে নেশায় বুঁদ। সে আছে। সিঁড়ির ধাপের এক পাশে চোরকুঠুরি মতো—সেখানে খাটিয়ায় নির্ঘাত সেই স্তব্ধ লোকটাই বটে। কয়েক ধাপ চুপিচুপি উঠে দেখলুম দোতালার সিঁড়ির মাথায় একটা বালব জ্বলছে। বালবটা কালিঝুলি মাখা। প্রথমে গেট ফুলগাছ ইত্যাদি দেখে ভেবে ছিলুম, বাড়িটা চমৎকার এবং পরিচ্ছন্ন হবে—কিন্তু ক্রমশ তার বার্ধক্য, জীর্ণতা ও অবহেলার চিহ্নগুলো চোখে পড়তে লাগল। যত উপরে উঠছি তত মনে হচ্ছে কোন অস্বস্তিকর পোড়ো জায়গায় আমি ঢুকে পড়েছি। দোতলার চারটে দরজায় তালা ঝুলছিল। দল বেঁধে কোথায় চলে গেছে ওরা? তেতলার তিন দিকে তিনটে দরজা। ওপরের বাতিটাও তেমনি অপরিষ্কার। এখানেও দুটো দরজায় তালা ঝুলছে—একটা বাদে। তাহলে এই ঘরের জানালাতে সেই গরিলাটা দেখেছিলুম। একা না সপরিবারে থাকে ও? আশ্চর্য কোন ফ্ল্যাটে কোন নেমপ্লেট নেই! কোন কলিং বেল নেই। দেয়ালে লাল ও কালিতে লেখা অজস্র কথা—যে কথা আমার এবং সবার সবিশেষ মুখস্থ। এবার গা ছমছম করে উঠল। হয়তো আমার পক্ষে নিরাপদ নয় জায়গাটা। হয়তো যেচে পড়ে স্বয়ং "ওদের" কারো খপ্পরেই ঢুকতে যাচ্ছি।

মরীয়া হতে হল। উপায় নেই। পকেটে হাত ভরে পয়েন্ট ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবারটা চেপে ধরলুম। একটা মাত্র গুলি আছে আর। সেই যথেষ্ট। অন্তত কয়েকটি ঘণ্টা আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে নিরাপদে—পরবর্তী আরও অনেক অনেক ঘণ্টা দিন মাস বছর বেঁচে থাকবার জন্যে। এবং সেটা আমার পক্ষে ভারি জরুরী। হায় আমার সাতাশটি ব্যর্থ বছর! সে বিমুগ্ধ বেড়াল ছানার মতো আমার ভিতরে চুপচাপ তাকিয়ে আছে।

খুবই চাপা কড়া নাড়লুম। দুবার। তারপর আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলুম।...

হিরণ্ময় দত্তরায়

.....কী ব্যাপার? ফের আলো গেল! সারা বর্ষা এ উপদ্রব সমানে চলবে। মোমবাতি কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে গেলুম। কর্পোরেশন.....

সেই সময় বউমা দৌড়ে এল।... ..শুনছেন? আজ রাতে ফের শুরু হল।

লাফিয়ে উঠলুম। কী, কী শুরু হল বউমা?

রানু কি বিরক্ত হল আমার ওপর? আসলে আমার কান দুটোকে বয়স ক্রমশ ক্ষয় করে ফেলছে—ঠিক চোখদুটোর মতোই—ওর জানা উচিত হয়তো

জানে, তবু বিরক্ত হয়। আমি জানি, রানু দিনে দিনে ক্রমশ বেশি বিরক্ত হয়ে পড়ছে আমার প্রতি। আমার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা, ছটফটানি, জানলা খুলে দিনরাত্তির নিচের পথটা লক্ষ্য করা এবং আচমকা কে ডাকল বলে দরজার দিকে ছুটে যাওয়া—সবই ওর পক্ষে বিরক্তিকর ঠেকছে। আমি টের পাচ্ছি এগুলো। বিশেষ করে বসবার ঘরে সৌমেনের ছবিটা রাখা তার পছন্দ হচ্ছে না। সৌমেনের সাম্প্রতিক ছবি বলতে এই একটাই—বেশ বড়ো সাইজ এবং একলা। তাছাড়া আর যত ছবি আছে তা অনেক আগের এবং কিছু কিছু বউমার সঙ্গে তোলা ছবি। সেগুলো ফ্যামিলি অ্যালবামে রয়েছে। অ্যালবামটা কখনও নিজের ঘরে রাখি, কখনও রানুকে দিই বা সে নিজেই চেয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে বর্তমানের সৌমেনকে তো পাই না। ইদানীং তার কপালে ভাঁজ পড়ছিল। চোয়াল ঠেলে উঠছিল। তার লাবণ্যটা ক্ষয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। চোখ দুটো অদ্ভুত উজ্জ্বল হচ্ছিল দিনে দিনে। এবং ওই নতুন ছবিতে তার সবটুকুই ধরা পড়ছিল। সৌমেন, আমার একমাত্র সন্তান, বড় আদরের ওই সৌমেন! ঈশ্বরকে বলছিলুম ওর সবটুকু জ্বালা আর উত্তাপ আমাকে দাও! পৃথিবীর অনেক শত্রুশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এ বুড়ো মানুষটির আছে। অনেক দুর্দান্ত বিষয়সমূহ আমার দেখা আছে। অনেক ভয়ঙ্কর উত্তাপ, আলো ফেটে বেরিয়ে-পড়া বিধ্বংসী আগুন, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা দুর্যোগ, অভাবিত দৈত্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। কত দুঃসময় না গেছে! এবং আমি সব সয়ে বা জয় করে আজও টিকে রয়েছি। তাই যা কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা উত্তাপ আধিব্যাধি আমার সইতে কষ্ট হবে না। কিন্তু সৌমেন! ওর জীবনটা তরুণ, নবীন ওর প্রাণ—ওর আত্মায় বড় কোমলতা। পৃথিবীর প্রতি অনেক প্রত্যাশা ওর। জীবনকে অনেক দুর্গম মায়ায় সে গভীরতর স্বপ্নের দিকে চলেছিল। আমি প্রার্থনা করতুম, ওর কষ্টটা আমাকে দাও—ওর যা কিছু সুখ তা ওরই থাক। অথচ·····

ছবির কথা বলছিলুম। এই ছবিটা সে হঠাৎ কেন তুলেছিল, তখন টের পাইনি, পরে যেন পেয়ে গেলুম। এ ছিল ওর চলে যাওয়ার সময় সান্ত্বনা পেতে দিয়ে যাওয়া একটা তাজা স্মৃতি। তার বাবা এবং স্ত্রীকে সে ইচ্ছে করেই এটুকু শুধু দিয়ে গেল যেন। যেন বলে গেল ওই নিয়েই বেঁচে থাকো।

হ্যাঁ, আমি বাহাত্তরের বুড়োমানুষ—আমি পারি শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে। এখন তো আমার মতো সবাই শুধু স্মৃতি নিয়েই বাঁচে। কিন্তু বউমা রানু? সে পারে না। তার রক্তমাংস মনের সব কাজ যে এখনও

অসমাপ্ত! সে চায় সৌমেনের রক্তমাংস—সে চায় তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বটা, পরোক্ষ কিছু নয়। তাই রানুর কষ্টটা কী, তাও আমি জানি! জানি, সে অক্ষম রাগে ছটফট করে। সে তার স্বামীকে অভিশাপ দ্যায়। মাথা কুটে গাল দ্যায়। সে হয়তো তাকে কাপুরুষ ভাবে। তবু রানুকে দোষ দিই নে। সত্যি তো, এমন করে পালাবে যদি তাহলে বিয়ে করেছিল কেন সৌমেন? তার বউ তার নিজেরই পছন্দ এবং আমি কিছু জানতে পারিনি। পরে জেনে বরং খুশি হয়েছিলুম। বউমাকে সাদরে ঠাঁই দিয়েছিলুম।……আর এর পর যদি রানু রাগের বশে কারো সঙ্গে……

সেটা অসম্ভব লাগে। আজকাল মেয়েদের মধ্যে রক্তমাংস-ইচ্ছায় তীব্র হয়ে ওঠাটা আমি লক্ষ্য করেছি। ওই যে কী বলে, সেক্স—যৌনতা, জেনে বা না জেনে তারা তার শিকার হয়ে উঠছে—আধুনিকতা মানেই নাকি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা—সভ্যতা ক্রমশ তাদের শেখাচ্ছে নতুন-নতুন নিয়মকানুন এবং যৌনতাকে মুক্ত করে দেবার সঙ্গেই নাকি মানুষের আত্মিক মুক্তির ব্যাপারটা জড়িয়ে রয়েছে……যাই হোক, রানু বউমার মধ্যে এ ঝোঁকটা সংক্রামিত নয় সম্ভবত। তাছাড়া তার বংশ, শিক্ষাদীক্ষা, ব্যক্তিত্ব—আমার ভরসা রাখার পক্ষে যথেষ্টই। তবে তার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া জাগা তো খুবই স্বাভাবিক। আমি নচ্ছার সেকেলে গৃহস্থ নই যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুণ্ডুপাত করব। সৌমেন যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে তক্ষুনি রানুর বাবা যাই বলুক ফের তার বিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করবই। অবশ্য রানুর মতামতের ওপর নির্ভর করবে সেটা।

আরে তাইতো! কী ভাবছি! আমার বুক ধড়াস করে উঠল। পা দুটো অসম্ভব ভারি লাগল। কাঁপুনি এল। সৌমেন, আমার একমাত্র সন্তান সৌমেন! আমি কি তাহলে ইচ্ছার অজানতে তার মৃত্যু কামনা করি? না না—যেখানেই থাক্ বেঁচে থাক। সে যা খুশি করুক, আমার কোন আপত্তি নেই আর—শুধু বেঁচে থাকুক। আজ অব্দি কত বিজ্ঞাপন দিলুম কাগজে, ছবি ছাপলুম, থানায় থানায় জানানো হল, অসনাক্তকৃত সব লাশের শুধু ছবি নয়—প্রত্যক্ষে গিয়ে দেখে এলুম—কতবার কতজনের লাশে সৌমেনকে ভুল দেখলুম। কিছুদিন আগে ন'টা লাশের একটায় ওকে খুঁজে পাওয়ার পরক্ষণে আরেক দাবিদার এসে বলল, এ তার মৃগাঙ্ক। অনেক ঝামেলা, পরীক্ষা, বিতর্ক—হাল ছেড়ে সরে এলম—হ্যাঁ ও মৃগাঙ্কই। সৌমেন নয়।…

তাই মনে হয়, সে পুলিসের ভয়ে কোন কারণে গা ঢাকা দিয়েছে। সে শিগগির এক সময় দেখা দিয়ে যাবে তার বাবা আর স্ত্রীকে। সে আসবেই। কারণ তার মতো ছেলের পক্ষে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে যাওয়া খুব জরুরী। হয়তো চিঠি লেখার অসুবিধে আছে কিংবা চিঠিতে সব বলা যাবে না—সেটা বিপজ্জনকও হতে পারে; তাই সে আসবে মুখোমুখি কৈফিয়ৎ দিতে। হয়তো চুপিচুপি এসে কড়া নাড়বে যখন হঠাৎ এমনি ইলেকট্রিসিটি ফেল, অন্ধকার রাত, মধ্যরাত, নির্জন পথঘাট, বৃষ্টি, ঝড়ো বাতাস বইছে—ভিজে পোশাকে সে চুপিচুপি উঠে আসবে তেতলায়। সে লক্ষ্য করবে, এ বাড়ির সব ফ্ল্যাটে তালাচাবি—সবাই পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে, কী চমৎকার নির্জনতা সে পেয়ে যাবে···

হ্যাঁ, তাই দারোয়ানকে বলে রেখেছি সিঁড়ির দরজাটা দিনরাত্তির যেন খোলা রাখে। লোকটা ভীতু কিন্তু হৃদয়বান। হৃদয়বত্তা তাকে সিঁড়ির দরজাটা খোলা রাখতে বাধ্য করে—কেবল ভীরুতা তাকে গেটের সদরকপাট দুটো বন্ধ করে দিতে হুকুম দ্যায়। এবং একটা জানালা খুলে আমি তাকিয়ে থাকি রাস্তার দিকে—সারা রাত—সারাটি রাত। আমার ঘুম আসে না। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে, সে যদি বা আসে—আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে লজ্জা পাবে, (ছেলে-বেলায় বড় অকারণে সৌমেন আমাকে কী ভয় না করত।) রানু দরজা খুলে দেবে—রানুর ঘরে চলে যাবে সে—এবং···

রানু চলে গেল কখন? কী সব হচ্ছে বলছিল না? তাই তো! এলাকার সম্ভবত কোন প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটা জখম করে দিয়ে কারা কী সব করছে যে! বার বার বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছে। কাদের সঙ্গে কাদের মারামারি হয় কে জানে। আমি কোন খবর রাখিনে। খবর না রাখাটাই আমার কাল হয়েছে হয়তো। আমার ছেলের খবরও তো আমি রাখতুম না—রাখিনি, তাই এই যন্ত্রণা সইতে হল!

আমাকে ফের জানালায় যেতে হবে। রানু এসে সরিয়ে দিয়েছে আমার জায়গা থেকে। আরে বাঃ! আলো জ্বলে উঠল! এতক্ষণ যদি সৌমেন রাস্তায় এসে থাকে—আমি নির্ঘাত তাকে মিস করেছি। তাহলে এতক্ষণে সে সিঁড়ির ধাপে—চুপিচুপি উঠছে—কড়া নাড়লে ধীরে, চাপা, হয়তো ডাকবে—রানুর নাম ধরেই ডাকবে। ডাকুক, আমি সব টের পেয়ে যাব।···

রাম্ভু দত্তরায়

একটা রাতও রেহাই পায় না ওদের কাছে। ওই, আবার শুরু হল তাণ্ডব। হয়তো আজ সারা রাত ধরে এসব চলবে। বার বার ঘুমের রেশ কেটে যাবে। রাগ হতে-হতে রাগ হতে-হতে ক্লান্ত হবে এবং ক্লান্ত হতে-হতে ক্লান্ত হতে-হতে দুর্বল হবে। কান্না পাবে। কিন্তু আজ সব কান্নাই যে নিজের কাছে লজ্জা। আত্ম-ধিক্কার এবং গ্লানির ব্যাপার! নিজের অসহায়তা যখন পুরোপুরি ধরা পড়ে যায় তখন মানুষ অবশ্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমার ঠাণ্ডা হবার কথা। কিন্তু পারছিনে। ওরা কারা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনে—শুধু মনে হয়, ওদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর জ্বালার প্রদাহ আছে এবং সেই প্রদাহ হঠাৎ হঠাৎ চরমতায় ফেটে পড়ে কারো-কারো ওপর। তাকে গ্রাস করে নেয়। আমার স্বামীকেও গ্রাস করে নিয়েছে। আর এখানেই আমার সান্ত্বনা যত রাগও তত। সান্ত্বনা কারণ আমার মতো আরও কত মেয়ের স্বামী বাবা বা সন্তান এমনি করে তার মুখে পড়ছে। কারণ আমরা কিছু করতে পারছিনে। কমাস আগে এত বড কারখানাটা বন্ধ হয়ে আমার স্বামীর চাকরি গেল। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়তে লাগল। সংসারে টান ধরল। আমার ভোগীপ্রকৃতির শ্বশুর সঞ্চয়ে পটু ছিলেন না। তাঁর পেনশনের টাকায় চলে হয়তো যাচ্ছে, কিন্তু এ কি মানুষের বেঁচে থাকা? বাইরে বেরিয়ে কিছু একটা যোগাড় করে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার কষ্ট হয়। ভিতরটা ছটপট করে। শ্বশুরমশাই আবার বড্ড গোঁড়া আর সংকীর্ণমনা। হয়তো প্রচণ্ড রকমের ভীতুও। স্বামীর জন্যে অনেক ছুটোছুটি করব ঠিক করেছিলাম। হয়তো ঠিকই তার খোঁজ পেয়ে যেতুম—কিন্তু শ্বশুরমশাই আমাকে কোথাও একা যেতে দেবেন না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এটা একটা বন্দিত্ব। একটা খাঁচায় আটকে গেছি নিজের অজানতে। আর ওই স্বার্থপর বুড়োটা আমাকে তার শূন্য সিন্দুকের ওপর যখ বসিয়ে রেখেছে।

নাঃ আর পারছিনে। অসহ্য লাগছে। এবার আমি পালাবই, পালাব। কেন আর এখানে থাকব শুনি? এই শূন্যতা আর মিথ্যে প্রতীক্ষা, এই একঘেয়ে দিনরাত্তির···ওঃ! তাছাড়া বাড়ি ছেড়ে সব ভাড়াটে পরিবারগুলো পালিয়ে গেল একে একে। পাড়াটাও নাকি খালি হয়ে যাচ্ছে। শুধু পড়ে রয়েছে কিছু বুড়োবুড়ি আর কিছু কাচ্চাবাচ্চা! মাঝে মাঝে শুধু ওই বোমা ফাটার আওয়াজ,

গুলির শব্দ, অস্পষ্ট দু-চারবার গর্জন বা আর্তনাদ ছাড়া বিকট স্তব্ধতা সব সময় স্থির হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ বা কারা সাঁৎ সাঁৎ করে চলে যায় রাস্তায়। আর কোন লোক নেই! এই নিঃঝুম যক্ষপুরীর মধ্যে আমার বাইশ বছরের তাজা প্রাণটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি থাকব না—পালাবই পালাব।

কিন্তু যাবো কোথায়? বাবা-মা আমার ওপর ভিতরে-ভিতরে চটে আছেন। তাঁদের মনোনীত পাত্রকে আমি অপমান করেছি। তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অন্যকে চুপিচুপি বিয়ে করে ফেললুম। রেজেস্ট্রির পর সব জানিয়ে দিলুম দুপক্ষকে। আমার বাড়িতে বেশ কিছুদিন ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটে গেল। আমার স্বামীর বাড়িতে অবশ্য তেমন কিছু ঘটলই না। ঘটত—যদি আমার শাশুড়ী বেঁচে থাকতেন। কারণ এসব ক্ষেত্রে মেয়েরাই তো মেয়েদের বড়ো শত্রু। আমার মা-ই আমার বড়ো শত্রু আমি জানি। তাই ওবাড়ি চলে যাবার কথা আর ওঠেই না। শত্রু হাসবে। আর কোথায় যাবো তাহলে? আমি খুঁজে মনে মনে ভাবি, ভাবতে ভাবতে দিনরাত্রি কেটে যায়। তবু আমি পালাবই পালাব। আঃ আমার ভিতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। আর কিছুদিন থাকলে আমি মরে যাবো। না না—বেঁচে থাকতে চাই।... ...

যাবার আগে ও কোন কথা বলে যায়নি। হঠাৎ এক বিকেলে বেরিয়ে গেল চা খেয়ে। কেমন গুম হয়ে ছিল সারাটা দিন। ইদানী খুব সহজে ও বিরক্ত হত বলে আমি আর কোন প্রশ্ন করতুম না ওকে। কেমন খটরাগী আর বদমেজাজী হয়ে পড়ছিল ও। ভাবতুম চাকরি-বাকরির ব্যাপারে ও উদ্বিগ্ন। খুব কম কথা বলত। চুপচাপ বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে। ফেরার কোন ঠিক ছিল না। শ্বশুরমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফিরে এসে তাঁকে কিছু কৈফিয়ৎ দিত। আমাকে দিত না। তার দরকারও ছিল না। রাতের দিকে ওর কাছ ঘেঁষে যেতুম। ওর স্পর্শ পেতে চাইতুম। আমার রক্তমাংস চঞ্চল হয়ে উঠত অভ্যাসে। ও আস্তে ঠেলে পাশ ফিরে বলত, গরম বড্ড। একটু সরে শোও তো রানু!

আমার কান্না পেত। তবে কি আমার ওপর ও কোন কারণে রাগ করেছে? মিথ্যে সন্দেহ? অবিশ্বাস কিছু? কেউ কি ওর কান ভারি করেছে? কিন্তু ঈশ্বর জানেন, মনে না হই—দেহে তো আমি নিষ্পাপ। আমি কাঁদতুম চুপি চুপি।

আশ্চর্য, ও ঠিকই টের পেয়ে যেত। হঠাৎ ঘুরে দু হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত আর বলত, না রানু না—তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। কারো

ওপর নেই। আমার সব রাগ দুঃখ নিজের ওপরে। নিজেকে আমি আর সইতে পারছিনে। তুমি বিশ্বাস করো—আমার বড় জ্বালা রানু, অসম্ভব জ্বালা।

আমি নারীর স্বাভাবিক প্রেরণাদাত্রী ভূমিকায় বলতুম, তোমার সব জ্বালা আমাকে দাও।

পাগল!···বলে ও চুপ করে যেত। জড়িয়ে ধরা বাহু শিথিল হয়ে যেত। তারপর ও চিৎ হয়ে শুয়ে থাকত।

জানতুম ও তাকিয়ে আছে। কিছু ভাবছে। বলতুম, কী হয়েছে বলবে না লক্ষ্মীটি? তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বলো।

ও কোন জবাব দিত না। কখনও বলত, কিছু না।

ভাবতুম, ওর যত কষ্ট সবটাই নিছক টাকা-পয়সা সংক্রান্ত। বেকারদের হয়তো এমনি সব হয়। বলতুম, ভেবো না—একটা কিছু পেয়ে যাবেই।···

চলে যাবার আগের রাতে—যেন ঘুমের ঘোরে কয়েকবার একটা কথা উচ্চারণ করেছিল। আমি তখনও ঘুমোইনি, কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিলাম? এক ঝলক রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল হৃৎপিণ্ডে। কী বলছে ও?···

ট্রেটর···আমি ট্রেটর···ওঃ আমি ট্রেটর···

কী যেন বুঝলুম—অথবা বুঝলুম না। ওর রহস্যময় কালো পর্দাটা হঠাৎ যেন কিছু ফাঁক হয়ে গেল। অথবা সবই আমার ভুল ধারণা, ভুল শোনা। আমার রক্ত তবু এত হিম হয়ে গেল, উরু ভারি হল, ক্রমে মাথার ভিতরটা বরফ হতে থাকল। নিঃসাড় পড়ে রইলুম।

কথাটা আজও শ্বশুরমশাইকে বলিনি। বলা সঙ্গত মনে করিনি। আমি জানি কী ঘটেছে। মিথ্যে শাঁখাসিঁদুর আর সধবার বেশ আমার মিথ্যে বউ সেজে থাকা অন্যের সংসারে—ওর আর ফেরা হবে না।

তবু রক্তের ভিতর প্রতীক্ষার কাঁটা খচখচ করে ওঠে। সিঁড়ির বিশাল খোলে ঘুরপাক খায় হাওয়া। শব্দ ওঠে কড়া নাড়ার মতো লাগে। ধড়মড় করে উঠে বসি। ছুটে যাই দরজার দিকে। দরজা খুলতে গিয়ে ঠিক করে নিই, ঠিক কী বলব। তারপর খুলি। আবছায় হলুদ কিছু রেখা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যায়। নিছক শূন্যতার কাঁপন থেকে ফুরিয়ে যায় একটা প্রতিভাস। আর পিছনে দৌড়ে আসেন শ্বশুরমশাই। অস্ফুট কণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলেন, এল? না? কে? বউমা, ও বউমা! কথা বলছ না কেন?

আমি কী বলব? শুধু বলি, বাতাস। সরে আসি।. পিছু ফিরতেই বসবার ঘরে ওই ছবিটা চোখে পড়ে। রাগে ক্ষোভে দুঃখে ওটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। যে নেই, তার নিশ্চল প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ট্রেটর। বিশ্বাসহন্তা।···

দীপক মিত্র

যে দরজা খুলল তাকে আমি চিনিনে। কিন্তু তার শরীরের পাশ দিয়ে ঘরের ভিতর উঁচু টুলে রাখা মস্তো ছবিটা কার জানি। তাকে ভালই চিনি। মুহূর্তে আমার মাথার ভিতর আগুন দপ করে উঠল। কান দিয়ে গরম গ্যাস বেরিয়ে গেল। চোখ দুটো ফুলে উঠল। সৌমেন! এই সৌমেনের ঘর এবং অবশেষে এখানেই আমি এসে পড়েছি!

আমার চমকটা এই মহিলার চোখে পড়ল কি না বুঝলুম না। কিন্তু উনিও আমাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। কাঁপানো গলায়—একপা পিছিয়ে বললেন, কা-কাকে চাই?

সামলে নিয়েছিলুম। ঠাণ্ডা স্বরে বললুম, আজ রাতের মতো এখানে থাকব। চেঁচামেচি করবেন না। কোন লাভ হবে না। কোন ক্ষতি করব না আপনাদের। শুধু এই রাতটা···

আশ্চর্য, সরে পিছিয়ে গেলেন মহিলাটি। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলুম। এগিয়ে গিয়ে ধুপ করে বসে পড়লুম। বললুম, এক গ্লাস জল দিন। স্রেফ জল। এত রাতে আর খাবার জন্যে উত্ত্যক্ত করব না। একটা মাদুর থাকলে দেবেন। এখানেই শোব।

কোন কথা বললেন না উনি। সৌমেনের বউ! তাহলে কি এরা এখনও খবরটা পায়নি?

পকেটে হাত রেখেছিলুম—পাছে গোলমাল করলে ওটা বের করে ভয় পাইয়ে দিতে হয়। দরকার হবে না। হাত বের করলুম। ঘরের ভিতরটা লক্ষ করছিলুম। দুপাশে দুটো ঘর। ময়লা ছেঁড়া পর্দা দরজায়। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই এঘরে। একটা র‍্যাকে কিছু বই। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। দেয়ালে ক্যালেণ্ডার। আর টুলে সৌমেনের ছবিটা। ছবিটার দিকে

তাকাতে ভয় হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এখনও সৌমেন বলছে, তোর চেহারায় কোন খুনীর আদল নেই। তোকে ভয় করিনে, দীপু।···

খুব শিগগির জল এসে গেল। ওঁর দিকে না তাকিয়ে ঢকঢক করে জল খেলুম। তারপর গ্লাসটা রাখতে যাচ্ছিলুম নিচে, উনি হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন। চলে যাচ্ছিলেন, আমি ডেকে বললুম, শুনুন!

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন।

ঘরে আর কে সব আছে?

আমি আর বাবা।

ওই ছবি যার—সে কোথায়?

জানিনে।

আপনি কে?

বাড়ির বউ।

ওই ছবিটা তাহলে আপনার স্বামীর?

হুঁ।

একটু চুপ করে থাকলুম।

সৌমেনের বউ বলল, আর কিছু জানতে চান?

হ্যাঁ—যাঁকে বাবা বললেন, তিনি আপনার শ্বশুরমশাই নিশ্চয়?

হুঁ।

আপনার স্বামী নেই কেন?

জানিনে।···আপনাকে বিছানা এনে দিই।

চলে যাচ্ছিল সৌমেনের বউ। ঠিক তক্ষুনি পাশের ঘরের পর্দা তুলে আচমকা সেই জানালায় দেখা বুড়ো গরিলাটা এসে পড়ল।···কে কে এসেছে? সমু? ···কে কে তুমি? কে আপনি? কথা বলছেন না কেন? বউমা, কে এ?

সৌমেনের বউ বলল, আঃ চুপ করুন বাবা। উনি আপনার ছেলের বন্ধু—ওর খবর এনেছেন।

আমি চমকে উঠলুম। হৃৎপিণ্ড ধকধক করতে থাকল। ও কি সব জেনে শুনে বলছে—নাকি নির্বোধ শ্বশুরকে উত্ত্যক্ত করতে চাইছে না? ওর দিকে তাকালুম। কী নিষ্পলক চাহনি, কী উজ্জ্বলতা। আর ঠোঁটের কোণায় ওই চুপিচুপি হাসির রেখাটা কেন? আমার রিভলবারটা হয়তো পকেটের ভিতর মরচে ধরে জ্যাম হয়ে গেল। নষ্ট ট্রিগার তার। শেষ গুলিটা ভিজে।

চাপা গলায় বুড়ো লোকটি ঝুঁকে এল। সমু কেমন আছে বাবা? কোথায় আছে সে? কী করছে! একেবারে ছেলেমানুষ বরাবর! ভয় পাবার কী ছিল এত? আমি পুলিসের বড়কর্তার কাছে যেতুম—আমি রিটায়ার্ড গভমেণ্ট অফিসার—

বাধা দিয়ে বললুম, ওর ভয় পুলিসকে নয়। আপনার ছেলে ছিল ট্রেটর—বিশ্বাসঘাতক। তাই···

খবর্দার! বুড়ো গরিলাটা গর্জে উঠল।

আমি হাসলুম।···আপনার বউমাকে জিগ্যেস করুন।

সৌমেনের বউ আমাকে অবাক করে বলল, হ্যাঁ বাবা। উনি ঠিকই বলেছেন।

অসম্ভব! এ লোকটা মিথ্যেবাদী···বুড়ো চেঁচামেচি শুরু করল।··· মিথ্যুক, বদমাস জোচ্চোর সব! আমি কাকেও বিশ্বাস করিনে। সবাই ট্রেটর! সবাই বিশ্বাসঘাতক।

সৌমেনের বউ এগিয়ে এসে বলল, আঃ কী হচ্ছে বাবা! চুপ করুন।

বুড়ো আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে বলল, এক্ষুনি চলে যান আপনি। কে বলেছিল এ মিথ্যে খবর দিতে? চলে যান বলছি। আমার সমু বিশ্বাসঘাতক?···

এবার পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে উঠে দাঁড়ালুম।···বেশি চেঁচাবেন না। যান, নিজের ঘরে চলে যান। আমি রাত্তিরটা এখানে থাকব। উত্ত্যক্ত করলে প্রাণটা খোয়াবেন বলে দিচ্ছি।···দেখুন, আপনার শ্বশুরকে নিয়ে যান তো ও ঘরে। আমার মাথার কিছু ঠিক নেই। এই ওল্ড ফুল। চুপ! ডোণ্ট শাউণ্ট।

বুড়ো কয়েক মুহূর্ত আমার অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থেকে দুহাতে মুখ ঢাকল। কেঁদে ফেলল। বসে পড়ল। জড়ানো স্বরে বলল, মারো—আমাকে বরং মেরেই ফেলো। সমুর কী হয়েছে এবার বেশ বুঝতে পারছি। আমার বেঁচে কোন লাভ নেই।

সৌমেনের বউ শ্বশুরকে সামলাচ্ছিল। এবার অদ্ভুত হাসল সে।···কী হল? পারবেন না? গুলি নেই আর? নাকি খেলনার জিনিস? ভীতু! বুঝতে পারছি, ওই যথেষ্ট। আসলে আপনি আর খোলস ছেড়ে বেরোতে পারছেন না। তাড়া খেয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই না?

রাগে আমার মাথার ঠিক ছিল না। বললুম, সৌমেনের মতো ছেলের জন্ম যে দিয়েছে, আমার ঘৃণা তার ওপরই বেশি। কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত—শুধু একটু আশ্রয় আর একটুখানি ঘুমের বদলে সব দিতে পারি।

বুড়োকে টেনে পাশের ঘরে নিয়ে গেল ও। তারপর ফিরে এল। নিজের ঘরে গেল। বিছানা নিয়ে এল। মেঝেয় পরিপাটি বিছিয়ে দিয়ে বলল, শুয়ে পড়ুন। আমারও বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ। আর···

বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বললুম, থামলেন কেন? আর?

আপনাকে ধন্যবাদ।···বলে দ্রুত ঘরে চলে গেল সৌমেনের বউ।

আমার ঘুম এল না। ওই ছবিটা! সৌমেন! খালের ধারে তার শ্বাসনালীটা আমিই কেটে দিয়েছিলুম। লাশটা পুড়িয়ে ফেলেছিলুম। এবং আবছা শব্দে অনুমান করছি ওঘরে কী ঘটছে। যেটুকু কাজ বাকি ছিল তা নিষ্পন্ন হচ্ছে চুপিসাড়ে। সৌমনের বউ শাঁখা ভাঙছে। সিঁদুর মুছছে। বাকসো থেকে সৌমেনের ধুতি বের করে পরছে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার কান্নার শব্দ বাড়ছে ধূপের ধোঁওয়ার মতো, কুয়াশার মতো, সর্বগ্রাসী সঞ্চরণশীল সেই বিলাপ আস্তে আস্তে দরজার ফাটল দিয়ে এগিয়ে এল আর এগিয়ে এল।

কতক্ষণ আমি কান চেপে পড়ে রইলুম। তবু মনে হল, এক শোকাকুল পৃথিবী থেকে কিছুতেই পালানো যাচ্ছে না।··আর ওই মহাকায় অজগর সাপটা—বিলাপের সাপ, পাকে পাকে জড়িয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলছে। একটু বাতাস চাই, একটুখানি বাতাস!

তারপর ভোরের আগে একটু ঘুমের আমেজ এল। স্বপ্ন দেখলুম, হাজার হাজার সৌমেনের ছবি পড়ে যাচ্ছে চারপাশে। ঢেকে ফেলছে পৃথিবীকে।

পড়ন্ত তাসের মতো স্তূপাকার বিশৃঙ্খল সৌমেনদের মধ্যে আর আমার পথ খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।·····

গল্পের গরু

আমার দস্যি ছেলে পুটুর জ্বর। গোবিন্দবাবু ডাক্তার তাকে নাড়াচাড়া করে বললেন, কী রে? ঠাণ্ডা বাধালি কোথায়?

পুটু বলল, জলে।

স্থলে নয়, জলে তা তো বুঝতেই পারছি। ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন। কন্তু জল তো বাবা, নানারকম। কুয়োর জল, টিউবেলের জল, ডোবার জল, নদীর জল। তোমার জলটা কী ছিল?

পুটু আরও গম্ভীর হয়ে বলল, তালপুকুরের।

তালপুকুরের। গোবিন্দবাবু ভাঁটার মতো চোখ করে বললেন। মানে সিঙ্গিদের তালপুকুরের? সে তো ডোবা বাবা! সেখানে নেমেছিলে কেন? বলে উনি ব্যাগের ভেতর কী একটা হাতড়াতে থাকলেন।

পুটু চোখ পিটপিট করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বলল, কাল তালপুকুরে সুইমিং রেস হল না? তারপর সে তড়াক করে উঠে দৌড়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন, ধরো! ধরো!

আমি মহাখাপ্পা হয়ে চেঁচালুম, পুটু! পুটে! একই সঙ্গে কোথায় পুটুর মায়ের গলা শুনলুম, ও পুটু! পুটুন! তারপর কেউ খনখনে গলায় বিকট হেসে বলে উঠল, এই ধরেছি।

জানলা দিয়ে দেখলুম, মধুরবাবু পুটুকে শূন্যে তুলে নিয়ে বাড়ি ঢুকছেন। পুটু বেজায় হাত-পা ছুঁড়ছে। উঠোনের মাঝামাঝি আসতে না আসতে তারপর সম্ভবত পুটু মধুরবাবুর হাতে কামড়ে দিল। অমনি উনি ওকে ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, যাঃ। ফস্কে গেল।

পুটুকে আর দেখতে পেলুম না। গোবিন্দবাবু বাঁকা হেসে চাপা গলায় বললেন, মধুরকেষ্ট তোমার বাড়ি আসে দেখছি। সাবধান! এক নম্বর ফ্রড।

মধুরবাবু পুটুর মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। ডাক্তারের কথা শুনে বললুম, বলেন কী! কৈ, তেমন কিছু তো শুনিনি ওর নামে! তাছাড়া দেখে ভাল-মানুষ বলেই মনে হয়।

ডাক্তার বললেন, চকচক করলেই সোনা হয় না। ওর রেলের চাকরি তো এমনি-এমনি যায়নি। ভাল চাও তো লোকটাকে বেশি পাত্তা দিও না। বলে উনি প্যাড বের করে প্রেসক্রিপশান লিখতে থাকলেন।

আমাদের এই বসন্তপুর এখন প্রায় শহর হয়ে উঠেছে। হাইওয়ে আর রেললাইনের দৌলতে আমার চোখের সামনে এ শ্রীবৃদ্ধি। অসংখ্য নতুন-নতুন লোক এসে ভিড় করছে। কত লোককে আমি চিনি না ভাবলে কেমন অসহায় লাগে। এই মধুরবাবুকে কিছুদিন ধরে বসন্তপুরে দেখছি। আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে ভালমতো। স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ব্রজেনবাবুর নাকি দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। পঞ্চান্নর মতো বয়স মনে হয়। ঢ্যাঙা শুঁটকো চেহারা। খাড়া প্রকাণ্ড নাক। বড়-বড় কান লোমে ভর্তি। ঠোঁটের ওপর হিটলারী গোঁফ আছে। কিন্তু পোশাক দেখলে বোঝা যায় লোকটা তেমন কিছু সুখে নেই। নোংরা ঢিলেঢালা প্যান্টের ওপর শার্টটাও মলিন এবং ওই কালো কোর্টটা যে রেল-

আমলের, তা দিব্যি কেটে বলা যায়। বলেন, টিসি ছিলুম মশাই! ঘুষ খেতুম না বলে হ্যাঙ্গামা হত। শেষে হ্যাত্তেরি বলে চাকরি ছেড়ে দিলুম। স্বাধীন-ভাবে একটা কিছু করার তালে আছি।

এ-কথায় অবিশ্বাসের কিছু নেই। বসন্তপুরের মতো উঠতি জায়গায় বাইরের লোকেরা তো এভাবেই এসে জুটছে। একটা কিছু করেও নিচ্ছে। অগত্যা চায়ের দোকানও। তাই মধুরবাবু নিশ্চয় একটা কিছু করে ফেলবেন শেষপর্যন্ত।

মধুরবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, আরে? ডাক্তার যে! তাই তো বলি শ্রীমান গুলতির গুলির মতো ছুটল কেন? ও মশাই, জানেন তো? গোবিন্দকে দেখা দূরের কথা, ওর গন্ধ পেলেই পেসেণ্ট লেজ তুলে পালায়! বিস্তর ডাক্তার দেখেছি মশাই, এমন কখনও দেখিনি যে রোগ পালানোর বদলে রুগীই পালিয়ে যায়।

গোবিন্দবাবু গুম হয়ে প্রেসক্রিপশন লিখছেন। গ্রাহ্য করলেন না। মধুরবাবু হাসতে হাসতে চেয়ার টেনে বসে ফের বললেন, কী হে ডাক্তার? রাগ হচ্ছে বুঝি? দেখো ভাই রাগের বশে সুঁই বের করো না।

ডাক্তার আমার হাতে প্রেসক্রিপশান গুঁজে দিয়ে বললেন, সামান্য ঠাণ্ডালাগা জ্বর। এবেলা বরং গরম দুধ-রুটি খাক। ওবেলা স্রেফ গরম দুধ।

দুধ! মধুরবাবু লাফিয়ে উঠলেন। মেঘ না চাইতেই জল দেখছি যে! ওই দুধের কথা বলতেই আসছিলুম। কী আশ্চর্য!

গোবিন্দবাবু ব্যাগ তুলে নিয়ে বাঁকা চোখে বললেন, দুধের কারবার শুরু করেছ বুঝি?

করেছি। মধুরবাবু মাথা কাত করে বললেন। অনেকদিন থেকে একটা কিছু করার তালে ছিলুম। শেষে ভেবে দেখলুম, বসন্তপুরে খাঁটি দুধ মেলে না। আমি খাঁটি দুধ সাপ্লাই দেব। সেণ্ট পারসেণ্ট দুধ উইদাউট এ সিঙ্গল ড্রপ অফ ওয়াটার!

ডাক্তার ফিক করে হেসে বললেন, গরু পুষেছ নাকি হে মধুরকেষ্ট?

মধুরবাবু সিরিয়াস এখন। বললেন, পুষেছি। বিশাল গরু। হরিয়ানার বংশ। এ গ্রেট কাউ। গোমাতা সুরভি বলতে পারো। দুধে বসন্তপুর ভাসিয়ে দেব দেখবে।

ভাল। গোবিন্দবাবু আমার উদ্দেশে চোখে ঝিলিক তুললেন। খুব ভাল। এবার তাহলে যথার্থ গোস্বামী হয়েছে মধুরকেষ্ট। কিন্তু তোমার গরুটি গাছে চড়তে পারে তো?

অত না ভেবেই মধুরবাবু জবাব দিলেন, পারে বৈকি।

পারে? ডাক্তারের মুখ পাকা খরমুজের মতো ফাটাফুটি হল। খুব ভাল। গাছে চড়ে যে গরু, তার দুধ খাঁটি না হয়ে যায় না। গাছের ডগার কচি-কচি পাতা খায় কিনা! ওহে মধুরকেষ্ট, আর ছিলিম টেনো না। লাং ফেঁসে যাবে।

বলে ডাক্তার চলে গেলেন। মধুরবাবু ততক্ষণে ঠাট্টাটা টের পেয়ে গেছেন। খাপ্পা হয়ে বললেন, শুনলেন? আমাকে গাঁজাখোর বলে গেল। আপনি বিশ্বাস করলেন আমি গাঁজা খাই!

মধুরবাবুর গাঁজা খাওয়ার কথা শুনেছি অবশ্য। একদিন সন্ধ্যাবেলা হাইওয়ের ধারে বদ্রী মুচির কাছে বসে ওইরকম কিছু করছেন বলে সন্দেহ হয়েছিল। আমাকে দেখে বলেছিলেন জুতোটা সারিয়ে নিচ্ছি। সন্ধ্যাবেলায় জুতো সারানোটা কাজের কথা নয়। যাই হোক, ওঁকে সন্তুষ্ট করতে বললুম, ডাক্তারবাবু রসিকতা করছিলেন। ছেড়ে দিন।

মধুরবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন। তবে আমি কিন্তু রসিকতা করছি না। সত্যি বলছি দুধের গরু কিনেছি। প্রচুর দুধ। যে দরে দুধ কেনেন, তার এক পয়সা বেশি নেব না। তাছাড়া ভেবে দেখুন, ভেজাল দুধ খেয়ে শ্রীমানের কী দশা! একটুতেই জ্বরজ্বালা সর্দিকাশি লেগেই আছে। খাঁটি দুধটা পেলে ছেলে দুদিনেই পালোয়ান হয়ে উঠবে।

পুটুর মা কান করে শুনছিল। এবার সায় দিয়ে বলল, ওঁকে বলো দু'লিটার করে নেব—যদি ভাল দুধ হয়। আর যেন একটু সকাল-সকাল পাই। কালু ঘোষের ছেলে ডেয়ারি করে যেন মাথা কিনে নিয়েছে। বেলা দশটায় এসে জাঁক দেখিয়ে বলে, আগে কলকাতারটা এক্সপোর্ট করব, না আপনাদেরটা? এক্সপোর্ট শিখে গেছে।

কী বলে, বললেন মা? এক্সপোর্ট! খিকখিক করে হাসলেন মধুরবাবু। মানে জানে ব্যাটা? ঠিক আছে, ভাববেন না। কাল থেকে আমার গরুর দুধ আপনার বাড়ি সাপ্লাই দেব, তারপর অন্যত্র।

পরদিন মধুরবাবু ভোরবেলা সত্যিসত্যি যখন এনামেলের মস্ত পাত্রে দুধ এনে

ঘুম থেকে ওঠালেন, অন্তত আমি খুব অবাক হয়ে গেলুম। বললেন, একটু হ্যাঙ্গামা হচ্ছে। যাকে দিয়ে দোহানো ঠিক করেছিলুম, সে বড্ড ফাঁকিবাজ। ট্রায়াল দিয়ে দেখি, বাঁট টানতে পারে না। বলে, আর বেরুচ্ছে না। শেষে নিজেই লেগে গেছি। মানুষ পারে না কী তাই বলুন না?

পুটুর মা দুধ জ্বাল দেবার পর বলল, ভীষণ ঘন দুধ, বুঝলে? শুধু কেমন একটু গন্ধ। পুটু খাবে তো?

বললুম, জোর করে খাওয়াতে হবে। কৈ, আমায় এক কাপ দাও তো। টেস্ট করা যাক্।

হুঁ, সত্যি কেমন একটু গন্ধ। তবে সয়ে যায় একটু পরে। বিকেলে বেরিয়ে মধুরবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল। গন্ধটার কথা বললুম। শুনে মধুরবাবু হাসলেন। ···মশাই। এই তো নিয়ম। ভেজাল খেয়ে-খেয়ে এমন হয়েছে যে খাঁটি জিনিস কেমন অচেনা ঠেকে। গন্ধের কথা বলছেন? হরিয়ানার বিদেশী ষাঁড়ের ঔরসজাত সন্তান কিনা। ইণ্ডিয়ান নাকে একটু ফরেন-ফরেন ঠেকতেই পারে। তবে দেখবেন, কী দারুণ বলবীর্যবর্ধক দুধ। সায়েবদের স্বাস্থ্য যে অমন পেল্লায় তার মূল কারণটা তো এই।

পুটুকে খাওয়ানো সমস্যা দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুদিনেই তার চেহারায় চেকনাই লক্ষ্য করছি। গোবিন্দ ডাক্তারের ওষুধের কথা তুললে পুটুর মা ভুরু কুঁচকে সুন্দর কটাক্ষ হেনে বলল, ওষুধ বুঝি খেয়েছে তোমার ছেলে? খাওয়াতেই পারিনি। মধুরজ্যাঠার গরুর দুধেই কাজ হয়েছে।

বিশ্বাস করা যায়। মধুরবাবুর গরুর বাবা হাঙ্গেরিয়ান সায়েব, মা নেটিভ। একটু গন্ধ হতে পারে। তবে এ দুধ তিনজনেই পান করছি এবং বাড়িতে আজকাল স্বাস্থ্য ফেরার কানাকানিও চলছে। পুটু তালপুকুরের সুইমিং রেসের ফাইনালে জিতেছে শুনেছি। তার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে গোপনে। এ রুক্ষ বসন্তপুরে বসন্ত এসেছে বলে মনে হয়। মরা গাঙে জোয়ারের মতো একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে ঘটছে। অভ্যস্ত একঘেয়ে যৌবনের ধার ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। মধুররুক্ষ গোস্বামীর সঞ্জীবনী সুধার দৌলতে পুটুর মায়ের চোখে, শরীরে এবং মুখেও ইদানীং শানদেওয়া উজ্জ্বলতা এবং তীক্ষ্ণতা। পুটুর দস্যিপনাটাও আরও বেড়েছে। সারাদিন তালপুকুরে। মাছ ধরার মতো ধরে আনতে হয়। কিন্তু ঠাণ্ডাটা তো আর ওকে কাবু করতে পারছে না। শুধু কাবু হচ্ছি আমি। তার মায়ের মুখের ধারে! কী তেজস্বিনী মহিলা, কস্মিনকালে কল্পনা করিনি।

মধুরবাবুর গরুটিকে একদিন দেখার ইচ্ছে হল। তার দুধে ঘন সর পড়ে। সর তুলে জমিয়ে পুটুর মা মাসান্তে কিছু প্রকৃত ঘি উৎপন্ন করবেই। সেই সমস্যা গোমাতা সুরভিকে দর্শন করার ইচ্ছা কি এমনি? আমার আগ্রহ জেনে মধুরবাবু বললেন, এত আর কথা কী? দুপুরে আসুন। বড্ড রোদ্দুর পড়েছে। পারবেন তো? সারাদিন মাঠে চরতে দিই।

জিগ্যেস করলুম, দূরে নাকি?

তা একটু দূরে। মধুরবাবু বললেন। কাছাকাছি গোচারণ কই? সব তো জমি আর বাড়ি। রেললাইনের ওপারে।

সাহস পেলুম না। কিন্তু দিন দুই পরেই অযাচিত সৌভাগ্য বলতে হয়। বিকেলে বেরিয়েছি—দেখি একটু তফাতে সিঙ্গি মশাইদের বাড়ির ওপাশে বাগানের কাছে মধুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। জনহীন পরিবেশ। বাগানের নিচু পাঁচিল। কোথাও ভেঙে চুরে গেছে। মধুরবাবু আমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন যেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, এই যে! আসুন, আসুন। আমার সুরভিকে দেখতে চেয়েছিলেন না? ওই দেখুন। চুপিচুপি বাগানে ঢুকিয়ে ঘাস খাওয়াচ্ছি। দেখলে ব্যাটা খোঁয়াড়ে নিয়ে যাবে।

গোমাতা দর্শন হয়ে গেল। পেল্লাই গরু বলতে হয়। গায়ের রঙটাও দুধের মত সাদা। তাই বুঝি অমন ঘন দুধ দেয়। বাঁকা প্রকাণ্ড শিং। আপন-মনে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সপ্রশংস দৃষ্টে বললুম, বাছুর কৈ মধুরবাবু? বাড়িতে বাঁধা আছে বুঝি?

মধুরবাবু বিরসবদনে বললেন, আপনাকে বলিনি। দুঃখের কথা কী বলব? বাছুরটা রাতারাতি ভুগে মারা গেছে। আমার বরাত মন্দ। খড়ের বাছুর বানিয়ে যেটুকু পারছি, দোহন করছি। জানি না আর কদিন এভাবে চালাতে পারব। গরুটা হয়তো বেচে দিতেই হবে।

খুব দুঃখ হল শুনে। সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, বেচবেন কেন? এমনি করে চালিয়ে যান। আবার তো বিয়োবে। বাছুরও হবে।

হবে। বলে মধুরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর পা বাড়িয়ে বললেন, চরুক। বুদ্ধিমতী গরু। তেমন বুঝলে পালিয়ে আসবে। চলুন, বাজারের দিকে যাই।

মধুরবাবুর কথা শুনে বিষণ্ণ হয়েছিলুম। তাহলে কি অলৌকিক শক্তি-প্রদায়িনী স্বরভিনির্যাসের বদলে কেলোর গোঁয়ার ষণ্ডটির শুঁতোসহ একপ্রকার সাদা তরলপদার্থ আবার ঔদরিক নিয়তি হয়ে উঠছে? হুঁ, যা আশঙ্কা করেছিলুম, তাই ঘটল। মধুরবাবুর পাত্তা নেই। বেলা বাড়ে। পুটুর মা দরজায় চাতক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা বাড়ে এবং মেজাজও বাড়ে। অগত্যা পুটুকে পাঠাই। পুটু তালপুকুরে যায়। ফেরে না। অগত্যা আমি যাই। হেডমাস্টারমশাই ব্রজেনবাবুর বাড়ির লাগোয়া ঘর করে নাকি বাস করছেন মধুরবাবু, তাই বলেছিলেন। ওঁদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লে ভুলো নামে এক পুরাতন ভৃত্য মুণ্ডু বের করে বলে, মশাই তো এখন ইস্কুলে। আমি বলি, না। মধুরবাবুকে চাই।

মধুরবাবু? ভুলো ফ্যাঁচ করে হাসে। ওঁকে তো ভোরবেলা মেরে বের করে দিয়েছেন হেডমাস্টারমশাই।

সে কী! কেন?

তা বলতে পারব না আজ্ঞে। ...বলে সে ভেতরের উত্তেজিত এক ডাক শুনে দরজা বন্ধ করে ফেলে। ব্যাপারটা রহস্যজনক বটে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। হতাশভাবে ফিরে আসি।

বিকেলে মধুরবাবু এলেন হাঁফাতে-হাঁফাতে করুণ ক্লান্ত চেহারা। বললেন, সবনাশ হয়ে গেছে মশাই! আমার গরু নিখোঁজ। সেই যে কাল বিকেলে কেষ্ট মিত্তিরের বাগানে চরতে দেখলেন, সেই শেষ দেখা। সারারাত খুঁজেছি। সারাদিন খুঁজে হন্যে হচ্ছি। খোঁয়াড় পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে এলুম। নেই।

এই বলে মধুরবাবু ফোঁসফোঁস করে কাঁদতে থাকলেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুলিশে খবর দিয়ে দেখুন না। নিশ্চয় কোনো গরুচোরের কাজ। অত দামী গরু দেখে লোভ সামলাতে পারেনি।

মধুরবাবু নাক ঝেড়ে নোংরা রুমালে মুছে হঠাৎ অদ্ভুত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ষড়যন্ত্রসংকুল চাপা স্বরে বললেন সিঙ্গিদের বাগানের কোনায় একটা ইঁদারা ছিল দেখেছেন। ওটার হিসট্রি জানেন কিছু?

অবাক হয়ে বললুম, সেটা তো পোড়ো ইঁদারা। কেষ্টবাবুর বাবার আমলে ওই ইঁদারায় নাকি হাওয়াকল বসানো ছিল। বেয়াল্লিশের ঝড়ে উড়ে যায় সেটা। ফুল-ফলের গাছে জল সেচতে হাওয়াকল করেছিলেন। তখন তো

ওঁরা জমিদার। পরে অবস্থা পড়ে গেছে। বাগানটা নষ্ট হয়েছে। ইঁদারাটাও ভেঙে থাকতে দেখেছি। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন মধুরবাবু?

মধুরবাবু তেমনি ফিসফিস করে বললেন, এতকাল পরে হঠাৎ আজই সাত তাড়াতাড়ি কেষ্ট সিঙ্গি ইঁদারাটা বুজিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে না আপনার?

মাথামুণ্ডু খুঁজে না পেয়ে বললুম, কী ভাবছেন আপনি?

মধুরকৃষ্ণ শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে গর্জন করলেন। ...গোবধ! পাটকেল ছুঁড়ে খেদাতে থিয়ে গোবধ করে ফেলেছে। তারপর ইঁদারায় ফেলে পাপ চাপা দিয়েছে সিঙ্গি। আপনি ঠিকই বলেছেন। এতক্ষণ পুলিশে যাওয়াই উচিত ছিল। তাই যাচ্ছি। ...বলে উনি নড়বড় করে পা ফেলে প্রায় দৌড়লেন।

এরপর যা ঘটল, তা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি মর্মান্তিক। এমন অদ্ভুত ঘটনা আমাদের বসন্তপুরে কখনও ঘটেনি। ব্যাপারটা এতখানি গড়াত না, যদি না এর মধ্যে গরু থাকত। কেষ্ট সিঙ্গি হাড়কেপ্পন মানুষ। কনট্রাকটরি এবং পরবর্তীকালে গোপনে মহাজনীবৃত্তি, চোরাকারবার নানান ধান্ধায় কিছু পয়সা করেছিলেন। কৃপণতা এবং অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ঈর্ষাও ছিল বিস্তর লোকের। পরদিন দুপুরের মধ্যে পুলিশের তদারকিতে ইঁদারা খোঁড়া হল এবং আশ্চর্য ঘটনা, গরুর লাশও বেরুল! ভিড়ের কানে তালা ধরিয়ে মধুরবাবু চিলচিৎকারে ফেটে পড়লেন। আর লাশের ওপর পড়ে সে কী তুমুল কান্না।

কেষ্ট সিঙ্গির অবস্থা শোচনীয়। দারোগা সাহেব বরকতুল্লাও বড় কড়া-ধাতের মানুষ। হাতকড়া পরানোর উপক্রম করতেই কিন্তু কেষ্টবাবু অন্যমূর্তি ধরলেন হঠাৎ। চেঁচিয়ে বললেন, আমার গরু! মধুরকেষ্টর বাপ কখনও গরু দেখেছে? এ আমার গরু। বিহারের হিরণপুরের গোহাটায় কিনেছিলুম। শেষে দেখি গরুটা বাঁজা। তারপর...

মিথ্যা! বলে পাল্টা আকাশ ফাটালেন মধুরকৃষ্ণ। আমার গরু। বাঁজা নয়ই, দৈনিক দশ লিটার করে দুধ দিত। যাঁরা-যাঁরা সে-দুধ খেয়েছেন, এখানেই আছেন জিগ্যেস করুন দারোগাসাহেব! বলে আমার দিকে আঙুল তুললেন।

আমি হকচকিয়ে বললুম, হ্যাঁ। দু লিটার করে রাখতুম।

মধুরবাবুর আরো সাক্ষী পাওয়া গেল। আমার মতো তাঁরা দুধ রাখতেন এবং কেউ-কেউ এই গরুটিকে মধুরবাবুর হাতে সেবা-যত্ন পেতে অর্থাৎ ঘাস খেতে দেখেছেন।

তখন কেষ্টবাবু বললেন, আমারও সাক্ষী আছে। এই দেখুন, এর নাম গোবরা। আমার বাড়ির রাখাল। এই হারামজাদার তাড়ার চোটে গরুটা ইঁদারায় পড়ে মারা যায়।

ব্যাপারটা আরও কঠিন হল। কারণ কেষ্টবাবুর সাক্ষীও কম নয়। বেগতিক দেখে বরকতুল্লা দারোগা বললেন, ঠিক আছে। তাহলে দুজনকেই চালান দেই। কোর্টে নিষ্পত্তি হোক। কী বলেন মশাইরা?

বসন্তপুরে আর সে সমাজ নেই, কিন্তু সমাজপতিরা আছেন। তাঁদের প্রতিনিধি সদানন্দবাবু বললেন, আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। সিঙ্গি, ইঁদারায় গরু পড়েছে জেনেও বুজিয়ে দিয়েছিলে কেন বলো তো বাপু? গরু যদি তোমারও হয়, কাজটা ভাল করনি।

কেষ্টবাবু কাতরস্বরে বললেন, গোবধের প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে। আপনারা আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন, মাথা পেতে মেনে নেব।

সমাজপতিরা পরামর্শ শুরু করলেন। হাড়কেপ্পনকে জব্দ করার এমন সুযোগ আর আসবে না। মধুরবাবু হাওয়া লক্ষ করে বিকট কেঁদে ফেললেন আবার।...সিঙ্গি বড়লোক বলে সাতখুন মাফ? আমার গরু মেরে গুম করে দিয়েছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না? এই আপনাদের বিচার? ও হো হো!

বরকতুল্লা দারোগার হাবভাব দেখে বুঝতে পারছিলুম, এখানেই একটা নিষ্পত্তি হলে ঝামেলা থেকে বেঁচে যান। তাঁকে বললুম, মধুরবাবু গরীব মানুষ। ব্যাপারটা এখানে যদি মেটাতেই চান, কেষ্টবাবুকে বলুন—অন্তত একটা গরু কেনার দামটা দিক। আমরা যে ওঁর গরুর দুধ খেয়েছি, সেটা তো মিথ্যা নয় আদালতে তা বলতে রাজি আছি।

ঝানু দারোগা মুচকি হেসে বললেন, দুধে তো কিছু প্রমাণ হবে না মশাই। আদালত গরুকেনার রসিদ দেখতে চাইবে। যে দেখাতে পারবে, তারই গরু।

কেষ্ট সিঙ্গি কান খাড়া করে শুনছিলেন। কালো মুখ করে বললেন, রসিদ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পেলে কি গোড়াতেই দেখাতুম না?

মধুরবাবুও দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। রসিদটা যদি রাখতুম সিঙ্গি, তাহলে এতক্ষণে তোমার হাতে হাতকড়া চড়িয়ে ছাড়তুম!

দারোগাসাহেব দাড়ি চুলকে বললেন, তাহলে? তাহলে মামলা না করে একটা রফা হতে আপত্তি কিসের?

পুটু আবার জ্বর বাধিয়েছিল। সুতরাং গোবিন্দ ডাক্তার এলেন। ওর পেট টেপাটেপি করে বললেন. কী রে? গাছ-চড়া গরুর দুধ আর খেতে পাস না বুঝি?

হাসতে হাসতে বললুম, গাছে-চড়া গরু বলাটা এখনও ছাড়লেন না ডাক্তার-বাবু!

ডাক্তার বাঁকা হাসলেন। সিঙ্গির টাকায় মধুরকেষ্ট দেখলুম চায়ের দোকান করেছে শিরিনতলায়। শুনলুম প্রায়শ্চিত্তের ভোজ খেতেও গিয়েছিল। সিঙ্গি পাতে বসতে দেয়নি। বসন্তপুরে ঢের-ঢের মাল দেখেছি, এমন মাল দুর্লভ।

বিরক্ত হয়ে বললুম, আপনার সন্দেহ এখনও যায়নি। দুধটা তো মিথ্যা নয়।

অবশ্যই নয়। গোবিন্দডাক্তার ভুরু কুঁচকে বললেন, তবে দুধটা সিঙ্গির বাঁজা গরুরও নয়। মধুরকেষ্টর গাছে চড়া গরুরও নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মানে? আমি ভড়কে গেলুম।

মানে প্যাকেটে করে যে গুঁড়ো দুধ স্কুলে আসে। গোবিন্দবাবু নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন। মধুরকেষ্ট মামার স্টকে ইণ্টারফেয়ার করতে করতে শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে বেদম পেঁদানি খায়। আমার ধারণা, বেগতিক দেখে সিঙ্গির বাঁজা গরুটাকে ও-ব্যাটাই ইঁদারায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এক ঢিলে দুই পাখি বধ। কিন্তু বাবাজী, কোন গরু গাছে চড়ে জানো তো?

আনমনে বললুম, জানি। গল্পের গরু। তাই শুনে পুটু বলল, গল্পের গরুর দুধে বিচ্ছিরি গন্ধ। ছ্যা!

জুয়াড়ি

লোকটার সঙ্গে বহরমপুর বাস স্ট্যাণ্ডে আলাপ। যেমন রোগাটে গড়ন, তেমনি খাটো। চুল কুচকুচে কালো হলেও মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। বলেছিল—আমার নাম কালীচরণ। ওদিকে লালগোলা, এদিকে সুপারিগোলার হাট, পদ্মার ধারে ধারে যদ্দূর যাবেন কালীচরণকে সবাই চেনে। আপনার কোন ভয় নেই। সঙ্গে গিয়েই দেখুন।

পদ্মা কেন পয়সা দেয়, কীভাবে দেয়, তার বিশদ খবর দিয়েছিল কালীচরণ। সে-খবর বনবিহারীর একেবারে অজানা, তাও নয়। পয়সার পিছনে সেই

ছেলেবেলা থেকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এবং পয়সার নেশাই বনবিহারীকে হাঘরে করে রেখেছে। পয়সার খোঁজ পেলে তার মনে একটা চিতাবাঘ চনমন করে ওঠে। সে কালীচরণের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছিল। লোকটা যে ফালতু নয়, মহা এলেমদার—বুঝতে দেরি হয়নি বনবিহারীর।

বিকেল নাগাদ পৌঁছে কালীচরণ তাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়েছে। হাটতলা, দোকানপাট, আজিমগঞ্জের জৈনদের গদি আর গুদাম ঘর, ননী ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির ডিসপেনসারি, প্রাইমারি স্কুল, রক্ষাকালীর মন্দির ঘুরে বর্ডার পুলিশের ক্যাম্পে। ক্যাম্প আলাপ করিয়ে দিয়েছে সেপাই আর জমাদারবাবুদের সঙ্গে।

বনবিহারী এমন বিশাল জলের ধারে কখনও দাঁড়ায়নি। নাকে কী একটা গন্ধ এসে লাগে। চেনা-অচেনার মাঝামাঝি কী গন্ধ। আবছা কত কিছু মনে পড়ে। চোখের সামনে অপার অথৈ জল। ওপারটা অস্পষ্ট। একটানা একটা ধূসর রেখার মতো। শেষ বেলায় জেলে নৌকোগুলো সবে এদিকে-ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কালীচরণ বলল—সারারাত ওরা ইলিশ ধরবে। ভোরবেলা হাটতলায় দেখবেন ইলিশের পাহাড়। ট্রাক এসে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু তফাত দিয়ে গেছে পীচের সড়ক। লালগোলা থেকে বাস এল। বাসের মাথাঅব্দি লোক। তাদের দেখিয়ে কালীচরণ মুচকি হেসে বলল—চেনা মনে হচ্ছে না কাকেও?

বনবিহারী বলল—না তো। কেন চেনা মনে হবে?

—বেশির ভাগই আপনার স্বজাতি।

—স্বজাতি মানে?

কালীচরণ হোহো করে হাসল—বুঝলেন না? খেলাড়িরা রাতের আসর জমাতে এল সব! হাটতলার পেছনে আমবাগানটা দেখালুম—দেখবেন, কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা এসে পড়ছে!

বুঝতে পেরে বনবিহারীও হাসল। সিগারেট বের করে বলল—নিন কালীদা।

কালীচরণ সিগারেট নিয়ে বলল—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। মেলা নেই, পালাপার্বণ নেই, গানের আসর নেই—রোজ রাতে ওই ব্যাপার। এ এক অদ্ভুত জায়গা মশাই। আসাঅব্দি একই রকম দেখছি। তবে মাঝে মাঝে

বর্ডারে যখন অশান্তি হয়, তখন অবশ্য আমবাগানটা খালি পড়ে থাকে। অন্ধকারে তখন ভূত-পেতের বাথান। ওখানে পা বাড়াতে গা ছমছম করে।

বনবিহারী ওর সিগারেট জ্বেলে দিয়ে নিজেরটা ধরাল। জোরালো হাওয়া বইছে। পদ্মার বুক থেকে থরে-বিথরে কী যেন আরাম এসে জড়ো হচ্ছে পাড় বরাবর। সারা দিনের গরম, বাসের ক্লান্তি—জুড়িয়ে যাচ্ছে এতক্ষণে। বনবিহারী আস্তে সিগারেটে টান দিয়ে বলল—অশান্তি বললেন। সে কিসের?

—গোলাগুলির। কালীচরণ হাঁটতে হাঁটতে সহজ সুরেই জানাল। মাঝে মাঝে কী যে হয় মশাই, আচমকা রাত-দুপুরে শুনি পদ্মার মধ্যিখানে কোথায় টাঁট টাঁট ফট ফটাস বুম বুম এই রকম আওয়াজ হচ্ছে। একবার হাটতলায় একটা গোলা এসে পড়েছিল। গরার মাস। পদ্মা তখন প্রায় শুকনো ওখানটায়।

—লোক মরেছিল নিশ্চয়?

—নাঃ! আটচালায় আগুন ধরে গিয়েছিল। মাটি অব্দি ফেটে হাঁ। আর বলবেন না। দুই পারের পুলিশে-পুলিশে ঝগড়া নাকি। শেষ অব্দি মিলিটারিও এসে যায় অনেক সময়!·····বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ আনমনে হাঁটল কালীচরণ। রাস্তার মোড়ে গিয়ে ফের মুখ খুলল···তবে অনেকদিন বর্ডারে শান্তি চলছে। শান্তি চললেই লোকের ভাল। ওপারেও ভাল, এপারেও ভাল। পয়সা আসে। বর্ডার অঢেল পয়সার জায়গা।···

কালীচরণের বাড়িটা একতালা। বেশ ছিমছাম নতুন বাড়ি। উঠানে টিউবেল আছে। জবা ফুলের ঝাড় আছে। একটা বাঁধানো উঁচু তুলসীমঞ্চ আছে। বাড়িটা একেবারে চুপচাপ নিঃঝুম সারাক্ষণ। বাইরের ঘরে বনবিহারী আতিথ্য করছে। একটা তক্তাপোশ আছে আর দুটো আমকাঠের হলদে পালিশ করা চেয়ার আছে। দেয়ালে মাকালী ও রামকৃষ্ণদেবের ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। বনবিহারীর সঙ্গে ছোট্ট একটা বিছানা সব সময় থাকে। সেটা কালীচরণ বিছোতে দেয়নি। নতুন তোষক চাদর আর বালিশ দিয়ে খাতির করেছে।

বনবিহারী অনুমান করেছিল কালীচরণের বউটউ আছে। বিকেলে বাস থেকে নামার পর এ বাড়ি এসে যাকে দরজা খুলতে দেখেছিল, সে এক বুড়ি। ঝি বলেই মনে হয়েছে। এখন দরজা খুলল যে, তাকে দেখে বনবিহারী একটু অবাক হল। সারা গা সোনার গয়নার ঝলমল করছে, ফর্সা রঙ ফুটফুটে সুন্দর যাকে বলে এমন এক যুবতী। গয়না, শাঁখা আর অতখানি সিঁদুর না থাকলে কালীচরণের মেয়ে বলেই মনে করত।

তার হাতে লম্ফ। দরজা খুলেই চলে গেল ভিতরে। মেঝেয় অবশ্য একটা ছোট হারিকেন জ্বলছে। কালীচরণ বলল···বসুন বনোয়ারিবাবু। আরেক কাপ চা খেতে-খেতে দু ভায়ে গল্পগুজব করা যাক। তারপর নাগাদ আটটা খেয়ে-দেয়ে বেরুনো যাবে।

বনবিহারী বিছানায় বসে বলল···দেরি হয়ে যাবে না?

কালীচরণ হাসল।···মোটেও না। পুরো আসর বসতে ধরুন দশটা বেজে যাবে। কারণ, লালগোলা থানা থেকে এক চক্কর অফিসার এসে টহল দিয়ে যাবে সেই জিপ চলে গেলে খবর হবে অল ক্লিয়ার। তখন আপনার দাদা-ভাই বন্ধুরা এদিক-ওদিক আটচালা, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান···সবখান থেকে পিলপিল করে বেরুবে। গ্যাস বাতিতে জল পুরবে। হ্যাসাগে পাম্প দেবে। আসর জমবে মাঝরাত। ভোর অব্দি খেলুন না, কত খেলবেন।

কালীচরণ ভেতরে চলে গেল। বনবিহারী বালিশে মাথা রেখে পা ছড়াল। চোখ বুজে অভ্যাস মতো পা নাচাতে থাকল। একটা কথা এখনও জিগ্যেস করা হয়নি কালীচরণ কখনও খেলেছে কি-না। নিজে না খেললে তো খেলার দিকে এতখানি টান থাকার কথা নয় এবং খেলাড়িরও খাতির করার কথা নয়। মনে হচ্ছে, এ লাইনে লোকটার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। বলেছে বটে, ছোটখাট দালালীর কারবার করে···কখনও ফসলের আগাম দাদন দেয় এ-গাঁ ও-গাঁয়ে। তবু কোথায় একটা চাপা ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে। লোকটা কেমন যেন রহস্যময়। তখন রাতের পদ্মায় আলোর ঝিলিকের কথা বলছিল। হয়তো নিজেও ঝিলিকের কারবার করে।·····

ভাবতে ভাবতে কালীচরণ একটু পরে চায়ের কাপপ্লেট নিয়ে ঢুকল। বলল···আপনি ভাই একটুখানি গড়িয়ে নিন। ঘণ্টাখানেক। আমি একটু কাজ সেরে আসি ততক্ষণ। ঠিক সময়ে এসে খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিয়ে দুভায়ে বেরুব।

চা খেতে খেতে আবার কিছুক্ষণ বর্ডার এবং পদ্মার হাওয়া নিয়ে গল্পগুজব করল কালীচরণ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে বলল—দরজাটা আটকে দিন বরং।

বনবিহারী বলল—থাক।

—উঁহু নতুন লোক আপনি। আটকে দিন। কার মনে কী থাকে।

বনবিহারী অগত্যা দরজা আটকে দিল। কালীচরণের হাতে টর্চ আছে। জানলা দিয়ে বাইরে টর্চের আলোর ছটা চোখে পড়ল। তারপর স্তব্ধতা। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। অবশ্য মশার চাপা গুনগুনানি আছে। সেটা যেন নিজেরই মাথার মধ্যিখানে। বনবিহারী তক্তাপোশের তলা থেকে ফোলিও ব্যাগটা বের করে বিছানায় রাখল। তারপর ব্যাগ খুলে তার খেলার সরঞ্জাম বের করল। হারিকেনটা তুলে বিছানার ওপর সাবধানে বসাল। তকিপুরে খেলার সময় মারামারি হয়েছিল আগের রাতে। ছকটা একটু ছিঁড়ে গেছে কোণার দিকে। তাতে কোন অসুবিধে হবে না। গুটিগুলো হারিয়েছে নাকি, ভাল করে দেখার সুযোগ পায় নি। তিন সেট গুটি আছে। একটা সেট ভারি পয়মন্ত। তোরমান ওস্তাদ দিয়েছিল ওই সেটটা। বলেছিল—নেহাত ফাঁপরে না পড়লে বের কোরো না বনোয়ারিবাবু, বেশি চাললে পয় ক্ষয়ে যাবে।……

সেটগুলো ছক বিছিয়ে মেলাতে থাকল বনবিহারী। ছটা গুটিতে একটা সেট। ইস্কাপন, রুইতন, চিড়িতন, হরতন, রাজমুকুট আর ড্রাগন। এরা রাজাকে ফকির করে, ফকিরকে করে রাজা। আজ রাতের আসরে বনবিহারী তার ছকের দিকে তাকিয়ে আছে।

অচেনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেচে কথা বলতে বাধে। বনবিহারী গম্ভীর হয়ে গুটিগুলো 'ফড' বা চামড়ার কৌটোয় সাজাতে শুরু করল। তারপর শুনল—আপনি জুয়াড়ি ?

সোজাসুজি আক্রমণ একেবারে। বনবিহারী নিজেই জানে সে জুয়াড়ি। কিন্তু কথাটা অমন করে বললে ভারি খারাপ লাগে। একবার একটা চায়ের দোকানের ছোকরা তাকে জুয়াড়িদা বলে ডেকেছিল। বনবিহারী চড় মেরে বলেছিল—তোর বাবা জুয়াড়ি! আসলে ভদ্রলোকের ছেলে, ম্যাট্রিক অব্দি পড়েছিল…সেই কথাগুলো কিছুতেই মন থেকে ঘোচে না। আর সব জুয়াড়ির সঙ্গে নিজের পার্থক্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা তার সব সময় আছে। তোরমানকে ওস্তাদ বলে মানলেও তোরমান তাকে অন্য শাগরেদের মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক তো দেখি! তোরমানও সেটা বোঝে।

বনবিহারী জবাব দিল না দেখে কালীচরণের বউ ফের বলল…হুঁ, তাই এত খাতির করে সঙ্গে এনেছে। আমি ভেবেছিলুম—

বনবিহারী মুখ নামিয়ে রেখেই বলল—কী ?

—ব্যাপারী-ট্যাপারী হবে।

বনবিহারী ছোট্ট করে নাঃ বলল।

—বাড়ি কোথায় আপনার? ওপারে নাকি?

—উঁহু, এপারে।

—কোথায় শুনি?

কান্দি এলাকায়।

কালীচরণের বউ দু-পা এগিয়ে এল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বলল—আমার বাপের বাড়ি কাঁদির পাশে। আঁদুলে চেনেন? সেখানে।

বনবিহারী খুশির ভাব দেখিয়ে বলল—বাঃ! তাহলে তো আপনি আমার দেশের মেয়ে।

—আপনার কোন্ গাঁয়ে বাড়ি বললেন না কিন্তু!

—এখন আর বাড়ি-ফাড়ি নেই।··· ·বনবিহারী একটু হাসল। এক সময় অবশ্য ছিল—ভরতপুরে।

—ভরতপুরে? সেখানে তো আমার মামার বাড়ি। কতবার গেছি।· ··· কালীচরণের বউ সংকোচ কাটিয়ে তক্তাপোশের কোনায় এসে বসল। ফের বলল—কিন্তু বাড়ি নেই মানে? একটা জায়গা তো থাকে মানুষের। যেখানে যাক, ঘুরে ফিরে সেখানে একবার যেতেই হয়।

বনবিহারী বলল—যখন যেখানে থাকি, সেখানেই আমার ঘর। এখন আপনাদের ঘরে আছি, এটাই আমার ঘর। বলে সে জুয়াড়ে ছক ভাঁজ করতে থাকল।

কালীচরণের বউ হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি দেখি। এইটে দিয়ে জুয়ো খেলেন বুঝি? ওগুলো কী? গুটি? একবার চালুন না, দেখি। আহা, চালুন না বাবা একবার।

বনবিহারী তামাশা করে বলল—বিনিপয়সায় খেলতে নেই। পয় ক্ষয়ে যায়। পয়সা নিয়ে বসুন। দু-চার দান খেলুন। তবে না মজাটা টের পাবেন।

কিন্তু কালীচরণের বউ অমনি ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল। নির্ঘাত মাথায় ছিট আছে। বনবিহারী একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। কালীচরণ এসে যদি দেখে তার বউকে নিয়ে খেলতে বসেছে, নিশ্চয় সেটা খুশি মনে নেবে না।

তক্ষুণি কালীচরণের বউ এসে হাজির। হাতের মুঠোয় পয়সা এনেছে। তক্তাপোশের কোনায় বসে দম বাড়িয়ে দিল হারিকেনের। তারপর বলল—নিন, একদান খেলে দেখব।

—কালীদা দেখলে কিন্তু বকবেন!

—বয়ে গেছে! কই, খুলুন!

বনবিহারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছকটা বিছিয়ে দিল। ছটা গুটি বাদামী রঙের চামড়ার ফড়ে রেখে মুখের ওপর তুলে নেড়ে ছকে উপুড় করে বলল—দান ধরুন।

কোন্ ঘরে ধরব?

আমি বলব কেন? সে তো আপনার ইচ্ছে।

কালীচরণের বউ চঞ্চল চোখে ঘরগুলোকে দেখার পর হরতনে একটা সিকি রাখল। বনবিহারী কৌটো তুলল। দুটো হরতন, বাকিগুলো কোনটা সাদা, কোনটায় অন্য 'রঙ' চিত হয়েছে। সে হরতন আঁকা গুটি দুটো হরতনের ঘরে রেখে খিকখিক করে হেসে উঠল। কালীচরণের বউ উদ্বিগ্ন মুখে বলল—হেরে গেলুম বুঝি?

না জিতেছেন। আট আনা পেলেন।···বলে বনবিহারী পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ছকে ছুঁড়ে দিল।

কালীচরণের বউ খিলখিল করে হেসে বলল—চার আনা জিতলুম?

—আপনার লাক ভাল। আমি হারলুম।

—এই আট আনাই ধরলুম।

বনবিহারী হাসতে হাসতে বলল—সবুর, সবুর। আগে গুটি চালি। তারপর দান ধরবেন।

—কেন? আগে ধরলে কী হবে?

—হারলে বলবেন, গুটি এমন কায়দায় চেলেছি যে, ও ঘরের রঙে কোন গুটির রঙ আসেনি।

—যাঃ! সে তো কপাল।

—না, কপাল নয় বউদি। হাতের চালের কায়দা। গুটি আমার কথা শোনে।

—সত্যি? কালীচরণের বউ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

—সত্যি।

—বিশ্বাস করিনে। এই নিন, আগেই ধরলুম। কই, জিতে নিন দেখি।

বনবিহারী একটু বেকায়দায় পড়ে গেল। গুটি কোন্ পাশে চিৎ হবে, বড় বড় জুয়াড়ি তা জানে। যে-হাতের ট্রিকস এখনও, বনবিহারীর ততখানি আয়ত্তে আসেনি। সে পারে তোরমান মিয়া। কাটোয়ার দিকে তাকে আর

সব জুয়াড়িরা রাজা বলে ডাকে। তবে বনবিহারী গুটির শব্দে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে আজকাল।

গুটি চেলে ফড় তুলল সে। ফের কালীচরণের বউ জিতেছে। সিকিদুটো টেনে একটা এক টাকার নোট এগিয়ে দিতেই কালীচরণের বউ প্রায় খামচে হাত থেকে নিল। আবার খিলখিল করে হাসতে থাকল। বনবিহারী টের পাচ্ছে, এই সেই সর্বনেশে ঘোর, যা রাজাকে ফকির করে—এবং যে-ঘোরকে সে নিজে জুয়াড়ি হয়েও আজো বুঝতে পারে না, কালীচরণের বউকে তাই পেয়ে বসেছে। বনবিহারী ঘড়ি দেখে বলল—এই থাক বউদি। দেখলেন তো কেমন মজার খেলা।

কালীচরণের বউ বলল—না, না। আর একদান—একটা দান খেলি।

এবারেও সে জিতল। বনবিহারী দু টাকার নোট দিয়ে বলল—আপনি আমাকে ফকির করে দেবেন। লাক আপনার ফেভারে।

নোট দুটো ড্রাগনের ঘরে পড়ে রইল। কালীচরণের বউ কেমন চোখে তাকিয়ে বলল—হুঁ, বুঝেছি। আপনি ইচ্ছে করেই জিতিয়ে দিচ্ছেন আমাকে।

তখন বললেন, গুটি কথা শোনে।

—বললুম। কিন্তু ব্যাপারটা—···

—না। আপনি ইচ্ছে করে জিতিয়ে দিলেন।

—বিশ্বাস করুন।·····

—উহুঁ আপনি জিতলে তবে বিশ্বাস করব।

—ইচ্ছে করলেই আমি জিততে পারিনে, বউদি!

কালীচরণের বউ জেদ ধরে বলল—না। আপনি হাতের কায়দা করেছেন

—বেশ। আপনি নিজে গুটি চালুন। আমি দান ধরি।

দুষ্টু মেয়ের মতো হেসে কালীচরণের বউ আনাড়ি হাতে ফড়টা খুব নাড়া-চাড়া করল। তারপর ছকের ওপর উপুড় করে চেপে ধরল। বনবিহারী রাজমুকুটে একটা পাঁচ টাকার নোট ধরল। তারপর বলল—তুলুন এবার দেখি।

কালীচরণের বউ কৌটো তুলল। গুটিগুলোর দিকে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—কে জিতল?

—আপনি।

—মিথ্যে।

—না বউদি, সত্যি। এই দেখুন, রাজমুকুটের রঙ একটা গুটির ওপরেও নেই।

গুম হয়ে বসে রইল কালীচরণের বউ। ভুরু কুঞ্চিত দৃষ্টি গুটিগুলোর দিকে। হাত ভর্তি সোনার চুড়ি ঝকমক করছে। গলার চন্দ্রহার আনমনে আঙুলে নেড়ে সে চাপা গলায় বলল—আজ আপনি খেলতে যাবেন না। আপনার ওপর কুদৃষ্টি পড়েছে। কাল রক্ষেকালীকে পুজো দিয়ে খেলতে যাবেন।

বনবিহারী হোহো করে হেসে উঠল। বলল—বউদি, ওসব কিছু নয়। এই ফড়ের মধ্যে গুটি নড়াচড়ার শব্দ শুনে আমরা বুঝতে পারি, কে কোন ঘরের রঙ খাবে। আপনি তো একেবারে আনাড়ি। কাজেই শব্দ শোনামাত্র বুঝলুম রাজমুকুট খালি যাবে।

কালীচরণের বউ অমনি তক্তাপোশ থেকে উঠে দাঁড়াল। বনবিহারীর দিকে বাঁকা ঠোঁটে তাকিয়ে ঘুরল দরজার দিকে। বনবিহারী বলল—জেতা টাকা-গুলো নিয়ে যান বউদি। ও বউদি।

কালীচরণের বউ জবাব দিল না। সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে বারান্দাটা অন্ধকার। বনবিহারী ফের বলল—বউদি, অন্তত আপনার সিকিটা নিয়ে যান!

কিন্তু আর কোন সাড়াই এল না। তখন বনবিহারী ছক ভাঁজ করতে ব্যস্ত হল।...

কালীচরণ এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি। হাটতলার পিছনে আমবাগান। তার ওপাশে পদ্মা অন্ধকারে অপার হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

আমবাগানে হ্যাসাক আর গ্যাস বাতি ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে জুয়াড়িরা। প্রত্যেক ছকে এক দঙ্গল করে খেলাড়ি। কালীচরণ বনবিহারীকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। বলল—এক্ষুনি আসছি, নিশ্চিন্তে বসুন।

ছোট কারবাইড বাতি জ্বেলে শতরঞ্জি বিছিয়ে আরাম করে বসেছে বনবিহারী। তলায় ঘাস আছে। সে বসতে না বসতে পোকার ঝাঁকের সঙ্গে খেলাড়ির একটা ঝাঁক এসে বসে পড়ল। নানান বয়সী লোক সব। পোশাক-আসাক দেখেই বোঝা যায় অনেকেই চাষাভুষো। কেউ কেউ একটুখানি উজ্জ্বল চেহারার, এবং পানে ঠোঁট রাঙা, দৃষ্টিতে চালাক-চতুর ভাব আছে।

বনবিহারীর চিনতে দেরি হয়নি, এরাই বর্ডারের আদত মাল। ছোট ব্যাপারীর ছদ্মবেশে ঘোরে। পদ্মায় রাতের কারবারই এদের আসল পেশা।

আমবাগানে এত সব লোক, অথচ কোন কথা নেই মুখে। বড় জোর ফুস্থর ফাস্থর, চাপা দু-একটা মন্তব্য। ফিক করে একটুখানি হাসি। জিভ বের করে চুকচুক। প্রথমে কিছুক্ষণ বনবিহারী জাল ছাড়ল—ঢিলে হাতে চাল দিতে থাকল। সিকি আধুলি. বড় জোর একটা করে নোটের দান পড়ছে। প্রতি চালে দু-তিন জন করে জিতছে। বনবিহারী হাসতে হাসতে বলছে—কার মুখ দেখে উঠেছিলেন ভাই ?

দেখতে দেখতে ছকের খেলাড়িদের সঙ্গে ভাব জমে গেল। বনবিহারী এটা পারে। এ তার ওস্তাদের শিক্ষা। ছকে বসলে তার চেহারা বদলে যায়। গম্ভীর ভাবটা আর একটুও থাকে না। কিন্তু ফতেখাঁর দিয়াড়ের এই আসর একেবারে অন্য রকম। মেলার আসরের মতো গলা ছেড়ে বুলি বলা যাবে না। বাঁধা গতের মতো সেই চমৎকার বুলি তালে তালে আউড়ে যেতে পারলে ছক জমে ওঠে। খেলাড়িদের মনে নেশা ধরে যায়। ছক ছেড়ে উঠতে পারে না, হেরে ভুট হয়ে গেলেও না।

রাত আড়াইটা অব্দি অপেক্ষা করেও কালীচরণের পাত্তা নেই। তখন বৃষ্টি পড়ছে। হাল্কা দু-চার ফোঁটা টাপাচ্ছে গাছগাছালি থেকে। ননীডাক্তার হাই তুলে শুতে গেলেন। বনবিহারী টর্চ জেলে এগোল। রাস্তা চেনা হয়ে গেছে। কিন্তু তার গা বাজছিল। সঙ্গে টাকাকড়ি আছে।

ড্যাগারটা ব্যাগ থেকে বের করে সে পকেটে ঢোকাল। ভিজে জামাকাপড় আর ব্যাগটা বাঁ হাতে—ডান হাতে টর্চ। কারবাইড বাতিটা ননীবাবুর কাছে রেখে এসেছে। চারদিকে আলো ফেলতে ফেলতে সে হাঁটছিল। ঝোপঝাড় আর গাছপালার ভেতর একটা করে বাড়ি। ভিজে গাছে ঝোপেঝাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি জ্বলছে। কুকুর ডাকছে কোথায়। রাস্তা মাটির। কিন্তু মাটিটার গুণ একফোঁটা জল জমতে দেয়নি। কাদাও হয়নি। একটু পিছল, এই যা।

কালীচরণের বাড়িতে আলোর ছটা দেখে সে ভাবল, তাহলে কখন সোজা বাড়ি ফিরেছে সে। দরজায় চাপা গলায় ডাকল - কালীদা ! কালীদা !

সাড়া দিল কালীচরণের বউ। বনবিহারী একটু জোরে বলল—আমি বনবিহারী বউদি।

দরজা একটা ফাঁক হল। কালীচরণের বউয়ের নাক দেখা গেল। তারপর দরজা খুলে গেল। বনবিহারী চমকে উঠল। ওর হাতে হাত তিনেক লম্বা একটা দা। বনবিহারী হেসে বলল—কালীদা ফেরেন নি?

—না। আপনি ঢুকে পড়ুন, দরজা আটকাব।

কালীচরণের বউ কেমন গম্ভীর। বনবিহারী ভিতরে ঢুকে বলল—যা বিষ্টি। খেলা পণ্ড করে দিল! এতক্ষণ কালীদার জন্যে ডাক্তারবাবার ওখানে বসেছিলুম। রোজ এমন দেরি হয় নাকি?

--হুঁউ। বলে কালীচরণের বউ চলে যাচ্ছিল।

বনবিহারী—আপনি একা এভাবে থাকেন বউদি?

অমনি কালীচরণের বউ হিসহিস করে বলে উঠল—কেন?

বনবিহারী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। জিব কেটে বলল—না, না। আপনি আমার দেশের মেয়ে। একলা এভাবে থাকেন, বাড়িতে একা মেয়েছেলে—তাই···

কলীচরণের বউ কাটারিটা দেখিয়ে বলল—এটা কী?

বনবিহারী হোহো করে হেসে উঠল। বলল—ওরে বাবা। আপনি একেবারে সাক্ষাৎ ইয়ে! যাক্, শোন গিয়ে। কালীদা এলে আমি বাইরের দরজা খুলে দেব।

কালীচরণের বউ ভেতরে চলে গেল। ভেতরের বারান্দার মাথায় আরেকটা হারিকেন জ্বলছে। পোকা থকথক করছে তার গায়ে। এ ঘরের হারিকেনটাও পোকায়-পোকায় থকথকে হয়ে গেছে। রাতের বৃষ্টির পর পোকা বেড়ে গেছে এতক্ষণে। বনবিহারী জিনিসপত্র সামলে রেখে তক্তাপোশে বসে সিগারেট ধরাল। তারপর আপন মনে বলল—সন্ধ্যায় এত মশা ছিল না। কী মশা রে বাবা!

ভেতরের দিক থেকে কথা ভেসে এল—বালিশের তলায় মশারি রেখেছি। টাঙিয়ে নিন।

বনবিহারী খুশি হয়ে দেখল মশারিটা নতুন। দেয়ালে পেরেক রয়েছে চার কোণায়! সে তক্ষুনি ঝটপট মশারিটা টাঙিয়ে ফেলল। তারপর ব্যাগটা খুলে টাকাগুলো বের করল। গুণে রুমালে জড়িয়ে বালিশের তলায় রাখল। ড্যাগারটা রেখে দিল। বরাবর এই অভ্যাস।

মশারিতে ঢুকে তার মনে পড়ল ভেতরের দরজাটা খোলা। তাই ডাকল—বউদি! জেগে আছেন নাকি শুয়ে পড়েছেন।

—কেন ?

—ওই দরজাটা···

—বন্ধ করে দিয়ে শোন।

সে মশারি থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করত গেল। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল কালীচরণের বউ কী করছে এখনও। তাই একটু ঝুঁকল দরজার বাইরে। দেখল ও থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনবিহারী ভালমানুষী করে বলল—শুয়ে পড়ুন বরং! আর জেগে কী লাভ ?

কালীচরণের বউ-এর হাতে এখন সেই দাটা নেই। গা ভরা সোনার গয়না পরে এমন একটা নির্জন বাড়িতে রাত জাগছে! অদ্ভুত মেয়ে তো! মাথায় পাগলামির ছিট আছে, তা স্পষ্ট। বনবিহারীর কথা শুনে সে ঘুরেছে। আলোর ছটায় চোখ দুটো জ্বলছে। তারপর হঠাৎ বনবিহারীর কাছে এসে সে ফিসফিস করে উঠল---একটা কথা বলি শুনুন। আপনি আমার বাপের দেশের লোক। না বলে পারছি না।

বনবিহারী বলল—কী ?

—রাত পোহাল এখান থেকে চলে যান! নয়তো বিপদ হবে।

বনবিহারী চমকে উঠল।—কেন ? কিসের বিপদ ?

—অত কৈফৎ দিতে পারব না—ভাল চান তো চলে যাবেন।

বনবিহারী গোঁ ধরে বলল—দেখুন বউদি, ছেলেবেলা থেকে এই করে দেশে দেশে ঘুরছি। বিস্তর বিপদআপদ দেখেওছি। নতুন আর কী হবে, বলুন!

কালীচরণের বউ গলা আরও নামিয়ে বলল—বাপের দেশের লোক বলেই বলছি। নৈলে আমার কী দায়! গত কালীপুজোর সময় কোত্থেকে ঠিক আপনার মতো একজনকে নিয়ে এসেছিল। আপনার চেয়ে বয়েস অনেক বেশি। হুঁ—কী যেন নাম। বোরেগী না কী যেন—হুঁ, বোরেগীবাবু। তারপর···

বনবিহারীর বুকে ধক করে এক টুকরো বরফ নড়ে উঠল। গা হিম হয়ে গেল। বৈরাগ্য জুয়াড়িকে সে ভাল চিনত। কাটোয়ার লোক। গত বছর থেকে আর কোন আসরে তাকে দেখা যায় না। গুজব রটেছিল, কোথায় খেলতে গিয়ে নাকি খুন হয়েছে।

সেই বৈরাগ্য জুয়াড়ির পাত্তা কালীচরণের বউয়ের মুখে! বনবিহারী বলল—বেঁটে শ্যামবর্ণ লোক। কড়ে আঙুলে পলাবসানো মোটা চাঁদির আংটি ছিল। নাকটা মোটা, বড় বড় কান···

—সেই। চেনেন নাকি?

—খুব। কী হয়েছিল বৈরাগ্যদার?

—ক'রাত এবাড়ি থাকল। রোজ রাতে বাগানে জুয়ো খেলল। তারপর এক রাতে আর এল না শুতে। পরদিন ঘোড়ামারার চরে লাশ পাওয়া গেল।

—খুন?

—জলে ডুবে মরেছিল।

—তাহলে দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল। নয় তো ধস ছেড়ে···

—না, না! ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল!

—কে?

—যম।···বলে সরে গেল থামের দিকে। ফের চাপা স্বরে বলল—ভালমানুষি করে কানে তুললে আমার কিছু হবে না। আরো কখানা সোনার গয়না বখশিস পাব।

বনবিহারী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মিনিট। তারপর ঠোঁট কামড়ে বলল—আচ্ছা দেখা যাবে। আমার নাম বনোয়ারি মুখুয্যে। আমার বাবার নাম কালু মুখুয্যে। ডাকাতের সর্দার। গুলি খেয়ে মরেছিল। তখন আমার বয়স ছ বছর।···

কালীচরণ কখন ফিরেছিল বনবিহারী জানে না। দেখা হল সকালবেলা। বলল—কাল একটা কাজে আটকে পড়েছিলুম। হঠাৎ বিষ্টি। আপনাদের আসরও নিশ্চয় জমে নি।

বনবিহারী বলল—জমাটি যা হবার হয়েছিল। আমার ওই নিয়ম দাদা। প্রথম কয়েক চালেই যা করার করে নিই!

—তাই বুঝি? কালীচরণ হাসি মুখে বলল।

—হুঁউ। দু ঘণ্টায় পাঁচশো মতো তুলেছি। এক রাতে আমার মতো চুনোপুঁটির পক্ষে ওই যথেষ্ট। তবে দাদা, যা মনে হচ্ছে, ক'রাতেই রাজা হয়ে যাব!

—আপনাকে বলেছিলুম। বর্ডারে প্রচুর পয়সা!

কিছুক্ষণ কথা বলার পর কালীচরণ কাজ আছে বলে বেরিয়ে গেল। বনবিহারী একটু পরে বেরোল। ডেকে বলল—বউদি, দরজা আটকে দিন। বেরুচ্ছি।

সকাল থেকে কালীচরণের বউ আজ অন্যরকম। কাল বিকেলে বা রাতে যেমন দেখেছে, তেমন নয়। গিরগিটির মতো রঙ বদলেছে যেন। হাসতে

হাসতে এল এঘরে। চোখ নাচিয়ে বলল—খুব লোভ দেখাচ্ছিলেন যেন? আপনার পরমায় শেষ হয়ে এসেছে। টাকার গন্ধ পেলে ও কিন্তু ক্ষেপে যায়।

বনবিহারী বলল—একটা ভয় শুধু বিষের। খাবারে বিষ দিলে আমার কিছু করার নেই!

কালীচরণের বউ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ জ্বলে উঠল তার। নাকের ফুটো কাঁপল। বলল—বিষ দিলে সে তো আমি! আর যে জন্যে হোক, টাকার জন্যে আপনার পাতে বিষ দেব না।

—এই রে! আপনি রেগে গেলেন!···বলে বনবিহারী হাত জোড় করল।

তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে পা বাড়াল। মনটা অস্থির। সারা দিন কীভাবে কাটাবে ভেবে পাচ্ছে না।

সে রাতে আবার আমবাগানে জমজমাট আসর। ননীবাবু আজ এলেন না। কালীচরণ আসরে বসেছে। কিন্তু খেলছে না। বনবিহারী টের পেল, কালীচরণকে তার আসরে দেখে অন্য জুয়াড়িরা যেন উসখুস করছে। মাঝে মাঝে কেউ ডাকছে—কালীদা, এখানে একবার আসুন না। পায়ের ধুলো দিয়ে যান, দাদা। ধন্য হই।

অগত্যা মাঝে মাঝে সে সবাইকে খুশি করে আসছিল। এক ফাঁকে কালীচরণ অন্য আসরে গেছে, তখন গত রাতের এক চেনা খেলাড়ি চোখ নাচিয়ে বলল—কালীদাকে কত দিচ্ছেন ওস্তাদ? খবর্দার, দশের বেশি দেবেন না। ওরা সব্বাই দশ করে দেয়।

বনবিহারী কালীচরণের আরও একটু পরিচয় পেয়ে গেল।···

খেলা ভোর অব্দি চালানো যায় না। গেলে খুব ভাল হত। কে এসে সাবধান করে দিয়ে গেল—অফিসার এসেছে ক্যাম্পে। তখন রাত সাড়ে তিনটে। আসর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল। আলোগুলো নিবিয়ে ফেলা হল। তারপর চুপচাপ যে যেদিকে পারল, গা ঢাকা দিতে গেল। কালীচরণ বলল—এই এক বিপদ। যাক্ গে, আসুন। এই যথেষ্ট!

বনবিহারী বলল—পেটটা ব্যথা করছে। একটু মাঠ সারতে যাব।

কালীচরণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বলল—টর্চ সাবধানে জ্বেলে ওখানে কোথাও বসুন। আগে জল দেখে নেবেন, কোথায় আছে।

বনবিহারী একটু ভেবে বলল—ওপাশটায় যাই। আপনি কি এখানে অপেক্ষা করবেন দাদা?

—পাগল! আর এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়। আমি বরং চায়ের দোকান-টোকানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

—আমার ভয় করবে, কালীদা। মাইরি।

কালীচরণ হাসতে হাসতে বলল—চলুন, চলুন।

বাগান পেরিয়ে ফাঁকায় গেল দুজনে। জায়গা পছন্দ হল না বনবিহারীর। যদি বা পছন্দ হল, কালীচরণ বলল—ওখানটায় আজ বিকেলে মাটি খেয়েছে। ওই শুনুন, এখনও খাচ্ছে।

আবছা ধস ছাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আরো একটু এগোল দুজনে। তারপর কালীচরণ বলল—যান! এবার নিশ্চিন্তে বসুন।

বনবিহারী পায়ের কাছে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে গিয়ে একটু তফাতে বসল। কালীচরণ আকাশ দেখতে দেখতে চাপা গলায় বলল—বনোয়ারিবাবু, খেলা যদি দেখবেন তো ওই দেখুন! ওই হচ্ছে খেলা। কালোছকে কেমন রঙ-বেরঙের গুটি ছড়িয়ে পড়ছে দেখবেন! ওস্তাদ খেলাড়ি বসে আছে কোথায়, কেউ দেখতে পাবে না তাকে। আপন মনে একা বসে গুটি চালছে কে জিতছে, কে হারছে!···কী হল?

বনবিহারী বলল—সাপ! কী সাপ দেখুন তো! বলে সে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে গেল। ব্যস্তভাবে ফের বলল—কালীদা, দেখুন—দেখুন! বিষাক্ত মনে হচ্ছে—দেখে যান শিগগির!

কালীচরণ এগিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।—দেখবেন, একেবারে জলের ধারে যাবেন না।

—আরে সর্বনাশ! ফণা তুলেছে দেখুন। আলোতে কী সাংঘাতিক দেখাচ্ছে।

—কই দেখি, দেখি। বলে কালীচরণ তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ফের বলল—কই সাপ, কোথায়?

বনবিহারী শক্তভাবে দাঁড়িয়ে বলল—এই যে!···

···একটু পরে বনবিহারী হাটতলা ছাড়িয়ে ননীবাবুর ডাক্তারখানার পেছন ঘুরে লুকোচুরি খেলতে খেলতে বড় রাস্তায় উঠেছে। বাঁয়ে কাঁচা রাস্তায় মোড় নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আবার ওবাড়ি কেন? সে বড় রাস্তায় হনহন

করে হাঁটতে থাকল। কিন্তু মনে কী কাঁটা বিঁধে থেকেই যাচ্ছে। কালীচরণের বউকে খবরটা দিয়ে এলে যেন মাথাটা ঠাণ্ডা হত। যাক গে।……

বছর চার-পাঁচ পরে বনবিহারী একদিন বহরমপুর বাসট্যাণ্ডে এসেছে। সঙ্গে এবার জুয়োর রাজা তোরমান মিয়া। ওস্তাদ-শাগরেদ জোট বেঁধে বর্ডার এলাকায় যাবে খেলতে। ফতেখাঁর দিয়াড়, নয়তো সুপারিগোলার হাট। নাকি কাতলমারির চরে গিয়ে ছক বিছিয়ে বসবে? চায়ের দোকানে বসে দুজনে পরামর্শ করছে কোন বাস ধরবে। বনবিহারীর মন টানছে ফতেখাঁর দিয়াড়ের দিকেই। তোরমান বলছে—শুনলুম ওপারওলারা সেদিন দিনদুপুরে এসে লুঠপাট চালিয়ে গেছে। মিলিটারিতে ছেয়ে ফেলেছে সারা তল্লাট। ভাল করে খবর নিতে হয় আগে।

এই সময় বনবিহারীর চোখে পড়ল প্রকাণ্ড শিরিষ গাছের শেকড়ে সোনার গয়নাপরা একটি মেয়ে বসে আছে। তার দু পায়ের ফাঁকে একটা সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চা। লাল পেণ্টুল, নীল জামা, চুলের সঙ্গে আটকানো একটা সোনার টায়রা। মা ছেলের নাক চুষে দিচ্ছে। ছেলে মায়ের। তার সঙ্গে খিটখিট করে হাসি।

ওদের সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক। বেঁটে, রোগা, শ্যামলা চেহারা। গায়ে টেরিকটনের পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি। তার এক হাতে এক ঠোঙা জিলিপি, অন্য হাতে মাটির ভাঁড়ে চা।

বনবিহারী নিজের চোখকে কয়েক সেকেণ্ড বিশ্বাস করতে পারল না। লোকটা বউয়ের হাতে চা আর জিলিপি দিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। বুকে চেপে আদর করতে করতে শিরিষ গাছের ওপরে পাখি দেখাতে থাকল—ওই দেখ, ওই দেখ…

তোরমান বলল—কী হল বনোয়ারি?

বনবিহারীও যেন মুখ তুলে পাখি দেখতে গেল। পাখি দেখতে গিয়েই সে অন্য কিছু দেখছিল। সে-রাতে পদ্মার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখিয়ে কালীচরণ বলেছিল—বনোয়ারিবাবু, খেলা যদি দেখতে হয়, ওই দেখুন। ওই হচ্ছে খেলা। কালো ছকের ওপর কেমন রঙ বেরঙের গুটি ছড়িয়ে পড়ছে দেখছেন? ওস্তাদ খেলাড়ি বসে আছে কোথায়, কেউ দেখতে পায় না তাকে। আপন মনে গুটি চালছে। কে হারছে, কে জিতছে। কেমন করে বেঁচেছিল কালীচরণ?

বনবিহারী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল—চলুন ওস্তাদ, বরং কাতলমারির বাসে গিয়ে বসি।···

আকারান্ত

জগনমামা বললেন, তাহলে বাবা ঝণ্টু, ততক্ষণ তুমি মামীমার সঙ্গে গল্পসল্প করো। আমি ঝটপট বাজারটা সেরে আসি।

বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে ডাকলেন, কই গো! ছাতিটা দাও বরং। এই সাতসকালেই রোদ্দুরটা বড চড়ে গেছে।

জগনমামার মাথায় এমন প্রকাণ্ড টাক আমি আশা করি নি। এতকাল পরে ওঁকে দেখে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। চেহারার কী দারুণ অদলবদল না ঘটে গেছে! রোগা খটখটে চেহারার মানুষ ছিলেন। এখন বিশাল পিপে হয়ে উঠেছেন। মুখের এমন প্রশান্ত হাসিও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই মফস্বল শহরে এখন ওঁর উকিল হিসেবে বেজায় নামডাকও হয়েছে এবং তার কারণ সম্ভবত ওঁর চেহারার এই ভোলবদল। আগে ওই শুঁটকে চেহারার আর খিটখিটে মেজাজের জন্যে মক্কেল যেমন জুটত না, তেমনি হাকিমরাও নাকি ওঁকে এজলাসে দেখলে চটে যেতেন। অবশ্যি, সবই শোনা কথা।

এও শোনা কথা যে জগনমামার স্ত্রী আত্মহত্যাই করেছিলেন। কৌশলে কলেরায় মৃত্যু বলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। উকিলমানুষদের তো পেটে-পেটে বুদ্ধি।

বলে রাখা ভাল, জগনমামা কস্মিনকালে আমার মামাকুলের কেউ নন। ছোটবেলায় আমার বাবা মারা যান। পাড়াগাঁয়ে সম্পত্তি রাখার নানা ঝামেলা। মামলা-মোকদ্দমার দায় সামলাতে হ'ত তাই মাকেই। সেই সুবাদে এই উকিলভদ্রলোক মায়ের দাদা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি ভেবে পেতাম না, জগনবাবুর মতো উকিল কেন ধরেছিলেন মা! তখন আরও কত জাঁদরেল উকিল এ শহরে তো ছিল! মামলায় হেরে গেলেও দেখতাম, মা ফের এই ভদ্রলোকের কাছে এসে পড়েছেন।

হয়ত এটাই মানুষের অভ্যাস। চেনাজানা ডাক্তারের হাতে মরতেও রাজি যেমন, তেমনি উকিল-মোক্তারের বেলাও তাই। এখন মা নেই। আমি বিষয়-সম্পত্তির হাল ধরেছি। আমি সেই একই অভ্যাসে এসে জুটেছি

জগনউকিলের দরজায়। মামলায় হার-জিত ভবিষ্যতের কথা,—ছোটবেলা থেকে যাঁকে মামা বলে জানি, তার কাছে এসে দাঁড়ালে মনের জোর ভীষণ বেড়ে যায়।

তবে তার চেয়ে বড় কথা, জগনমামার এখন নাকি নামডাক হয়েছে। কাজেই আমার মনের জোর অনেক বেশি করেই বেড়েছে। আজ রোববার। আজকের দিন ও রাত্তিরটা জগনমামার বাড়ি কুটুম্বিতা এবং সলাপরামর্শ করা যাবে বলেই আসা। আগামীকাল ফার্স্ট আওয়ারে কেস ঠোকা যাবে।

বুঝতে পারছিলাম, জগনমামা আবার বিয়ে করেছেন কবে। কিন্তু অবাক হচ্ছিলাম নতুন মামীমা একবারও ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না দেখে। ভেতরের বারান্দায় একটা চেয়ারে আমি বসে আছি। জগনমামা ওপাশের কিচেন থেকে চা বয়ে এনেছেন। চায়ের খালি কাপপ্লেট উনি নিজেই রেখে এসেছেন। মামীমার পাত্তা নেই। জগনমামা ওঁর উদ্দেশে কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু কোনো সাড়া আসছে না।

তাই ভাবছিলাম, একটা দাম্পত্যকলহ-গোছের কিছু ঘটে থাকবে। নাকি মামীমা ঠাকুরঘরে পুজোয় বসে আছেন?

জগনমামা ছাতি চাইলেন। তবু মামীমার সাড়া এল না। তখন জগনমামা মুখে একটু বিরক্তি ফুটিয়ে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলেন। তারপর ছাতির খোঁজে ঘরে ঢুকলেন। ঘর থেকে ওঁর চাপা গলায় কথাবার্তা শুনতে পেলাম। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ছাতি হাতে। মুখে প্রশান্ত হাসি। বললেন, তাহলে গল্পসল্প করো তোমরা। আমি ঝটপট ফিরব।

উনি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওদিকটায় আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শর্টকাট পায়ে চলার পথ আছে। গিয়ে উঠেছে বাজারের চওড়া রাস্তায়। এদিকটা একেবারে নিরিবিলি নিঝুম জায়গা। আশেপাশে বাড়ি বিশেষ নেই। গঙ্গার ধারে শহরের একান্তে এই বাড়িটার বয়স প্রাচীন। একটু তফাতে হাসপাতাল এলাকা। অন্যদিকটায় গঙ্গার পাড়ে বনদফতরের যত্নে সাজানো ঘন বন। ভাঙন আটকাতেই ওই নিরামিষ জঙ্গল। জগনমামার ভাষায় নৈমিষারণ্য।

বাড়ি একেবারে চুপচাপ। গ্রীষ্মের এই সাতসকালে গঙ্গার দিক থেকে একটা হাওয়া এল শনশনিয়ে। হাওয়াটা খিড়কির দরজা ঠেলে উঠোনে ঢুকে ঠাঁই ঠাঁই করে ঘুরতে থাকল। তারপর পাঁচিলের ধারে জবা ও শিউলির ঝোপ

হুলুস্থুল করে পটাপট কিছু হলুদ পাতা ছিঁড়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে গেল। এই সময় আমার মনে পড়ল, যেদিকে গেল, সেদিকটায় শ্মশানবট এবং একটু পরে সেই উঁচু বটগাছের মাথায় ঝাঁকুনি লাগল।

কিছু করার না থাকলে আমার উদ্ভট সব অনুভূতি জাগে। হঠাৎ মনে পড়ল ছোটবেলায় দেখা মামীমা অর্থাৎ জগনবাবুর প্রথম স্ত্রীর কথা। আত্মহত্যা করলে মানুষ নাকি ভূত হয়। এমন নিরিবিলি বাড়িতে ভূতের পক্ষে হামলা করা ভারি সহজ। পুরনো মামীমার ভূত নতুনমামীকে জ্বালায় না?

কে জানে কেন, এ বাড়িতে রাতে থাকতে হবে ভাবতেই এবার অস্বস্তি জাগল। ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভূতের ভয় আমার বেজায়-রকমের।

একটু কাশলাম। ভেতরের ঘর একেবারে চুপচাপ। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হঠাৎ নতুন মামীমা বেরিয়ে এলে লজ্জা পাব। আরও একবার কাশলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। দরজার দিকে তাকিয়ে আধআধ গলায় বললাম, মামীমা! আমি একটু ঘুরে আসি। শুনছেন? মামীমা!

কিন্তু সাড়া এল না। অদ্ভুত মহিলা তো! উঠোনে গিয়েও সাড়া পাব ভাবলাম। না পেয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আগাছার জঙ্গলে ঢুকলাম। সিগারেট টানতে থাকলাম। জগনমামা বলছিলেন, সবসময় খালি তোদের গল্প করি। তোর মায়ের মতো মহীয়সী মেয়ে আর হয় না। আর তুই—কট্টুকুন ছিলি জানিস বাবা ঝণ্টু? এই এ্যাট্টুকুন। আর কী ভীতু, কী ভীতু!

এতসব যদি শুনে থাকেন ভদ্রমহিলা, তাহলে আমাকে দেখার জন্যে বেরুলেন না কেন—কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।

সিগারেট শেষ করে বাড়ি ঢুকে চমকে উঠলাম। কোত্থেকে একটা নেড়ি কুকুর ঢুকে পড়েছে যে! বারান্দায় গিয়ে ভেতরের ঘরের পর্দার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠলাম, মামীমা! কুকুর ঢুকছে! কুকুর!

তবু সাড়া নেই দেখে দৌড়ে গেলাম। কুকুরটা ঘরে ঢুকে পড়েছিল। লাথি খেয়ে কেঁউ করে উঠল এবং ডিগবাজি খেতে খেতে উঠোনে গিয়ে পড়ল। লেজ গুটিয়ে পালাল।

পর্দা তুলে উঁকি মেরে ডাকলাম, মামীমা। কিন্তু ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। সেকেলে পালঙ্কের ওপর জগনমামার লুঙি পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকালাম। একগুচ্ছের স্নোপাউডার ইত্যাদি যথারীতি সাজানো। ওপাশে আলনায় কয়েকটা শাড়ি ও সায়া পর্যন্ত! সেগুলো অত ময়লা কেন ভেবে পেলাম না।

কিন্তু ঘরে একটা মেয়েলি গন্ধ টের পাচ্ছিলাম। আবছা মনে হল, নতুন মামীমার বয়স নিশ্চয় জগনমামার তুলনায় ঢের কম। মেয়েলি গন্ধটা কি চুলের? স্নানের পর মেয়েদের চুলের এমন গন্ধ হয়। একটু লজ্জা পেলাম। এভাবে এঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ভদ্রমহিলা ওপাশে কোথাও আছেন। এসে গেলে অপ্রস্তুতের একশেষ হব।

বেরিয়ে আসার আগে ড্রেসিং টেবিলে রাখা ছবিটার দিকে চোখ পড়ল। পুরুষ ও মহিলার ছবি পাশাপাশি। কিন্তু চিনতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, যুবতী মহিলাটি কেমন চোখে তাকিয়ে হাসছেন।

ঠিক এইসময় বাইরে জগনমামার সাড়া পেলাম। বহুভাগ্যে দুটো গলদা পেলাম, বুঝলে? মোটে দুটো। যাক্ গে, এতেই হবে। আর ইয়ে, শোনো— দুঃচ্ছাই। ভুলে গেলাম যে!

ঝটপট বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম, জগনমামা সদরদরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন। বগলে ছাতি। একহাতে বাজারভর্তি থলে। বললেন, এ অসময়ে ওদের বাড়ি না গেলে চলত না? ঝটপট ফিরে এস তাহলে। অবশ্যি আজ রোববার। বেলা করেই খাওয়া যাবে।

নতুন মামীমা তাহলে কিচেনে ছিলেন!

ঘুরে আমাকে দেখে জগনমামা একগাল হেসে বললেন, এই যে ঝণ্টু! আলাপ হল মামীমার সঙ্গে? গপ্পের রাজা। থুড়ি রানী! রানী! আর তুমি তো বরাবর ভূতের গপ্প শুনতে ভালবাসতে! এখন অবশ্যি বড় হয়েছ। তাহলেও মন্দ লাগবে না! কী বলো!

বলে চোখ নাচালেন। রাত্তিরে শুনবে'খন।

নতুন মামীমাকে তখন পর্যন্ত চোখে না দেখলেও বুঝতে পারছিলাম, ভদ্রমহিলা খুব শান্ত ও চাপা স্বভাবের। কথাবার্তা বলেন হয়ত অতি সামান্য। যেটুকু বলেন, তাও যেন ভীষণ আস্তে গলার ভেতর। তাছাড়া বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপে হয়ত সংকোচ বোধ করেন, অথবা আদপে পছন্দই করেন না।

বাইরের ঘরে জগনমামার ওকালতির আপিস। আজ ছুটির দিন বলে বুঝি ওঁর মুহুরিবাবু আসেন নি। সেই ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বাইরে রোদ বেড়েছে। এখনই লু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চারপাশে শুধু গাছপালার শনশন আর গঙ্গায় নাইতে যাওয়ার সরু গলিপথে ধুলোবালি আবর্জনার ঝড় বইছে শোঁ শোঁ করে। ভেতর থেকে জগনমামার কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। নতুন মামীমার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছেন। ভদ্রমহিলা ভারি অদ্ভুত বলব। সম্ভবত শুনেই যাচ্ছেন মুখ বুজে।

আর কৌতূহল সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হল। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম। জগনমামা কিচেনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেবিলে তরকারি কুটছেন এবং কথা বলছেন। কিচেনের দরজা সামনাসামনি। ভেতরে কেরোসিনকুকার জ্বলছে। রান্না হচ্ছে। কিন্তু নতুনমামীমাকে দেখা যাচ্ছে না।

মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম। আমার সাড়া পেয়ে জগনমামা হেসে বললেন, এস বাবাজী। তোমার মামীমাকে বলছিলাম, ঝণ্টু তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে। বিশুদ্ধ জল-বায়ু আর নির্ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ হয়েছে। এ ভূতের জায়গায় অখাদ্য কি ওর রুচবে?

বলেই ভেতরের সেই ঘরের দিকে তাকালেন। তোমার অত কেন লজ্জা বলো তো? ঝণ্টু বলতে গেলে আমার আপন ভাগনে। এস। কই? সে, এসো না। ফিরে গিয়ে তোমারই বদনাম করবে। অচেনা তো নয়। সেই ছোট্টবয়সে কতবার দেখেছ। বড় হয়েছে বলে লজ্জা। আশ্চর্য।

আপনমনে যেন গজগজ করতে থাকলেন। তোমার এই একরোখামিই যত সর্বনাশের গোড়া।

আমি হকচকিয়ে গেছি ততক্ষণে। ছোট্টবয়সে কতবার দেখেছ—এর মানে কী? তাহলে কি নতুন মামীমা আমার চেনাজানা কোনো মহিলা? জগনমামার হাবভাব দেখে কোনো কথা জিগ্যেস করতে সাহস হল না। বুঝলাম, আমার খুব পরিচিত মহিলাকেই বিয়ে করেছেন জগনমামা। এত পরিচিত যে মুখোমুখি হলে নিশ্চয় দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। তাই উনি দেখা দিচ্ছেন না। খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। খুঁজেই পেলাম না তেমন কে হতে পারেন নতুন মামীমা?

দুপুরে খাবার সময়ও উনি এলেন না। জগনমামার মুখ গম্ভীর। সেটা খুবই স্বাভাবিক। টেবিলে সব সাজানো ছিল। দুজনে পচাপ খেলাম।

খাওয়া হলে, জগনমামা বললেন, ওঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে নাও। সাড়ে পাঁচটার আগে উঠো না। গরম কমলে বরং ঘুরে এসো গঙ্গার ধারে।

লম্বা হয়ে গেল ঘুমটা। উঠে দেখি, টেবিলে চা ঢাকা আছে। নতুন মামীমা এসে দিয়ে গেছেন কি? বোধ হয় জগনমামাই। বাড়ির ভেতর চুপচাপ। চা জুড়িয়ে গিয়েছিল। কল্পনা করলাম, নতুনমামীমাই চা রেখে গেছেন এবং আশ্চর্য, সেই মিষ্টি মেয়েলি গন্ধটা অবিকল টের পেলাম।

দরজা ভেজিয়ে গলিরাস্তায় গঙ্গার ধারে ঘুরতে গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরে এলাম, তখন এদিকটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। লোডশেডিং। দরজা বন্ধ থাকবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে ঠেলতেই দেখি, তেমনি খোলা। ভেতরে ঢুকে ডাকলাম, জগনমামা!

সাড়া এল, আয় ঝণ্টু! এখানে আয়।

উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন জগনমামা কালো মূর্তিটি হয়ে। আলো নেই বাড়িতে। বললাম, আলো জ্বালেননি যে?

জগনমামা বললেন, অন্ধকার ভাল লাগে। আয়, এখানে আয়। কী গো! এখন তো ঝণ্টু তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না—এবার কথা বলবে না কী? অ ঝণ্টু, মামীমার সঙ্গে কথা বল্।

ডাকলাম, মামীমা! তারপর টের পেলাম অন্ধকার উঠোনে আবছা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি শুধু আমি আর জগনমামা। হঠাৎ কেমন গা ছমছম করে উঠল। বললাম, জগনমামা! মামীমা কই?

এই তো দেখতে পাচ্ছিস না? জগনমামা অস্বাভাবিক গলায় বললেন। কই গো, ঝণ্টুকে ছুঁয়ে দাও তো! আহা, দাও না বাবা! বলতে গেলে আপন ভাগনে—ছোটবেলায় কত আদর করেছ!

হিহি করে অদ্ভুত হাসি হেসে জগনমামা আমার একটা হাত টেনে অন্যহাতে অন্ধকারে অদৃশ্য মামীমার হাত টানার ভঙ্গি করতেই আমার মাথা ঘুরে গেল এবং আচমকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এক লাফে বারান্দাএবং বারান্দা থেকে বাইরের ঘরে তারপর ব্যাগ-ট্যাগের কথা ভুলে দড়াম করে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়লাম।

মাসদুয়েক পরে একদিন শহরে গেছি। ব্যাগটা নিয়ে আসতে তো বটেই—জগনমামার অবস্থা দেখতেও তীব্র কৌতূহল হল। নিরিবিলি জায়গায় পুরনো

জরাজীর্ণ বাড়িটা দেখে একটু গা ছমছম করল। কিন্তু দিনদুপুরে আশা করি আর ভূতের ভয়টা পাবে না।

দরজায় কড়া নাড়ার পর খুলল। খুলতেই আমার বুকের ভেতর রক্ত চড়াৎ করে উঠল। হাসিখুশি মিষ্টি চেহারার সুন্দরী মহিলা দরজার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন। যেই হাসিমুখে বলেছেন, কাকে চাই—অমনি আমি পিছিয়ে এসেছি। প্রায় লাফ দিয়েই।

ইনিই যে সেই নিরাকার মামীমা—যাঁর সঙ্গে জগনমামা অনর্গল কথা বলতেন এবং যিনি আত্মহত্যা করে মারা যান, তিনি ছাড়া আর কে হতে পারেন? ভুল হয়েছে বলে আমি হনহন করে চলে এলাম। পা টলছিল। একবারও পিছু ফেরার সাহস হল না। নিরাকার আকার ধরলেই সমস্যা।

কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া রহস্যময়। তবে এটুকু মনে পড়ছে, পেছনে জগনমামার যেন চিৎকার শুনেছিলাম—ঝণ্টু! ও ঝণ্টু! চলে যাচ্ছিস কেন? তোর নতুনমামীমার সঙ্গে আলাপ করে যা!

কানের ভুল হতেও তো পারে। 'নতুন' শব্দটা কি সত্যি শুনেছিলাম?

সাক্ষীবট

মাখনবাবু বলেছিলেন, তোমরা দেখে নও। এ কেষ্টব্যাটা করে বেঘোরে মারা পড়বে।

তখন সবাই হেসেছিল। হাসির কারণ মারা পড়াটা নয়, নামটা। ওর নাম কেষ্ট নয়, কালা। কুড়ুলে-কাপশার কালাচরণ। তিরিশের মধ্যে বয়স। পেটে বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্যই। ছেলেবেলায় যাত্রাদলে একানি গানের 'বালক' ছিল। এ যৌবনে সে গলা আর নেই। রূপও নেই। রুক্ষসুক্ষ পোড়খাওয়া চেহারা। পেশাদার চোর বলে বদনাম প্রচুর।

ইটখোলার মাখনবাবু ম্যাট্রিক পাস। রবি ঠাকুরের পদ্যপড়া লোক। 'পুরাতন ভৃত্যের কেষ্টাব্যাটাই চোর, এই অনুসঙ্গ থেকেই হয়তো বলে থাকবেন কথাটা। কিন্তু লোকে বুঝেছিল অন্য কেষ্ট। বৃন্দাবনের প্রেমিককে।

সেই প্রেমিকের গায়ের রঙও নবঘনশ্যাম অর্থাৎ স্রেফ কালো ছিল। যমুনা নামে একটা নদীও ছিল, যেমন এই ছোট্ট নদীটা। সেই প্রেমিক বাঁশিও বাজাত। আসলে প্রেমিকাকে ডাকার সংকেত।

কুড়ুলে-কাপশার এ কালীচরণের সঙ্গে তার এমন অনেক মিল। তাছাড়া চুরি-চামারিতেও দুজনের নামডাক—যদিও বৃন্দাবনের প্রেমিক স্রেফ ননীটা মাখনটাই চুরি করত। কাজেই সুঁদরিতলায় লোকেরা এমনি-এমনি হাসেনি।

ইটখোলাটা নদীর পাড়ে। পিচরাস্তা গ্রাম ঘুরে যেখানে সাঁকো পেরিয়ে গেছে, তার নীচে। মাখনবাবুর দরমাবেড়ার ঘরের বারান্দায় বসলে সামনা-সামনি ওপারে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখা যায়। তার তলায় ষষ্ঠী নামে একটা লোক বুড়ো হয়ে গেল কালক্রমে। চা-বিস্কুট আর বিড়ি সিগারেট বেচছে সেই খেয়া নৌকোর আমল থেকে। এখনও ভোল ফেরাতে পারেনি। কালী তারই ছেলে। শিবরাত্রির সলতে।

ওপারে কুড়ুলে-কাপশার বিস্তীর্ণ মাঠে সন্ধ্যার ঘোর লাগতে না লাগতে ষষ্ঠী তার সলতেটিকে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় বটতলায়।

আজকাল নদীর ধারের খোলামেলায় রাতের হাওয়াটা সয় না। বুড়ো হাড় এখন একটু ঘুমের আরাম চায়। এদিকে কালী টাট আগলায়। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ এ-গাঁ ও-গাঁর লোকেরা বসে যায় বটতলায়। বিক্রিবাটা মন্দ হয় না। তারপর রাত আটটার বাস চলে গেলে একেবারে নিশুতি। চারদিক জুড়ে অন্ধকার। তার মধ্যে টিমটিমে আলো আর কালীর বাঁশের বাঁশির সুর। রাতের নদী বাঁশির সুরকে প্রতিধ্বনিতে মুড়ে উজান-ভাটি কতদূর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খেলা করে।

ইটখোলার মজুর-মজুরনীরা যদ্দিন ছিল, তদ্দিন ব্যাপারটা কানে আসেনি মাখন হালদারের। কারণ সেই সন্ধ্যা থেকে ওদের ঢোলে উঠত তুমুল বাজনা। তার সঙ্গে ইকড়ি-মিকড়ি ভাষার গান। সেই মধ্যরাত অব্দি এই আসর চলত। এখন ইটখোলায় স্টক ঠাসা। কণ্ট্রাকটার ফেঁসে গেছে কিসে, মাল ডেলিভারি নিচ্ছে না। চৈত্রের মরশুমটাই 'ব্লকড'। মাখনবাবুর মনমেজাজ খিঁচড়ে গেছে। ইটখোলা খাঁ খাঁ করে দিনরাত। কাজকর্ম না থাকলে সময় কাটানো দায়। মন সবখানে সবকিছুতে ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়।

এই ছোঁক-ছোঁকামি এবং স্তব্ধতার দরুন মাখনবাবুর চোখে পড়ে যায় ব্যাপারটা।

ইটখোলার অন্যপাশে নদীর একটা দহ আছে। সারা বছর সেখানে জল থাকে এবং সুঁদরিতলার লোকেরা শীতের শেষ থেকে ঘাট বদল করে ওখানেই যায়। বারান্দা থেকে দহের ঘাট ভালই নজরে পড়ে। রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার।

কালীর বাঁশি বাজতে বাজতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। তারপর মাখনবাবু ভূত দেখে চমকে উঠেছিলেন।

সাদা কাপড়পরা মূর্তি দহের ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূত তো এরকমই। মাখনবাবু ভয় পাওয়া ভাবটা জেদ করে কাটিয়ে পা টিপে-টিপে এবং সাপের ভয়ে পায়ের কাছে সাবধানে টর্চের আলো ফেলে ইটের স্তূপের আড়াল দিয়ে এগিয়েছিলেন। তারপর যা থাকে বরাতে বলে টর্চের আলো সোজা সেই মূর্তির ওপর ফেলেছিলেন।

তখন মূর্তি একটা নয়, দুটো। এবং কালী তক্ষুণি পালিয়ে গেল। ঝোপ-ঝাপ ডিঙিয়ে একেবারে হাওয়া। আর সরমা দুহাতে মুখ ঢেকে হাসল।—মাখনদা নাকি?

মাখনবাবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবতেই পারেননি, এমন অদ্ভুত কিছু ঘটতে পারে। ভদ্রবাড়ির বিধবা মেয়েটি ওই চোরচোট্টা কালীর সঙ্গে প্রেম করছে, এ কি ভাবা যায়?

তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, নিলাজ মেয়েটা আবার অমন গলায় বলছে, মাখনদা নাকি?

মাখনবাবু গুম হয়ে ফিরে আসছিলেন। তখন ফের সরমা ডেকেছিল—মাখনদা, শুনুন!

—বলো।

—কাকেও বলবেন না যেন। বললে ভাল হবে না।

এ কি শাসানি, না দাবি? মাখনবাবু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে শুধু বলেছিলেন, হুঁ।

বুকের পাটা অসতী মেয়েটার—ফের বলেছিল, হুঁ নয়। বললে ভাল হবে না কিন্তু।

মাখনবাবু ফোঁস করে উঠেছিলেন—শাসাচ্ছ নাকি?

—তা বললে তাই।

এতক্ষণে চোখে পড়েছিল জ্যোৎস্নায় একটা পেতলের ঘড়া চকচক করছে। ঘড়াটা তুলে নিয়ে সরমা জলে নেমেছিল। আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এসেছিলেন মাখনবাবু। ভীষণ খাপ্পা হয়ে গিয়েছিলেন মনে-মনে। কিন্তু তিনি হিসেবী মানুষ। তাছাড়া বাইরের লোক। সরমাদের বাড়ি যাতায়াত করে থাকেন বটে, তেমন যাতায়াত তো সুন্দরিতলার সব বাড়িতেই। এই সুনসান

ইটখোলায় একা পড়ে আছেন। প্রাণের ভয়ও আছে কারণ-অকারণে। সুঁদরিতলার লোকের বদনাম আছে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বলে। নদীতীরের লোকেরা যা হয়। তার ওপর বিশেষ করে সরমার দাদা পরেশ নাকি সাংঘাতিক লোক। একসময় মিলিটারিতে ছিল। সবসময় সেই রোয়াব দেখায়। ওর সঙ্গে ভাব রাখাটা ভাল ভেবেছিলেন।

কিন্তু সাতপাঁচ ভেবে এ ঘটনাটা চেপেই গিয়েছিলেন। শুধু কখনও-সখনও কালীর কথা উঠলে বলেন, কেষ্টাব্যাটা মরবে। লোকেরা হাসে। ষষ্ঠীর ছেলে কালী নাকি পুলিশের হাতে কতবার ঠ্যাংগানি খেয়েছে। জেল এখনও হয়নি—তবে বদনামটা রটে গেছে ইতিমধ্যেই। কালী নাকি পাকা চোর। রাত-বিরেতে চুরি করে বেড়ায়। ওর সাঙ্গাতরা সবাই এলাকার দাগী। তবে পুলিশের ভয়ে বটতলায় এসে প্রকাশ্যে মাখামাখি করে না কালীর সঙ্গে।

কিন্তু মাখনবাবু ভেবে কুল পান না, ওই একটা কালোকুচ্ছিত চোরচোট্টার সঙ্গে ভদ্রলোকের বাড়ির সুন্দর মেয়েটা—বিধবা মেয়েটার এ প্রেমের মানেটা কী? নিছক কাম ছাড়া কিছু হতে পারে না। গতরের সুখ মেটানো। মেন্নায় রাগে মাখনবাবুর পিত্তি জ্বলে যায়। ওদের বাড়ি আর যান না। দূর থেকে সরমাকে দেখলে অন্যদিকে ঘোরেন। মনে মনে বলেন, মরবে। দুজনেই মারা পড়বে। তবে ওই কালীর মরণটাই আগে হবে পরেশের হাতে। তারপর মরবে সরমা। অবশ্য সরমার মৃত্যুটা ওর নিজের হাতেই হবে। সচরাচর তাই হয়ে থাকে বিধবাদের বেলায়।···

কালীর চোর বদনামের সঙ্গে লাম্পট্যের বদনামও আছে। তাই বলে কেউ ভুলেও ভাবে না সরমার সঙ্গে তার কিছু থাকতে পারে। এটা অকল্পনীয়। কালী সুঁদরিতলা বরাবর যাতায়াত করেছে কাজে-অকাজে। পরেশের পায়ের কাছে বসে আড্ডা দিয়েছে কতদিন। পরেশ তাকে সেই ছেলেবেলা থেকে একটু আধটু আস্কারা দেয়, সেটা স্বাভাবিক। পরেশ লোকটাও তো ভাল নয়। মুরুব্বির জোর আছে বলে, তাছাড়া ভদ্রলোকের বংশ, পুলিশের পাল্লায় তাকে কখনও পড়তে দেখে নি কেউ। বরং পুলিশই গাঁয়ে এলে তার পাল্লায় পড়ে। অর্থাৎ তার বসার ঘরে আড্ডা দিয়ে যায়। দারোগাবাবুরা তাকে খাতির করে কথা বলেন। তার বাড়ি খাওয়াদাওয়া করেন। পরেশের দাপট তাই বেড়েছে।

এমন মানুষ পরেশ—তার বিধবা বোন সরমাও তেজী মেয়ে। সকাল-সন্ধ্যা একাদোকা ঘুরে বেড়াতে তার বাধে না। জোরটা তার নিজের খানিকটা এবং খানিকটা দাদার। কে তার দিকে খারাপচোখে তাকানোর সাহস পাবে? ধারণাটা এমন: পরেশের বোন যদি ন্যাংটো হয়ে পড়ে থাকে পথেঘাটে, মানুষ তো দূরের কথা—কুকুর-বেড়ালেরও সাধ্যি নেই তার দিকে একবার তাকায়।

কথাটা সত্যি। সুঁদরিতলার প্রেমিক বা লম্পট কারুর সে হিম্মত নেই। তাছাড়া শহর থেকে অনেক দূরে এই অখদ্যে গাঁয়ে এখনও চিরাচরিত গ্রামীণ ঐক্যবোধ বড় প্রবল। গাঁয়ের লোক সবকিছুতে এককাট্টা। আণ্ডাবাচ্চা থেকে বুড়োবুড়ি সবার এক রা। নিজেদের ব্যাপারে সামাজিক শাসন বড় কড়া। এ গাঁয়ের চোর নিজের গাঁয়ে চুরি করে না। এ গাঁয়ের লম্পট কদাচ নিজের গাঁয়ে লাম্পট্য করে না। অবশ্য প্রেম জিনিসটা আলাদা। একটু-আধটু প্রেম না হয়, এমন নয়। তবে বেশিদূর এগোতে পারে না।

এমন গাঁয়ের ধারে ইটখোলা করে মাখন হালদার নিরাপদ বোধ করেছেন। গাঁয়ের লোকে বলেছে, নির্ভয়ে থাকুন মাখনবাবু। মাখনবাবু নির্ভয়ে আছেন বৈকি—দারোয়ান রাখেননি ইটের পাহারায়। তবে সংস্কারবশে মাঝে মাঝে ভয় পান এই যা।

সেই জ্যোৎস্নারাতের ঘটনা থেকে তাঁর মনে কী একটা অস্বস্তির শুরু। তারপরও কোনো-কোনো রাতে টের পেয়েছেন দহের ঘাটে কালী আর সরমার প্রেম চলছে। কিন্তু আড়ি পাততে যাননি। যতক্ষণ ব্যাপারটা চলতে থাকে, অস্বস্তি ঝড়ের মতো হুলুস্থুল বাধায়। ছটফট করেন। কান পাতেন, কালীর মৃত্যুকালীন আর্তনাদ শুনবেন বলে।

কখন কান পেতে থাকেন, হইহল্লার আওয়াজ আসছে নাকি।

কিছু আসে না। নিশুতি রাত থমথম করে। জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে নদী তেমনি শান্ত শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সাঁকোয় শব্দ করে চলে যায় মোটর-গাড়ি। আলোর ঝলকানি ছড়িয়ে যায় বাঁকের মুখে। মাঠ ঝোপঝাপ আর বটগাছটা জ্বলে ওঠে যেন। ফের নিভে যায়। কখনও লালচে ইটের স্তূপে আলোর থাবা পড়ে। থাবা সরে যায় দূরে। মোটর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যায়। ফের জেগে ওঠে স্তব্ধতা। সেই বিরাট স্তব্ধতার ওপর রাতের হাওয়া এসে খেলা করে। বটের ডালে পেঁচা ডাকে একবার। কোথাও শেয়াল ডেকে ওঠে। আবার সব চুপ। দহের দিকটাও ভারি শান্ত।...

চৈত্র শেষ হয়ে এসেছে। গাজনের বাজনা বাজিয়ে ভক্তরা দহের ঘাটে এসে ঠিকন-ঠাকনের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে। এখন নাইতে মানা ওদের। ওদিকে ইটখোলার পেছনে বাঁশবনের ভেতর আখমাড়াই কল বসেছে। মিঠে গন্ধ ভেসে আসে ফুটন্ত রসের। ক্ষেতে চৈতালীর হলুদ রঙের ঘোর লেগেছে। সেই সময় মাখনবাবু শুনে আঁতকে উঠলেন, সরমার সঙ্গে কালীর ব্যাপারটা সুঁদরিতলায় কীভাবে জানাজানি হয়ে গেছে।

অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কথায় বলে, পাপ চাপা থাকে না। মাখনবাবু জানতেন, এ পাপ কখনও চাপা থাকবে না। তাছাড়া কতবার আসল কথাটা ঢেকে ইশারায় বলেছেন, দেখে নিও—কেষ্টব্যাটা মরবে। লোকেরা হেসেছে।

এখন সেই লোকেরাই বলছে, আপনি ঠিক কথা বলেছিলেন মাখনবাবু। তাহলে নিশ্চয় কিছু চোখে পড়েছিল আপনার?

মাখনবাবু জোরে মাথা দুলিয়ে বলছেন, আরে না না। ওটা বোঝা যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা কীভাবে জানাজানি হল? আর কার চোখে পড়ল? মাখনবাবু এর সঠিক জবাব পাচ্ছেন না। বিজ্ঞের মতো সুঁদরিতলার লোকেরা খালি এক কথাই বলে, ও জিনিস কি চাপা থাকে?

দুপুরবেলাটা ইটখোলায় ঘুমঘুম ভাব। কুকারে রান্না সেরে মাখনবাবু চান করে এসেছেন। খাবার জল গাঁয়ের টিউবেল থেকে দিয়ে যায় একটা লোক। খাওয়াদাওয়া সেরে সবে ভাতঘুম দিতে গড়িয়েছেন, বারান্দায় কেউ এল। কুকুর ভেবে বললেন—যাঃ যাঃ।

সরমা সোজা ঘরে ঢুকে বলল—আমি।

মাখনবাবু ধুড়মুড় করে উঠে বসলেন। বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে শুধু বললেন—কী?

সরমার কাঁধে গামছা। ঘাটে নাইতেই এসেছে। ঘড়াটা নিশ্চয় ওখানে রেখে এসেছে। কবে চুল মুড়োতে হয়েছিল। মুরুব্বিদের চাপে, ফের গজিয়েছিল। কিন্তু আর কাটেনি। এখন কাঁধ ছুঁয়েছে। ছিপছিপে হাল্কা গড়ন। তাই বলে রোগা ছাখায় না। ডিমালো মুখ। নীলচে সূক্ষ্ম রোম আছে ঠোঁটের ওপর। চিবুকের বাঁদিকে জড়ুল। গায়ে জামা নেই। চুলপাড় ঘিয়ে রঙের শাড়ি জড়িয়ে যৌবনের অনেকটা আড়ালে রেখেছে। ভুরু কুঁচকে বলল—একটা কথা বলতে এলাম মাখনদা।

মাখনবাবু কোনোরকমে খালি বললেন—উঁ?

সরমা এবার ফিক করে হাসল।—উঁ নয়, একটা কথা বলতে এলাম। বোবাকালার মতো তাকাবেন না। শুনুন। ওবেলা বটতলায় কালীকে একটা খবর দেবেন?

মাখনবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—খবর দেবার আর লোক পেলে না?

—না। সরমা ফের গম্ভীর হল। গাঁয়ের লোককে তো জানেন। সব এক রা। আপনি কালীকে বলবেন, এখন কিছুদিন যেন ভুলেও এপারে না আসে। এমনকি বটতলাতেও যেন না আসে। বলবেন—কেমন?

—বলব। মাখনবাবু ভালমানুষের মতো বললেন।

সরমা যেমন এসেছিল, তেমনি হুট করে মিলিয়ে গেল। মাখনবাবু সিগারেট ধরালেন। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি? সিগারেট টানতে টানতে রেগে গেলেন ক্রমশ। কী ভেবেছে আমাকে? ওই হারামজাদীর দূতিয়ালি করতে হবে নাকি? কী আব্দার দেখছ?

বিকেলে অস্থির হয়ে সাঁকোতে ঘুরছেন, সুঁদরিতলার কানু নামে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হল। কানু বলল, দাদাবাবু হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ হে কানু, শোন। মাখনবাবু ফিসফিস করে বললেন—পরেশবাবুরা কালীকে খুন করবে, সত্যি নাকি হে?

কানু একগাল হেসে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ দাদাবাবু। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সেদিন রাতে মিটিংয়ে কথা হয়েছে, কালীকে হাত-পা বেঁধে গুড জাল দেওয়া চুলোয় ঢোকানো হবে।

মাখনবাবু আঁতকে উঠে বললেন—বলো কী হে!

কানু অকপটে সরলমুখে বলল—প্রথমে কথা হয়েছিল, বলি দেওয়া হবে বরজেতলার হাঁড়িকাঠে। শেষে ঠিক হল, মুণ্ডু কাটলে তো কিছু বুঝবেই না। তার চেয়ে চুলোয় ঢুকিয়ে মারলে কষ্টটা বেশি হবে। জ্ঞানও হবে।

মাখনবাবু করুণ হাসলেন। —সে জ্ঞানে আর কী ফল?

কানু বলে গেল—ফল আছে বৈকি। মুরুব্বিরা বুঝেসুঝেই ওই শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

মাখনবাবু মনে মনে নাক কান মুললেন। ইটগুলোর ব্যবস্থা বোশেখেই হয়ে যাবার কথা। এমন ভয়ঙ্কর জায়গায় আর নয়।

কানু চলে যাওয়ার কতক্ষণ পরে সূর্য ডুবল। কুড়ুল-কাপশার মাঠের দিকটা ধোঁয়াটে হয়ে এল। বনচড়ুইয়ের ঝাঁক উড়ল আর বসল শূন্য ধানক্ষেতে।

শেষ ঘূর্ণিটা চলে গেল খড়কুটো উড়িয়ে। বটতলায় হারিকেন জ্বললে মাখনবাবু গেলেন।

কালীর টাটে অচেনা দুজন লোক চা খেয়ে বোঁচকা-বুঁচকি কাঁধে নিয়ে মাঠের পথ ধরল। একটু তফাতে বাসের অপেক্ষায় কারা দাঁড়িয়ে আছে। মাখনবাবুকে দেখে কালী হেসে বলল—আসুন দাদাবাবু। বসুন, চা খান।

মাখনবাবু বাঁশবাতার বেঞ্চে বসে বললেন—থাক্। একটা কথা বলতে এলাম, কালী।

কালী এদিকওদিক দ্রুত দেখে নিয়ে বলল—দাদাবাবু, কথা আমিও বলতে যেতাম। এসেছেন ভালই হয়েছে।

মাখনবাবু বললেন—তোমার কথাটাই শোনা যাক আগে।

কালী চাপা গলায় বলল—দোহাই দাদাবাবু, কাকেও বলবেন না। আপনি বাইরের লোক বলেই অনুরোধ করছি। আপনি তো পরেশবাবুর বাড়ি যান-টান দেখেছি।

—হুঁ। যেতাম, আজকাল যাইনে। কেন?

তাহলে···কালী একটু ইতস্তত করে বলল, তাহলেও আপনার সঙ্গে ওর দেখা হতে পারে। ঘাটে তো আসে-টাসে! দয়া করে বলবেন, কালী বলেছে···

মাখনবাবু বাধা দিয়ে বললেন—আহা, ও-টা কে আগে তাই বলো না হে!

কালী লাজুক হেসে বলল—আজ্ঞে, পরেশবাবুর বোনের কথা বলছি।

—হুঁ। বলে মাখনবাবু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

কালী বলল—আপনি তো সবই জানেন দাদাবাবু। আপনার হাতে একবার ধরাও পড়েছিলাম। আপনি বড় ভালমানুষ দাদাবাবু। আমরা কত সুনাম করি আপনার।

মাখনবাবু হাত তুলে বললেন—আহা, বলোই না বাবা কী বলতে চাও।

—আপনি সরমাকে বলবেন, তুমি কালীকে যা বলেছ, কালী তাতে রাজী না। বাস্, তাহলেই ও বুঝবে। আর কিছু বলতে হবে না।

মাখনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—দেখা হলে বলব। এবার আমার কথাটা বলি।

কালী চা ছাঁকা বন্ধ রেখে আগ্রহে তাকিয়ে রইল।

—ওবেলা সরমা বলে গেছে তোমাকে বলতে। ওপারে কিছুদিন তুমি ভুলেও পা দেবে না এমন কী বটতলাতেও আসবে না।

কালী নড়ে উঠল।—কেন? কেন?

মাখনবাবু একদমে বললেন—তুমি খুন হয়ে যাবে।

কালী হেসে উঠল। —হ্যাঁ! এই কথা।

মাখনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কোরো না কালী। আমিও শুনেছি, তোমাকে গুড়ের চুলোয় ঢুকিয়ে মারবে সুঁদরিতলার লোকেরা।

—যাঃ! কালী চা ছেঁকে চায়ের গেলাস দিল। তারপর দাঁড়িয়ে ওপারটা দেখতে দেখতে বলল—সুঁদরিতলার লোকেরা কী, তা জানি দাদাবাবু। কিন্তু এ কালীকেও কম ভাববেন না।

—কথা শোনো কালী। অত বড়াই কোরো না। যা বললাম, শুনো।

কালী একটা আড়ামোড়া খেয়ে বলল—সরমার কাছে আর যাব না, সে তো বুঝতেই পেরেছেন। ও আমাকে ঠকিয়েছে। তবে ওই যে বললেন, ওরা আমাকে খুন করবে—সেজন্যেই ওপারে যাব।

—কালী! পাগলামো কোরো না।

কালী ফের হাসতে লাগল। তার হাসিতে আত্মবিশ্বাসের ভাব জোরালো। মাখনবাবু আর কোনো কথা বললেন না। চা শেষ করে চুপচাপ চলে এলেন। কালী পিছু ডেকে একবার বলল—কথাটা বলবেন কিন্তু।

সরমা এল পরদিন দুপুরের একটু আগেই। তেমনি কাঁধে গামছা, স্নানের ভঙ্গি। ঘরে ঢুকে সোজা বলল—দেখা হয়েছিল? বলেছেন?

—বলেছি।

—কী বলল?

—গ্রাহ্যই করলে না। আর···

—আর?

—তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছে।

—কী?

—তোমার কথায় ও রাজি না। তুমি ওকে নাকি ঠকিয়েছ!

সরমা ঠোঁট কামড়ে ধরল। ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ওর নাকের ফুটো কাঁপছিল। একটু পরে মাখনবাবুর চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বলল—ঠকিয়েছি বলল?

—হুঁ। তাই তো বলল।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সরমা বলল—আচ্ছা। তারপর দরজার দিকে ঘুরল।

মাখনবাবু পিছু ডাকলেন—সরমা, শোন।

পিছু না ফিরে সরমা বলল—কী ?

—ব্যাপারটা খুলে বলবে আমাকে ?

—সব কথা সবাইকে বলা যায় না মাখনদা। যায় ?

—না। মানে,…

সরমা ঘুরে তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। মাখনবাবু একটু কেসে গলা সাফ করে হাসলেন। —ধরো, তোমাদের যদি সাহায্য করতে পারি। আমি বাইরের লোক কিনা!

সরমা কেমন হাসল। —আপনি খুব ভালমানুষ জানি, মাখনদা। কিন্তু থাক্। বাইরের মানুষ বলেই আর আপনাকে জড়াবো না। তবে লোকে আপনার ক্ষতি করে বসবে।…

সরমা হনহন করে চলে গেল। ইটের পাঁজার ফাঁক দিয়ে সাবধানে পা ফেলে শেয়ালের মতো চলে গেল। মাখনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন তো আছেন। বড় রহস্যময় একটা ব্যাপারের সঙ্গে যেভাবেই হোক, জড়িয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু তিনি তো ইচ্ছে করে জড়াননি। পরেশের বোন আর ওই হারামজাদাটা তাঁকে বেমক্কা জড়িয়ে ফেলেছে। অথচ ভেতরকার কিছু আঁচ করতে পারছেন না। এ বয়সেও বিয়ে করেননি। প্রেম করারও সুযোগ পাননি জীবনে। সরমা আর কালীর প্রেমের আড়ালে একটা কিছু আছে যেন। সেই অন্য ধরনের ব্যাপার।

তবে নিজের পৌরুষে বড্ড বাজে। মেয়েটা তাঁকে কী ভেবেছে ? ওদের জঘন্য ব্যাপারটার দালাল বানিয়ে বসেছে তাঁকে। এটা ধৃষ্টতা। মাখন হালদারের মতো সোমত্ত পুরুষমানুষ, তাঁকে নোংরা একটা মেয়ে চাকরের কাজ করিয়ে নিচ্ছে। পরেশের বাড়ি ওঠাবসা করতে গিয়েই হয়তো নিজের অজান্তে প্রশ্রয় দিয়ে বসেছিলেন মেয়েটাকে।

সেদিনের মতো মনমেজাজ বেজার হয়ে রইল মাখন হালদারের। বিকেলে একবার সাঁকোর ওপর ঘুরতে গিয়েছিলেন। বটতলা পর্যন্ত এগোননি। দূর থেকে দেখলেন, কালী আজ সকাল-সকাল বাবাকে ছুটি দিতে এসেছে।

একটু পরে তিনটে সাইকেলে চেপে তিনজন পুলিশ এসে বটতলায় থামল। তখন সূর্য ডুবে গেছে। মাখনবাবু দেখলেন, পুলিশরা হেসে-হেসে কথা বলছে কালীর সঙ্গে। চা খাচ্ছে।

তারা যখন ফেরার পথে সাঁকোর ওপর এসেছে, মাখনবাবু চিনতে পারলেন,

কাপাসীর দারোগা ত্রিলোচনবাবু আর দুজন সেপাই। মাখনবাবুকে দেখে ত্রিলোচন দারোগা রাস্তায় পা ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন।—মাখনবাবু যে। হাওয়া খাচ্ছেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল আছেন স্যার?

—আপনার আশীর্বাদ।

মাখনবাবু সিগারেট দিয়ে বললেন—আর বলবেন না স্যার! ইট ডেলিভারি হচ্ছে না। কী যে বিপদে পড়েছি। যখের ধনের মতো আগলে থাকা। কখন গাড়ি বোঝাই করে মেরে দেয় কে।

দারোগা হাহা করে হাসলেন। —সুঁদরিতলা ভাল জায়গা। এককাট্টা গ্রাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। চুরি যাবে না।

যা দিনকাল পড়েছে স্যার। বলে মাখনবাবু হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন দারোগাবাবুকে।

ত্রিলোচন দারোগা ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন—এ-গাঁয়ে আমরা বিশেষ ঢুকি না জানেন? কারণ, গ্রামবাসীর একতা। কতকাল এ গাঁয়ের কোনো মামলা কোর্টে যায়নি জানেন? যাক্ গে, চলি। আজ খুব হয়রানি গেছে। দশ মাইল চক্কর দিয়ে এলুম।

মাখনবাবু হঠাৎ চাপা গলায় বললেন—একটা কথা ইদানীং কানাঘুঁষো শুনছি স্যার! আপনারা তো আইনরক্ষক। তাই বলা উচিত মনে করছি।

দারোগা আগ্রহে বললেন—বলুন, বলুন কী ব্যাপার?

—সুঁদরিতলার লোকেরা নাকি ওই কালীকে খুন করবে ঠিক করছে।

—তাই বুঝি? বলে আকাশমুখো ধুঁয়ো ছেড়ে ত্রিলোচন দারোগা হাসির মতো একটা শব্দ করলেন। সেটা কাশিও হতে পারে। তারপর ফের বললেন—দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। ওই যে শাস্ত্রবাক্য আছে, দুষ্কৃতয়াং বিনাশাশ্চ পাপীনাং উদ্ধারেণ না কী যেন। আমার আবার মুখস্থ বিদ্যাটা আসে না। তা বুঝলেন কি না? সবই ভগবানের লীলা। তিনিই পাপীদের সৃষ্টি করেছেন এক রূপে, হনন করছেন অন্যরূপে। এতে আপনিই বা কী করবেন, আমিই বা কী করব? আমরা কে, বলুন? নিমিত্ত মাত্র।

সন্ধ্যার আকাশের দিকে সিগারেটসুদ্ধ আঙুলের চক্কর এঁকে দারোগা দার্শনিক হাসি হেসে প্যাডেলে পা রাখলেন। সেপাই দুজন সাঁকোর রেলিং-ঘেঁষে সাইকেলে বসে ছিল। তারাও প্যাডেলে চাপ দিল।

তারপর ওই অবস্থায় ত্রিলোচন দারোগা ঘাড় ঘুরিয়ে ফের বললেন—রাখে হরি তো মারে কে, আর মারে হরি তো রাখে কে?

আবছা আঁধারে তিন আইনরক্ষকের মূর্তি মিলিয়ে গেল। মাখনবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেরাতে বটতলায় কালীর বাঁশি জোর বাজছিল। কী সুর বাজায় এলোমেলো, মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। যাত্রাগানেরই সুর হয়তো। আর আজকাল রাতের দিকে হাওয়া বড় উত্তাল। ইটের পাঁজাগুলোকেও যেন কাঁপিয়ে দেয়। সবকিছু নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। বুক কাঁপে। কী হয় কী হয় এরকম একটা উত্তেজনা রক্ত ঘুলিয়ে তোলে। একটা মানুষ খুন হবে—একটা জলজ্যান্ত মানুষ! ভাবতেই হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে যায় মাখনবাবুর। কালীর বাঁশি থামলে আগেও একটা উত্তেজনা জাগত, সেটা নির্জন নদীর ঘাটে একজোড়া মানুষের জোড়বাঁধার খেলা চলছে অনুমান করেই। এখন থামলে যে উত্তেজনা, তা আতঙ্কের। ওরা কি কালীর হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে নিয়ে যাচ্ছে আখমাড়াই কলের দিকে বাঁশবনের ভেতর?

বড় অসহায় লাগে নিজেকে। এই ইটভাটায় এভাবে থাকা যায় না। এ এক শাস্তি।···

এর ক'দিন পরে সুঁদরিতলার সেই কানুর সঙ্গে ফের দেখা হল সাঁকোর ওপর। কানু বলল—এই যে দাদাবাবু। আপনার কথাই ফলল। কেষ্টাব্যাটা খুন হল।

চমকে উঠলেন মাখনবাবু।—এ্যাঁ সত্যি খুন হল নাকি? কবে?

—গত রেতে।

—সর্বনাশ! মাখনবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কানু একগাল হেসে বলল—গুড়ের চুলোয় ঢোকানো হয়নি। ঘাড়ে বাঁশ রেখে ধড়টাকে উল্টে দিতেই মট করে শব্দ হল। বাস্, বাছাধন কাঠ। কই, একটা সিগারেট দিন আগে।

নিঃসাড় হাতে সিগারেট দিলেন মাখনবাবু। কানু মৌজ করে টানতে টানতে সাঁকোর রেলিঙে ঠেস দিয়ে ফের বলল—তখন রাত বারোটা-টারোটা হবে। কালী পরেশবাবুদের বাড়ি ঢুকেছিল পাঁচিল ডিঙিয়ে। আর পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের মুখে। পরেশবাবু লোহার রড হাতে রেডিই ছিলেন। এক ঘা খেয়ে কালী খিড়কির দরজা খুলে পুকুরে পড়ল। ততক্ষণে পরেশবাবুর ডাকে লোকজন হাজির হয়েছে। পুকুর ঘিরে ফেলেছে। যেদিকে উঠতে যায় কালী, বল্লমের খোঁচা খায়। শেষে বল্লমে গেঁথে মাছের মতো তোলা হল। সদররাস্তায় টানতে টানতে নিয়ে গেল পরেশবাবু। তখন গাঁসুদ্ধ জেগেছে। আমিও দাদাবাবু—বুঝলেন? বরজেতলার থানে ওর ঘাড়ের তলায় বাঁশ দিয়ে···

মাখনবাবু বললেন—থাক্।

কানু হাসতে লাগল।—লাস বিলের তলায় পুঁতে দিয়েছে। আজ সকাল থেকে তার ওপর বোরো ধানের চারা রুয়ে দিয়েছে পরেশবাবু।

একটু চুপ করে থেকে মাখনবাবু বললেন—সরমার খবর কী?

কানু বলল—গতিক বুঝে রাতেই পালিয়েছে। সামনে থাকলে তো গাঁয়ের লোকে ওকেও ছাড়ত না। পরেশবাবুর সে হুকুম দেওয়া আছে। জোড়া লাসের ওপর ধান ফলিয়ে ছাড়ত।

এরা কী নিষ্ঠুর—এই সুঁদরিতলার লোকেরা। মাখনবাবু ভুরু কুঁচকে বিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুধু একটা ব্যাপার এখনও বোঝা যাচ্ছে না, কালী সরমার কোন কথায় রাজি নয় বলেছিল? সেটা কী? এ জীবনে রহস্যটা আর হয়তো জানাও যাবে না। কুলটা মেয়েটা নিপাত্তা হয়ে গেছে।···

বোশেখের মাঝামাঝি সুঁদরিতলার ইটখোলা শূন্য করে কণ্ট্রাক্টর মাখন হালদারকে উদ্ধার করেছিল। পরের ইটখোলার জায়গা খুব ভেবেচিন্তে বেছেছিলেন মাখনবাবু। শহরের কাছাকাছি জায়গা। একটু তফাতে ভাগীরথী। মাটিটা আরও ভাল। বর্ষার পর কাজ শুরু হবে। ততদিনে জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ আছে। সেই নিয়ে ব্যস্ত।

সরমার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন সাইকেলে শহরের রাস্তায় যেতে যেতে মাখনবাবুর চোখে পড়ল, চাপানবিড়ির ছোট্ট একটা দোকানে কুড়ুলে-কাপশার সেই ষষ্ঠীচরণ বসে আছে। তাহলে ওদের অত্যাচারেই বুড়োটা শহরে চলে এসেছে। মাখনবাবু কাছে গিয়ে বললেন—চিনতে পারছ ষষ্ঠী?

ষষ্ঠী একটু হেসে ঘাড় নাড়ল। —আপনি ইটখোলার মাখনবাবু।

—হ্যাঁ। খবর কী তোমার? এখানে এসে জুটলে কবে?

ষষ্ঠী বলল—তা মাসদুই হবে বাবুমশাই। গাঁয়ে মানুষ থাকে? চলে এলাম।

মাখনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন—তোমার ছেলেকে নাকি···

কথা কেড়ে বুড়ো বলল—ওরা পিচাশ বাবুমশাই। তাজা যোয়ান ছেলেটাকে মেরে ফেললে। ফেলুক। থানাপুলিশ করিনি। কী লাভ? ও গাঁয়ের সব শেয়াল এক রা।

মাখনবাবু বললেন—পরেশবাবুর বোনের খবর কী ষষ্ঠী? সে নাকি বেপাত্তা?

দোকানের ভেতর থেকে চটের পর্দা তুলে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে মাখনবাবু হতভম্ব। এ যে সরমা! এই ষষ্ঠীর কাছে আছে সে? সরমা বলল—পরেশবাবুর বোন কোন দুঃখে বেপাত্তা হবে মাখনদা? তাহলে শাস্তিটা দেবে কে পরেশবাবুকে?

—সরমা! কেমন আছ তুমি?

—খুব ভাল। দেখতেই তো পাচ্ছেন কেমন আছি।

মাখনবাবু ইচ্ছে হল বলেন, ভদ্রঘরের বিধবা মেয়ে হয়ে এভাবে বেজাতের ঘরে কাটানোটা কেমন ভাল এবং কতখানি ভাল? বলতে পারলেন না। তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণে আবিষ্কার করলেন, সরমার পেটে বাচ্চা আছে। সরমা সেটা গোপন করতেও চায় না। ছি ছি, এ-কী নিলাজ সৃষ্টিছাড়া মেয়ে রে বাবা!

সরমা হাসল। —আপনি বলবেন পাপ। কিন্তু আমি জানি, পাপ করিনি। ঘটা করে পুরুত ডেকে মন্তর আওড়ালেই বিয়ে হয়, আর মনের মিল হলে বুঝি বিয়ে হয় না? একবার তো ভাগ্যপরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল মাখনদা। পরের বার বটকে সাক্ষী রেখে আগুন ছুঁয়ে বিয়ে হল। এবার কিন্তু পরীক্ষায় হেরে জিতলাম। পেটে একটা বাচ্চা এল। ওকে চোরছ্যাঁচোড় বলে বদনাম দিত লোকে। আমি জানতাম ও কী। জানাজানির ভয়ে বাচ্চাটা নষ্ট করতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, আজকাল তো হাসপাতালে গেলেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। শুধু তুমি সঙ্গে গিয়ে স্বামী বলে কাগজে সই দেবে। আমি সিঁদুর প যাব। কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হল না। উল্টে আমাকে ভুল বুঝল। ভাব আমি অন্য কারুর সঙ্গে···

সরমা আঁচলে মুখ ঢাকল। কাঁদতে থাকল। ষষ্ঠীবুড়ো বলল—আহা কাঁদে না মা! আমি তো আছি।

সরমা কান্না সামলে জলজলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—দাদার গুমোর আ থাকবে ভেবেছেন মাখনদা? সুঁদরিতলার লোকেরা কি খবর পাবে ন পরেশবাবুর বোন কোথায় আছে, কেন আছে? শাস্তিটা ভালমতো না দিয়ে ছাড়ব ভাবছেন? আমি সেই সুঁদরিতলারই মেয়ে।

ষষ্ঠী বলল—আমারও সেই কথা বাবুমশাই! মেয়েটা সেই রেতের বেলা দৌড়ে গেল আমার কাছে। আমার সাধ্যি কী? ভাবলুম বোকা ছেলেটাকে তো বাঁচাতে পারব না। বরঞ্চ মেয়েটাকে বাঁচাই। ভাল করেছি, না মন্দ করেছি এবার বলুন?

মাখনবাবু চুপ করে আছেন দেখে বুড়ো ফের বলল—বলুন বাবুমশাই, ভাল না মন্দ করেছি?

মাখনবাবু বললেন—ভাল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল নদীর পাড়ে সেই পরিচিত বটগাছটাকে। বিশাল বট। চারদিকে ঘন সবুজ পাতা ছড়িয়ে ধূসর ডালপালা ও অজস্র ঝুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের বটগাছ। তলায় ছায়া। কিন্তু এ মুহূর্তে গাছটার চেহারা কেমন যেন মানুষেরই মতো।···

গল্প-সমগ্র

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

করুণা প্রকাশনী কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬৬

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
এইচ. পি. রায় এ্যাণ্ড কোং
১২নং যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

গাজন তলা	...	১
হরবোলা ছেলেটা	...	২৩
ইস্কাপন এবং তিরি	...	৩৩
শয়তানের টাকা	...	৪০
সাড়েচার হাত মাটি	...	৪৯
বৃষ্টিতে দাবানল	...	৫৭
কালিকাপুরের বড় গোসাঞি	...	৭০
সহারাজা	...	৮৪
ভয়	...	৯৮
বোধ	...	১০৮
সাজ ভেসে গেছে	...	১১৬
নাগিনী ছন্দ	...	১২৯
জুলেখা	...	১৩৬
পায়রাদের গল্প	...	১৫৪
কবির বাগানে	...	১৬৬
কাঁটালে ঘাটের বুড়োবাবু	...	১৮১
জ্যোৎস্নায় রক্তের গন্ধ	...	১৯৭
মালী	...	২১২
একটা পিস্তল ও ডুমুর গাছ	...	২১৭
আরেক জন্মের জন্য	...	২২৪
প্রকৃতির করতলে	...	২৩০
বানকুঁড়ো	...	২৪৭

গাজনতলা

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন অবেলায় বাবা ন্যাংটেশ্বরের মন্দিরতলায় গাজনের ধুম লেগেছে। মন্দিরের উঁচু বারান্দায় একটার পর একটা কাটা পাঁঠার ধড় আর মুণ্ডু এসে পড়ছে। মন্দিরের ঘুপচি কোটরে বসে দেবতা যা নেবার নিচ্ছেন, মানে স্রেফ ওই মুণ্ডুটা, এবং ধড়টা ছুড়ে ফেলে ঠাকুমশাইয়ের মুখ দিয়ে বলছেন—যা, নিয়ে যা। এরপর ঠাকুমশাই আর তাঁর বাড়ির লোকগুলোর মুখ দিয়েই তিনি কচমচিয়ে মড়মড়িয়ে মুণ্ডুগুলো খাবেন। ঝোলেঝালে হাপুস হুপুস কাণ্ড। নাকে ও চোখে জল বেরিয়ে যাবে।

আগে পাঁঠা পড়ত বিশ তিরিশটে। আজকাল ছ-সাতটাও পড়ে তো বিরাট ধুম! ঠাকুমশাইয়ের কত্তাবাবার আমলে নাকি শয়ে-শয়ে পড়ত। রক্তে ভেসে যেত গাজনতলা। গাঁসুদ্ধু ছড়িয়ে ছিটিয়েও বাসি থেকে যেত। আজকাল ভক্তি কমেছে নয়, পাঁঠার দাম বড্ড চড়া। ওসমান পাইকার সপ্তায় একদঙ্গল করে সোজা চালান দিচ্ছে টাউনে। টাউনে প্রচুর পয়সা। ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা কঞ্চি হাতে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। বলল—ও বাবা, চারটে মোটে! আর পড়বে না? সে মুণ্ডু গুনছে আর গুনছে। গুনে-গুনে আনমনা। আর মুণ্ডুগুলো নীল চোখে আকাশ দেখছে। ঘুপচি মন্দিরের চৌকাঠের কাছে বসে ঠাকুমশাই ওসমান পাইকার আর টাউনের নিন্দামন্দ করছেন। শুনছে ভকা বাউরি। তাড়ির নেশায় ঝিমধরা ভাবটা একটু করে কেটে যাচ্ছে। সন্ধেবেলা মুণ্ডুগুলো ধামায় ভরে তাকেই পৌঁছে দিতে হবে। মজুরি একমুণ্ডু। ভকা সেই আশায় বলছে—সবই আজ্ঞে টাউনে খাচ্ছে। বাবা আর খাবেন কী বলুন?

কাল ছিল হোম। স্রেফ নিরিমিষ আহার। বাবুপাড়া কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঘটি-টাক সরপচানো ঘি জুটেছিল। যজ্ঞে পুড়ে সবটাই নাকি বাবার পেটে চলে গেছে। এক কলসী সিদ্ধির শরবতও ছিল। আতপচাল ফলমূলও ছিল অল্প-স্বল্প। বাবুবাড়ির মা-লক্ষ্মীরা এসে বাবাকে প্রণাম করে গেছেন। কিন্তু আজ বাবা পুজো খাবেন কুচুনীপাড়ার। মানে ছোটলোক-টোটলোকদের। তারা বাগ্দী-কুড়ুর কুনাই বাউরি ডোম মানুষ। মাঠেঘাটে জলাজঙ্গলে জন্তুর মতো চরে ফিরে খায়, আর জন্তুর মতোই রক্তমাংস চেনে। হোমের ছাই রক্তে ভাসিয়ে কাদা করে

ফেলল। আজ তাদের দিন! তালের তাড়ি আর পচুই গিলে টলতে-দুলতে দলে দলে গাজনতলায় এসে জুটেছে। নাচছে কুঁদছে। ঢাক বাজাচ্ছে তোলমাতোল। তাদের লোকেরাই বরাবর বাবার নিজের লোক। তিনদিনের উপোসে চোখের তলায় গর্ত, মুখের রঙ কালিঝুলি। পরনে লাল কাপড়, মাথায় লাল ফেট্টি, হাতে বেত। তারা এখন ভক্ত সন্নেসী। জলজল করছে দৃষ্টি। চত্বরের হাড়িকাঠ কেন্দ্র করে গোল হয়ে বসে আছে। হাতের বেত শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হাঁক দিচ্ছে: 'শিবো নামে পুইণ্য করে বোল শিবো বো-ও-ল!' এবং বেতগুলো একসঙ্গে আছড়ে পড়ছে সামনের মাটিতে: 'বো-ও-ও-ল!' সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদ্যি বাজছে দ্বিগুণ চৌগুণ। ন্যাংটেশ্বরো দিগম্বরো···ন্যাংটেশ্বরো দিগম্বরো! তার সঙ্গে কাঁসি বাজছে ন্যাং ন্যাং ন্যাংটেশ্বর! খগা জগা দুভাই বায়েনের ঢাকদুটি রঙবেরঙের পালকে সাজানো। ছিটের কাপড়ে প্রযত্নে মুড়েছে কাঠের খোল। সরু কাঠির মতো পাগুলো এগোচ্ছে পিছোচ্ছে। তার মধ্যে হঠাৎ এসে জুটে গেল হেরম্ব চৌকিদার। গায়ে নীল উর্দি, মাথায় নীল পাগুড়ি, কোমরে চওড়া বেলটিতে আঁটা প্রকাণ্ড পেতলের তকমা। তার হাতে লাঠি আছে। এবং এই তার রাজবেশ! কারণ সে এক রাজপ্রতিনিধি, রাজার লোক। তার বউ আমোদিনী বিলে গিয়ে ইজারাদারের গাল শুনে বলেছিল—জানো আমার মরদ আজার নোক? সেই রাজার লোকটির চোখ এখন ভাঙের নেশায় ঢুলুঢুলু। কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে বোল শেখাচ্ছে খগাকে: বাজাদিকিনি! ডিগম্বরো···ডিগ ডিগ ডিগম্বরো! ল্যাং ল্যাং ল্যাটেশ্বরো! খগা বায়েন এক ঠ্যাং পেছনে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে। ডিগম্বরো বাজিয়ে হেরম্বকে যেন তাড়া করে। হেরম্ব বলে—এ্যাই বাপ, এ শালা যে টিমের উলগাড়ি! স্টিমরোলার। ওদিকে বুড়ো নিমতলায় তার বউ আমোদিনী বসেছে পা ছড়িয়ে। তাড়ি গিলে হি-হি করে হাসছে। একরাশ চুল এলিয়ে দিনকে দিচ্ছে অন্ধকার করে। দুলছে। চোখে ঝিলিক তুলছে। থলথলে স্তন পড়েছে বেরিয়ে। পড়ুক না! এই এসে পড়ল তার শরীলে বাবারই এক ভূতিনী। কেশ দুলিয়ে ভরের খেলা জুড়ে দেবে গাজনতলায়। আর তার মেয়ের নাম সৈরভী। বাপের বাড়ি এসেছে গাজনের ধুম দেখতে। দুবাটি তালরস খেয়ে তার হৃদয় এখন আর্দ্র। মুখে লাস্য, চোখে রঙ। দূর থেকে মাকে দেখে বাঁকা ঠোঁটে বলে—ঢঙ মাগীর। তারপর এসে ঢোকে ভক্তসন্নেসী আর বলির আসরে। বাবার নাচ দেখে বলে—ও বাবা! তোমার পাগুড়ি কই? পাগুড়ি পায়ের

তলায় রক্ত আর হোমের ছাইয়ে মাখা-মাখি। উদাসীন চৌকিদার একবার শুধু হেঁটমুণ্ডু হয়। পাঁঠার গলা তখন হাড়িকাঠে। রাখু কামার রাঙা চোখে তাকিয়ে দেখে। তার মধ্যে এখন বাবার এক পিশেচ এসে ঢুকে আছে। সেই পিশেচ তার মুখ দিয়ে বিড়ির সুখটান টেনে নিচ্ছে। এবং ঠোঁটে হাসে। স্ফীত নাসারন্ধ্র। কুঞ্চিত ভুরু। কেন বলে 'মরণ', কেউ জানে না। নিজেও না।

ওপাশে বাঁজা রুক্ষু চটানে বসেছে ছোট্ট একটা মেলা। দুপুর থেকে সন্ধ্যা কিছুক্ষণের বিকিকিনির আসর। এগাঁ-ওগাঁ থেকে এসে জুটেছে আদেখলা মেয়ে-মরদ কাচ্চাবাচ্চার দঙ্গল। এসেছে প্রেমিক-প্রেমিকা, মাতাল এবং ভাঁড়েরা। শেষ বেলার রোদ্দুরে বুড়ো গাজনতলা আপনমনে হাসছে। পাঁপর ভাজার গন্ধে ম ম করছে চারদিক। বেলুনবাঁশি বাজছে। তালপাতার চিল চ্যাচাচ্ছে ফেরিওলার মাথার ওপর। মোটা বাঁশে সারবন্দী বসিয়ে রেখেছে চিলগুলোকে। আরও কতরকম শব্দ! কতরকম রঙ। বাবা ন্যাংটেশ্বরের কুচুনীপাড়ায় আজ দিনশেষে গাজনের ধুম। পাড়াগাঁর হৃৎপিণ্ডে রক্ত উঠছে ছলকে।

এ ধুম পাগলা ভোলানাথের। ভূত-ভূতিনী প্রেত-প্রেতিনী ডাক-ডাকিনী তাঁর চেলা। কে কার শরীলে ঢুকে গাজনতলায় এসে জুটে গেছে চেনা কঠিন। সোনাই খেপার মতো নিরিবিলি ছেলেটাও সাধুর মতো হাঁটু দুমড়ে আসন করে গাঁজা টানছে সবার সামনে, গাল ফুলিয়ে ববম্ বম্ গালবাদ্যও বাজায়। তার বাবা যুধিষ্ঠিরের ধানভানা ময়দাপেষা কল আছে। কয়লার আড়ত আছে। একটা লরি আছে। আজ সোনাই স্বরূপ দেখাচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের ঘরের শিবরাত্রির সলতে। তার হাতে নির্ভীক ছিলিম। শেষ চৈত্রের অবেলায় রহস্যময় নীল ধোঁয়া দিয়ে সোনাই ঈশ্বরের ধূসর দাসখতে সই করে ফেলল। 'আর তাকে পাবে না যুধিষ্ঠির।' উদ্বিগ্ন কোনও গাঁওবুড়ো এ কথা বলেই মিশে গেল ভিড়ে।

আরেক ভিড় আসছে হই-হই করে। তোরাপ গুণিনের সাঙ্গপাঙ্গরা। লাঠির ডগায় মড়ার মাথা। দিনের আলো আবছা হলেই সেই মাথা নাচবে। খিটখিট করে হাসবে। তোরাপ সারা চোতমাস রাতের পর রাত তন্তরমন্তর দিয়ে জাগিয়েছে মুণ্ডুটাকে। কাল থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়বে গুণিনের থানে। ঘরের মধ্যে সেই থান। মাটির বেদী লাল কাপড়ে ঢাকা। তার ওপর পেঁচার ঠোঁট, বাদুড়ের নখ, ভাল্লুকের রোঁয়া, একটা কালো চামর। রুদ্রাক্ষ, পাথরের মালা—হেঁদু-মোছলমানের তীর্থস্থান ঘুরে সারাজীবন ধরে সংগ্রহ করে এনেছে তোরাপ। এখন তোরাপের জটাচুলের ভিরকুটি দেখে ভয় করে। কপালে

দগদগে সিঁদুর তেড়ে মারতে আসে। হাড় জিরজিরে বুকে ঝোলে রুদ্রাক্ষ, পাথরের মালাটা। বাহুতে অষ্টধাতুর বালা। বগলে ফকিরের চিমটে। দলবল নিয়ে এসে বসে পড়ল বুড়ো নিমের তলায়। লাঠির ডগায় মুণ্ডুটার এখনও ঘুমঘুম ভাব। ম্রিয়মাণ দাঁতগুলো। রোদ্দুর চলে যাক। ঝুঝকি অন্ধকার আসুক না! ওই বিস্ফারিত দাঁতে জলজল করে উঠবে গভীরতর উৎসের কী এক আলো। সেই উৎস জীবনমৃত্যুময়।...

তোরাপের মড়ানাচানোর ক্ষণ গুনছে এবার গাজনতলা। এই অবেলাটা ঘাসফড়িঙের মতো ছটফট করছে আকাশের ঠোঁটে। দণ্ডপল আস্তেসুস্থে হাঁটছে কি? বাঁজা ডাঙার ওপারে দেব্‌তা পাটে বসতে বড় দেরি করছেন। ন্যাড়া শিমুলের সিলুট মূর্তি সাঁতু ডোমের মতো শ্মশানবৈরাগ্যে বিষাদগ্রস্ত। ওখানে বিশাল স্তব্ধতা। এখানে তুমুল কোলাহল। ডিগ ডিগ ডিগম্বরো...কাপড় পরো। ডিগম্বরো বসন পরো। খগাজগার ঢাক বাঘের গলায় ডাকে। ভক্ত সন্নেসীরা চেঁচিয়ে ওঠে—শিবো নামে পুইণ্য করে বোল্‌ শিবো বো-ও-ও-ও-ল্‌! গাজনতলার আকাশের পথে উত্তরের দেশে ফেরার সময় চমক খেয়ে বালিহাঁসের ঝাঁক দিক বদলায়। আমোদিনীর গলায় কোন ভূতিনী এসে স্বর ধরে কাঁদে। এলোকেশের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার নড়েচড়ে। ছাইরক্তকাদায় মাখামাখি নীল পাগুড়ি উদ্ধার করে হেরম্ব চৌকিদার যায় সোনাই খেপার কাছে ছিলিম টানতে। মন্দিরের বারান্দায় ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা পাঁঠার মুণ্ডু গুণে শেষ করতেই পারে না। আর সৈরভী এখন চলেছে অভিসারে। কলকেফুলের জঙ্গলে বসে আছে তার প্রেমিক হারাধন সদ্গোপ। ঠোঙায় রসগোল্লা ভরা। রস পড়ছে চুঁইয়ে। শুকনো ঘাস আর হলদে কলকেপাতায় দিনশেষে এখন পিঁপড়েদের মচ্ছব।.....

গাঁয়ের শেষে এই গাজনতলার চটান। সারাবছর নিঃঝুম পড়ে থাকে এক একর রুক্ষ কাঁকুরে ন্যাড়া মাটি। তার কপালে আবের মতো ভাঙাচোরা ঘুপচি ওই মন্দির। তার ওপাশে হাজামজা দীঘি। দীঘির পাড়ে তালগাছ, কেয়া ফণিমনসা কোঙাঝোপ কাঁটামাদারের ক্ষয়াখর্বুটে জঙ্গল। মধ্যিখানে গাঁয়ের আঁতুড়ের নোংরা ফেলার 'ধুলগাড়ি'। হাঁড়িকুড়ি খোলামকুচি ন্যাকড়াকানি কুলকাঠপোড়া ছাই ভূতপেরেতের হরেকরকম খাদ্য। মাঝরাতে এসে খেয়ে

যায়। অজাতক কাচ্চাবাচ্চারা ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদে। ঠিক শেষ রাতে বিলের দিক থেকে আসে একটা হাওয়া—'বাওর' যার নাম, সেই হাওয়া কদমফুল পেড়ে চুলে গুঁজে তালগাছে ওঠে। শুকনো বাগড়া ধরে টানাটানি করে। তারপর যায় উত্তরপাড়ে একানড়ে চিনাথ বাউরির বাড়ি। মস্করা করতেই যায়। খড়ের চাল মচমচিয়ে উঠলেই চিনাথ ঘুম ভেঙে বলে—যা, যা! ঢঙ করিসনে। তখন 'বাওর'টা চলে যায়। মানিক ঘোষের বাঁশবনে ঢোকে। শুকনো পাতা ওড়ায় মুঠোমুঠো। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসে। পুবের আকাশে তখন 'ঝুঝকো তারা'। পশ্চিমে দৌড়ে যায়। কান্না থামিয়ে মাই দেয়। তখন চিনাথ জেগে আছে।

এই চিনাথের কত্তাবাবা মড়িরাম বাউরির ডাকে দীঘির তলা থেকে ভেসে উঠতেন চড়ককাঠ। চোত-সংক্রান্তির দিন সুমসাম নিঝুম ভোরে ভক্তসন্নেসীর দল নিয়ে মড়িরাম দাঁড়াত ঘাটে। চড়ককাঠ ভেসে তরতর করে চলে আসতেন কাছে। সেই 'বিরিক্ষি'কে তুলে নিয়ে গিয়ে গাজনতলায় বাবার মন্দিরের সামনে পুঁতে দিত ওরা। পুজো-আচ্চা হত। এখনকার চেয়ে হাজারগুণ ধুম লাগত। সন্ধ্যার পর একপ্রহর রাতে সেই কাঠ তুলে আবার দীঘিতে ভাসিয়ে দিত ওরা। তরতর করে ভেসে তলিয়ে যেতেন মধ্যিখানে। আর 'বিরিক্ষি' আসেন না। আর চড়কপুজোও হয় না। আজকাল লোকে বলে গাজন 'বাণফোঁড়', 'ঘুরনচড়কি', কিংবা 'পিঠে ভক্তার, তাকলাগানো মানুষে কাণ্ডও দেখা যায় না এই গাজনতলায়। এখন সার করেছে শুধু বাবা ন্যাংটেশ্বরকে।

তবে একটা ব্যাপার আছে টিকে। চিনাথের কাকা ফেলু বাউরি গাজনতলা হাসিতে হুলস্থুলুস করে ফেলত। চিনাথ কত্তাবাবা বাবার সেই গুহ্য ব্যাপারটা পায়নি বটে, কাকারটা পেয়েছে। গাজনের বিকেলে চিনাথ সঙ সাজতে বসে। রঙচঙ মাখে। শণের গোছা হাঁড়ির কালিতে ঘষে দাড়ি বানায়। কতরকম সাজে সে। ছেলেঠ্যাঙানো মাস্টের, পুলিসের দারোগা, পুজুরী বামুন, ব্যাংকের নেসপেটর, এমনকি এসডু সায়েবও সাজতে ছাড়ে না। গত গাজনে সেজেছিল ভোটকুড়ুনি বাবু। জোরালো 'বক্তিমে' দিয়ে ভিড় বাড়িয়েছিল চিনাথ। সঙাল সাজলে 'তলপেটে' বা চেলা লাগে। চেলারা মিছিলের মোক সেজেছিল! যা দাবি করে, ভোটের বাবু বলে—দোব। লোক হেসে খুন।

এবার চিনাথ গাজনে কী সঙ দেবে, তাই নিয়ে সারামাস চিন্তাভাবনা করেছে। তার ভুঁইক্ষেত নেই। ফসলের মরশুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাঠে

পাহারাদারি কাজটা নেয়। তখন সে 'জাগল'। দিনরাত মাঠে টো টো ঘুরতে হয়। ঘোরাঘুরির সময় তার ভাবুক ভাবটা জমে ভাল। এতোলবেতোল সব ভাবনা তার। বাঁজা বউ ছিল ঘরে। বিয়োতে পারেনি বলে নাথি মেরেছিল মনের দুঃখে। বউটার মনে বড্ড বেজেছিল। হেরম্বের ভাগ্নে থাকে টাউনে। তার সঙ্গে চলে গেল। চিনাথ ভাবে রাগ পড়লেই ফিরে আসবে। আসে না। মাস যায় বছর যায়। চিনাথের কেশ পাকে দাঁত নড়ে। নাড়ু ডাক্তার চিমটেয় টেনে তুলে দেন। রক্তারক্তি হয়। আর চিনাথ ভাবে মেয়েমানুষ তো! বুদ্ধিসুদ্ধি কম। রাগ পড়লেই আসবে। আসে না। চিনাথ স্যাঙা করতে গিয়ে আবার ভাবে, যদি হঠাৎ এসেই পড়ে—সতীনে চুলোচুলি থামাবে কে? আমি নিরীও নোক। যাক্ গে বাবা! এবং এই করে মাস, বছর, গাজনতলায় ধুমের পর ধুম, কতগুলো কেটে গেল। পটেশ্বরী বাউরান আর ফিরল না। এখন চিনাথ ভাবে, আসুক না। সেবার মেরেছিলাম এক নাথি। এবার মারব জোড়ানাথি।

এবং রাগের চোটে শেষঅব্দি চিনাথ করেছে কী, পটেশ্বরী আর হেরম্বের টাউনবাজ ভাগ্নে ষষ্ঠীর নামে সঙের গান বেঁধেছে। এমন কী, একখানা সঙও বানিয়েছে। তার মানে জোড়া লাথি। চেলা গোবরা কুনাই বয়সে নবীন যুবোপুরুষ। চেহারাও দেখনশোভা। তাকেই সাজাবে পটেশ্বরী। নিজে সাজবে ষষ্ঠীচরণ। বাবুপাড়া থেকে পাতলুন জামা চেয়ে এনেছে। সইদ মনোহারিওলার কাছে দশ পয়সায় একটা হাতঘড়িও কিনে এনেছে।

গত রাতে হঠাৎ গোবরা বলেছিল—ও মামা! এ কি ভাল হচ্ছে?

—ক্যানে? ভালমন্দর কথা ক্যানে?

—নিজের ঘরের খিটকেল নিজেই গাইবে?

—গাইব।

—লোকে বলবে কী মামা?

—লোকে হাসবে! বুঝলি বাপ গোবর্ধন?……চিনাথ ঢোলে চাঁটি দিয়ে বলেছিল—নে, লাগাদিকিনি এবারে। গলা ছেড়ে ধর বাপ!'বঁধু লাও বা না লাও মুখ দেখে যাও/পটেশ্বরীর আয়না।'…

কাল নিশুতি রাতে নির্জন দীঘির পাড়ে চিনাথের উঠোনে পটেশ্বরী ও ষষ্ঠীচরণের কেলেঙ্কারির 'ইহারছাল' হয়ে গেছে। তার মানে রিহার্সাল। গোবর্ধন সাজছে। চিনাথ সাজছে। বেলার রঙ আর একটু ফিকে হোক। ওদিকে পাঁঠাবলি শেষ হয়ে যাক। তখন সঙ আর ছড়ার ধুম পড়বে। তোরাপের

মড়ার নাচও শুরু হবে। এগুলো হচ্ছে গাজনতলার শেষ মজা। লোকে সময় গুণছে মনে মনে। এখানে চিনাথের উঠোনে বাঁশের মাচায় ঢোলের ওপর কাঁটামাদারের ছায়া। লম্বা ছায়াটা মাঠফেরা মুনিষের মতো ক্লান্ত হয়ে দীঘির জলে গিয়ে নেমেছে। মাটির কুণ্ডে তাড়ির ফেনা পড়েছে উপচে। পাতলুন ও শার্ট ঢ্যাঙা চিনাথের শরীরে বেঢপ আঁটো হয়ে গেছে। সরু গোঁফটা যাচ্ছে খসে, আবার এঁটে নিচ্ছে পাকুড়ের আঠায়। এনামেলের খুরিতে তাড়ি ঢেলে 'পটেশ্বরী' বলে—ও মিনসে, খাও গো! চিনাথ হাসে।—চুপ্ বে! এখন আমি তোর মামা। মামা বলে ডাক।

তখন সেজে গুজে তৈরি হয়েছে সীতু ডোমের মা। তার সঙ একটাই। কাবুলীওলার। থলথলে মোটাসোটা মেয়ে। চুল পাকন্ত। মাথায় ফেট্টি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে কাবুলী সেজে ভিড়ে ঢুকবে। 'উপিয়ার' বদলে ছুদ চাইবে। লাঠি ঠুকবে। আর তার খাতক সাজার কথা ন্যাড়া ডোমের। রোগা পাকাটি চেহারা। কালো কুচকুচে রঙ। খুব লোক হাসাতে পারে। কিন্তু এবার ঝুরন ডোমনীর সঙ্গে তার বউয়ের ঝগড়া হয়েছে। সে সাজছে হনুমান। উপ আঁপ করে উঠোনে খড়ের লেজ নেড়ে দাপাদাপি করছে। তার বউ হাসি চেপে ধমকেছে—এখানে কী? গাজনতলায় জাঁক দেখাও গে না! তাই শুনে গম্ভীর ন্যাড়া বলছে—থাম্ মাগী! পেরাকটিস কচ্ছি।.....

আর কুনাইপাড়ায় তখন সুদাং কুনাই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু সাজতে ব্যস্ত। তার সঙ্গে ছড়াও থাকবে। ছড়া বেঁধেছে তিলক কুনাই। ইস্কুলে কেলাস থিরি অব্দি পড়েছিল। গোমুখ্য নয়। খাতা আছে। পেনের কলম আছে। লিখেছে: আর যাব না আঁতুড়শালে/রেক্শা ডেইক্যে নিয়ে যাও গো বহরম-পুরের হাঁসপেটালে॥' পরকলিটা শেখাচ্ছে দোহারকিদের। 'ইনজেকশন দেবেন ডাক্তার পেঁচোয় পেলে॥'

এই নয়। আরও আছে। জিভের সরে আঙুল ভিজিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে। তারপর—'ওগো বঁধুয়া, পাশে শুয়ো না দিন বড় কঠিন/দেশে এল ফেমিলি পেলানিং॥'...

গাজনতলায় আজ এইসব হাঁড়ি ভাঙার ধুম। যার যা মনের কথা আছে, বলে নাও সম্বচ্ছরের মতো। এখন বাবা ন্যাংটেশ্বর তোমার সহায়। কাকে পরোয়া?

তাই বলে একেবারে বেপরোয়া হওয়াও যায় না। ছোটলোক-টোটলোক মানুষ সব। রাত পোহালেই পেটের ধান্দায় বেরুতে হবে। গাঁয়ের লোকদের চটানো বিপদ। সে যদি পারে কেউ, তো ওই বোরজে মশাই। বাবুপাড়ার বজ্রধর বাঁড়ুজ্যে। নিজেকে বলেন পল্লীকবি। কখনও বলেন চারণকবি। অবশ্য কবিয়ালী করতে কোন আসরে কেউ দেখেনি কখনও। নিদেন রথযাত্রা বা পুজোপার্বণের দিন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছড়া গান। কবিয়ালের ভঙ্গীতে নাচেন। ঢোল বাজায় নবীন বোরেগী। খঞ্জনি বাজায় অরু নাপিত। দোহারকি করে জনাকতক চাষাভূষো মানুষ। কিন্তু বোরজে মশাইকেও সারা বছর যেন গাজনতলার জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হয়। এমন জমাট আসর আর থাকতে নেই। রসিক মানুষ বলে রসের গানেই পাকা। সঙের ঝাঁঝমেশানো সেইসব ছড়াগান গাজনতলার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে যায়। তার ওপর আছে হাটে হাঁড়িভাঙার বদখেয়াল। পাড়ার গোপন কেলেঙ্কারি নিয়ে গান বাঁধতে ছাড়েন না। পারে কে বোরজে মশাইকে? কালো দাঁতগুলো বের করে হেসে বলেন—আমি বজ্রধর, বজ্র ধরতে পারি হে। যা পারো কোরো।

নাদুসনুদুস মানুষটি। মাথায় টাক আছে। প্রকাণ্ড গোঁফ আছে। সামনে একটা দাঁত ভাঙা। ওখান দিয়ে পিক করে থুতু ফেলার অভ্যেস। ভুঁড়িটিও নেয়াপাতি। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে একহাত কপালে অন্যহাত মাজায় রেখে নাচেন। কপালে সিঁদুরফোঁটা। হঠাৎ কারও দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসলে তার আর মুখে ভাত রোচে না। বোরজে মশাই আমাকে দেখে হঠাৎ হাসলেন কেন? সারাক্ষণ মগজে এই ঝিঁঝি পোকা ডাকে। যদি জিগ্যেস করে বোরজে মশাই, হাসলেন কেন? বোরজে মশাই জবাব দেবার পাত্রই নন। কথায়-কথায় ছড়া কাটেন। রঙ্গব্যঙ্গ করেন। বকুলতলায় বুড়োথুড়ো বাবুরা আড্ডা দিচ্ছেন এবং কোন চাপা ব্যাপার নিয়ে কথা চলছে, দূর থেকে ওঁকে দেখলেই—চুপ, বোরজে আসছে, বলে গম্ভীর হয়ে যান। ছোটভাই চক্রধর বিডিও আপিসের পিওন। তারও বয়স পঞ্চাশ হয়ে এল। বলে—আর কতকাল এঁড়েমি করবে বলোদিকিনি দাদা? তোমার জন্যে মুখ পাইনে কোথাও। ছিঃ! বজ্রধর ফিক করে হেসে বলেন—কী বললি, এঁড়েমি? এঁড়ে দেখেছিস কখনও? দেখে আয় গে, মিত্তিরমশাইয়ের বাগানে চরছে। এবং চক্রধর একদিন সাইকেলে আপিস থেকে ফিরে আসছে, সন্ধেবেলা সেই বাগানের দিকে তাকিয়ে সত্যি একটা এঁড়ে দেখেছিল। হাসতে-হাসতে নাড়ি ছিঁড়ে যায়। মাইরি দাদাটা যেন কী!

এই বোরজে মশাইও এখন তৈরি হচ্ছেন অক্ষ নাপিতের বাড়িতে। অক্ষ এক বালতি ভাঙের শরবত বানিয়েছে। বোরজে মশায়ের চোখ ক্রমশ ঢুলুঢুলু। গাজনতলায় গিয়ে একবার ফাঁক বুঝে ছিলিমও টানবেন। একসময় গাজনতলা অন্ধকার হয়ে যাবে। ভিড় যাবে ভেঙে। শুধু কয়েকজন মাতাল থাকবে শুয়ে। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলবে। আপনমনে কথা বলবে। আর আসবে একটা কি দুটো শেয়াল। হাড়িকাঠের কাছে ঘুরঘুর করবে। রক্ত চাটবে। গাজনতলা তখন পুরাণের শেষপাতা।···

দীঘির পাড়ে চিনাথ তার উঠোনের মাচায় এনামেলের খুরি ধরেছে, গোবরা সাবধানে নীলচে রঙের তালরস ঢালছে, পিছনে চাপা একটা শব্দ হল। ঢালু পাড়ে কেয়া কোঙা ফণিমনসা আর নাটাকাঁটা কুচফলের ঝোপঝাড় আছে। গোবরা ভাবল গরু কী মোষ, ঘুরল না। চিনাথ বলল—সাবোধান বাপ। এবং চিনাথের দৃষ্টি খুরির দিকে। তারপর মাচাটা মচমচিয়ে উঠল।

চিনাথ উদাস চোখে তাকায়। গোবরা বলে—কে বটে হে? তারপর সেও মুখ তোলে। দুই সঙালের চোখে পলক পড়ে না। এসেই মাচায় পা ঝুলিয়ে বসেছে একটা লোক। একটু-একটু হাঁফাচ্ছে। রোদপোড়া তামাটে চেহারা। চোয়ালের হাড় ফুটে আছে পষ্টাপষ্টি। এক চিলতে গোঁফও আছে। পাতলা খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে। তার গায়ে ধুলোকাদায় নোংরা খয়েরি জামা, পরনে আঁটো ছাইরঙা পেন্টুল. তার কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। চিনাথ একটু ঝুঁকে পায়ের দিকটাও দেখে নেয়। খালি পা শুকনো কাদা মাখা। লোকটা ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

চিনাথ বলে—আপুনি কে বাবুমহাশয়?

গোবরা বলে—নিবাস কোথা বাবুমহাশয়?

লোকটা খিক্‌খিক্ করে হেসে ওঠে।—আমাকে চিনতে পারছ না শ্রীনাথ?

অমনি চিনাথের নেশা চিড়িক করে দুফাঁক হয় এবং মধ্যিখানে মাথা তুলে চমকখাওয়া গলায় নেশা ও স্বাভাবিকতায় দুদিকে দুহাত রেখে সঙাল বাউরি বলে—তাইলে চিনলাম বাবু মহাশয়!

গোবরা মেয়েলি চোখে তাকিয়ে বলে—আম্মোও চিনি-চিনি লাগে। বো··· বো···বোর···

—আপুনি আজ্ঞে বোরজে মশায়ের জামাই। বলে চিনাথ মাচা থেকে

ধুপ করে নামে এবং আঁটো পাতলুন প্রায় কাটিয়ে হেঁটমুণ্ডে পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়ায়। বিগলিত হয়ে বলে—অপোরাদ লেবেন না জামাইবাবু, আমি বাঞ্চোত লেশাখোর মনিষ্যি। কী দেখি। ও জামাইবাবু, খবরাদি ভাল তো? আমাদের মেয়ের খবর ভাল তো? বাড়ির সব ভাল তো? ও জামাইবাবু, দেখি, শ্বউরবাড়ি ঢোকেন নি এখনও—হুঁ, আগে ঘাটে গিয়ে ধোয়াপাখলা করুন! বাপ গোবর্ধন, ঘাটবাগে লিয়ে যা জামাইবাবুকে।

এই দীর্ঘ আবেগাপ্লুত সংলাপের পর চিনাথ পশ্চিম মাঠের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে—উদিকে ফের কোত্থেকে এলেন গো? বিলখাল জায়গা। দিশে লেগেছিল নাকিন? যান, মুখচোখে জল দিন।

বোয়জে মশাইয়ের জামাই কোন কথার জবাব না দিয়ে পুবের গাজনতলার দিকে তাকায়। বলে—ওখানে কী হচ্ছে শ্রীনাথ?

—আজ যে গাজন আজ্ঞে! চিনাথ ভক্তিতে নম্র হয়ে বলে। আজ সংকেরান্তির পুজো আজ্ঞে! দেখছেন না, তাইতে আমি সেজেছি। সঙটঙ দোব। ছোটনোক মনিষ্যির কথা ছেড়ে দিয়ে ঘাটে যান জামাইবাবু! আমরা গাজনতলা যাব। বেলা পড়ে এল।

গোবরা চোখে ঝিলিক তুলে বলে—আপনার শ্বউরমশায়ও সঙ দেবেন গাজনতলায়।

জামাইবাবু শুকনো হাসে। তারপর বলে—তেষ্টা পেয়েছে। জল খাওয়াও তো শ্রীনাথ।

—জল?

—হ্যাঁ, জল। জামাইবাবু ঢোক গিলে ফের বলে—ঘরে মুড়িটুড়ি থাকলে দিতে পারো। নেই?

সন্দিগ্ধ স্বরে চিনাথ বলে—শ্বউরবাড়ি যাবেন না জামাইবাবু? ক্যানে গো?

জামাইবাবু এবার রেগে যায়। —অত কথায় তোমার কাজ কী শ্রীনাথ? জল চাইলাম, দেবে কী না বলো।

অপ্রস্তুত হেসে চিনাথ টলতে টলতে ঘরে ঢোকে। পটেশ্বরীর শাড়িপরা গোবরা মেয়েমানুষের চোখে তাকিয়ে থাকে বোয়জে মশায়ের জামাইয়ের দিকে। জামাইবাবু খুঁটে খুঁটে জামার শুকনো কাদা ছাড়াচ্ছে। কোঁচকানো ভুরু। ঘাম শুকিয়ে মুখটা মরামানুষের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। গোবরা ভাবে, এর অর্থটা কী বটে? বড়ই গুরুকথা মনে হয়।

কাঁসার একটা গেলাস আছে ঘরে। চিনাথ হাতড়ে পায় না। জানালাহীন ছোট্ট ঘরে এখন অন্ধকার। ওদিকে গাজনতলার ধুম বুঝি ফুরিয়ে যায়। অসময়ে এ কী জ্বালাতন! নেশার ঘোরে খালি পটেশ্বরীকেই বিড়বিড় করে গাল দেয় চিনাথ। পেতলকাঁসার জিনিস বলতে ওই গেলাসটা বাদে সব ঘুচিয়ে গেছে পালানী মেয়েটা। অপয়া রাক্ষুসী! চিনাথ তুমদাম পেটরা সরায়। হাঁড়ি খালা ওলটপালট করে।

গোবরা ডাকে—ও মামা! দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চিনাথ বলে—যাই বাপ্। জামাইবাবু বড় মুখ করে আমার কাছে জলটল চাইলেন। ই কি কম কথা? যাই বাপ্, যাই!

হুঁ! অসময়ে এ কী ভোগান্তি দেখদিকিন্। তুমি বাপু বোরজেমশায়ের জামাই। শ্বউরবাড়ি গিয়ে খাটে বসবে। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙাবে। আপন শাউড়ি নেই বটে, ছোটঠাকরুন তো আছেন। তিনিও শাউড়ি। ···বোরজে মশায়ের ছেলেপুলে বলতে ওই একটিমাত্তর মেয়ে। মা-মরা মেয়েটা বড্ড ন্যাওটা ছিল বাবার। টাউনে বিয়ে দিলে সেবার চিনাথ সেই বিয়ের ভোজ খেয়েছিল। একসময় বোরজে মশাইয়ের দলেও সে ছড়া গাইত সঙ দিত! কিন্তু ওনার যা মুখখিস্তি আর কথায় কথায় চড় থাপ্পড়!

—ও মামা!

—যাই বাপ্, যাই!

গেলাস খুঁজে পেয়ে হঠাৎ সেটা খামচে ধরে বসে রইল চিনাথ। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেছে। চিনাথের বুক ঢিপঢিপ করে কাঁপে। নেশা ফিকে হয়ে যায়। হা বাবা ন্যাংটেশ্বর, খামোকা এ কী ঝড়বাদল অবেলায়!

আর সেই সময় বোরজে মশায়ের জামাই এসে ঘরে ঢোকে। চাপা গলায় বলে—শ্রীনাথ, আমি তোমার ঘরে থাকছি। তোমরা গাজনতলায় চলে যাও। আর শোন, আমি এখানে থাকছি, কেউ যেন জানে না। কেমন?

অগত্যা চিনাথ বলে—আচ্ছা।

—ওই ছেলেটাকেও আমি বলেছি। ওকে একটু সামলে রেখো ভাই!

—আজ্ঞে।···

চিনাথ যখন বাইরে এল, তখন গাজনতলার দিকে আকাশের রঙ শালিখ পাখির ডিমের মতো নীলধূসর হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমের মাঠের আকাশে রক্তসন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। মাচার কলসীটা থেকে বাকি রস খুরিতে ঢেলে গোবরা মিচিক মিচিক হাসে। —খাও মামা।

খুরি তুলে চিনাথ ঘরের দিকে চোখ নাচিয়ে বলে—সাবোধান।

গোবরা অবিকল পটেশ্বরীর গলায় বলে ওঠে—হ্যাঁ মিনসে, হ্যাঁ। সেটা তুমাকে বলতে হবে না।···

গাজনতলায় হুলুস্থুলু ভাব জমেছে ততক্ষণে। ঘন ঘন শিবো নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে ভক্ত সন্নেসীরা। শেষ বলির ঢাক বাজছে চৌগুণ তোলমাতোল। হাড়িকাঠ ঘিরে ওরা ঘুরে ঘুরে নাচছে। মাথার ওপর বেতে-বেতে হচ্ছে ঠোকাঠুকি। বুড়োনিমের তলায় রামপদ বাগদী যাত্রাদলের বিবেক সে. গমগমে গলায় গান ধরেছে :

নাচে, পাগলা ভোলা গলায় মালা
হাতে লয়ে শূল।
প্রমথ প্রমত্ত নাচে, (কানে) ধুতুরারই ফুল ॥
স্কন্ধেতে নাচে নাগিনী
হাঁ করে হাঁকে হাকিনি
ডাঁ করে ডাকে ডাকিনী
এলাইয়া চুল ॥···

রামপদের মূর্তিটি শিবের। সারা গায়ে চুলোর ছাই মাখানো। পরনে নকল বাঘছাল। হাতে ডম্বরু। কাঁধে প্লাস্টিকের সাপ আর মাথায় পরচুলোর জটাজুট। তাতে একফালি রাঙতার চাঁদও আঁটতে ভোলেনি ; মুখে খড়িগোলা রঙ মেখেছে এবং গোঁফ এঁটেছে কান বরাবর দড়ি টেনে। বেশি হাঁ করা যাচ্ছে না। তাতে কী? গলার স্বর হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন, এমন গমগমে ও প্রতিধ্বনিময়। বোরজে মশাই তারিফ করে বলেছিলেন—বাগ্দীর পো কাঁকড়াগুগলি খেয়ে একখানা সরেস গলা জুটিয়েছে বটে! ও রামপদ, রেডিও-সেণ্টারে তোকে লুকে নেবে রে। যেতে চাস তো বল্, জামাইকে এককলম লিখে দিই। জামাই এখন কলকাতার কলেজে পোফেসর হয়েছে জানিস তো? খুব নাম। খবরের কাগজেও নাম ছাপা হয় বাবা। সহজ কথা।···পরে একদিন রামপদ গিয়ে ধরল—কই বোরজে মশাই, দিন তাইলে এককলম লেখে, কলকেতা যাই! অমনি বোরজে মশাইয়ের কী রাগ! জামাই না আমার শালা! বুঝলি? শালা। অবশ্য তখন ভাং খেয়ে মনের গতিক অন্যরকম ছিল হয়তো। রামপদ বেজার হয়ে ফিরে এসেছিল। যাক্ গে বাবা, এ গাঁগেরামই ভাল।

ভিড়ের একপাশে মনকির হোসেন ছড়াদার দলবল নিয়ে ছড়া গাইছিল : 'কুচুনীপাড়ায় ভোলা যাও কিসের কারণ। কার সঙ্গে প্রেম করে মজাইলে মন হে…' এবং হইহই করে কুনাইপাড়ার সুদাং-এর দল এসে পড়তেই শ্রোতৃবৃন্দ ছত্রখান, মনকির ছড়াদার তখন আরো চড়ায় গলা তোলে।

এবার জমাটি তুঙ্গে ওঠার সময়। একের পর এক সঙের দল আসছে। ছড়াদাররা আসছে। এসে গেল ন্যাড়া ডোমও হনুমান সেজে। এসে সটান উঠে পড়ল বুড়ো নিমের কাঁধে। ডালপালা নেড়ে উপ আঁপ করতে থাকল। তলায় বাচ্চাকাচ্চারা চ্যাঁচায়—এই হনুমান কলা খাবি? জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি? যুধিষ্ঠির মণ্ডলের সেই গাঁজাখোর ভ্যাবলা ছেলেটা বন্দুক তাক করে। আঙুল হয়েছে নল। মুখে বলে—গুড়ুম। একপা পেছনে, একপা সামনে, একই ভঙ্গীতে বন্দুক তাক করে থাকে। হনুমান ভিড়ে নেমে এসেছে, তখনও মোনাক্ষেপা বন্দুক তাক করে আছে। হেরম্বর মেয়ে সৈরভী অভিসার থেকে ফিরে তার পিঠে খোঁচা মেরে বলে—মরণ! তখন সে ঘোরে। এবং দাঁত বের করে নিষ্পাপ হাসে। বলে—সৈরভী! কবে এলে গো? সৈরভী যেতে যেতে ফের বলে যায়—মরণ।

এসে পড়েছে 'কাবুলীওয়ালা' সীতু ডোমের মা ঝুরন ডোমনীও। তাকে ঘিরে মেয়েদেরই ভিড়। হাসতে হাসতে মেয়েদের কোমরের কাপড় যাচ্ছে খসে। ডাগর স্তনে ঝড়লাগা দুলুনি। যুবোযোয়ান পুরুষেরা আড়চোখে তাকিয়ে আছে। হেনসময়ে খবর হল, বোরজে মশাই আসছেন! এতক্ষণে আসছেন দলবল নিয়ে। আবার ভিড়গুলো ভাঙল চুরল। এসে পড়েছেন! বোরজে মশাই এসে পড়েছেন! গাজনতলায় সাড়া পড়ে গেল।

দীঘির পাড় দিয়ে দিনশেষের রোদ ঝিকিমিকি প্রজাপতির মতো নাচছে বোরজে মশায়ের টাকে। মুখে সেই বাঁকাচোরা হাসি। সামনের একটা দাঁত নেই। ঢুলুঢুলু চোখ। কোমর ঘুরিয়ে হাত মাথায় তুলে নাচতে-নাচতে আসছেন। নবীনের ঢোলে বাজছে তেওট তাল : ধা ধিন ধিন ধেরেকেটে ধেরে কেটে…রসিক বোরজে মশাই ফাঁকের মাথায় বলে উঠছেন : এক দুই তিন মেরেকেটে মেরেকেটে…এবং তিনটি আঙুল দেখাচ্ছেন। তার মানে? মানে আবার কী? ফেমিলি পেলানিং। সুদাংয়ের গান এবার মাঠে মারা গেল। সুদাং গতিক বুঝে অন্য গান ধরেছে। বোরজে মশায়ের মতো অমন ঠাটঠমক অমন রঙধরানো পদ বাঁধার সাধ্যি তার নেই।

সবশেষে এল চিনাথের সঙ। সঙ্গে গোবর্ধন। 'বঁধু লাও বা না লাও মুখ দেখে যাও পটেশ্বরীর আয়না'।। সৈরভী তার 'মরণ' ছুঁড়ে গোবরার পিঠে কিল মেরেছে—গলা নেই, টলা নেই, খালি চিঁ চিঁ!

গোবরা নাচতে নাচতে একটু কাছ ঘেঁষে চাপা গলায় বলে—ও সৈরভী, তোর চুলে অত খড়কুটো ক্যানে?

সৈরভী রাঙা মুখে সরে যায়। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে আবার খোঁপাটা ঠিক-ঠাক করে নেয়। খোঁপার কাছ থেকে হলদে শুকনো কল্কেপাতা ঝরে পড়ে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগে। একবার ঠোঁট কামড়ায়। তারপর হনহন করে চলে যায় অন্য ভিড়ে। কেন যেন হঠাৎ বড্ড ভয় করে সৈরভীর।···

তখন মন্দিরতলায় ভক্ত সন্নেসীরা লম্বা হয়ে পড়ে প্রণাম করছে। খগা জগার ঢাক শেষবারের মতো বাজছে। ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা ধামার মুণ্ডুগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, নাকি ভকা বাউরির দিকে, বোঝা যায় না। ঠাকমশাই ভেতরে ঢুকে সলতে উসকে দিচ্ছেন। বাইরে হাতের রেখা ঝাপসা হয়ে এল।

এবার সময় হয়েছে তোরাপ গুণিনের মড়া নাচানোর। অং বং করে মন্তর পড়ছে গুণিন। অষ্টাবক্র লাঠির ডগায় সিঁদুর মাখানো মুণ্ডুটার সবে ঘুম ভাঙছে। দাঁতগুলো আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। গুণিন দুলছে। হাতের লাঠিটাও দুলছে। চোখ বুজে গুণিন হেঁড়ে গলায় তালে তালে বলছে: জাঁগ জাঁগ জাঁগ জাঁগর ঘিনা···জাঁগর ঘিনা জাঁগ জাঁগ জাঁগ···

ওদিকে বোরজে মশাই খিটকেলে ছড়া গাইছেন। বাবুপাড়ার একটা কেলে-ঙ্কারি। সবাই টেব পেয়ে উপভোগ করছে। ভুজঙ্গ ডাক্তারের বিধবা বোন আর ব্লক আপিসের পশুডাক্তারের প্রেম জমে উঠেছে। ডাক্তারের গাইগরুর ব্যামো সারাতে এসেই নাকি এই ব্যাপার। এখনই খবর চলে যাবে ডাক্তারের কানে। কিন্তু কী করার আছে! বজ্রধর বাঁড়ুয্যে বলবেন—আমার রবডঙ্কাটি। ভুজুর ওষুধ আমি খাই নাকি? ওষুধ নয়, ঘোড়ার পেচ্ছাপ। আসলে হয়েছিল কী, ও মাসে একবারান্দা রুগীর সামনে বোরজে মশাইকে অপমান করেছিল ভুজঙ্গবাবু। মিক্সচারের দাম না হয় ছেড়েই দিচ্ছেন, ট্যাবলেটগুলো কিনতে তো পয়সা লেগেছিল! উনি তো আর দানছত্র খুলে বসেননি। বোরজে মশাই গুম হয়ে বলেছিলেন--ট্যাবলেটে আমাশা বেড়ে গেছে ভাই ভুজু। কাজেই তুমিই আমাকে ক্ষতিপূরণ দাও। তারপর তক্ষুনি কেটে পড়েছিলেন। এবং

আসতে-আসতে মাথায় গজিয়েছিল এই গানটা। রোস, দেখাচ্ছি মজা গাজনের দিন। আজ সেই মজা দেখাচ্ছেন। তিনবার ধুয়ো গেয়ে দোহারকিরা সমের মুখে ছেড়েছে, বোরজে মশাই অন্তরার প্রথম কথাটা বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, ঠিক সেই সময়···

হঠাৎ সব শব্দ থেমে গেল গাজনতলায়।

দিনশেষের ধূসর কী এক আলো ন্যাড়া, পাথুরে এবং চাষাপুরুষের হাতের তালুর মতো খসখসে এই এক একর চটানে এতক্ষণ মানুষজনকে প্রাগৈতিহাসিক যূথ-স্মৃতিতে চুবিয়ে রেখেছিল।

একখানা পুরানো ছবির পট ভাঁজ করা থাকে সারাবছর এবং সেই পট খুলে হাত পা ছড়িয়ে বসে ঢুলুঢুলু চোখে দেখছিলেন বাবা ন্যাংটেশ্বর শিব, যাঁর অন্য নাম মহাকাল।

হঠাৎ কারা এসে লাথি মেরে উল্টে দিল সেই পট। প্রাগৈতিহাসিক যূথ-স্মৃতির তাবৎ মন্ময়তা ও তন্ময়তা বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল তক্ষুনি।

মন্দিরের কোটরে পিদীম ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ঠাকমশাই বিগ্রহের আড়ালে খেঁকশিয়ালের মতো লুকিয়ে পড়লেন। শেষ আরতির ঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে গেছে থেমে। আর ভকা বাউরি সেই ফাঁকে একটা মুণ্ডু নিয়ে পালায়। ট্যারা মেয়েটা একবার চেরা গলায় চেঁচিয়েই ব্যাপারটা চোখে পড়ামাত্র চুপ করে।

ন্যাড়া বাউরি খড়ের লেজ কামড়ে আবার নিমগাছে চড়তে যাচ্ছিল। গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। নকল শিবের মুখ চচ্চড় করে, পিটপিট করে তাকায়। ঝুরন ডোমনী, সুদাং, চিনাথ, গোবর্ধন···তাবৎ সঙাল ভাঁড় এবং ভক্ত সন্নেসীগণ, খড়্গধারী রাখু কামার, খগাজগা ভ্রাতৃদ্বয় এবং খগার পুঁকড়োলাগা কাঁসিবাজানো ছেলেটা কুমোরের বারান্দায় ঝুলনপূর্ণিমার পুতুল হয়ে ওঠে।

আমোদিনীর ভূতিনীও পালিয়ে যায়। হেরম্ব চৌকিদার রক্তকাদাছাইমাখা নীল পাগুড়ি মাথায় জড়াতে গিয়ে কপালে হাত ঠেকায়। সে হাত নামাতে ভুলেই যায়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ যেমন।

বোরজে মশাই ঠোঁট ফাঁক করেছেন তো করেছেন। ভাঙা দাঁতের গর্ত দেখা যাচ্ছে। নবীন ঢোল থেকে হাত তুলতে পারছে না, কী ভীষণ আঠালো ছাউনি! অরু নাপিতের খঞ্জনিজোড়া কানের কাছে ধরা, শব্দহীন। বড় সাধে

ভুজু ডাক্তারের বিধবা বোনের গাইগরু সেজে চার-পা হয়েছিল হারাধন তিওর, সে দু-পা হতে গিয়ে বসে পড়েছে।

তোরাপ গুণিনের লাঠির ডগা থেকে মড়ার মাথা লাফ দিয়েছিল পালাবে বলে, পারেনি। গুণিনের দুপায়ের ফাঁকে গেরুয়া লুঙ্গির তলায় লুকিয়ে আছে। তোরাপের চোখের জ্যোতিটি আর নেই। ঘোলাটে চোখের পাতা, নিষ্পলক এবং তারাদুটো ন্যাবায় আক্রান্ত, হলুদবর্ণ।

গাজনতলার চারদিক থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে 'ছিয়ারপির নোক।' বাবুরা বলেন সি আর কি। দিল্লি থেকে পাঠানো।

ছিয়ারপির নোক শুনলেই ইদানীং গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বউ-বউড়ি ঝি-ঝিয়াড়ি আর যুবোযোয়ান মরদগুলো মাঠেবাদাড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। ঝগড়াঝাঁটিতে পরস্পরকে লোকেরা শাসায়—থামো, ছিয়ারপি ঢোকাব ঘরে। চ্যারাক-পোঁ চলবে না।

'ছিয়ারপিরা, দেখতে কেমন, সবাই জেনে ফেলেছে ইদানীং। ওনাদের মাথার টুপিটি লাল নয়কো মোটে। মহা বন্দুকবাজ। লাঠিবাজও বটেন। এবং ঝাঁকে আসেন, ঝাঁকে যান। এবং বাবুপাড়ার বর্ণনা মতো ওনারা সেই হিল্লিদিল্লির নোক। তাই মহিমাপুরের বংশীদারোগারও সাধ্যি নেই, সামাল দেবেন। গতমাসে পাশের গাঁ হাটপাড়ায় চালে আগুন ধরিয়ে আসামী বের করেছিল। বংশী দারোগা পরে বলে গেছেন—বাবারও বাবা থাকে। আমি তো এতটা কাল সামাল দিয়ে এসেছিলুম, পারলুম না। আর হাটপাড়ার ও শালারাও মহা ত্যাঁদোড়। কতবার বলেছি, শোনে নি। নে, এখন মর্।

গাজনতলার চোখে সেই মরার আতঙ্ক। ছোটলোক টোটলোক মানুষ সব। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। রক্তারক্তি হয়। মেঘের মতো গর্জে গালমন্দ করে পরস্পরকে। কিন্তু বাবুমশায়দের সামনে একেবারে কেঁচো। ওনারা চটলে পেটে পাথর বেঁধে পড়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর সেই বাবু-মহাশয়রাও যমের মত ভয় পায় যেনাদের, তেনাদের এমন করে সশরীরে চোখের সামনে দেখলে পিথিমী আঁধার হয়ে যায়। ভুঁইকম্পে পা টলে। জিভ শুকিয়ে খড় হয়। হে বাবা ন্যাংটেশ্বর, অবেলায় হঠাৎ এ কী উপদ্রব! আসরভঙ্গ, নেশাছুট্, রা সরে না মুখে।

একটা হৃদয়হীন ভয়ঙ্কর শব্দহীনতার তলায় ক্ষীণতম একটা বিলাপ নড়ে-চড়ে। কে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

তারপর কে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে বলে—এ্যাই শুওরের বাচ্চারা !

সঙ্গে সঙ্গে নড়াচড়া শুরু হয়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ থেকে ছিটকে পড়ে মূর্তিরা ছত্রভঙ্গ পালাতে থাকে। রুক্ষ ন্যাড়া চটানে পায়ের শব্দ ওঠে। ভারী জুতোর শব্দ ওঠে। ধুপ ধুপ ধুপ দুদ্দাড়···ঝন ঝনাৎ। উল্টে যায় পাঁপর ভাজার উনুন কড়াইসমেত। রসগোল্লার গামলা গড়িয়ে পড়লে বেচা ময়রা আকাশপাতাল আর্তনাদ করতে থাকে। সইদের মনোহারির রঙ ঝিলিমিলি বাজারের ওপর অজস্র হাতিবাঘশুওর ও হরিণের পাল ছুটোছুটি করে।

—এ্যাই শুওরের বাচ্চারা। আবার কে হাঁকরায় এবং বোরজে মশাইয়ের কাঁধে থাবা পড়ে। অমনি বোরজে মশাই ভাঁড়ের গলায় বলতে থাকেন—আমি কিচ্ছু জানিনে। মাইরি বলছি, আমি কিচ্ছু···আমার জামাই নয়, শালা··· একশো শালা—মাইরি বলছি···তারপর গুঁতো খেয়ে অঁক করেন এবং চুপ করেন।

ওদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে হাতিবাঘশুওর ও হরিণের পাল। মন্দির থেকে বুড়ো নিমতলা, বুড়ো নিমতলা থেকে দীঘির পাড়, দীঘির পাড় থেকে কেয়া-ফণিমনসার ঝোপ অব্দি।

বস্তুত কী যে ঘটেছে, কেউই বুঝতে পারছে না। হাতের রেখা অস্পষ্ট করেছে সন্ধ্যার ছাইরঙ, যখন বুনোপায়রার পালকের মতো দেখায় দিনের মরণদশাকে।

তাহলেও এতক্ষণে ঠাহর হয়েছে, শুধু 'ছিয়ারপির নোক' নয়, বংশী দারোগার দলবলও আছে। তাদের মাথার লাল টুপিগুলো ঘুরপাক খেয়ে ভাসছে।

তারপর বংশীলোচন গাজনতলার মন্দিরের সামনে গেলেন। প্রণাম করে একচিলতে মাটি কপালে ঘষে একটু হেসে বললেন—এবার কটা পাঁঠা পড়ল রে ? কেউ জবাব দিল না। তাকিয়ে দেখলেন দুটো ঢাক সিংহের কাটামুণ্ডুর মতো পড়ে আছে। বায়েন নেই। খাঁড়া পড়ে আছে হাড়িকাঠের পাশে। কামার নেই। বেতগুলো পড়ে আছে। সন্নোসীরা নেই। আর দারোগাবাবুর পায়ের তলায় কাঁসি। বললেন—শালারা মানুষ, না ভূত ? এ্যাঁ ?

একে-একে ধরে নিয়ে আসছে সেপাইরা সঙসাজা লোকগুলোকে। সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। টর্চ জ্বালছেন বংশীলোচন। মুখে কিছু দেখছেন। খুঁজছেন।

—এ্যাই ব্যাটা! কে তুই?

—এজ্ঞে সুদাং।

—কী সেজেছিস?

—ডাক্তারবাবু এজ্ঞে!

—ডাক্তার! দারোগা খিকখিক করে হাসেন।

একটু সাহস পেয়ে সুদাং বলে—এজ্ঞে ফেমিলি পেলানিংয়ের সঙ দিচ্ছিলাম কি না!

—কী!! ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের সঙ? গিরিধারী, শালাকে এখানে বসিয়ে রাখো। আর তুই কোন ব্যাটা?

—আমি সার ন্যাড়া।

—ওটা কী তোর হাতে?

—লেজ সার!

বংশীলোচন লেজটা কেড়ে নিয়ে খড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করেন। তারপর ফের খ্যা খ্যা করে হেসে বলেন—কী সেজেছিলি? বাঘ?

—না সার, হনুমান!

—এ ব্যাটা আবার কে?

—হুজুর, আমি তোরাপ আলি।

দারোগা তার জটাজুট আর দাড়ি ধরে টানাটানি করেন। তোরাপ খোলা গলায় বলে—ওঁ বাঁপ, বাঁপজান গোঁ!

এবার দারোগা চিনতে পেরে বলেন—ও। তুই সেই ভূতের রোজা। ডাকাতদের বোমা সাপ্লাই করিস না আজকাল?

—লাঁ হুঁজুর, লাঁ। তোরাপ পা ছুঁতে হুমড়ি খায়। কিরে করে খোদা আর ন্যাংটেশ্বরের নামে।

—বোস্ এখানে। কথা আছে তোর সঙ্গে।

তোরাপ বসে থাকে রক্তছাইকাদার ওপর। মড়ার মাথাটা কাঁধের ঝোলায় রাগে ফোঁসে না কি? নিশ্চয় ফোঁসে। তোরাপ টের পায় সেটা। মনে মনে মন্তর পড়ে। খ্—খাঁ এই দারোগার পেঁকে। কঁড়মঁড়িয়ে মচমচিয়ে খা।

—তুই কে?

—আমি ঝুরুন গো! হেই দারোগাবাবু চেনা মানুষ চিনতে ভরোম। ই কী কথা।

—কী সেজেছিস ঝুরুন? তোর মাথায় ওটা কী? বংশীলোচন মিঠে গলায় বলেন। ও ঝুরুন, হাতে লাঠি কেন?

ঝুরনডোমনী হেসে হেসে বলে—অমোৎ (রহমত) কাবুলীকে মনে পড়ে না দারোগাবাবু? আমি অমোৎ গো, অমোৎ।

—হুঁ, তুই কোন ব্যাটা?

—হুজুর, আমি আমপদো বাগ্দী। সুরোপদর ছেলে হুজুর।

—তোর বাপ তো দাগী ছিল?

—ছেল হুজুর। আমি দাগী লই। খাতা খুলে নিষ্টি দেখুন।

—ক' হাঁড়ি গিলেছিস ব্যাটা?

—হুজুর, বিরিক্কি আজকাল তেমন ঝরেন না। আগে মনিষ্যি তো বটেই, পাখপাখালি কাঠবেড়ালি অসের বন্যেতে ভেসে যেত। আপনি তো জ্ঞেনী বেক্তি হুজুর, ক্যানে এমন হল, বলুনদিকিনি?

—চোওপ্!

—চুপলাম হুজুর।

—হুঁ, শিব সেজেছিস দেখছি?

—ওইটুকুনই পারি এঁজ্ঞে।

—বোরজে বাঁড়ুয্যের জামাইকে দেখেছিস?

আবছা আঁধারে সঙালের দল মুখ তাকাতাকি করে। বংশীলোচনের টর্চ সমানে আলো বিকিরণ করতে থাকে। কয়েক দণ্ড চুপচাপ থাকার পর রামপদ জোরে মাথা দোলায়।—বাবা ল্যাংটেশ্বরের ছামুতে বলছি, তেনাকে অনেকদিন দেখিনি। সেই যে আঘুন মাসে একবার এলেন—

—এসেছিল নাকি?

—এসেছিলেন বটে। কিন্তুক, যতীনবাবু, চিকান্তবাবু, আপনার মশাই হরিরামবাবুরা বোরজে মশাইকে শাসালেন। বোরজে মশাই বললেন, জামাই তুমি পালিয়ে যাও। গণ্ডগোল করো না।

—থাম্! চৌকিদার কোথায় গেল? চৌকিদার!

—আছি সার। পেছনেই আছি।

—সে ব্যাটা এসেছিল, খবর দিস নি কেন?

—সন্ধেবেলা এসেছিল শুনলাম, খবর দেব-দেব ভাবছি, আবার শুনলাম, কেটে পড়েছে।

—চুপ্‌ ভাঙখোর কোথাকার! রোস, দেখাচ্ছি মজা।

এই সময় গাঁয়ের দিক থেকে একটা হ্যাজাক আসছিল। বংশীলোচন ও তাঁর বাহিনী আলো দেখতে থাকেন। আলোটা এনেছে হরিরামবাবুর লোক। মন্দিরের বারান্দায় সেটা রাখা হয়। আরেকজন এনেছে একটা চেয়ার। বংশী-লোচন খাপ্পা হয়ে বলেন—এখন সিংহাসনে বসব না।

তাহলেও আলোটা পেয়ে ভাল হল। দারোগা সিগারেট ধরিয়ে বলেন—তুই কে রে?

—আমি লাটু কুনাই এঁজ্ঞে?

—কী সেজেছিস?

লাটু হাউমাউ করে কেঁদে পা ধরতে যায়। সেজেছিল দারোগাবাবু। বরাবর তাই সাজে সে। খাকি পোশাকটার বয়স তার বড় ছেলের সমান। হ্যাটটারও তাই। এগুলোর মালিক ছিলেন কায়েতবাড়ির মটর সিঙ্গি। বন্দুকবাজ শিকারী ছিলেন তিনি। বিলেখালে পাখপাখালি মারতেন। বুড়ো হবার পর ভিক্ষে করে এনেছিল লাটু। তারপর তো কবে মরেহেজে গেছেন মটর সিঙ্গি। সে প্রায় এককুড়ি বছর আগের কথা।

—তুই কে রে?

—গোবরা দারোগাবাবু।

—মাগী সেজেছিস কেন?

গোবরা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তার হয়ে চিনাথ বলে—গাজনের দিন হুজুর। বাপপিতেমোর আমল থেকে আমরা সঙালী করে আসছি।

—চোওপ্‌। তোকে কে ফোঁপর দালালী করতে বলেছে? কে তুই?

—অধীনের নাম আজ্ঞে চিনাথ বাউরি।

—কোথায় থাকিস? কী করিস?

—হুইখানে আজ্ঞে। দীঘির পাড়ে একাদোকা থাকি। মাঠে জাগালী করে খাই।

— বোরজে বাঁড়ুয্যের জামাইকে চিনিস?

—না আজ্ঞে। বললাম তো, মাঠে-ঘাটে সম্বচ্ছর কাটাই। গাঁঘরের খবর জানতে পারিনে।

—পণ্ডিতের মতো কথা বলছিস কেন? তাড়ি গিলিস নি?

চিনাথ সবিনয়ে বলে—ছোটনোক মনিষ্যি আজ্ঞে। গিলেছিলাম বইকি।

তাতে আজ বাবার গাজন। কিন্তুক মজাটা দেখুন, লেশা আপনাদের দেখেই চটে গেয়েছে। হিঁক···হিঁক···হিঁক···

—দাঁত বের করিস নে।

—আচ্ছা হুজুর।

—আবার দাঁত বের করে!

—হুজুর অবোস। আজ বছরের শেষ দিন। হাসতে হয়।

—দাঁত ভেঙে দেব ভূতের বাচ্চা!

—হুজুর, আজ শিবের বিয়ের পরব। শিব বড়নোক শ্বশুরকে হেনস্তা করতে সঙ সেজে গেলেন। সঙ্গে আমরাও গেলাম। তাপরে হুজুর, বড় লণ্ডভণ্ড হুলস্থুলুস হল। তাপরে···

বেটনের গুঁতো খেয়ে সে চুপ করে। হেঁটমুণ্ডে ঝুলন্ত গোঁফটা টেনে ছাড়াতে থাকে। বংশীলোচন আরেকজনকে নিয়ে পড়েন।···

মাঠের ধারে নিসিং পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি। অন্ধ হয়ে গেছেন ইদানীং। তবু কত বছরের অভ্যাস। নাতি-নাতনীরা হাত ধরে এনে বারান্দায় বসিয়ে দেয়। পা ঝুলিয়ে শতরঞ্জিতে বসে পশ্চিমের আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকেন। হাতের মুঠোয় লাঠিটা খাড়া হয়ে থাকে সামনে। মনের চোখে সূর্যাস্ত দেখেন।

আজ ছিল গাজনতলায় ধুম। বাজনা হইহট্টগোল কানে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল তো গেলই। নিসিং পণ্ডিত বললেন—কী হল রে?

কেউ ধারেকাছে নেই। জবাব পেলেন না। তখন গলা চড়িয়ে ডাকলেন—পিণ্টুমণ্টুরা কোথা গেলি রে?

পিণ্টুমণ্টুরা নেই। কেউ যেন নেই বাড়িতে। আরও দু-চারবার ডেকে তেতোমুখে বললেন—সব মরেছে, সব্বাই। তারপর কান পেতে বসে আছেন তো আছেন। টের পাচ্ছেন একটা কিছু ঘটেছে গাজনতলায়। এমন হঠাৎ সব নিঃঝুম হয়ে যাবার কথা তো নয়।

কতক্ষণ পরে পায়ের শব্দ শুনে বলেন—কে?

—আমি সল্লা পণ্ডিতমশাই!

—সল্লা মানে?

—দুলেপাড়ার সল্লা গো! বিল থেকে আসছি।

—ও, সরলা। মাছ পেলি রে?

—আর মাছ পণ্ডিতমশায়! পেরান নিয়ে তটস্থ। সেই দুপুর থেকে লুকিয়ে ছিলাম বেনার জঙ্গলে। এতক্ষণে পালিয়ে আসছি। বাবা রে বাবা! মিনসেদের বিলখালেও মরণ নেই গা!

নিসিং পণ্ডিত গলা চেপে বলেন—কী, কী?

—আবার কী? ছিন্নারপি বলেই মনে হল।

—বিলে কী করতে গেল বল্ তো?

—উদ্ধব গয়লার সঙ্গে দেখা হল। বললে, বোরজে মশায়ের জামাই নাকি কাল থেকে ওখানে লুকিয়ে আছে। ছিরু ঘোষের বাথানে ওনাকে কে দেখতে পেয়েছিল। পেয়ে খবর দিয়েছিল গাঁয়ে।

—তারপর, তারপর?

—গাঁ থেকে নাকি সেই খবর গেল থানায়। তাপরে যা হবার হল! ঢঙ মিনসেদের।

নিসিং পণ্ডিত মাথাটা একটু দোলান। বলেন—হুঁ। বোরজেটাও মরবে। তখন বলেছিলাম, যেখানে-সেখানে মেয়ে দিসনে বোরজে। কোথাকার কে, জাত-পাত চেনাপরিচয় কিচ্ছু ঠিক নেই।

—হ্যাঁ গা পণ্ডিতমশায়, বোরজেবাবুর জামাই নাকি জেহেলখানা ভেঙে পালিয়ে এসেছে?

—হুঁ তাই শুনেছি।

—জেহেলখানায় ঢুকেছিল ক্যানে বাপু? ঢুকল যদি পালালই বা ক্যানে?

—সরলা, তুই গোমুখ্যু। খিকখিক করে হাসেন নিসিংপণ্ডিত।

—বলুন না বাপু, কী করেছিল জামাইবাবু?

—নকশাল পার্টি করত। বুঝলি?

—ও, নকশাল। বুঝলাম বটে।

—কী বুঝলি?···নিসিং পণ্ডিত নড়ে চড়ে বসেন। ফের বলেন—বেশ। যা বুঝেছিস, বুঝেছিস। এখন বাড়ি যা। ছাখ্ গে, তোদের গাজনতলায় কী যেন হচ্ছে।

সরলা দুলেনীর কাঁধে বেসাল জাল। লম্বা বাঁকা দুটো বাঁশে আটকানো। মনে হয় বিশাল ডানাওলা পরী এল পশ্চিমের বিল থেকে উড়ে। সাঁৎ করে উড়ে চলে গেল ফের।

আবার নিঃঝুম চুপচাপ অবস্থা। কতক্ষণ পরে আবার পায়ের শব্দ হয়। নিসিং পণ্ডিত বলেন—পিণ্টুমণ্টুরা এলি নাকি রে? গাজনতলায় কী হচ্ছে বল্‌দিকি?

কোন জবাব না পেয়ে ভাবেন কুকুরটুকুর হবে। তারপর আপনমনে বলেন —হবেটাই বা কী? সঙ হচ্ছে, সঙ। গাজনতলায় যা হয়!··

হরবোলা ছেলেটা

সকাল থেকে সাদেরালির মনে ধাঁধা, ছেলের পেণ্টুল কাচতে গিয়ে পকেটে কাঁইবিচির সঙ্গে একটা দু টাকার নোট পেয়েছিল।

বছর দশেক বয়েস হল ছেলেটার। এখনও মাঝে মাঝে বিছানা ভেজায়। শোবার আগে মাথায় ফুঁ, তুকতাক, পীরের সিন্নি, মৌলবির তাবিজ, এমন কী মা ষষ্ঠীর থানের ধুলোতেও ফল ফলেনি।

পাশের বাড়ির আয়মন বুড়ির এক পেল্লায় মোরগ আছে। ভোরবেলা দরমা থেকে ছাড়া পেলেই সে সাদেরালির খড়ের চালে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে মটকায় ওঠে। আর তক্ষুণি টের পায় সাদেরালি। তার কলজেয় নখের আঁচড় পড়ছে খর খর খর খর। একঠেঙে ভিখিরী-সিখিরী মানুষ সে। ক্রাচে ভর করে কষ্টেসিষ্টে সারাটা শীতকাল মাঠে মাঠে ঘুরে চেয়েচিন্তে ওই খড়গুলো এনেছিল। আয়মনের মোরগ চালটা ঝাঁঝরা করে ছেড়েছে। মটকায় চড়ে বাং দিলে পাড়ার মুর্গির ঝাঁকও তার সঙ্গে প্রেম করতে আসে।

তাই রোজ ভোরে সাদেরালির প্রথম কাজ মোরগ তাড়ানো। দ্বিতীয় কাজ কাঁথাকানির তলায় হাত চালিয়ে ছেলের পেণ্টুল পরখ। ভিজে থাকলে ছেলের ঘরপালানী মায়ের নামে একনাগাড়ে গালমন্দ দেয়। শুকনো থাকলে ওর কপালে হাত রেখে ডাকে, সোনা রে! মানিক রে! হরবোলা রে!

হরবোলা বলার কারণ, ছেলেটা পাখপাখালি আর জন্তু জানোয়ারের ডাক নকল করতে পারে। যখন আপন মনে একলা হেঁটে যায়, দুপুরবেলার নিঃঝুম ঘোরলাগানো ঘুমঘুম স্বরে ঘু ঘু ডাকে—ঘু ঘু ঘু···ঘু ঘু ঘু। ওই তার যেন নিজের ডাক।

আগে জীবন্তীর বাজারে বেড়ালের ঝগড়া শুনিয়ে দুটো লেবনচুস কী একটা

জিলিপি রোজগার করত। রিকশোওলারা কুকুর শেয়ালের ডাক শুনতে চাইত। এক গেলাস চায়ের লোভে ছেলেটার কচি গলা চিরে যেত। সাদেরালি বারণ করেছিল। খামোকা গলার কষ্ট করা। লোকেরা মাগনি আমোদ লুটতে চায়। দুনিয়া জুড়ে খালি আমোদগেঁড়ের ভিড়।

আজকাল বাপব্যাটা আলাদা হয়ে বেরোয়। খোঁড়া মানুষ। খানতিনেকের বেশি গাঁ ঘুরতে বেলা গড়িয়ে যায়। আর ছেলেটা ধুকুর ধুকুর হেঁটে পাঁচ-সাতটা গাঁ সেরে আসে। বাজারের মুখে খালের ধারে বটতলায় দুজনের দেখা হয়। ওখানেই সকালবেলা ছাড়াছাড়ি, সন্ধেবেলা ফের দেখা। কাল সাদেরালি ভেবে সারা হচ্ছিল। মাঠে তখন বুনোপায়রার পাখনায় মুখ গুঁজে থাকার মতো ছাইরঙা সন্ধেবেলাটা ঝিম মেরে আছে। গাঁয়ের গোরস্থানে শিমুল গাছটা কুয়াশার জোব্বা আর টুপি পরে নমাজে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা। এমন সময় খালের ওপরে কোথাও ঘুঘু ডাকল। ঘু ঘু ঘু···ঘু ঘু ঘু। সাদেরালির বাপের হৃদয় খুব নাড়া খেয়েছিল।

কিন্তু তখনও টের পায়নি ওর পেন্টুলের পকেটে একগুচ্ছের তেঁতুল বিচির সঙ্গে একটা লালচে নোট আছে।

একসঙ্গে কে ওকে দু-দুটো টাকা দিতে পারে, কে এমন দয়াল দাতা, সাদেরালির মনে পোকা ঢুকেছে। বটতলা থেকে বাজার, বাজার থেকে কয়েক একর নীচু মাঠ পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছনো অব্দি ছেলে তাকে সারাদিনের পুরো বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে বলতে ভোলে না। সাদেরালিও জিগ্যেস করতে ছাড়ে না, কারণ তার বাপের মন। আর ছেলেও বাপেরটা জেনে নেয়। কে কত কামাতে পেরেছে, তাই নিয়ে ঠাট্টাতামাশাও চলে। হঠাৎ কাল সন্ধে থেকে তাল কেটে গেছে, সাদেরালি আজ সকালে সেটা ঠাহর করেছে।

কাল সন্ধে থেকে ছেলেটার মুখে অন্য ভাব। টুকটুকে ফর্সা ছেলেটা ধোঁয়াটে নীল চোখ। মাছের মতো তাকাচ্ছিল লম্ফের আলোয়। আঙুলের ডগায় ভাত ঘাঁটছিল।

আর কী যেন বলতে যাচ্ছিল অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে, সাদেরালির চোখে ঘুমের পাথর তখন। সকালে পেন্টুল কাচতে গিয়ে তেঁতুলবিচি আর লাল রঙের নোট দেখে একে একে সব মনে পড়েছিল। তারপর থেকে লাল নোটটা তার খুলির ভেতর খসখস করে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। মাথা থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। বার বার ছেলেকে জেরা করছে। ঠিকঠাক জবাব নেই। খালি বলে, পেয়েছি।

পেয়েছিস, তো বুলিস নি ক্যানে? ধমক দেয় সাদেরালি। থাপ্পড় তুলে চ্যাচায় ফের, একটো লয় আধটো লয়। দু-দুটো টাকা। টাকা কি গাছের ফল?

ছেলেটা ঘাড় গুঁজে আবার বলে, পেয়েছি।...

বেরুতে খানিকটা দেরি হল আজ। আলপথে গিয়ে ইটভাটার কাছে সাদেরালি হঠাৎ দাঁড়াল। ছেলেটা পিছনে হাঁটছে। কেমন ঝিমধরা আড়ষ্ট চেহারা। কাঁড়ির সেপাইদের কাছে পাখপাখালির ডাক শুনিয়ে কবে একটা খাকি পেণ্টুল পেয়েছিল। হিসির দিন ওটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরতে হয়। পেণ্টুলটা হাঁটু পেরিয়ে ঝোলে। আর এই শীতের হিম থেকে বাঁচতে ওই সাইজেরই একটা ঘিয়ে রঙের সোয়েটার আছে। মেদীপুরের হিঙন আলি হাজি পেল্লায় মানুষ। তার বাড়ি দিনকয়েক রাখালী করতে গিয়েছিল গত বছর। দাতা হাজিসায়েব তাকে টুটাফাটা ওই সোয়েটার পরিয়ে বলেছিলেন, যা ব্যাটা! বাদশা বানিয়ে দিলাম। কদিন পরে হাজিসায়েবের বদনার গুঁতো খেয়ে পালিয়ে আসে। গায়ে তখন সোয়েটারটা ছিল। তারপর আর বাপ ব্যাটা ভুলেও মেদীপুরের দিকে পা বাড়ায় না।

সাদেরালি চাপা স্বরে বলল, হ্যা রে বাছা, চুরিচামারি করিস নি তো?

ছেলেটা জোরে মাথা দোলায়।

ভয় পাওয়া গলায় সাদেরালি ফের বলে, বাপ নাদেরালি! এখনও খুলে বল। আমি তোর জন্মদাতা। চুরি করিস নি তো?

ছেলেটা এবার ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, না।

তবে কে দিলে টাকা?

দিয়েছে।

কে দিয়েছে রে?

সেই ধোঁয়াটে নীল চোখ। নিষ্পলক মাছের মতো চাহনি। নাকের ফুটো একটু একটু ফুলছে। পাতলা চিমসে রুক্ষ ঠোঁট চাটল একবার। দুপায়ে শিশিরভেজা ঘাসের কুটো, নিস্পন্দ দু একটা পোকাও লেগে আছে।

উঁচু রাস্তায় এক্সপ্রেস বাসটা জীবন্তীর বাজার ছেড়ে জোরে বেরিয়ে গেল। রোজ সকালে দুজন গিয়ে নৈমুদ্দির চায়ের দোকানে বসে এই বাসটার অপেক্ষা করে। দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে বাসটা। যাত্রীরা চা খেতে নামে। সাদেরালি আর তার ছেলে নাদেরালি দু গেলাস চা আর অন্তত এক টুকরো পাঁউরুটির পয়সা কামিয়ে নেয়। সাদেরালি হেঁড়ে গলায় সুর ধরে বলে :

ঘরবাড়ি বালাখানা···

সাদেরালি চেরা গলায় বলে ওঠে :

রবে না রবে না।

ধনদৌলত খানাপিনা···

রবে না রবে না ॥

রূপযৌবন পোশাক আশাক···

রবে না রবে না ॥

সাদেরালি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পা বাড়াল। ছেলের স্বভাব সে জানে। একবার গোঁ ধরলে আর কিছুতেই নোয়ানো যাবে না। জবাই করতে গলায় ছুরি ঠেকালেও না। তবে একথা ঠিক, চুরিচামারি করা স্বভাব নয় ছেলেটার। সেই এতটুকু থেকে দেখে আসছে। শিক্ষা সহবতও দিয়েছে। ন্যায়-অন্যায় ভালমন্দ সমঝে দিয়েছে। বার বার বলেছে, ছাখ বাপ! কপালদোষে ভিক্ষ মেঙে খাই বটে, আমরা ভিখমাঙা বংশ নই। নেহাৎ এই পাটা কাটা গেল, শরীলে আধিবেধি ঢুকল। গতর খাটিয়ে খেতে পারিনে বলেই ভিখ মাঙি দোরে দোরে। তুই বড়োসড়ো হ। খাটতে শেখ। তখন আমার জিরেন।···ছেলে বাপের কথা কান করে শুনেছে। জিগ্যেস করেছে, পা কিসে কাটা গেল বাপজী? সাদেরালি একটু হেসেছে।···সে শুনে তুই কী করবি বাছা? সে বড়ো অনাছিষ্টির কথা।

না শুনে ছাড়বে না। ছেলেটার এই স্বভাব। কথাবার্তা কমই বলে। হাসেটাসেও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু জেদ ধরলে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে। ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। একঠেঙে কমজোরী মানুষের পক্ষে তাকে নড়ানো কঠিন। অগত্যা সাদেরালি তার পা খোয়ানোর কাহিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে শুনিয়েছে। শোনালে মনটাও হাল্কা হয়। কতজনকে তো শুনিয়ে ছেড়েছে।

আমার এই পা, বুঝলি বাপ—এই পায়ে হেসোর কোপ মেরেছিল তোর মা। বলেই সাদেরালি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছে। মনের ভাবটা আঁচ করতে চেয়েছে। মায়ের কথা জানতে-টানতে ওর আগ্রহ নেই কোনদিনও। মা কী জিনিস, হয়তো বোঝেও না। সেই দেড় বছর বয়সে মায়ের সঙ্গছাড়া।

ক্যানে মেরেছিল বাপজী?

এই প্রশ্ন শুনে সাদেরালি মুশকিলে পড়ে গেছে। সত্যি কথাটা অতটুকু ছেলেকে বলা যায় না! অথচ খাঁটি মনে হয়েছে, ও জানুক। ওর জানা

উচিত। অগত্যা ভেবেচিন্তে সাদেরালি বলেছে, তোর মায়ের সঙ্গে আমার কাজিয়া হয়েছিল।

ক্যানে বাপজী?

ভুরু কুঁচকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছে সাদেরালি। বলবে নাকি, বলা কি উচিত হবে অতটুকু দুধের বাচ্চাকে—তোর মা ছিল খানকী মেয়ে?

মুখে বলবে কী, মনের ভেতর ছবি এখনও স্পষ্ট। সেই খরার দুপুরবেলাটা চোখের সামনে এখনও জলজল করছে। কাঁকরগড়ার সোলেমান ঠিকেদার রাস্তা মেরামতের কাজে মুনিশ খুঁজতে আসত এ গাঁয়ে। তখন সাদেরালির শরীরে জোর ছিল। মাটি কোপানোর কাজে তার জুড়ি ছিল না। সেই সুবাদে সোলেমান সাইকেলে চেপে তার বাড়ি আসত। বোকাসোকা সরল মানুষ সাদেরালি হুঁশ করে নি কেন ঠিকেদার সকালসন্ধে তার মতো মুনিশখাটা লোকের বাড়ি আড্ডা দেয়। তারপর একটু করে সন্দ জেগে উঠেছিল। এক খরার দুপুরে মাথা ধরেছে বলে সাদেরালি কাজ ফেলে হুট করে বাড়ি ফিরেছিল। এসেই দেখে, উঠোনে দেড় বছরের বাচ্চাটা আপনমনে খেলছে। ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠেলে বেরিয়ে গেল হারামজাদা সুলেমান ঠিকেদার। ভেতরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেয়েটা তখন আলুথালু চুল আর গতরের কাপড়খানা সামলাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাদেরালি। গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল কিন্তু মেয়েটা যেন তৈরী ছিল। আচমকা হেসো ছুড়েছিল। হেসোটা হাটুর নীচে লাগল। সাদেরালি আর্তনাদ করে বসে পড়েছিল।

সেই ফাঁকে মেয়েটা বেরিয়ে যায়। দেড় বছরের ছেলেটা তখন মোরগঝুঁটি ফুলগাছটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করছে।

পরে পায়ের ঘা বিষিয়ে যায়। ওই নিয়ে মুনিশ খেটেছে। জলকাদা ঘেঁটেছে। ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে মেহনত করেছে। পা ফুলে ঢোল হয়েছে। যন্ত্রণা বেড়েছে। তখন অগত্যা জীবন্তীর হাসপাতালে গিয়েছিল সাদেরালি। ছেলেটাকে রেখে গিয়েছিল আয়মন বুড়ির কাছে। মাস দুই পরে ক্র্যাচে ভর করে বাড়ি ফিরল। দয়াবতী আয়মন ছেলেটার যত্নআত্তির ত্রুটি করেনি।

ভেবেছিল, হারামজাদী মেয়েটা ছেলের টানে ফিরে আসবে। আসে নি। আরও কিছুদিন পরে তার বাপ এসে তালাক চাইল মেয়ের জন্যে। লোকের

পরামর্শে সাদেরালি পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। শেষঅব্দি দুশোয় রফা হয়। সাদেরালি পরে জেনেছিল, টাকাটা সোলেমানের।

টাকাগুলো পুঁজি করে তিন-চারটে বছর সে কত কী করেছে। একটা গাই গরুও কিনেছিল। দুধ বেচে খাওয়া-পরাটা জুটছিল। তার কপাল! গাইগরুটার কী অসুখ হল। পিরিমল হাড়ি নামকরা গোবদ্যি। সারাতে পারল না। ব্লকে পশুডাক্তার আছেন। সেও ছমাইল দূরে। শেষঅব্দি হাল ছেড়ে দিয়েছিল। নকড়ি কসাই এসে নিয়ে গেল। পঞ্চাশ টাকার বেশি দেয় নি। সেই টাকায় অল্পস্বল্প মনোহারী জিনিস কিনে জীবন্তীর বাজারে হাটবারে গিয়ে বসত। চুড়ি, সেপটিপিন, চুলের ফিতে আর প্লাস্টিকের কাঁটা বেচত। ছেলেটা ভারি বশ। বাপের সঙ্গে ধুকুর ধুকুর হেঁটে আসে। তেলেভাজা খায়। চটের কোনায় চুপ-চাপ বসে থাকে। খোঁড়া সাদেরালি দোকানদারি করে। পুঁজি ভাঙিয়ে পেট চালায়।

এর বছরখানেক পরে সে ভিখিরী হয়ে গেল।

এইসব কথা ছেলেকে ইনিয়েবিনিয়ে অনেকবার বলেছে। শুধু ওই কেলেঙ্কারিটুকু গোপন করেছে। অথচ যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে, ওকে সবটাই বলা উচিত। ওর জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে। জানুক ওর মা মেয়েটা কেমন ছিল। আজ আট-নটা বছর কেটে গেল। নিদয়া মেয়েটার মনে একবারও ছেলের কথা বাজল না। বড় তাজ্জব লাগে সাদেরালির। লোকের কাছে বরাবর খবর পেয়েছে, হারামজাদী কাঁকরগড়ায় সোলেমান ঠিকেদারের ঘর করছে। খুব সুখেই আছে। কয়েকটা বাচ্চাকাচ্চাও বিইয়েছে! দামী শাড়ি আর গয়নাগাঁটি পরে মাঝেমাঝে শহরে সিনেমা দেখাতে যায়। সাদেরালি গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘোরে বলেই আবছা নানান কথা কানে আসে।

কিন্তু ভুলেও সে কোনদিন কাঁকরগড়া যায় নি। না খেয়ে মরে গেলেও ওদিকে পা বাড়াবে না। আর ছেলেটাকেও বলা আছে, হুঁশিয়ার বাপ! কাঁকরগড়ায় যদি পা দাও, আমার মরা মুখ দেখবে।

ক্যানে বাপজী?

প্রশ্ন শুনে মুশকিলে পড়েছে সাদেরালি। ছেলেটা মায়ের খবর জানতে চায় না। সাদেরালি তাকে ভুলেও বলে নি, তার মা আছে কাঁকরগড়ায়! অন্ত

কেউ বলেছে কি না, তাও কৌশলে জেনে নিয়েছে। ছেলেটা এমন কিছু বলে না যাতে বোঝা যায়, ব্যাপারটা সে টের পেয়েছে।

ফের প্রশ্ন করলে সাদেরালি একটা রূপকথার গল্প শুনিয়েছে ছেলেকে। আহিরজান নামে এক বাদশার ব্যাটা ছিল। সে গেল শিকারে। বনের মধ্যে হরিণ চরে। বাদশার ব্যাটা তীর ছুঁড়ল। সেই তীর বিঁধল হরিণের বুকে। কিন্তু মারা পড়ল না। পালিয়ে গেল গহন বনের ভিতরে। আহিরজান তাকে ঢুড়ে হয়রান। হেনসময়ে দেখা এক ফকিরের সঙ্গে। ফকির বললে, হরিণ গেছে উত্তরে। কিন্তু হেই বাপ হুঁশিয়ার। ক্যানে? না—সবদিকে যাও, উত্তরে যেও না। গেলেই বিপদ। কি বিপদ? না, ওই হরিণ হরিণ না। তবে কী? না—আক্ষুসী। মানুষের কলজে খায়।...

দম নিয়ে সাদেরালি বলেছে, তাই বলি নাদেরালি, সব বাগে যেও। খোদাতালার দুনিয়াটা অনেক বড়ো। ইচ্ছেমতো চরে ফিরে খেও। কিন্তু হুঁশিয়ার, উত্তরে পা দিও না। আর ছাখো বাপ, আমি একদিন গোরে যাব। তুমি লায়েক হবে। তখনও কথাটা মনে রেখো।

উত্তরে কাঁকরগড়া মাইল তিনেকের বেশি দূরে না। পাকা রাস্তায় যাওয়া যায়। মাঠের পথেও যায়। কতবার ওই মাঠ পেরিয়ে দুজনে দূর-দূরান্তের গাঁয়ে গেছে। সাদেরালি ওদিকে তাকালেই চোখে কাঁকর পড়ে। তাকায় নি। ছেলেকেও নানান কথায় ভুলিয়ে রেখেছে। যদি কখনও বলেছে, চলো না বাপজী, আজ ওই গাঁয়ে যাই।

অমনি সাদেরালি রেগে ধমক দিয়েছে। কতবার বলেছি না ওদিকে যেতে নেই? গেলেই বিপদ। কাঁকরগড়ায় কলজেখাকী ডাইনী আছে।

ছেলেটা যেদিন থেকে আলাদা হয়ে ঘুরছে, সেদিন থেকে সাদেরালি আরও হুঁশিয়ার। কাঁকরগড়ার কথাটা রোজ সকালে তুলতে ভোলে না। সন্ধ্যাবেলায় ও ফিরে এসে বটতলায় দাঁড়ালো। ছল করে জেনে নেয়, ও তল্লাটে গিয়েছিল নাকি। তবে সাদেরালি বুঝেছে, ছেলে বাপকে ভীষণ মানে। এতটুকু অবাধ্যতা তো কোনদিন করে নি। যা বলে তাই শোনে।

তবু মাঝে মাঝে কাঁটার মতো সংশয় বেঁধে। নাবালক ছেলে। দৈবাৎ গিয়ে পড়তেও তো পারে। শেষে ভাবে, যদি গিয়েও পড়ে, মাকে তো চিনবে না। আর ও নিদয়া হারামজাদীও ছেলেকে কি চিনতে পারবে? কত ছেলে-পুলে ভিখ মেঙে বেড়ায় গাঁয়ে-গাঁয়ে।

কাল সন্ধেবেলা কি যে হয়েছিল, কাঁকরগড়ার কথাটা অভ্যাসমতো জিগ্যেস করে নি। সকালে পেণ্টুলের পকেটে কাঁইবিচির সঙ্গে লাল নোটটা পেল, তখনও মাথায় আসে নি।

এতক্ষণে নৈমুদ্দির চায়ের দোকানে বসে চা আর পাঁউরুটি তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার পর সাদেরালি সেই লাল নোটটা বের করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কলজেয় কী চিড়িক করে উঠল। তার খুলির ভেতরটা কাঁপা মনে হল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেখল, হাতটা কাঁপছে।

কোনরকমে পয়সা মিটিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে সে বাকি পয়সাগুলো ফতুয়ার পকেটে রেখে ক্রাচটা ওঠায়। রোজকার মতো ছেলেটা তাকে অনুসরণ করে। পীচের রাস্তায় খটখট আওয়াজ করে সাদেরালি একটু জোরেই হাঁটতে থাকে। সাঁকো পেরিয়ে খালের ধারে বটতায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এখানেই দুজনে ছাড়াছাড়ি হবে। কে কোন গাঁয়ে যাচ্ছে, পরস্পরকে জানাবে।

কাল সকালে ছাড়াছাড়ির সময় ছেলেটা হাসি মুখে বলেছিল, আজ আমি চণ্ডীতলা যাব বাপজী! নাককাটীর গান শুনে অনেক চাল দিয়েছিল।

নাককাটীর গানটা সাদেরালি শেখায় নি। কী ভাবে কোথায় শিখেছে কে জানে।

…নাকটি ছিল বাঁশির মতো
কতজনায় দেইখ্যে যেতো
পথেঘাটেতে হায় গো…
মোড়লবুড়া বদের গোঁড়া
কেইট্যে লিলে নাকের গোড়া
পথেঘাটেতে হায় গো…

গানটা শুনলে সাদেরালি হাসিতে গা ঘুলোয়। সে বলেছিল, তাই যাস চণ্ডীতলা।

তা পরে যাব কাপাসী।

তাই যাস বাপ! যেথা মোন চায় যাস। হরবোলার খুব কদর হয়েছে। তার কুকুর ডাক শুনে গাঁয়ের সব কুকুর ছুটে এসেছিল। বাপ-ব্যাটায় হেসে খুন। খানিক পরে ছেলেটা খালের ধার দিয়ে চলে গেল। ঘু ঘু ঘু…ঘু ঘু ঘু…দূর থেকে ভেসে আসছিল তার ঘুঘুপাখির ডাক।

আজ বটতলায় দুজনের মনে অন্য ভাব। মুখে থমথমে ছায়া কাঁপছে। সাদেরালি ভুরু কুঁচকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা তাকিয়েই দৃষ্টি সরালো। ধোঁয়াটে নীল চোখে দূরের দিকে তাকাল। রুক্ষ ঠোঁটটা চাটল একবার। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় সাদেরালি ডাকল, নাদেরালি!

হাঁ?

তুই কাল কাঁকরগড়া গিয়েছিলি, তাই না?

হুঁ।

দম আটকানো স্বরে সাদেরালি বলে, হুঁ! তাই বটে। তো টাকাটা তোকে কাঁকরগড়ায় দিয়েছে?

ছেলেটা গলার ভেতরে বলে, হুঁ।

হাঁ করে দম নেয় সাদেরালি। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, তো মরদমানুষ দিলে, কী মেয়েমানুষ দিলে টাকাটা?

ছেলেটা মুখের দিকে তাকায়।

সাদেরালি গর্জন করে, মরদমানুষ, কী মেয়েমানুষ?

বাপের মূর্তি দেখে নাদেরালি কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে, একটা মেয়েমানুষ দিলে। আমি···আমি তেঁতুলতলায় কাঁইবিচি কুড়িয়ে দীঘির ঘাটে গেলাম। পানির পিয়াস লেগেছিল। তাপরে—তাপরে কলজেখাকীটা ধরে নিয়ে গেল।

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ওঠে ছেলেটা। তখনি খোঁড়া লোকটা তার কাঁধ খামচে ধরে। থাপ্পড় মারে গালে। নেমকহারাম!

ছেলেটা পড়ে যায়। কান্না সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে। নিষ্পলক তাকিয়ে বাপের মার খায়। সাদেরালি হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে টেনে ওঠায় ফের। বেধড়ক মারতে থাকে। কষা কেটে রক্ত ঝরে। হিঙন হাজির ঘিয়ে রঙের সোয়েটারে ধুলো আর রক্তের ছোপ।

সাদেরালি চ্যাঁচায়, আজ থেকে তুই ফের আমার সঙ্গে ঘুরবি। তারপর পকেট থেকে সেই পয়সাগুলো ছুড়ে ফেলে খালের জলে। বার বার থুতু ফেলে। ছেলেটা আস্তে আস্তে উঠে বসল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটার কাঁধ খামচে ধরে সে মাঠের পথে নেমেছে। খোদাতালার আসমানকে শুনিয়ে বলছে, আজ আমি শুওর খেলাম। যতদূর যায়, খোঁড়া লোকটা ধুয়োর মতো আওড়ায় কথাটা।

কাঁকরগড়ার দীঘির ঘাটে আনমনে দাঁড়িয়ে আছে সোলেমান ঠিকেদারের বউ। পাড়ের তেঁতুলবনে দৃষ্টি। কাঁকে একটা পেতলের ঘড়া।

ঘু ঘু ঘু··ঘু ঘু ঘু!

তেঁতুলবনে ঘুঘু ডাকল। হরবোলা ছেলেটা এসে গেছে। হেই বাপ! আর অমন করে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিখ মেঙে ঘুরিস নে। সোনার গতর কালি হয়ে যাবে। রোজ এই তেঁতুলতলায় এসে দাঁড়াস। রোজ তোকে টাকা দেব। চাল দেব। খন্দ দেব। পেণ্টুল দেব। জামা দেব। সব দেব।

চঞ্চল চোখে চারদিকটা দেখে নিয়ে সোলেমানের বউ পাড়ে ওঠে। কেয়া ফণিমনসা নাটাকাঁটার জঙ্গলে চুপিচুপি হেঁটে যায়। ঘুটিঙ কাঁকরে ঢাকা মাটিতে পায়ের তলায় কষ্ট। আর ওই ঘু ঘু ডাক আজ তুরপুনের মতো ঘুরে ঘুরে কলজের শুকনো ঘায়ে ঢুকে যাচ্ছে। বড্ড টাটায়।

ঘু ঘু ঘু···ঘু ঘু ঘু!

বুকের কাছে চালের পুটুলিটা লুকোনো, তাতে একটা দশ টাকার নোট। ঠিকাদার টের পেলে জবাই করবে। রূপসী বউয়ের আর সে রূপ নেই। চুলেও পাক ধরেছে একটা দুটো। ঠিকেদারের চোখে আর সেই নেশার রঙটা খেলে না। কথায় কথায় তেড়ে আসে। শহরের মেয়ে নিকে করে আনবে বলে শাসায়।

তেঁতুলবনে ঢুকেই সোলেমান ঠিকেদারের বউ থমকে দাঁড়ায়। জাং দুটো ভারি লাগে। মাথার ওপর ডালপালায় বসে একটা ঘুঘু ডাকছে।

রাগে দুঃখে সে বলে ওঠে, মর মর! তারপর মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে ঝাপসা চোখে। বিশাল মাঠ হু হু করে জলে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে ঘাটে ফিরে আসে। ভাবে, তাহলে কি একটা স্বপ্ন দেখেছিল? ঘড়ায় জল ভরে তেঁতুলবনের দিকে তাকাতে তাকাতে সে বাড়ি ফেরে। হরবোলা ছেলেটা এল না। কিন্তু কাল থেকে তার মাথার ভেতর যে ঘুঘু পাখিটা ঢুকে গেছে সে সমানে ডাকছে আর ডাকছে।

আর তখন দূরের গাঁয়ে এক মোড়লের বাড়ির উঠোনে হরবোলা ছেলেটাকে মেয়েরা সাধাসাধি করছে ঘুঘু পাখি ডাকতে। সে পাথরের মতো চুপ। তার খোঁড়া বাপটা তার চুল খামচে ধরলে এবার সে কাঁদে আর শুধু বলে জানি না।

ইস্কাপন এবং তিরি

ইস্কাপনের একটা আসল নাম ছিল। তার বোন তিরিরও ছিল। কিন্তু তাদের তাসের দেশের লোক করে ফেলেছিল কপালীতলার ম্যাওনবাবু। আগের দিনে গাঁয়ে পালে পালে হনুমান হানা দিত। হিন্দুদের ধর্মভয়, এদিকে মুসলমানদের মধ্যেও কালক্রমে সেই ধর্মভয়ের একটা ছায়া পড়েছিল, বড়জোর অহিংস ধরনে হেই হাই চেঁচানো ছাড়া আর কিছু ঘটত না। এইতে পালের গোদার সাহস বেড়ে যায় এবং 'স্বৈরাচার।' হয়ে ওঠে। দোগাছির বাঘা মৌলবী সায়েবের ফতোয়াতেও কাজ হয়নি। বড়জোর ইশপ নামে একটা জেহাদেচ্ছু গোঁয়ার চাষা গোদাটার ঝুলন্ত লেজ কেটে দিয়েছিল। তাতে আরও অত্যাচার বেড়ে যায়। দূর গাঁয়ের লোকেরা কপালীতলার শীর্ষে তার হিংস্র হাঁকরানি শুনতে পেত। অবশেষে রায় চৌধুরীদের ম্যাওনবাবু বন্দুকের লাইসেন্স পেল।

সেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ার শুরু থেকে মুসলমান পাড়ার ইস্কাপন তার পিছনে থেকেছে। গোদাটার নাম দিয়েছিলেন নিসিং পণ্ডিত : এ্যাটিলা দি হুন। মাঠের বটগাছে যখন এ্যাটিলাকে বধ করা হল চারদিকের গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিল। বোঝাই যায়, ম্যাওনবাবুর চেলা ইস্কাপনকেই সেই মহাভারতের কুরুক্ষেত্রপর্ব শতমুখে বর্ণনা করতে হয়েছিল।

তবে মরার আগে এ্যাটিলা ইস্কাপনের একটা কানের লতি নিয়ে যায়। ফলে সে কানকাটা ইস্কাপন হয়ে ওঠে।

তার কিছুদিন পরে কালবোশেখীর ঝড়ে ভাঙা ডাল কুড়োতে গিয়ে তিরির একটা চোখে খোঁচা লাগে। পরে তার নাম হয় তিরিকানী।

ভাইবোনের যা চেহারা, তাতে বিয়ে হওয়া কঠিনই ছিল। তার ওপর, ভিটে বাদে এক কড়িরও সম্পত্তি নেই। একজন ক্ষেতমজুর, অন্যজন ধান-কুটোনী। একজন মাঠে ম্যাওনবাবুর জমিতে ধান কাটে, অন্যজন ম্যাওনবাবুর ঢেঁকিতে ধান কোটে। দুজনেরই গলায় সুর আছে। কপালীতলার মাঠে ভাই গান গায়, বোন গায় ঢেঁকি চেপে—দুলে দুলে নাচের ভঙ্গীতে, পাড়াগেঁয়ে দুপুরের ঘুমঘুম সুরে স্মৃতি জাগানো—যখন নিঃঝুম দুপুরে বাজপড়া তালগাছের মাথায় চিল ডাকে বিষাদে। নিমের পাতায় শিরশির করে ওঠে অন্যমনস্ক বাতাস। হাজার-হাজার বছরের গ্রামীণ অবচেতনায় গহন জল কাঁপতে থাকে। কত কী মনে পড়ে যায়। কত সকাল দুপুর বিকেল কত রাতের একচিলতে

স্বপ্ন ঝিলিমিলি রাঙতার মতো কালো জলের নদী কপালীর অতলে পড়ে থাকা —যা অলৌকিক রোদে প্রতিফলিত।

ওদিকে হনুমান হত্যার পাতকেই যেন ম্যাওনবাবুর পেটে শূলের রোগ হল। এক দুপুরে রূপালী নদীর ওপারে জঙ্গলে পেট চেপে ধরে সে ধড়ফড় করছিল। বন্দুক পাশে পড়ে ছিল। ইস্কাপন দৌড়ে গিয়ে দেখে, বন্দুকটা তেমনি পড়ে আছে। ম্যাওনবাবু নেই।

অনেক খুঁজে নদীর দহের ধারে তার লাশটা পাওয়া গেল। এক হাত জলের দিক বাড়ানো, অন্য হাত পেটের তলায়—উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চাপ চাপ রক্ত।

জল খেতে গিয়েছিল। পায়নি। এ্যাটিলাও মরার আগে জল পায়নি। লোকে দুয়ে দুয়ে চার করার এমন সুযোগ ছাড়ল না। বিরাট প্রায়শ্চিত্তযজ্ঞ হয়েছিল সেবার।

ইস্কাপন এসব পাপটাপ মানে না। তার মতে, দিনরাত টোটো বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়ানো, খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, খালি পেটে যেখানে সেখানে জল গিলেছে, জঙ্গলে আফল-কুফল খেয়েছে কত সময়। বাবুকে বন্দুকের নেশায় পেয়েছিল। ওই নেশাতেই খেল। ইস্কাপন একলা হয়ে পড়েছিল। তার মাথার ওপর ছাদের মতো দুর্দিনের নিরাপত্তা ছিল, সেটা গেল। বেমরশুমে ইস্কাপনের পেটের ভাত জোটে না। ওদিকে তিরিকানীর বয়স বাড়ছে। ডাগর হয়েছে। আজকাল কেউ না কেউ একলা পেলে খপ করে তার হাত চেপে ধরে। ভাইবোন টের পায়, ম্যাওনবাবু তাদের পথে বসিয়ে গেছে।

অথচ তিরিকে ধান কুটতে যেতেই হয় গেরস্থবাড়ি। কিছু চাল আনে। ইস্কাপন বিলখাল খুঁজে শাকপাতা নিয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলা উঠোনে উনুন জ্বলে। মাটির হাঁড়িতে শাক ভাত সেদ্ধ করে একচোখওয়ালী মেয়েটা। ইস্কাপন দাওয়ায় বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

সেবার প্রচণ্ড খরা। মাঠে ধুলো ওড়ে। সব জলা শুকিয়ে কাঠফাটা। বৃষ্টির জন্যে মুসলমানরা মাঠে গিয়ে নামাজ পড়ে। হিন্দুরা অষ্টপ্রহর খোলকত্তাল বাজিয়ে নাম সংকীর্তন গায়। বাবা ধর্মরাজের চত্বরে সন্ন্যাসী এসে ধুনো জ্বালে এবং যাগযজ্ঞ হয়।

রাতে উৎকট গরমে কুঁড়েঘরের দাওয়ার নিচে ছেঁড়া তালাই বিছিয়ে শুয়ে আছে ইস্কাপন। দাওয়ায় দরজার সামনে শুয়েছে তিরি। সে মেয়ে। সা

খুলে শুয়েছে। গামছা ঘামাচি। ঘুমের ঘোরে খোলামকুচি দিয়ে চুলকোয়। নিচে শুয়ে ইস্কাপন আকাশের ছায়াপথ দেখছে। হঠাৎ চাপা গলায় তাকে তিরি ডাকে—ঘুমোলি?

উঁহু। ঘুম কই?

আজ মোল্লাবাড়ি ধান কুটছিলুম। তখন মোল্লা এল বেলডাঙ্গার হাট থেকে।

হুঁ।

বাঁজা গাইগরুটা বেচে এল।

হুঁ।

আড়চোখে দেখলুম কাঠের সিন্দুকে গোছাগোছা নোট রেখে দিলে।

ইস্কাপন খুকখুক করে হাসে। কিছু বলে না। কানা বোন। একটি চোখ। তাও আড়চোখ।

তুই দাঁড়িয়ে থাকবি গোয়াল ঘরের পেছনে। আমার চেনা বাড়ি। দেখে এসে তোকে বলব। তারপরে···

তারপরে?

দেয়ালে গর্ত করবি। আমি ঢুকব।

সিঁদ? বলে ইস্কাপন আবার হাসে। চাপা হাসি।

পারবি না? ক্যানে পারবি না? তুই তো মরদ মানুষ।

ইস্কাপন চুপ করে থাকে। কখনও এসব কথা ভুলেও ভাবেনি। কিন্তু বোনটার বুদ্ধি আছে।

কী হল? পারবি না?

ইস্কাপন হাই তুলে বলে, হুঁউ। পারব মনে হচ্ছে।

তবে ওঠ।

এক্ষুনি?

হ্যাঁ, এক্ষুনি লঘু চৌকিদার হেঁকে গেল। আর বেরবে না। ওঠ!

ভাই বোনে ওঠে। ঘরের কোণা হাতড়ে বাপের কালের ভাঙা শাবল বের করে। দুজনেই কিন্তু থরথর করে কাঁপে। কাঁপতে কাঁপতেই বেরিয়ে যায়।

সেবার কপালীতলার থানায় এসেছেন নতুন দারোগা। লালমোহন খাস্তগীর নাম। লোকে বলে লাল দারোগা। চোখ ঘুরিয়ে তাকালেই দাগী চোর

কাপড়ে-চোপড়ে হয়। আর সেইবারই কপালীতলার সব গেরস্থবাড়ি কোন-না কোন রাতে সিঁদ কেটে চুরির খবর। গাঁয়ে চোরডাকাত ছিল না বললেই চলে থানার দাপটে, এবং লোকগুলোও হাঙ্গামা-হুজ্জত ভালবাসে না বংশপরম্পরা গোড়ার দিকে সন্দেহভাজন লোকেরা বেদম মার খেল। সে মারের মা-বা নেই। লালু দারোগার কারবারই আলাদা।

কানকাটা ইস্কাপনকে কে সন্দেহ করবে! অমন সরল গোবেচারা বোকা হাবা মানুষ আর দুটি নেই গাঁয়ে! আর কানী মেয়েটাও তেমনি। সুর ধ গান গেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেয়। মেয়েমহলে জনপ্রিয়তা আছে, বিয়েশাদীতে নাচে গায়। পুরুষ সেজে ফার্স দেয়। কেউ ভাবতেও পারে না। গের বাড়ির গুপ্ততথ্য সে আঁচলে চালের সঙ্গে গিঁট দিয়ে বাঁধছে।

কিন্তু ইস্কাপনের চুকচুকে শরীর, পাঁজরের হাড় মাংস, মুখের তৃপ্তি আ সারাদিনের নাক ডাকানো ঘুম, ওদিকে ঢেঁকিতে চেপে কানী মেয়েটাও দুলতে থাকে—শরীরে ফুলন্ত ভাব, হঠাৎ যৌবন জেল্লায় ফেটে পড়ছে—হাঁটতে পাছ দোলে, আত্মবিশ্বাসের জলজলে ছটা।

ক্রমশঃ এসব দিকে চোখ পড়ে লোকের।

লালু দারোগার তাক আসে। রঘু চৌকিদার তলব দিয়ে দিয়ে যা দুজনকে। দারোগা ধূর্তচোখে খুঁটিয়ে ভাইবোনকে দেখতে দেখতে হাসেন তর তো দেহি একগোয়া কানই নাই! নিল কেডা? চিলে?

ইস্কাপন করুণ হাসে। আজ্ঞে না। হলুমানে।

হলুমানে! এ্যাই মরসে! অর তো দেহি একচক্ষু নাই!

তিরি কাঁপতে কাঁপতে বলে, গাছের ডাল পড়েছিল হুজুর: ঝড়ে।

ঝড়! এ্যাই মরসে! দারোগা হাহা করে হাসেন। এই সময় ভুব জমাদার সেপাইবাহিনী, কিছু মাতব্বর লোক আর দু'জন বাহকের মাথা চাপানো দুটো বস্তা নিয়ে থানায় হাজির। ইস্কাপনের বাড়িতে বমাল মিলেছে দেড় বস্তা ধানচাল, তার মধ্যে গয়নাগাঁটি আর টাকা পয়সার পুঁটুলি। একঝাঁ থালাবাটি গেলাস—সবই কাঁসার।

তেওয়ারী! দারোগা হাঁকেন। মাইয়াডারে লইয়া যাও। ফজল আ সমাদ্দার লও কান-কাটাডারে। এ্যাহন আইনের কাজ আইন করুক। ক কন আপনারা। হাঃ···হাঃ···হাঃ।

সবাই বোঝে, ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে। তবু সবাই ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে

প্রায় দেড়বছর পরে। সদর শহরের জেলখানা থেকে একই সময় খালাস পেল ইস্কাপন আর তিরি। গঙ্গার ধারে জেলখানা। বাঁধে বটগাছ। বটতলায় চা-পান-বিড়ির দোকান আর এক সন্ন্যাসীর আড্ডা। বটতলায় দাঁড়িয়ে ভাইবোন পরস্পরকে দেখছিল।

তিরি একটু হাসে। চল যাই।

কোথায় ?

গাঁয়ে।

ঘাড় নাড়ে ইস্কাপন।—না।

মরণ! তাহলে যাবি কোথা ?

ইস্কাপন অনবরত দাড়ি চুলকোয়। জেলে গিয়ে দাড়ি রেখেছে। মাথায় লম্বা চুল হয়েছে। খুব নামাজ পড়ত আর তার ফকিরী চালচলন দেখে বিজ্ঞ জেলার খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন লোকটা ছিল চোর। সাধু হয় তো হোক। সে তো ভালই।

হঠাৎ তিরি বলে, তুই তো ফকিরের মতো চেহারা করেছিস! আয় ভিক্ষেয় যাই। আমার একটা চোখ কানা। তোর দুটো চোখ কানা হোক।

ইস্কাপন গম্ভীর হয়ে বলে, হোক।

হুঁ। চোখ বুজে থাকবি। আমি তোর লাঠি ধরে বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াব। আর···

ইস্কাপন বুঝেছে। বলে, হুঁ।

তারপর থেকে এ গাঁ ও গাঁ ঘোরে এক অন্ধ ফকির। তার লাঠি ধরে নিয়ে বেড়ায় একটি যুবতী মেয়ে—তারও একটা চোখ নেই। তারপর সিঁদ কেটে চুরি হবেই সে গাঁয়ে। তবে আর ধান চাল নয়। বাসন কোসন গয়নাগাঁটি—নয়তো টাকা।

ভাইবোন আরও চালাক হয়েছে। সদর শহরে মহাজন ধরেছে। কত্ত ধুরন্ধরের সঙ্গে ভাবও হয়েছে। ওদিকে পাড়াগাঁর পথে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে ঘুরে বেড়ায় এক সংসারত্যাগী ফকির আর ফকিরনী—গলায় পাথরের মালা আর মনমাতানো সুর। নির্জন দুপুরে সেই সুর আগের মতোই ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা আনে।

পয়সাকড়ি জমেছে। তবু অভ্যাস! নেশা ধরে গেছে রক্তে। রাত না চ'রে শান্তি পায় না।

শহরের বস্তি এলাকায় ঘর ভাড়া করে ভাইবোন থাকে। ছেঁড়া কাঁথার তলায় বমাল। সুযোগমতো গদীতে বেচে আসে। সকাল হলে আবার গঙ্গা পেরিয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক—দূরের পাড়াগাঁয়ে।

তেমনি এক গাঁয়ের নাম কুসুমপুর। মকিম মোল্লা সেখানকার বড় চাষী। চারটে মরাই, দু জোড়া হালের বলদ আর জোতজমার মালিক। এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যাবেলা তার দরজায় অন্ধ ফকির আর এক তরুণী ফকিরনী জোড়াগলায় হাঁক ছেড়েছে—ইয়া হক, মওলা!

বৈঠকখানায় সবে হারিকেন জেলে নামাজ সেরে মোল্লা শণের দড়ি কাটছে ঢেরা ঘুরিয়ে। অভ্যাস। বয়স হয়েছে। তবু গতর চনমন করে। কিছু না কিছু করা চাই। হাঁক শুনে তাকায়। অন্ধ ফকির বলে, সেলামালেকুম! একচক্ষু ফকিরনী হাত তোলে কপালে। আদাব দেয়।

মোল্লা বলে, আলেকুম সেলাম ফকির সাহেব।

রাতটুকুন শোবার ঠাঁই চাই, বাপজান!

মোল্লা ফকিরনীকে দেখে বলে, ই! এটি কে বটে ফকির সাহেব?

ওটা আমার বহিন, বাপজান। আমি দু'চোখে দেখি না, ও এক চোখে। কপাল দেখুন!·····ফকির খিলখিল করে হাসে। কী আর করি? ভাইবোনে ভিক্ষেসিক্ষে করে বেড়াই।

মোল্লা বলে, হুঁ। আসমান জোর বর্ষাচ্ছে। এ সময়ে মেহমান এলে ফেরাতে নেই। ঠাঁই পাবে ফকির সাহেব। ফকিরনী চোখে ঝিলিক তুলে বলে, খানাও চাই মোল্লা সাহেব।

পাবে, পাবে। হাত তুলে আশ্বস্ত করে প্রৌঢ় মোল্লা।

সে রাতে ফকিরনী শোবার ঠাঁই পেয়েছে বাড়ির ভেতরে। স্ত্রীলোক সে। স্ত্রীলোকের ইজ্জত আছে। মনে মনে হেসে ফকির বৈঠকখানায় শুয়ে পড়ে। তক্তপোশে কাঁথা ও বালিশ পেয়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। অথচ ঘুমোবার জো নেই। কখন ফকিরনী এসে জাগাবে সেই প্রতীক্ষা। ঝুলির মধ্যে সিঁদ কাটিতে হাত ভরেই চুপ করে পড়ে আছে সে। চোয়াল শক্ত। অন্ধকারে চোখ জলছে।

মধ্যরাতে বিষ্টি থামল। তারপর গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ফোঁটা ঝরে। রাতের পাখি ডানা ঝাপটায়। ঝিঁঝি ডাকে। ফকিরনী আসে অবশেষে। পায়ে হাত রেখে ফিসফিস করে, আয়।

পূর্ব-দক্ষিণ কোণার বড় ঘরেই মাল আছে। সব দেখা হয়ে গেছে। দেওয়ালের পিছনটা বৃষ্টির ছাঁট পেয়ে নরম হয়ে আছে। সহজেই মাটি খসে যায়। নিপুণ হাতের সিঁদকাঠি চুপিচুপি মাটি খসায়।

তিরিই ঢুকবে ভেতরে। ইস্কাপন মুখ ঘোরাবে। তিরি শাড়ি খুলবে, জামা খুলবে, ন্যাংটা হয়ে ঢুকবে। তেলও মেখে নেবে ঝটপট। একাজে তার তুলনা নেই।

এবং এভাবেই তিরি ঢুকল। ইস্কাপন হুমড়ি খেয়ে গর্তের সামনে বসে আছে।

বসে আছে তো আছেই। কোথায় যেন চাপা শব্দ হল কয়েকবার। তার পর সব চুপ। পা ব্যথা করে। ইস্কাপনের তিরি আসে না।...

আর এল না তিরি।

ভোর হয়ে আসছে। কাক-কোকিল ডাকছে। তিরি এল না। তখন ইস্কাপন উঠল। রাগে ভয়ে দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে মাঠের দিকে চলল। নদীতে সবে ঢল নেমেছে। গাঢ় হলদে জলের স্রোত বইছে। সেই ধূসর ভোরবেলায় অনেক কিছু ভাবতে-ভাবতে ইস্কাপন করল কী তিরির কাপড়টা, ব্লাউসটা (ভিক্ষেয় বেরিয়ে সায়া পরে না সে) আর সিঁদ-কাঠিটা নদীতে ডুবিয়ে দিল। তারপর ঘাটের দিকে চলল। খেয়ানৌকায় পার হবে। কোথায় যাবে আর?

শহরেই ফিরবে আপাতত।

এর কিছুদিন পরে ইস্কাপন গদীতে কিছু পুরনো বমাল বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে। টিকটিকিরা ওঁৎ পেতে ছিল। ইস্কাপন ফকির এখন জেলে। ছবছরের মেয়াদ।

তিরির চিঠি যায় মাসে মাসে। ভালই আছে। কুসুমপুরও জায়গা ভাল। মকিম মোল্লাও ভাল লোক।

মেয়াদ খেটে ফিরলে আল্লার ইচ্ছায় তুমিও ভাল হয়ে যাবে। বিয়ে শাদি করবে। চিরদিন একরকম থাকা পোষায় না। তিরির চিঠি যায়। আল্লার দয়ায় আমার কোলে সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে। মেয়াদ খেটে এসো। দেখে মন ভরবে। কপালে এত সুখ ছিল ভাবিনি।

ইস্কাপন ক্ষেপে যায়। ইচ্ছে করে—

যাক গে! বোনের তো একটা গতি হয়েছে।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে রাতে ব্যাপারটা ঘটেছিল কী? কী হয়েছিল? হারামজাদী মেয়েটা তা প্রাণ গেলেও যেন বলবে না। আসলে মোল্লা লোকটা অতিশয় ধূর্ত।

ইস্কাপন কপিক্ষেতে বসে চুপিচুপি কাঁদে। পরনে জেলের পোশাক। চুলে সত্যিকার জটা। দাড়ি বুক ভাসিয়েছে। সে স্তব্ধভাবে কাঁদে। হয়তো দুঃখে, হয়তো সুখে।...

শয়তানের চাকা

গাঙ পেরোলেই শহর। এখানে দূরের পথ এসে হামাগুড়ি দিতে দিতে গাঙের বালিতে নেমে গেছে। হাত বাড়িয়ে জল ছুঁয়েছে। আশেপাশে কাশ-ঝোপ, করমচা, আকন্দগাছ সন্ন্যাসীর মত কৌপীন-পরা—প্রতি বর্ষার তোড়ে ওদের সংসারের ধস ছেড়েছে ক্রমান্বয়ে। এখন লম্বা চিরোলচিরোল হলুদ বা ধূসর পা বাড়িয়ে দিয়েছে নিচে। খাদের দিকে। ঢালু পথটারও ওই দশা। ইটের টুকরো পাথরকুচি বেরিয়ে পড়েছে উদোম হয়ে। পিচের আবরণ ধুয়ে ভেসে গেছে কবে। তার সামনেই শীতের ঠাণ্ডা আর শান্ত জল। কিনারে পারাপারের খেয়া। তাই বাবুরালি ওরফে বাবরালির বড় কষ্ট হয় রিকশো টেনেটুনে আনতে। ছেড়ে দিলে তো অকাল গঙ্গা বিলক্ষণ; কিন্তু সওয়ারী রুগ্ন। হয়ত তাকেই পাঁজাকোলা করে তুলে নৌকোর পাটাতনে রাখতে হবে। বাড়তি পয়সা দিক বা না দিক, মানুষোচিত অল্প খাটুনি—বাবুরালি আনন্দই পায়। হৃদয়ের কোনখানে ঠাণ্ডালাগা চিরকালের ঘা, সেখানটিতে বেশ তাত পায়।

অন্য অন্য সওয়ারীর বেলা অন্য রকম। ওই উঁচুতে ঘাটবাবুর আটচালার পাশেই রিকশোর 'খেল খতম।' বাবুরালিরই বুলি এটা: খেল খতম দাদা, আসুন। তার মানে, বেশ এতক্ষণ ক'মাইল পথ তো খেল দেখলেন—আসমানের খেল, জমিনের খেল। পথেও রকমারি রঙ-বেরঙের খেল কমতি নেই। তার উপর হাড্ডিসার গতরে আর শামুকখোল পাখির মত দুটি ফাটাফুটি ছাইরঙা পায়ের ওঠাপড়া কসরত কম দেখা হল না দাদাদের। এবার আসুন।...

তারপর নিষ্ঠাবান জাদুকরের মত রিকশোর ছাউনি ঝপ্ করে নামিয়ে নিজেই সওয়ারী কিছুক্ষণ।—এ কিরূপাদাদা, মেহেরবানী করে জেরাসে চায় পিলায়ে দে! কৃপাময় বাবুরালিকে ভালবাসে। রানীরঘাট লাইনে এই প্যাডলারটি তার সমসাময়িক। রানীরঘাট যখন জন্মেছিল, তখন থেকেই যে যার নিজের লাইনে রয়েছে। আজ তো রানীরঘাট হাটের মাঝে শোভা মেলেছে। ঝলকে উঠছে দাতরঙা বসনভূষণের ছটা বেলায় বেলায়। কাছে-আসা দূরের পথে পিচ পড়েছে। অজস্র বাস-লরী রিকশোয় আড্ডা গুলজার। রানীরঘাটের সুখ কানায় কানায় উপচে পড়ছে।

সেই সুখেই সুখী বাবুরালি প্যাডলার শহরের সওয়ারী এপারের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে, ফের স্টেশনের নতুন সওয়ারী নিয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক পাড়ি দিতে পারে। ওদিকে ন্যাশনাল হাইওয়ের পথে সাগরদীঘি, এদিকে জেলা বোর্ডের পুরনো লজঝড় পথে কান্দী—আরও বিশ-ত্রিশ মাইল যেতে বললেও অক্লেশে উড়ে যাবে। যেতে যত কষ্টই হোক, ফেরার পথে চেঁচিয়ে বলবে—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট! রানীরঘাটে মনটি বাঁধা পড়ে আছে। তাই যেন গানের সুরে ডাক: রানীর ঘা-আ-আট্! ধুয়োতে ফেরা ঘূর্ণিপাক তীব্রতর।

তেমনি এক ফেরার পথেই পেয়ে গিয়েছিল এই সওয়ারীকে। পাশে বটগাছ। তার ছায়ার বাইরে শীতের রোদপোহানো দুটি মেয়েমানুষ। একজন চুলে শণের পাক-ধরা, তোবড়ানো গাল, দড়ি-দড়ি মাস,—অন্যজন মুখের রঙ ফিকে হলুদ, বসা কালো কালো চোখ, লতানো রুক্ষ চুল, খড়ি-খড়ি মিহি হাতে গোছি লাল প্লাস্টিকের বালা। বিজ্ঞ বাবুরালির বুঝতে দেরি হয় নি, অকালে ব্যাধির ক্ষয় কী সর্বনাশ লিখে দেয় টাটকা গতরে। এই মেয়ে হতে পারত মের শীষের মত ডাঁটালো, অল্পেতে অস্থির, মুখে কথার খৈ ফোটে; তা নয় তা, দেখ, সব শুকিয়ে কাঠফাটা ঘোর খরায়। সব চুপচাপ। যেন চিতার ন্দন কাঠখানি পড়ে আছে পথের পাশে।

থেমেছিল বাবুরালি।—এঃ হে হে, বিমারিতে ঘায়েল করেছে, বাসের ভিড়ে বেজায় পেরেসানী হবে মা! আসুন, লিয়ে যাই।

মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির ফোঁটা যেন। মড়বড় করে উঠেছে শণচুলো ড়িমানুষ। হঠাৎ পেয়ে যাবার আনন্দ তো বটেই; শহর থেকে দশ-বারো াইল দূরে এমন উড়ন্ত সিংহাসন আচমকা মিলে যাওয়া।—অ মা সুরধুনী,

কষ্ট করে গতরখান তোল এট্টু। চাপলেই সোয়াস্তি পাবি—কতক্ষণ থেকে ঠায় অপিক্ষেয় বসে আছি। মুখপোড়া বাসগুলোর গিদেরে পা পড়ে না মাটিতে। ...এই বলে বাবুরালির দিকে চেয়ে একটুখানি হাসি। —বাবা আমার ভগবানের দূত। ইচ্ছেমাত্তর এসে পড়েছে!

বাবুরালিও হাসছিল। —আপনাদের মরজি, আর ওপরওলার দোওয়া মাজান! এ লাইনে জিন্দেগী ফুরিয়ে দিলাম চাক্কা ঠেলে।

—অই, সুরি! অ সুরধুনী, শীগগিরি কর বাছা, বেলা বাড়ছে ইদিকে। বুড়ি হাত ধরে মেয়েকে ওঠানোর চেষ্টায়। মেয়ের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। কোনদিকে চোখ বোঝা যায় না। ঈশানকোণে চিনিকলের চোঙ দেখে, না দূরের ঐ শঙ্খচিল—নাকি ফাঁকা মাঠে কয়েকটা অর্জুন গাছের সারি, উপচে-পড়া হলুদ ফসলের উপর তাদের ছায়ার মোটা কালো দাগগুলো।

শেষে অটস্ফুকণ্ঠে কী বলেছে। যাবে, না যাবে না, এইরকম অস্পষ্ট কী একটা। বুড়ির টানাহেঁচড়া সমানে চলছিল।—অই, ও কি কথা মেয়ের! সেই সাত সকালে জাড়ে কাঁপতে কাঁপতে গেরাম থেকে বেরিয়েছি। পাকা সড়কে আসতে জলখাবার বেলা কাবার। যাবিই বা কখন? উদিকে হাসপাতালের দুয়োরে আবার তালাকুলুপ না মেরে দেয়। ওঠ্ মা, ওঠ্!

সুরধুনীর রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে অনিচ্ছার ছায়া দুলছে। চোখের তারাদুটো নীলাভ—ধূসর পর্দার ভিতর থেকে আবছায়ার মত পৃথিবীকে যেন দেখছে। সংশয়ের কাঁপন ভেঙে ভেঙে জলের ফোঁটা গুটিকয়। এক কোণে তারা লুকিয়ে আছে—সহজে দেখতে পাওয়া কঠিন। তবু, বাবুরালির দেখছিল। দেখেই বলল,—কোন তকলিফ হবে না মা। ওখানে বড় বড় ডাক্তারবাবুরা আছেন। বেমারী তেনাদের গায়ের হাওয়া লাগলেই পালাবে। তখন শহরে বায়স্কোপের বাজী দেখে হাসতে হাসতে গাঙ পেরোও, ইচ্ছে হলে এই গোনাগার বান্দা বাবুরালির চাক্কায় চাপো, নয়তো ব্রেজোবাবুর ভ্যানগাড়িতে খুশিতে ঘরে ফেরো।

বুড়িও হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে। —চাই কি, তখন বিনোটিতে শ্যামচাঁদের মেলা দেখিয়েই নিয়ে আসব। কাল পুন্নিমা গেল, আরেক পুন্নিমা অব্দি ধুমধাম লেগে থাকবে। বাঘ-সিঙ্গি হাতী-ঘোড়ার সার্কেস, মেমসায়েব নাচবে, কত কাণ্ড সেখানে রে সুরি!

সুরির যেন কান নেই। কোনরকমে এতদূর নিয়ে আসা হয়েছে, আর

এগোচ্ছে না, ও যতই লোভ দেখাও। সে তো কচি খুকীটি নয়, মোয়া দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করবে!

বাবুরালি সেটা বুঝতে পারছিল। মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন—অবহেলায় ঘষাঘষা হালকা ছোপ। হাসপাতাল নিয়ে যাবে বলে বুঝি সাতসকালে চুলে চবচবে তেল মাখানো হয়েছে। খোঁপা বাঁধা হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, নিজের হাতে চুলবাঁধার ব্যাপার নয়। বুড়ির কীর্তি। বোধ করি, সিঁদুরের দাগও পুরু ছিল—কখন যেন ইচ্ছে করে ঘষে ঘষে তুলেছে। কাপড়ের পাড়ে সেই দগদগে চিহ্ন। কিসের ক্ষোভ? সোয়ামীর উপর মান? তাই বটে। কিন্তু ও মেয়ে, তোমার সোয়ামী কোথা গো?···বলতে না পেরে বাবুরালি আমতা হাসছিল। সওয়ারীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে নেই। এ লাইনের সব চাক্কাওলাই জানে, সওয়ারীর সঙ্গে বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি অর্থাৎ সুখ-দুঃখ বিনিময় মাত্রা ছাড়ালে ঠিকে ভাড়ারও কম পয়সা নিতে হবে শেষ অব্দি। এতখানি পথ যার সঙ্গে হৃদয়সংযোগ ঘটেছে, সে পয়সা কমিয়ে হাতে দিলে প্রতিবাদের জোরটাও ফুরিয়ে যায়।

তবু একটা অদম্য ইচ্ছা বাবুরালিকে কাবু করল। বলেই ফেলল—'তা ওগো মাজান, তুমি বুড়োমানুষ, সঙ্গে রুগী আনলে। বরঞ্চ একজনা জোয়ান মানুষ থাকলেই ভালো হত। জামাই এল না কেন মাজান?···বলেই গা বাঁচাতে ফের মন্তব্য করল—তা তিনিই বা আসেন কী করে? গেরামের মানুষ, এখন আবার মাঠঘাটে ফসল উঠছে। বাবুরালি জোরে হাসতে লাগল। —বুঝি বৈকি মাজান, আমিও তো তোমার গে একসময় গেরামে ছিলাম। ক্ষেত ভি ছিল, লেড়কাবালা জরু···

যেন কট্ করে কামড়ের শব্দ ভিতরে থামল বাবুরালি। —বহত দের হয়ে যাচ্ছে, জলদি করো মা।

বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল এতক্ষণে। —ন্যাকামি করবার জায়গা পেলি নে সুরি! দোব পটাপট চড় কষে! এখনও হুজ্জতী তোর?···তারপর আচমকা কান্না হাউমাউ করে। —কী পাপে তোকে গর্‌ভে ধরেছিলাম—আমার সারাটা কাল যন্ত্রণার কূলকিনার নাই। হাড়মাস জ্বালিয়ে কালি করে দিলি হারামজাদী! অই—অই জেদই তোর সব্বনাশ কল্লে, সোনার গতরে বেয়াধি ধরল, ফের সেই জেদ এখনও···নে, ওঠ! হাসপাতালে তোকে সঁপে দিয়ে তবে আমার ছুটি···

সুরিও তেমনি কেঁদে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। আমি যাবো না, যাবো না আমি! গলা টিপে মেরেফেলো, বিষ এনে দাও, খাই। আমি ওখানে থাকতে পারবো না।

বাবুরালিকে সাক্ষী মানল বুড়ি। আঁচলের খুঁট থেকে একটা কাগজ বের করে বলল—এই দেখ বাবা, চিনাথ ডাক্তার সব নেকে দিয়েছে। বলেছে- হাসপাতালে ওটা দেখালেই চোখ বুজে ভর্তি করে নেবে। কোন কষ্ট হবে না। বলো দিকি বাবা, হাসপাতালে কি মানুষ মরতে যায়, না বাঁচতে যায়? বলো, তুমিই বলো?

কী জবাব দেবে বাবুরালি? শহরের হাসপাতালে কেউ যায় মরতে, কেউ যায় বাঁচতে। অনেক দেখা হয়ে গেছে তার। এমনি রুগী অনেক গেছে সওয়ারী হয়ে। তারা কতজন ফিরেছে, কতজন ফেরে নি—সে খবর তো সে জানে না। বাঁচার আশা সকলেরই থাকে। বাঁচার কথাই ভাবতে হয়। বাবুরালির বলেছে—বেঁচেবর্ত্তে ফিরে এসো মানিক, আমার চাক্কা হামেশা তৈয়ার রইল। সেই চাক্কা শহরফেরা নীরোগ স্বাস্থ্যকে ঘরে পৌঁছে দিতে গানের সুরে বাজে। চাক্কার ঘুরনপাকে কত মরণ-বাঁচনের সমাচার, পুছ করে দেখ। চাক্কা সব বাত বলবে ঠিকঠিক। সওয়ারী চাপলেই চাক্কার বাত শুনে সব হালহকিকত টের পায় বাবুরালি। রুগী যখন বলে—ফিরে এলে দেখা হবে, বাবুরালি চাক্কাকে পুছ করে। তারপর চুপিচুপি হাসে।

এদিক সুরির নাকিকান্না ক্রমশ বেড়েছে। কথাও বলছে পুটপুট করে—খৈ ফোটার মত। বাবুরালি কান খাড়া করে সমঝে নিচ্ছে। উত্তরের হাওয়া আসছে দূরের শহর থেকে গাঁও পেরিয়ে। ঐ হাওয়ায় শহরের গন্ধ যেন ভাসতে ভাসতে চলেছে দূরের পথে দূরতর দিকে। রানীরঘাটে এতক্ষণে কত সওয়ারীর ঘরে ফেরার সময় হল। গ্রামের চাষাভূষো জোয়ানেরা গত সন্ধ্যায় আড়তে চাল বেচে বায়স্কোপ দেখেছে। তারপর শীতের রাতটা আড়তেই কাটিয়ে দিয়েছে। তাদের ফেরার পালা শুরু। সকালে শহরের বাজারে অল্পস্বল্প কেনাকাটা চুকেবুকে গেছে কখন। ঘাটবাবু পারানির কড়ি গুণছে এতক্ষণ। বস্তায় তাজা ফুলকপি, দু-চারখানা শীতের কাপড়, মনোহারী জিনিসপত্তর। অবিকল দেখতে পাচ্ছে বাবুরালি। স্বাস্থ্য নিয়ে যাওয়া, স্বাস্থ্য নিয়ে ফেরা। যেতে আসতে সমান আনন্দ। আর, এখানে এই সমিস্তে।

তো কী আর করা! অবুঝ যুবোজোয়ান মেয়েমানুষ, মুখ খড়িখড়ি, ঠোঁট আমচুর। পাকাটি শরীর যেন পটপট করে ভাঙছে গভীর দুঃখে। দেখে কষ্ট

লাগে। তবু বুরি বাত ভাবে না বাবুরালি। চাকার দিকে তাকায়। বাঁচিয়ে দেবার অস্থিরতায় মনের ভিতরটা আঁকুপাঁকু করছে। ফেলে গেলে মনে হয়, বড় গোমাঁহর কাজ করা হবে।

আলবাৎ হবে। মনের ভিতর মৌলবী যেন হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। বেচারী লড়কীটাকে সোয়ামী পোছে না; বিমারির হাল দেখে ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দিয়েছে ঘর থেকে। —তো দেখ মাজান, আদমী বড় নিমকহারাম দুনিয়ায়। যবতক তোমার দৌলত আছে, জওয়ানী আছে, তবতক তুমি একদম আরসির মাফিক রৌশনদার। দুবেলা চেকনাই মুখ দেখবে ঘুরিয়েফিরিয়ে। আরসি কানা, তো হারামজাদা ভি কানা!···হেঁট হয়ে শুকনো ঘাস তুলে দাঁত খুঁটছে বাবুরালি। চাকার দিকে চোখ। সামনে শীতের হাওয়া ঝাঁপিয়ে আসছে। বুকটা কেমন শুকনো লাগছে। কোথাও হার হয়ে যাবে, এমনি মনে হয় বার বার। আর, মাথার ভিতর—খুবই ভিতর দিকে কী কথা ঘুরপাক খায় ঐ উড়ন্ত শঙ্খচিলের মত। সেই কথা কান্নার সুরে বাজে।

এতক্ষণ ভিড়ের বোধটা ছিল। নাইকুণ্ডলে যেন কুত্তার কাঁইকুঁই ডাক ছিল। কখন থেমেছে। পথের পাশে সমিস্তে— সমিস্তে তাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলল কেমন করে।

বুড়ি ইতিমধ্যে অনেক এগিয়েছে। প্রায় টেনে ধরাশায়ী করে রিকশোর পাদানির পাশে এনে ফেলেছে মেয়েকে। সুরি চুল ছিঁড়ে একাকার।—আমাকে যেন ফিরতে না হয় আর! হে মা গঙ্গা, আমাকে তোমার কোলে টেনে নিও মা·····

তাজ্জব। বাবুরালি ভেবে পেল না, এত ভয় কেন, কেনই বা এত কান্নাকাটি! বেমারি হলে মানুষের হুঁশ-আক্কেল থাকে না সত্যি; কিন্তু এমন তো দেখা যায় না বাবা! আদিখ্যেতার চূড়ান্ত একেবারে। সে সীটে বসে সামনে ঝুঁকে প্যাডেল ঠেলল। ঠেলতে ঠেলতে বলল—ধুস্ শালার চাকা!

খানিক এগিয়ে বাবুরালি বুঝতে পারল, চাকা বেজায় নারাজ। বেমারি ঐ সওয়ারীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে গোঁ ধরেছে। আরে বাসরে, তুই তো বেটা হাসপাতাল-যাওয়া রুগী নোস, তুই কিনা তেজী টাট্টু। লে, কদমবাজী করে রানীরঘাটে হাজিরা দে দিকি; তারপর খানিক আরাম।···এইরকম বলতে বলতে সে দম আনছিল বুকে। ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ঝুঁকে-ঝুঁকে প্যাডেল ঠেলছিল। সামনে বুকের উপর যেন দেয়াল তোলা হয়েছে ইতিমধ্যে। গুমগুম

শব্দ ওঠে কোথায়। নাকি বুকের ভিতর? কানে ঝাপটানি দেয় ঠাণ্ডা হাওয়ার থাবা। ঠোঁট শুকিয়ে আরও কাঠ। জিভ দিয়ে চাটতে গেলে থুতুও মেলে না। গলা আঠা-আঠা। হঠাৎ কোনখানে তলে তলে ফুটো করা হয়েছে, আর চুপিচুপি ধসে-পড়ার সুড়সুড়ি—তাই হঠাৎ-হঠাৎ চমকে ওঠা ভয়েডরে। এমন কেন হচ্ছে রে দাদা? এই বাবুরালি প্যাডলার অনেক শীত দেখেছে। অনেক হাওয়ার সঙ্গে লড়েছে। যখন নীল আসমান বরফের চাঁই হয়ে থেকেছে, মাঠের নগ্নতায় অজস্র নেকড়ের মত ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া তোলপাড় করে ফিরেছে, সূর্যকে মনে হয়েছে পটের ছবির মত মিথ্যে, রোদ হয়েছে ফলের খোসার মত রঙসর্বস্ব নীরস ঢাকামাত্র—তখনও বাবুরালির চাক্কা চলেছে অকুতো-ভয়ে। জমাট রক্ত গলে গেছে সাহসের উষ্ণতায়। চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্!··· আজ যেন তামাম জিন্দেগী ঠাণ্ডা হয়ে এল। সামনের পথ সামনেই থেকে যাচ্ছে। রানীরঘাট দূর থেকে দূরতম হয়ে রইল। বাবুরালি দম টেনে বলতে চেষ্টা করল—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্! অথচ চাক্কা পায়ের সঙ্গে বেইমানি করে। পাশের শিরীষ-কৃষ্ণচূড়ার ধূলিমলিন পাতা কাঁপিয়ে উজান হাওয়া তার উপর লাফ দেয়। বাবুরালি কাতরস্বরে ডাকে—মাজান, পেরেসানী হচ্ছে না তো?

বুড়ি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। চাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছে, পারে নি। হাওয়ার হিম থেকে বাঁচতে আড়াল দরকার। বুড়ি বলল—ঢাকনাটা তুলে দাও বাবা।

বাবুরালি পিছন ফিরল একবার—পেরেসানী আরও বাড়বে মা, চাক্কা গড়াবে না। গায়ে রোদ লাগাও বরঞ্চ, আরাম পাবে।

বুড়ি গজগজ করল।—আরামের মুখে ঝাঁটা। এমন কষ্ট জানলে রিকশোয় চাপতাম না!

তিন মাইল এগোলে দ্বারকানদীর ব্রীজ। দুস্তর চড়াই খানিক। তবে ব্রীজে উঠলে কিছুক্ষণ আরাম। ওপারে ঢালুতে পোয়াটাক রাস্তা বেশ যাওয়া যাবে। ব্রীজটা দূরে মস্তো সাদা শকুনের মত দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁকে। সেই-সময় হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল বাবুরালি। বলল—মাজান!

—কী হল?

—চাক্কা চেপে ধরেছে শয়তান, বুঝলে মাজান? বাবুরালি হাসবার চেষ্টা করছিল। —মাঝে মাঝে শয়তান এসে ঐ রকম বদমাইসী করে।

বুড়ি ককিয়ে উঠেছে একেবারে। —সে কি বাবা!

—জী হাঁ। তবে ডর পাবেন না। একটু জিরিয়ে লিই। বিড়ি খেয়ে লিই।

আসলে চেন খসেছে। নেমে এসে পিছনে ঢুকে চেন লাগিয়ে নিল বাবুরালি। তারপর বিড়ি ধরাল। নিঃশব্দে টানতে লাগল। হাওয়াও কেমন বদমাইসী করে দেখ। এখন যেন তাড়া খাবার ভয়ে সরে গেছে। অথচ চাপলেই তখন হুড়মুড় করে ছুটে আসবে।

বুড়ি বলল—একটু তাড়াতাড়ি করো বাবা! অনেক দেরি হয়ে গেল।

গোঁফ মুছে হাসল বাবুরালি। —সবুর, সবুর। হাসপাতাল তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ঠিকই পৌঁছে দেব, ভেবো না মাজান। কাঁচাপাকা চুল ঠিকঠাক করে নিল সে। গামছা খুলে ফের জড়াল কানমাথা ঢেকে। ফের গোঁফ মুছে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সীটে। হাঁকল—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্!

সুরির কোন সাড়া নেই। বুড়ির কোলে উবুড় হয়ে আছে। বুড়ির চোখে মুখে অস্বস্তি। রিকশোয় চেপে বড্ড ভুল করেছে। এত দেরি হচ্ছে, তাতে ঠাণ্ডা বাতাস, মেয়ের অসুখ আবার বাড়বে নির্ঘাত।

ফের চেন পড়েছে দ্বিতীয়বার। বাবুরালি গজগজ করছে—শয়তানটা আজ জ্বালাবে দেখছি।

ব্রীজে আসবার আগেই আরও বারকয় এমনি শয়তানি। বার বার থামা আর গালাগালি—শালা শয়তান, তোর একদিন কি, আমার একদিন···

হাঁফাচ্ছিল বাবুরালি। নামিয়ে দেবে সওয়ারী? এত পেরেসানী আজ —এত ঠাণ্ডা হাওয়া। অথচ চারপাশে রোদের দুনিয়া আসমানে রোশনাই, সামনের স্বপ্নের মত রানীরঘাট বাবুরালির জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু জেদ্ বেড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এই রুগ্ন যুব-জোয়ান মেয়েটিকে হাসপাতালে না পৌঁছে দিয়ে ছুটি মিলবে না। পথের মাঝে ফেলে দিলে বড্ড হার হয়ে যাবে, মনে হয়। মনে হয়, মাথার ভিতর কে চুপি চুপি বলে—বাবুরালি, খবরদার! বেইমানি করিস না। সারা জিন্দেগী সওয়ারীর সঙ্গে বেইমানি করিস নি, আজ কেন করবি?

দশ বছর আগে রানীরঘাটের একটি ছোট্ট ঘরে এক রুগ্না আউরত প্রতিদিনই তাকে বলত—আমাকে হাসপাতালে দিয়ে এসো, খোদার কসম লাগে···। সে বলত—একবারও সময় হল না তোমার, হা খোদা! ···সময় হয়নি বাবুরালির।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সওয়ারীর পথ চেয়ে ছুটোছুটি করছে, ঘরের সওয়ারীকে গাড পেরিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ফুরসৎ পায় নি। ঘরের সওয়ারী নিয়ে যায়; অত সময় কোথা? এদিকে রোজগার বন্ধ হলে দুনিয়া অন্ধকার। বাবুরালি ঘাটে দাঁড়িয়ে হেঁকেছে—আসুন, আসুন, লিয়ে যাই! সওয়ারী না পেলে তাদের অপেক্ষায় সময় খরচ করেছে দরাজ হাতে। অথচ ঘরে বেমারি আউরত কাঁদে। ফিরে এসে বলেছে—আর একবেলা সবুর। ওবেলা ঠিকই লিয়ে যাবো। ...যাওয়া হয় নি। বড় ভয়, পাছে মোটা মজুরীর সওয়ারী হাতছাড়া হয়ে যায়।

আসলে কী একটা অভাব ছিল কোথাও। মস্ত ফাঁক ছিল যেন। মুহব্বত মমতার অভাব? ঘরে কি ফুটো ছিল সুখের পাত্রে?...কী ছিল কে জানে শুধু মনে হয় আলসেমি করে জীবনের ধন হেলায় মানুষ খুইয়ে ফেলে শয়তানের চাকায় নিশির টান তাকে ঘর থেকে পথের দিকে টেনেছিল। ঘরের কথা কোনদিনই ভাবে নি। পথের উপর প্যাডেল ঘুরিয়ে দ্রুত ধেয়ে চলাই তার কাছে পরম সুখ মনে হয়েছিল।

সেদিন যেন ঠিক এমনি করে শয়তান চাকা টেনে ধরেছিল।

কতকটা গোঙিয়ে উঠল বাবুরালি—খবর্দার! যেন নিজেকে হুঁশিয়ারি দিল। ব্রীজ সামনে। চড়াই এসে গেল। বাবুরালি নামল সীট থেকে। হাঁফাতে হাঁফাতে হ্যাণ্ডেল ধরে টানতে লাগল ভারী রিকশোটা। কষ্ট দেখে বুড়ি বলল—আমরা খানিকটা নেমে গেলে ভালো হত বাবা। কিন্তু সঙ্গে এই বোঝা...

বাবুরালি একবার পিছু ফিরল মাত্র। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। সব রক্ত জমেছে মুখে। ঝুঁকে-ঝুঁকে টানছে। যেন যুগ যুগ ধরে বাবুরালি এমনি করে তার সওয়ারীকে নিয়ে দুস্তর চড়াইপথে চলেছে। সব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। সব মুখ ধূসর হয়ে যায়। পারা-ওঠা আয়নার মত প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট। অস্পষ্ট দু-পাশের বাবলা বন, পীচের পথ, ব্রীজের সাদা রেলিঙ। স্বপ্নের মত আবছায়া ভাসে চতুর্দিকে। বাবুরালি মুখ নামিয়ে ঠোঁটটা ঘষে নিতে চেষ্টা করছিল হ্যাণ্ডেলে। শয়তান এবার তার পা-দুটোকেও টানছে। চাকায় জড়িয়ে থেকে হাত বাড়িয়েছে পায়ের পেশীতে।

ব্রীজের উপর কিছু সমতল চত্বর। রিকশোটা একপারে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাবুরালি দাঁড়িয়ে পড়েছে। হ্যাণ্ডেলের উপর মাথাটা রেখেছে।

বুড়ি ডাকল—থামলে কেন বাবা? বাবুরালি নড়ে না।

—ও বাবা!

বাবুরালি চুপ করে আছে। যেন এখনই মাথা তুলে ব্যস্ত সওয়ারীকে ধমক দেবে—সবুর, সবুর!

বুড়ি একটু উঠে হাত দিয়ে পিঠটা ঠেলে দিল তার—ওগো ছেলে, শুনছ?

সাড়া নেই দেখে ধড়মড় করে উঠল এবার। সুরধুনীও উঠে ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে। বুড়ি বাবুরালির কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল। —ওগো রিকশোওলা, কী হল তোমার?

সেইসময় ব্রজ ড্রাইভারের ভ্যান এসে গেছে পিছনে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে। চেঁচামেচি শুনে না দাঁড়িয়ে পার নেই।—ও বাবা ডেরাইভার, আমাদের এট্টু তুলে নাও দিকি, মুখপোড়া রিকশোওলা ভিরমি খেয়ে বসে রইল। উদিকে হাসপাতালের দুয়োর বন্ধ হতে চলল···

ব্রজ পানখেকো মোটা মোটা লাল দাঁতে হাসছে। —বাবুরালি না? শালা মাতালের কাণ্ড! নেশায় উবুড় হয়ে গেছে বেটা। কই, ওঠ শীগগির!

মা-মেয়েকে তুলে নিয়ে ভ্যানটা চলে গেল। বাবুরালির যাওয়া হল কই? শয়তান চাকার সঙ্গে তাকে চিরকালের মত বেঁধে ফেলেছে।

সাড়ে চার হাত মাটি

এক শীতের সন্ধ্যায় ঠাণ্ডাহিম কুয়াশায় ঢাকা মাঠে ঝাপসা বিবর্ণ চাঁদ কাঁধে নিয়ে ফেরা হাটুরেরা গমক্ষেতে বাবরুকে দেখে বলেছিল, "বুঢ়া, তুমি জাড়ে মরে যাবা হে!" আর বুঢ়া বাবরু তাদের বলেছিল, "জাড়? তা অনেক জাড় আমার দেখা হয়েছে। ই কী জাড়!"

আসলে বাবরু বলতে চেয়েছিল, এই মাটির দুনিয়ায় সে অনেক শীত এমনি করে কাটিয়েছে। আর সে কী শীত! যখন কিনা সাপ আর পোকামাকড়েরা মাটির তলায় দীর্ঘ ঘুমের ভেতর নিস্পন্দ হয়ে থাকে, মধ্যরাত্তের কুয়াশায় চাঁদটাকে মনে হয় ছেঁড়া ন্যাকড়াকানির মতো ফালতু জিনিস আর প্রহর ডাকা শেয়ালেরা মাঝে মাঝে ককিয়ে ওঠা কণ্ঠস্বরে শপথবাক্য আবৃত্তি করে, "আজ যদি বেঁচে থাকি কাল ঘর করব"—পাড়াগেঁয়ে রাখালেরা তাদের এই

আর্ত বাক্যটি ছড়ার সুরে গেয়ে পরিহাসে হি হি করে হাসে। আর সত্যিই সে কী শীত! যখন বুড়ো-বুড়িরা দু'পায়ের ফাঁকে মাটির মালসায় তুষের আগুন রেখে এক পুরনো পৃথিবীর বৃত্তান্ত শোনায় নাতিপুতিদের। বারোয়ারিতলায় কম্বল জড়ানো হারু পঞ্চায়েত বাবুপাড়ায় শোনা কাগজের খবর প্রতিধ্বনিত করে, "বড় হিম আসছে বাবাসকল! আর কেউ বাঁচবে না, পাহাড়ি মুলুকে শয়ে শয়ে মরছে—বাবুমশাইরা কাগজে নেকে দিয়েছেন।" আর তাই শুনে খড়কুটো জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে জোড়া-জোড়া আদিম চোখ হলুদ হয়ে যায় আতঙ্কে। কোনও এক প্রাজ্ঞ মোড়ল ঘড়ঘড়ে গলায় বলেও ওঠে, "তাইলে আর কেউ বাঁচবে না হে!" আর তখনই হয়তো মুসলমানপাড়ার বাবরু তার গমক্ষেত থেকে ফিরছে। তার আধন্যাংটো ঢ্যাঙা দেহটি ঈষৎ কুঁজো, যার কারণ এই মাটিরই প্রচণ্ড টান। সে মাটির ভেতরটা ঢুঁড়ে সেই রহস্য খুঁজে পেতে চায়, যা কিনা এই দুনিয়াটাকে শস্যবতী করে, এবং বীজকণা থেকে যে বিস্ময়কর রহস্যে উদ্ভিদেরা জেগে উঠে মুখ বাড়ায়, সে তারই তত্ত্বতল্লাশে নিয়ত ব্যগ্র বলেই হুমড়ি খেয়ে বসে থাকে মাটির ওপরে। ঝুঁকে থাকে ভিন্ন এক জোরালো মাধ্যাকর্ষণে, এবং এই করতে গিয়েই তার লম্বাটে মেরুদণ্ডটি ক্রমশ বেঁকে গেছে। হারু পঞ্চায়েতের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত বাবুদের কাগজের খবর শুনে একটু দাঁড়িয়ে কেশে সাড়া দেয় এবং একটু হেসে বলে যায়, "মোড়লদাদা, কী বুলছ হে? ই কী জাড়! অনেক জাড় আমার দেখা আছে।" আর হারু পঞ্চায়েতমশাই রাগ করে বলে, "তুমি বাবরু তালি, ই বিত্তেন্ত বুঝবা না হে! ঘর যাও।"...

এই ছিল বাবর আলি ওরফে বাবরু, আমাদের ছোট্ট গ্রাম কাঁসুলির এক বুড়ো চাষাভুষো মানুষ। তার কাছেই জেনেছিলাম, আরও এক জগৎ আছে দূরের আকাশে, যেখান থেকে জ্যোৎস্নারাতে পরীর ঝাঁক উড়ে এসে সাতবাউড়ি বিলের জলে সাঁতার কাটে। খিলখিলিয়ে হাসে। আর ভিজে চুলে ফিরে যাবার সময় গমক্ষেতের বুড়ো মানুষটির সঙ্গে মস্করাও করে যায়। বাবরু বলত, 'ওই যে দেখছ আজ বড় লিওর পড়েছে. সে কি তুমি লিওর ভাবছ গো? পরীদের চুলের পানি।' লিওর হল শিশির, এতো জানতাম না। শিশির হল বইতে পড়া 'নীহার'। আমাদের পাশের বড় গ্রাম ইন্দ্রাণীর স্কুলে জমিদারবাড়ির যে ছেলেটি আমার সহপাঠী ছিল, তার নাম ছিল শিশির। একদিন ক্লাসে বাংলার স্যার হরিনাথ 'নীহারবিন্দু'র মানে বোঝাতে গিয়ে শিশিরকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ওই

ছাখো, মূর্তিমান নীহার বসে আছে। তবে বিন্দু নয়, সিন্ধু।' সাত্না ক্লাস হেসে খুন।

সে আলাদা গল্প। আমি বাবরুর গল্পই বলতে চাইছি। তবে শিশিরও এর সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে। তাদের আলাদা করা যায় না।

কাঁসুলি থেকে মাঠের পথে ইন্দ্রাণীর স্কুলে যেতে আমি পাখিওড়া দূরত্বই বেছে নিতাম। চষা ক্ষেত, কাঁদর, জলকাদা আর উলুকাশের জঙ্গল এসব কোনও বাধা ছিল না আমার কাছে। আর ওইরকম গতিপথের দরুন রোজই দেখা হয়ে যেত বাবরুর সঙ্গে। তার কোনও ছেলেপুলে ছিল না। তার বউয়ের ছেলেপুলে বাঁচত না। শেষবার বিয়োতে গিয়েই সে নাকি মারা পড়ে। বাবরুর মাটির দিকে মুখ ফেরানোর এও একটা কারণ হতে পারে। সে তার অল্প কয়েকটুকরো নাবাল মাটির ভুঁই নিয়েই জীবন কাটাচ্ছিল। তখন আমার বছর-বারো বয়স। পৃথিবীর কিছু-কিছু সত্যাসত্য আঁচ করতে পারলেও বাবরুর মুখোমুখি হলেই কী একটা আমূল রদবদল ঘটে যেত আমার ভেতর। হাঁটু ভেঙে সে যখন ফসলের গাঢ় বর্ণালী থেকে মুখ তুলত, গায়ে কাঁটা দিত। এ কাকে দেখছি? এ কি মানুষ? এ কী মানুষ! মনে হত, অবিকল দেখতে পাচ্ছি, ওর হাঁটুর নিচে থেকে শেকড়বাকড়ের আঁকুর গজিয়েছে, তার সাদা চুলে চৈত্রের ভাঁড়লে ফুলের বিস্ফোরণ—যা সাদা রেশমি তুলো উড়িয়ে নিয়ে যায় আর ঘূর্ণিহাওয়া তক্ষুণি কুড়িয়ে নিয়ে পাগুড়ি বেঁধে ব্যস্তভাবে গাঁওয়ালে যেতে থাকে মাঠ পেরিয়ে। মনে হত, তার ঢ্যাঙা, কুঁজো শরীর জুড়ে গজিয়ে উঠেছে শ্যাওলা। আর ছত্রাকের মতো তার না-ভাঙা ধূসর দাঁতের প্রাকৃতিক সেই হাসি! আর সে কাছে ডেকে পুরনো পৃথিবীর আদিম বৃত্তান্ত শুনিয়ে ছাড়ত। তখন পৃথিবীর সত্যচেনা সেই সত্যাসত্যগুলি বড় নিষ্ফল হয়ে যেত তার মুখোমুখি গিয়ে। টের পেতাম জীবজগতের ভেতর দিকটাতে তার নিয়মিত গতিবিধি এবং পাখি, পোকামাকড়, পশু ও উদ্ভিদের গোপন রহস্যময় খবর সে জেনে ফেলেছে। তার শরীরে পেতাম পাখির বাসার খড়কুটোর গন্ধ। সাতবাউড়ির বিলের জল বর্ষায় উপচে এসে তার ভুঁইগুলি ডুবিয়ে দিলে তখন সে বাধ্য হয়ে মানুষের পৃথিবীতে ফিরে আসত। করুণ মুখে বাবাকে বলত, 'ছ্যান না একখানা পিটিশান নেকে নবাববাহাদুরকে।'

তখন ইংরেজ আমল। মহালের মালিক ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর। নাবাল এলাকায় নদীর অববাহিকায় চাষীরা নিজেরাই বাঁধ বেঁধে-বেঁধে হন্যে হয়ে যেত। প্রতিবছর কোথাও-না-কোথাও বাঁধ ভাঙতই, আর বাবরুর মতো লোকেরা নবাববাহাদুরের কাছে পিটিশন পাঠাত।

তো এই বাবরুকে পরে দেখতাম গ্রামের গোরস্তানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠতাম। ওখানে আবার কী করছে সে? সে কি এবার মৃতদের ভেতর পৌঁছানোর চেষ্টা করছে? জীবজগতের সব খবর জানার পর এ বুঝি তার ভিন্ন এক তত্ত্বতল্লাশ। তখন আমিও কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকালে পৌঁছেছি। এক দুপুরে তাকে গোরস্তানে শিমুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে গেলাম। আমার ডাক শুনে সে বিষণ্ণ একটু হাসল। তারপর সাদা চুলদাড়ি নেড়ে বলল, "পসন্দ হল না বাছা!"

"কী পছন্দ হল না বাবরু?"

বাবরু আস্তে বলল, "কবরের জায়গা।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। অথচ অবাক হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। এটা তো চিরদিন মুসলিমদের একটা প্রথার মতনই, বুড়ো হয়ে গেলে লাঠি ঠুক ঠুক করে গোরস্তানে গিয়ে কবরের ঠাঁই বেছে রাখা। কিন্তু কেন বাবরু কবরের ঠাঁই ঠিক করতে এসেছে? সে কি মৃত্যুর পায়ের সাড়া পেয়ে গেছে? বিশ্বাস হয় না। সে তখনও নাবাল মাটির ক্ষেত্রে আসন্ধ্যা খাটে। মাথায় করে খড় বা বিচুলি বয়ে আনে। অবরে-সবরে অন্য লোকের মুনিশও খাটে। খাটতে পারে। তার শরীরটি তখনও মজবুত। আমি বললাম, "কেন তুমি কবরের জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছ, বাবরু?"

বাবরু শ্বাস ফেলে বলল, "বয়েস তো কম হল না গো! তাই শোবার জাগাটুকুন ঠিক কত্তে এসেছিলাম। তো কথা কী, যেখানটা যাচ্ছি সেখানেই দেখি কোন-না-কোন শালাব্যাটা শুয়ে আছে!"

হেসে ফেললাম। "তা তো থাকবেই! তুমি কি শোন নি, মৌলবিসায়েবরা বলেন, দুনিয়া ধ্বংস হলে প্রতি কবর থেকে সত্তর হাজার করে মানুষ উঠে হাশরের ময়দানে গিয়ে দাঁড়াবে আর খোদা তাদের বিচার করবেন?"

বাবরু আরও আস্তে বলল, "শুনেছি।"

"তাহলে?"

বাবরু জোরে মাথা নেড়ে বলল, "সেটা কথা লয়গো! এই গোরস্তানের

কথা লয়গো! এই গোরস্তানের যেখানটা যাচ্ছি, সেখানেই দেখি এমন লোকের কবর আছে, তাদের আমার পসন্দ হয় না।" বলে আঙুল তুলে বনতুলসীর ঝাড়ের দিকটা দেখাল। "ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ওখানটা পসন্দ হল। তো মনে পড়ে গেল, উখানে শালীবিটি শুয়ে আছে—তুমি দেখনি তাকে, বড্ড পাড়াকুঁদুলি ছিল। বনবে না।"

হাসি চেপে বললাম, "তাহলে এক কাজ করো। তোমার বিলের জমিতে—"

দ্রুত কথা কেড়ে বাবরু বলল, "সেটাই তো ইচ্ছে ছিলো গো! সেখানে শুতে পেলে শান্তি হত মোনে। কিন্তুক, আর তো তার যো নাই বাবা!"

"কেন?"

বাবরু তাকাল। একটু পরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "চেরটাকাল ভাবতাম, ভুঁইয়ে যদি হঠাৎ মরণ হয়, যেন আমাকে সেখানেই কবর দেয়। কিন্তুক আর তো একটুকুনও ভুঁই নাই, বাবা।"

"সে কী!" চমকে উঠে বললাম। "বেচে ফেলেছ নাকি?"

বাবরু ম্লান হাসল। "বছর বছর ডুবে যায়। যেটুকুন চৈতেলি হয়, বেচে খাজনার টাকাও হয় না। শেষে ইস্তফা দিয়ে এলাম লায়েববাবুকে।"

সে আমলে নদীর অববাহিকায় নাবাল আর জঙ্গুলে জমি সামান্য সেলামিতে বছরওয়ারি বন্দোবস্ত করার প্রথা ছিল। বছরসন খাজনা না দিলেই বেজে উঠত নিলামের ঢোল। বন্যার পর বন্যায় বিপর্যস্ত চাষী বাধ্য হয়ে 'ইস্তফাপত্র' লিখে দিত কাছারিতে। এর ফলে সে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের হাত থেকে নিস্তার পেত।

তো সেদিন বিষণ্ণ বাবরুর কথা শুনে চমকে উঠলেও তার কবরের জায়গা খোঁজার ব্যাপারটা ভারি হাস্যকর মনে হচ্ছিল। হাসতে হাসতে বলেছিলাম, "বেশ তো! তাহলে বলাইহাজির মতো তুমি বরং নিজের বাড়ির উঠোনেই কবর দিও নিজেকে।"

বাবরু আবার আমাকে চমকে দিয়ে বলেছিল, "ভিটেটুকুনও তো বাঁধা আছে দেনার দায়ে। কবে দেনা করে খেয়েছিল আমার বাবা। পঞ্চুবাবুর খাতায় সে দেনা শোধই হয় না—শোধই হয় না। শেষে মকবুল দফাদারকে বন্ধক দিয়ে সে দেনা শুধলাম। ইদিকে মকবুল করাড়ে বন্দক নেকে লিয়েছে—পাঁচবছরে টাকা না দিলে ভিটের মালিক হবে।"

'করার' হল 'ইকরারনামা', সেটা অনেক পরে জেনেছিলাম। ইংরেজ আমলেও মুসলিম শাসনকালের অসংখ্য রীতি প্রচলিত ছিল। আর 'প্রান্তিক-চাষীও' যে আরো প্রান্তিক চাষীর মাংসভোজী, এবং তথাকথিত জোতদারদের চেয়ে কম যায় না, সেটা জানতে তো আরও দেরি হওয়ার কথা। আসলে প্রতিটি গ্রামীণ মানুষই মাটিখেকো রাক্ষস। তো আমার সহপাঠী শিশিরের কথা বলেছি। কলেজেও দুজনে সহপাঠী ছিলাম। কলেজে ঢোকার বছরই দেশ স্বাধীন ও বিভক্ত হয়েছিল। পাস করার পর আমি চাকরির জন্য যখন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি, তখন শিশির সাতবাউড়ির বিলের নাবাল মাটিতে কৃষিখামার গড়ে তুলেছে। টেস্ট রিলিফের বদান্যতায় পাকাপোক্ত বাঁধ হয়েছে নদীর কিনারায়। চাষীদের ইস্তফা দেওয়া সব জমি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের হিড়িকে শিশিরের বাবা নামমাত্র সেলামিতে নবাববাহাদুরের কাছারি থেকে বিক্রিকবলা দলিলে কিনে ফেলেছেন। তাঁর নিজের জমিদারিটির পরিধি ছিল যৎকিঞ্চিৎ। গ্রাজুয়েট ছেলেকে 'মর্ডানাইজড এগ্রিকালচারে' নামিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধিমান পিতা। সাতবাউড়ির অনাবাদী মাঠে উলুকাশের জঙ্গল ছত্রখান করে ফেলেছে ট্রাক্টরের দাঁত। একপ্রান্তে শিশিরের 'ক্যাম্প।' সেই ক্যাম্পে একদিন আমন্ত্রণ পেলাম শিশিরের।

চিনতে পারছিলাম না সেই রহস্যময় ছেলেবেলার আরও রহস্যময় ভূখণ্ডকে, যেখানে গমের ক্ষেতে হুমড়ি খেয়ে বসে এক বুড়ো চাষা মাটির অলৌকিককে ঢুঁড়ে হন্যে হত, মুহুর্মুহু বিস্মিত হতে-হতে প্রাণরহস্যের তত্ত্বতল্লাস করত। আর কোথায় সে পরীর ঝাঁক-নামা অথৈ স্বাধীনতাময় বিলের জল? আর সেখানে পরীদের অবগাহনের যো নেই। মাছের ঘেরি ঘিরে টাঙ্গি-বল্লম হাতে দিনভর রাতভর পাহারা দিচ্ছে এলাকার দুর্ধর্ষ খুনেরা—শিশির যাদের মাথা কিনে ফেলেছে। গরিবগুরবো মাঠ-বিলকুড়ুনি মেয়েরা আর শাক তুলতে গুগলি শামুক সংগ্রহে পা বাড়ায় না তাদের ভয়ে। আদিগন্ত শরৎকালীন সবুজ ধানক্ষেতে সব প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ফর্দাফাঁই। এই কি তাহলে অসীমকে সীমায় বাঁধা? এই কি তাহলে মানুষের ঐতিহাসিক শক্তির সেই দক্ষতা, যা দিয়ে যুগে যুগে পৃথিবীর রূপ বদলে যায়? আমি কি প্রশংসা করব, না নিন্দা করব? আনন্দিত হব না বিষণ্ণ?

তবে এ তো ঠিকই যে, মানুষ পৃথিবীর রূপ বদলে দেয়, দিতে পারে। মানুষই রূপকার। পৃথিবীকে যুগে-যুগে নানান রূপে যারা সাজায়, স্থাপত্যে কী ভাস্কর্যে কী শিল্পকলায়—কিংবা এইসব বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র আঁকে যারা, তাদের সবাই-ই তো রূপকার।

আর ঠিক এই কথাটা ভাবতেই মনে পড়ল বাবরুর কথা। আরে তাই তো। বাবরুও তো ছিল এক রূপকার, যে নিজের মাটিতেই যথার্থ শিল্পীর মতো অহঙ্কারে ও স্বাধীনতাবোধে মৃত্যুর পর শুয়ে থাকতে চেয়েছিল! কোথায় সে?

তারপরই হঠাৎ তাকে দেখতে পেলাম। ফার্মের জমিতে সারবন্ধ নিড়ান-রত মুনিশদের ভেতর সাদা মাথাটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। শিশিরকে বললাম, 'ওই লোকটা বাবরু না?"

শিশির বলল, "হ্যাঁ। ঠিক চিনেছিস।"

"ও এখনও বেঁচে আছে, ভাবা যায় না রে।"

শিশির হাসল। তার পায়ে গামবুট। পরনে প্যান্টশার্ট, মাথায় বিলিতি টুপি। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "বুড়োটা মাইরি বদ্ধপাগল! বুড়ো হলেও খাটে প্রচণ্ড। কিন্তু সবসময় ওর ওই এক ধুয়ো, কথাটা মনে আছে তো বাবুমশাই? অতিষ্ঠ করে ছাড়ে একেবারে।"

জিগ্যেস করলাম, "কী কথা রে?"

শিশির তেতো মুখে বলল, "আচ্ছা তুই কল্পনা কর, এই ফার্মের জমিতে একটা জায়গায় লোকটা—ওই যে দেখছিস, একটা লাঠি পুঁতে রেখেছে। বলে ওখানে নাকি ওর জমি ছিল, ও মারা গেলে যেন ওখানে ওকে কবর দেওয়া হয়।"

মাথার ভেতর ঝড়ের ঝাপটানি টের পেলাম। সব মনে পড়ে গেল। চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকলাম। ইচ্ছে হল, বলি, কেন একজন যথার্থ শিল্পী তার নিজের মাটিতে শুতে পারবে না—কিন্তু শিশিরকে সেকথা বোঝানো নিরর্থক।

সে একই ভঙ্গীতে ফের বলে উঠল, "রাগ করিস না—আমাকে সাম্প্রদায়িক ভাবিস না। তুই তো জানিস, আমি কী! কিন্তু আমি যদি মুসলমানও হতাম, আমার ফার্মের জমিতে একজনের কবর দেওয়া কি সম্ভব হত আমার পক্ষে? তুই বল্। কবরের জন্য গ্রামে কবরখানা আছে। এখানে কেন বাবা?"

কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্পখাটে বসে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিচ্ছি, সামনে সাদা

চুলদাড়ি নিয়ে হাড়জিরজিরে আধন্যাংটো কুঁজো একটি লোক এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। তারপর ডাকল, "বাবুমশাই!"

শিশির জড়ানো গলায় বলল, "কী বাবা? মজুরি নেবে তো এখানে কেন? ভুলুবাবুর কাছে যাও। ওই ছাখো, ভুলুবাবু বসে আছে।"

বললাম, "কী বাবরু? চিনতে পারছো?"

বাবরু আমার দিকে তাকাল না। শিশিরের উদ্দেশে কাতর ভঙ্গীতে বলল, "বাবুমশাই!"

শিশির মিটিমিটি হেসে বলল, "কী?"

বাবরু বলল, "কথাটো মোনে আছে তো বাবুমশাই? পয়সা লয়, কিছু লয়—খালি সাড়ে চারহাত মাটি বাবুমশাই—আপনার পায়ে ধরি। সাড়ে তিন হাতেই চলত। তবে কিনা মাথার পেছনে আধহাত পায়ের পেছনে আধহাত জায়গা লাগবে। ক্যান কী, দুদিকে দুই ফেরেশতা এসে দাঁড়াবে। তেনাদেরও জায়গা চাই।"

শিশিরের এক প্রহরী বাবরুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে একটা ঘৃণা আমাকে পেয়ে বসল। শিশিরকে ঘৃণা? বাবরুকে ঘৃণা—তার এই অদ্ভুত জেদের জন্য? কিংবা পৃথিবীটাকেই ঘৃণা?

জানি না। সব কিছুকে, এমন কী নিজেকেও ঘৃণা করার জন্য আমি হুইস্কির বোতল শেষ করে দিচ্ছিলাম।...

একটু উপসংহার আছে।

সে-বছর সেই শরতেই নদীর উজানে পঞ্চবার্ষিক যোজনার অনবদ্য কীর্তি একটি ড্যামের অবস্থা বিপন্ন দেখে তার সবগুলি দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সারা মহকুমায় নাবাল অঞ্চল আচমকা ভেসে উজাড় হয়ে যায়। শিশিরের ফার্মও ভেসে গিয়েছিল। তার কৃষিযন্ত্রপাতি বহু দূরে একে একে উদ্ধার করা হয়। সদ্য রাশিয়া থেকে আনা হার্ভেস্টার কম্বাইনটি তিনমাইল দূরের রেললাইনে গিয়ে আটকে ছিল। বানের জল নেমে গেলে সেটিও উদ্ধার করা হয়।

কিন্তু তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটি প্রকাণ্ড হিজলগাছের কোটরে আটকে থাকা একটি কংকাল, শেয়াল-শকুনের ভুক্তাবশেষ।

ইন্দ্রাণী স্কুলের ময়দানে ত্রাণশিবিরে যখন ওই কংকালটি নিয়ে জল্পনা হচ্ছে, একবার জিগ্যেস করেছিলাম, "কংকালের শিরদাঁড়াটি কি বাঁকা ছিল?"

আমার এই অত্যদ্ভুত প্রশ্নে শিবিরে অট্টহাসির ধুম পড়ে গেল। শুধু কর্মক্লান্ত, ব্যতিব্যস্ত নিরন্তর অভিযোগের চোটে বিপর্যস্ত উন্নয়ন অফিসার মুখ তেতো করে বলে উঠলেন, "ধুর মশাই! স্কেলিটনের আবার সিধে বাঁকা কী? স্কেলিটন ইজ স্কেলিটন। পিস বাই পিস বোন।"...

তাহলে বাবরু শেষ পর্যন্ত মাটি পেল না! কেন পেল না বাবরু? সে তো মাটিকে ভালবাসত। মাটির গন্ধ শুঁকে আবিষ্ট চোখে পৃথিবীকে দেখত। তবু সে মাটি পেল না কেন? বেশি নয়, মাত্র সাড়ে চার হাত মাটি!

বৃষ্টিতে দাবানল

সেবার শরতে বনকাপাসিতে তিন দিন ধরে বৃষ্টি। বাউরিপাড়ার ক্ষেতমজুর নারাং (নারায়ণ>নারাণ)। একদিনের বৃষ্টিতেই বেকার এবং দ্বিতীয় দিন ক্ষুধার্ত হল। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ঢ্যাঙা, হাল্কা গড়ন, তামাটে রং, চৌকো চোয়াল, ছোট চুল, লম্বা নাক, চেরা চোখ, পাঁজরে কাঠি-কাঠি দাগ, আর চাঁছা পেট। এই নারাং বাঁজা ডাঙায় ভুঁইফোড় এক তাল গাছের মতো একলা। খুব সহজে তাকে চোখে পড়ে। এই নারাং দুবার দোকলা হবার চেষ্টা করেছিল। প্রথমবার বউটার খাওয়া দেখে দুঃখিত হয়ে নানান অছিলায় তাড়িয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার বউটা কম খেত, কিন্তু চাউনিটা ও শরীলটা ছিল ভীষণ পিচ্ছিল এবং পিছলে যাবে-যাবে করতে-করতেই ছোট্ট স্টেশন বনকাপাসির সিগন্যালম্যান গোবরার সঙ্গে ভাগল। দুবারের দুঃখ নারাংকে আর বউমুখো করেনি।

এই বৃষ্টির নাম টিপটিপানি, আবহাওয়ার নাম গাজোল। আকাশ নিভাঁজ মেঘে ঢাকা, হাওয়া নেই। তাই বৃষ্টির ফোঁটা সোজাসুজি পড়ছে। যদি হাওয়া দিত এবং ফোঁটাগুলো একটু কাত হয়ে পড়ত, নারাংয়ের দাওয়ার মাটি অনেকটা ভিজত, তাহলে এই আবহাওয়ার নাম হত ডাওর। ডাওর বাড়লে তার নাম ফাঁপি। সে খুব ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর হলেও ফাঁপিতে নারাংয়ের সুদিন। গাছ ভাঙে। সে ডালপালা

কুড়োয় এবং রোদ উঠলে বেচতে যায়। ঘর ধসে পড়ে। তাই সে কাজ পায় আর ডাওরেও নারাংয়ের মন্দ হয় না। পুকুর ভাসাভাসিতে মাছ ধরে বেচে লোকের গরুছাগলের জন্যে পাতা কেটে দেয় এবং চালডাল পায়। কিন্তু গাজোল—গাজোলে ঝিমঝিম ভাব, আলস্য, যার বউ আছে সে গলা ধরে শুয়ে থাকে। নারাংয়ের নেই!

নারাং স্টেশনে গেল প্রথমে। পর-পর দুটো রেলগাড়ি দেখল, মোট পেল না। ছোট লাইনের ছোট গাড়ি। স্টেশন ছোট। একটা মোটে চা-বিড়ি দোকান আছে। পিছনে সামনে ডাইনে ফাঁকা মাঠ। ঝাঁপ ফেলে শুয়ে গেছে। স্টেশনবাবুও আস্তে আস্তে কোয়ার্টারে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সিগন্যালম্যান নবা শুওরের পাল ডাকিয়ে বউয়ের দিকে কেমন চোখে তাকাল নারাং সব দেখল।

দুজন যাত্রী নেমেছিল। তারা ছাতার তলায় কথা বলতে বলতে এগোল নারাং তাদের পিছন-পিছন এসে শুনল খিচুড়ি, মাংস এবং বউয়ের গল্প হচ্ছে সে আরও মনমরা হয়ে গেল। গায়ে টিপটিপ বৃষ্টি, ভেতরদিকে জ্বরভাব নাইকুণ্ডলে প্রাচীন খেঁকি কেঁউ কেঁউ করছে. সে মনে মনে বলল—ও কিছু না ও কিছু না!

গাঁয়ে ফিরে বারোয়ারিতলায় একবার দাঁড়াল নারাং। মাথার ওপর তিন পুরুষের বট। পাকা ফল লাল টুকটুকে, মাটিতে পড়ে ছেৎরে গুঁড়োগুঁড়ো হয়েছে এবং সিমেন্টের চত্বরটা যেন বুড়ো বটেরই গুয়েমুতে একাকার। আর ডালপালার পাখপাখালিরও এই গাজোলজনিত আলস্য, ফলে ঠোকরাতে ঠোঁট ওঠে না। গুম হয়ে বসে আছে, পাখি পাখিনীর পাশে। হায় নারাং, এই গাজোলে তোর কেউ নেই।

নারাং আশা নিয়ে ঘুরে শংকরার কামারশালের দিকে তাকিয়েই আশা মুখে পেচ্ছাপ করে দেয়। চোয়াল আঁটো হয়। মগজ রিরি করে। কারণ কামারের ঝাঁপ বন্ধ. হাপর টানার কাজটুকুও জুটল না, এবং শংকরার যুবতী বউ মাথায় গামছা ঢেকে পা টিপেটিপে পুকুরঘাটে গেল। বউটার দলদলে গতর, পাছা টলছে, ঠোঁটে কী হাসি, এবং সামনাসামনি ঘাটে নেমেই সাঁতার দিতে থাকল।

নারাং দাঁড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ পরে সেই বউটি ভিজে কাপড়ের মারাত্মক শব্দ করতে করতে নারাংয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ঘুরে কেন ফিক করে হেসে যায়। বারোয়ারি বটতলায় অমনি মার মার শব্দে বজ্রপাত হল।

কাতর নারাং জ্বলতে জ্বলতে সেখপাড়ায় গেল। হৈদর মণ্ডলের ছেলে হৈবর বাড়ির সামনেকার ছোট্ট ফাঁকা জায়গা 'লাছ' (লন) থেকে তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে কাকে যেন ডাকছে। নারাং দেখল, ওপাশের গোয়ালঘরের দেয়ালে হৈবরের বউ শুকনো গোবর-চাপড়ি ছাড়াচ্ছে কাস্তে দিয়ে এবং তার ডাঁটালো হাতের চুড়ি বাজছে, স্তনদুটো ভীষণ দুলছে, পাছা নড়ছে। হৈবর ডাকছে। এখন কি কাজের সময় ?

গরু ছাগলের জন্যে পাতা লাগবে নাকি আর শুধোনি হল না নারাংয়ের। এ এক আশ্চর্য সময়, এই গাজোল। এখন কিসের কাজ ?

'তিনদিনকার গাজোলে
মহিষ খ্যাপে হিজোলে
উকুন খ্যাপে মাথায়
টিকটিকিরা বাতায়…'

পরের লাইন লেখার যোগ্য নয়। আর বড় সরল মানুষ বনকাপাসির এই নারাং। লাজুক, অশৌখীন, নীরব শ্রমিক। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতেই পারে না। সে তখন মাটিতে চোখ ফেলে এই নৈসর্গিক নাছোড়বান্দা উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যে হাঁটতে শুরু করল—দিশাহারা ও ভূতগ্রস্ত।

এরপর যখন সে তাঁতিপাড়ায় ঢুকেছে, আচমকা কার হাতের মাকু বন্ধ হল। অমনি একটা মেয়েলী খিলখিল হাসি বিদ্যুতের মতো দেয়ালের ওপারে ঝলসে উঠে আবার বজ্রপাত। নারাংয়ের মনে হল, সে দেখতে পাচ্ছে বাঁজা ডাঙার এক ঢ্যাঙা তালগাছের মাথা দাউদাউ জ্বলছে। তারপরই স্তব্ধতা। এবং স্তব্ধতার ওপর বৃষ্টির টিপটিপানি মাকড়সার জাল দিয়ে নারাংয়ের মতো মানুষের বিশাল লজ্জা দ্রুত ঢেকে ফেলছে। চতুর্দিকে ধূসরতা। কিছু চোখে পড়ে না আর। নাকি পড়ে, বাঁজাডাঙার একলা তালগাছের মাথায় দাউদাউ আগুন।

অগত্যা নারাং ফিক করে হাসল। 'তাঁত বোনাবুনি মাকু চালাচালি… তাঁত বোনাবুনি মাকু চালাচালি…। তাঁতির পাছায় লাল সুতো…তাঁতিনের মাথায় গামছা।'…

আর সেই সময় সল্লা দাইয়ের হাতে নতুন সরাঢাকা হাঁড়ি, হাতে কঞ্চি, কঞ্চি নাড়তে নাড়তে সে চেরা গলায় হাঁক দিচ্ছে : ধুল ফু-উ-ল, ধূ-ল-ল ফুল ! বাবাবাছারা মায়েরা দিদিরা সোনামুখীরা ! সরে-সরে যাও, সরে-সরে-এ-এ ! রাস্তা খাঁ খাঁ সুমসাম। লোকজন থাকলে তো সরবে। আর নারাং, নারাং

এখন লোকও নয় জনও নয়। দাউদাউ জ্বলা ঢ্যাঙা তালগাছ। বনকাপাসিতে এই গাজোলে কে জঞ্জাল, তার ঠাহর নেই।

—ও নারাং, ও মুখপোড়া! বলি, সরবি না মরবি? হাঁক থামিয়ে সল্লা হেসে-হেসে বলে। কঞ্চি নাড়ে।

নারাং নড়ে না। কাদায় গোঁজের মতো দাঁড়িয়ে সরলার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কতটুকু পোঁতা আছে, নিজেই বুঝতে পারে না। নিজেকে ওপড়াতে যথাশক্তি টানাটানি করে।

—মিনসের বাওরের ডর নেই! ও মা, আমার কী হবে! সল্লা আবার হাসে। হাসতে হাসতে বলে আবার—নিনেংটে ডাকার আবার বাওর! বাওর (মন্দবায়ু) ছোঁবে না!

নারাং মনে মনে জবাব দেয়—আমি যদি ডাকা, সল্লা ডাকিনী।

কাছে এসে সল্লা দাই কঞ্চিটা মারার ভান করে নিজের কাজে এগোয়। নিজের মনে কথা বলে—কারণ, আধখেপী স্ত্রীলোক! আপনমনে রাস্তায় কথা বলা অভ্যেস আছে। লোক না পেলে গাছের সঙ্গে, ইতর প্রাণীর সঙ্গে, এমন কি আকাশের সঙ্গেও কথা সে বলে। সল্লার (সরলার) অনেক কথা। সল্লা বলতে বলতে যায়: মাস্টারের বউয়ের আর কাজ ছিল না! এই গাজোলেই বিয়োলি। হুঁ, এখন মজা করে কিনা মাস্টার মশায়ের গলা ধরে শুবি। খ্যাপা-খ্যাপতোর (ক্ষিপ্ততার) সময়, এই গাজোল!

এবং সে ফিক ফিক করে হাসে। পিছু ফিরে দেখে না পিছনে বজ্রাহত তালগাছ।

এই সল্লার বয়স বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। রোগা গড়ন। স্তনদুটো চিমসে। ময়লা রং। খসখসে চামড়া। সব ঋতুতেই ঘামাচি হয়। ঘুঁটে হাতে আন-বাড়ি আগুন আনতে গিয়ে সেই ঘুঁটে দিয়ে গা চুলকোয়। বুক সম্পর্কে প্রচলিত লজ্জা তার নেই। কিন্তু তার মুখখানি সুন্দর। সরু নাক, চেরা চোখ পিঙ্গলবর্ণ, কপাল চওড়া বা টিপ্‌ কপালী, ঘন কালো চুল আছে মাথায়। দীঘির একবুক জলে সিঙাড়া বা পানিফল তুলতে তুলতে একবার সে এক বাবুবাড়ির নতুন জামাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল, তাইতেই সেই জামাই (রাঢ়ের প্রবাদ বনেদী বাবুরা ভীষণ গাঁজাখোর) রাতদুপুরে সল্লার কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আজ অবশ্য সল্লার সেই বয়েস নেই, কিন্তু চাহনি আছে।

এই সল্লা কানে শোনে না, ঠসী। তাই প্রেম নিবেদন করতে হলে আগে ভালভাবে বক্তব্যটা তার কানে ঢুকিয়ে দিতে হয়। নৈলে সে গোলমাল করে।

এই সল্লা নিজেকে বলে, বনকাপাসির ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। নয়তো জাড়ের রেতে এক মালসা আগুন। সে শরীল সম্পর্কে কৃপণ নয়। সে যতীন মাস্টার কিংবা থানার মধু দারোগাকে বুকের ওপর নিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে পারে: আমার আর সেদিন নেই! এই সময় সে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মাস্টার বা দারোগা যেই হোক, হঠাৎ প্রচণ্ড তেঁতো টের পেয়ে নিজের শরীলের প্রতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, কারণ—সত্যি, সরলার আর সেদিন নেই। এত খাটুনির মজুরি কানাকড়ি।

কিন্তু এই খ্যাপা-খ্যাপ্তোর গাজোল, এই দাউদাউ প্রজ্বলন, এইসব নৈসর্গিক উপদ্রব বনকাপাসিতে ঘটে থাকে। অগত্যা তাই সল্লা ঠসীই নিদান।

নারাং সল্লার পিছনে-পিছনে চলে আর সল্লা ধুল-ফুলের (আঁতুড়ের আবর্জনা) ঘোষণা দিতে দিতে মাঠে নামে। বৃষ্টি পড়ে ধানের পাতায়, গাছের পাতায়, পাতা থেকে মাটিতে আর জলে—টুপ টাপ, টিপ টাপ, টুপ টাপ···

বাঁজাডাঙার এক কোনায় ফণিমনসা ফেয়া কোঙাঝোপ মাদারগাছে ঘেরা একটা ছোট্ট জায়গা। তার নাম ধুলগাড়ি। খরায় মাদারগাছে লাল লাল ফুল ফোটে। বর্ষায় ফোটে সাদা কেয়াফুল। সেখানে জ্যৈষ্ঠে সাপসাপিনী জোড় বাঁধে। গাঁয়ের কত ছোটলোক বাড়ির কিশোরী মেয়ের কুমারীত্ব ঘোচে নির্জন দুপুরবেলায়। চুলে আটকে যায় খোলামকুচি, পিঠে কাঁটার জখম। মধ্যিখানে অজস্র হাঁড়ির টুকরো, বিবর্ণ ন্যাতা। বনকাপাসির অনেক জোড়বাঁধার প্রত্যক্ষ এমন প্রমাণ কোথাও নেই। একটা মানুষ দেখে বলা যায়, কারা জোড় বেঁধেছিল বটে—কিন্তু বিশ্বাস হয় না! মানুষ দেখলেই আর সব ভাল ভাল অজস্র ব্যাপার কি না সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জৈবতাকে বাঁচায়। কিন্তু ধুলগাড়িতে নারাং শুধু জোড়বাঁধার খেলা দেখে। দেখে দেখে গাজোলের হিজোলে মহিষের মতো খ্যাপে। শিং নাড়তে নাড়তে ধুন্ধুমার উপদ্রব সেই কালো বলশালী মহিষ এগিয়ে আসে আর এগিয়ে আসে। নারাং ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে ডাকে—এ্যাই সল্লা!

বনকাপাসির বড় সরল লাজুক অল্পভাষী আর গরীব মানুষ এই নারাং।···

সল্লা ভীষণ চমকে গিয়েছিল। হাঁড়িটা ফেলে সবে ঘুরেছে, নারাং তাকে ধরেছে। এই গাজোলে পরিত্যক্ত ইটভাটার শেয়ালরা হাঁসমুরগি ধরে, ছাগলের টুঁটি কামড়ায়। নারাং ধরেছে।

সল্লার পিঙ্গল চোখ দপ করে জ্বলে উঠেই নেভে। —অ, নারাং মুখপোড়া! তারপরই ব্যাপারটা এত হাস্যকর এত উদ্ভট লাগে তার, সে খিলখিল করে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে ভেঙে যায়, দোলে। তুই-ই! ও মিনসে, তুইও? আমার মরণ! ও নারাং, ই কী রে!

বড় সরল লাজুক সাত-চড়ে-রা-নেই মানুষ, সাতে-পাঁচে-না-থাকা নির্জন মানুষ, শুদ্ধ মানুষ নারাং। সল্লা হি হি করে হাসে। তার চুল খসে পড়ে। নারাংয়ের বুকে কিল মারে সকৌতুকে।—ওরে ডাকা! আমার কী হবে রে! তোরও পেটে-পেটে এই ছিল রে! সল্লা লুটিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে।

আবার বলে—ছাড় ছাড়। অশুচি আছি। দীঘিতে ডুবতে যাব। উদিকে মেয়েটা একা আছে। ছাড় নারাং, খেপিস না!

নারাং জানে, আস্তে আস্তে কানের কাছে বললে সল্লা শুনতে পায়। এবার সে তাই করে। কাকুতিমিনতি করে বলে—সল্লা সল্লা···ব্যস, আর কী বলতে হবে, ভেবেই পায় না। সল্লা সল্লা করে চলে ক্রমাগত।

সল্লা আপোসের সুরে বলে—আরেকদিন হবে, আরেকদিন। ছাড় নারাং, ছেড়ে দে। আমি অশুচি আছি রে, তোর দিব্যি। বিশ্বেস না হলে দেখ্ না···

তারপরই সল্লা এক ধাক্কা মারে। কামার্ত নারাং পড়ে যায়। তখন সল্লা হাসতে হাসতে দৌড়ে পালায়। পালাবার সময় তাকে শূন্য বাঁজাডাঙায় গাজোলে এক পেত্নীর মতো দেখায়। আস্তে আস্তে নারাং ওঠে। গায়ে কাদা। চুলে কাদা। লাল চোখে তাকিয়ে সল্লার দৌড়ে যাওয়া দেখে সে। ঠোঁট কামড়ায়। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে। দম আটকে যায়। পরিব্যাপ্ত ধূসরতার মধ্যে একলা বজ্রাহত তালগাছ মাথায় আগুন আর ধোঁয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দূরের হিজোলে খ্যাপাখ্যাপ্তো কালো মহিষ শিং নেড়ে গর্জন করছে। তাঁতিপাড়ায় আচমকা মাকু বন্ধ হলে খিলখিল হাসি, আর শংকরার বউ থপ থপ ছলাৎ ছলাৎ ভিজে কাপড়ে হাঁটছে, হঠাৎ ফিক করে হেসে যায়, হৈবরের বউয়ের হাতের চুড়ি বাজছে, স্তন দুলছে, পাছা টলছে, বৃষ্টি পড়ছে টুপ টাপ টুপ টাপ টিপ টাপ টিপ টাপ···

রাগে দুঃখে নারাং অস্থির হয়ে গাঁয়ে ফেরে। বড় আশা করে সল্লাকে

ধরেছিল। সল্লা তো কাকেও ফেরায় না। খোঁড়া ভিখিরি কৈজু ফকিরকেও এক দুপুরে সল্লার ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিল সে। আর নারাং তো পরিপূর্ণ মানুষ।

নাকি সল্লা তাকে অবহেলা করল? তার শরীলটাকে? হুঁ, সল্লা ভেবেছে, নারাং যদি পুরুষ, তবে তার বউছাড়া জীবন কেন? এই দুর্দিনে ছোটলোকের মেয়েরা ভিক্ষে করে খাচ্ছে। গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে পেটের জ্বালায়। আর নারাংয়ের বউ জোটে না! হুঁ, সল্লা তাই ভেবেছে। ওরে আমার ঢলানি রে! ধানকাটার সময় হোক। তখন নারাং বউ আনবে।

কিন্তু এই গাজোলে! নারাং গভীর দুঃখে ভাবে, ই কী উপদ্রব রে বাবা! এখন কী করি, কোথা যাই! মোন বশ মানে না। ই কী খ্যাপাখ্যাপ্তো কাণ্ড!

অন্যমনস্ক নারাং গাঁয়ে ঢুকে কতকটা হাল ছেড়ে দিয়ে মনে মনে গান গায়:

'দেহর গিদের করিস নে লো
দেহ কি তোর সঙ্গে যাবে।
চিত হয়ে ভাসবি জলে
দাঁড়কয়োতে ঠুকরে খাবে।...'

আর এখন বনকাপাসি কী নির্জন! আরামে ডুবে আছে, সুখে। ঘরে-ঘরে না-জানি কত জোড়বাঁধার খেলা। গাছেরও কোটরে পাখপাখালি পোকামাকড় জড়াজড়ি গতরের ওমে শান্ত। আর নারাং একলা। নারাং জ্বলতে জ্বলতে ঘুরছে।

হঠাৎ নারাং দাঁড়াল। নিমবনের ধারে সল্লার বাড়ি। ভাঙা পাঁচিলের পারে সল্লার ঘর। ঘরের দাওয়ায় একটা বুড়ি ছাগল বাচ্চাকে মাই দিচ্ছে, পায়ের তলায় নাদি। এক ঝাঁক বাচ্চা নিয়ে ধাড়ি একটা মুরগি চুপচাপ বসে আছে। আর চৌকাঠে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সল্লার মেয়ে। বিষ্টি দেখছে। উঠোনে জবা ফুল। লাউয়ের মাচায় লাউ ঝুলছে। মেয়েটার ফর্সা রং। পরনে ডুরে শাড়ি। একটু একটু দুলছে। নারাং তাকিয়ে থাকে।

বাড়ির কানাচে ধূর্ত শেয়াল যেমন তাকায়, এই গাজোলের দিনে।

মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিল সল্লা। স্বামী ভাত দেয়নি, নাকি ইল্লুতে স্বভাব, আর বোবা। ঠসীর মেয়ে বোবা। দলদলে চেহারা, বড় বড় চোখ, শাড়ির আঁচল চেবায়, নয়তো বুড়ো আঙুল চোষে, অনর্গল লালা ঝরে, কষায়।

নারাং ভাবে।

সল্লা নাকি মেয়ের পেট পুড়িয়ে বাচ্চাটা মেরেছিল, কাপাসের শেকড়-বাটা খাইয়ে দিলে গর্ভপাত হয়। সল্লা দাই, অনেক রকম ওষুধ জানে; উঠোনে কতসব জড়িবুটির গাছ।

নারাং কানের লতি চুলকোয়।

মেয়েটার নাম জ্যোৎস্না। নাকি যতীন মাস্টার দিয়েছিল—মেয়ে এবং নামটাও। নারাংকে হঠাৎ ঘুরে সে দেখতে পায়। কিন্তু তাকিয়েই থাকে। তখন নারাং লম্বা পায়ে এগিয়ে দাওয়ায় ওঠে। তারপর হেসে বলে—ভালো তো? মা কই? তারপর বুঝতে পারছে না কি না সন্দেহ, তাই হাত নেড়ে নানান ভঙ্গী করে বলতে থাকে—গাজোল লেগেছে দেখছ? চালভাজা খাওয়ার সময়। ভাল্লাগে না? মা আসতে দেরী হবে, কী বলছ? মাস্টারের বাড়ি ছাঁদাপত্তর মিটিয়ে নেবে, তবে তো? ছাগলের পাতা লাগবে না? এনে দেব পাতা? ওই তো জামগাছ আছে। দেব? ও জোছনা, আমার কথা বুঝতে পারছ তো?

কী বোঝে, মেয়েটা হাসে শুধু। লালা ঝরে। চিবুক গলা ও বুকের কাপড় ভিজে যায়। এখন তার মুখে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল। আঙুলের তলা দিয়ে পাপহীন সরলতারই স্রাব।

বনকাপাসির ফাঁড়িতে কোয়াটার নেই। চারদিকে উঁচু বারান্দাওলা বাংলো ঘরের মতো বিশাল ঘর, টিনের চাল। মাটির দেয়ালে পলেস্তারা, আলকাতরা ও চুনকাম আছে। চালের মটকায় দুধারে দুই সিংহ লেজ তুলে দাঁড়িয়ে ভিজছে, মধ্যিখানে বেখাপচা একটা টিনেরই ত্রিশূল। টিনে কবে আলকাতরা লেপা হয়েছিল। এখন মরচেধরা খয়েরি রঙ। সামনের বারান্দায় বড়ো টেবিল। পিছনে হাজত, একপাশে বড় কামরায় সার সার লোহার খাট, সেপাইরা থাকে। অন্যপাশে দুটো কামরায় একটায় এস আই, তিনিই ও সি, মধুবাবু থাকেন, অন্যটায় দুটো খাটে হাবিলদারজী আর এ এস আই গোপেন সরকার। মধুবাবুর ফ্যামিলি সদর থানার কোয়াটারে আছে। এ থানায় টহলদারি ডিউটি।

দুপুরের খাওয়ার পর মধুবাবু বারান্দার টেবিলে জরুরী ফাইল সই করছেন।

তেওয়ারী সেপাই স্পেশাল মেসেঞ্জার হয়ে কাটোয়া যাবে ফাইলটা নিয়ে। সে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। গোপেন জমাদার ঘরে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছে। হাবিলদারজী ডিউটিতে বাইরে। থানা সুমসাম চুপ। হাজতঘরে শুধু একজন গরুচোর কয়েদী। তাকে নিয়ে যাবে তেওয়ারী। শালা বেধড়ক পেঁদানি খেয়ে কবুল করেছে।

এই সময় আচমকা চেরা গলায় চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সল্লা তার বোবা মেয়েটাকে টানতে টানতে হাজির হল।

আর ঠিক এই সময় বৃষ্টিটাও যেন থেমে গেল। পশ্চিমে মেঘের খানিকটা সিঁদুরে হয়ে গেল, এবং একটা হাল্কা ক্লান্ত আলো গাছপালার মাথা ছুঁতে-ছুঁতে বারান্দায় এসে পড়ল। এই অবস্থায় তোলপাড় হয়ে মধু দারোগা খ্যাঁক করে গর্জাল—এ্যাই মাগী! চোওপ!

ভঙ্গী দেখে সল্লার চ্যাঁচানি থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মুখে উ উ উ উ চাপা কান্নার সুরটা থামে না। যে বিরাট শোকাবহ ঘটেছে নেপথ্যে, তার আবহসঙ্গীত। বোবা মেয়েটা আঁচল চুষতে চুষতে থানার দেওয়াল ও আসবাবপত্র, শেষে দারোগাবাবুকে দেখতে থাকে। দারোগা সই করতে করতে আড়চোখে তাকান। মেয়েটার চোখ সল্লার মতো কটা নয়, স্বাভাবিক। বড় চেরা চোখ। যতীন শালারই বা! চোখের তলায় খাঁজে কয়েক কুচি জল আর কোনায় পিচুটি লেগে আছে। আর, ঠোঁটের নিচে লাল দগদগে একটা রেখা। মধুবাবু ফাইল রেখেই বলেন—লোকটা কে?

পরক্ষণে খেয়াল হয়, দাই মাগীটা ঠসী। তখন ডাকেন—গোপেন! খিক খিক করে হাসেন। —গোপেন! রগড় দেখছ? কী কাণ্ড! এ্যাঁ?

—হ্যাঁ সার, বাদলায় মাথা গরম করেছে কোন বাঞ্চোত! হাসতে হাসতে গোপেন জমাদার বেরোয়।

ফাইল নিয়ে তেওয়ারী বোবা মেয়েটার দিকে তাকাতে তাকাতে হাজতের দিকে চলে গেল। মধুবাবু টেবিলের তলা দিয়ে পা লম্বা করতেই সল্লা গুঁড়ি মেরে তা আঁকড়ে ধরে এবং মাথা ঠোকে।—এ্যাই সল্লা! ছাড়্ ছাড়্ বলছি! নাম বল্!

গোপেন বলে—কানে শোনে না সার!

—এ্যাই ছুঁড়ি, কে ধরেছিল তোকে?

ফের গোপেন বলে—বোবা সার।

—এই মরেছে! বলে অভিজ্ঞ মধু দারোগা এত জোরে হাসেন যে, বারান্দার কোনায় খুঁটিতে বাঁধা রামখাসিটা মাথা নেড়ে ঘণ্টা বাজাতে থাকে। তার মাথার কাছে কচি পেয়ারাপাতা ডালসুদ্ধ ঝুলছে।

মধুবাবু পা টেনে ছাড়ান। সল্লা টেবিলের তলায় ফুলে ফুলে কাঁদে, মেঝেয় মুখ। সে বলতে চেষ্টা করে—আমার বাপমরা মেয়েটা দারোগাবাবু, আমার অনাথ বোকাসোকা মেয়ে···মুখে বাক নেই দারোগাবাবু, সরল নিদুষী মেয়েটা···

—জ্বালাতন! মধুবাবু ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে হাসেন। —গোপেন, মাগীকে ওঠাও তো। নাম জেনে নাও। আর···হঠাৎ চুপ করেন তিনি।

গোপেন সহজেই সল্লার একটা হাত ধরে টেনে বের করে টেবিলের তলা থেকে। সল্লা পুরো দমটা এতক্ষণে ছেড়ে জোরে কেঁদে ওঠে—লিমেগে পাপিষ্ঠি দারোগাবাবু, আপন-পর মা-মাসি বাছাবাছি নেই গো, বনকাপাসির পাঁটা দারোগাবাবু গো···

ফের ভুরু কুঁচকে তাকান মধুবাবু। তাঁকেই গাল দিচ্ছে না তো! পরে ফের খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসেন।

গোপেন ডাইরি খুলে পেনসিল বাগিয়ে ধরে। তারপর পায়ের বুড়ো-আঙুলে সল্লার পাছায় খোঁচা মারে। এই সময় গরুচোরের কোমরে দড়ি বেঁধে তেওয়ারী বারান্দা থেকে নেমে যায়। প্রাঙ্গণে আমগাছের তলায় বড় পাথর। তাতে বুটসুদ্ধ একটা পা রেখে লক্ষ্মণ সেপাই লাঠি ঠুকছিল হাঁটুর নিচের পট্টিতে। সে তেওয়ারীর সঙ্গে যাবে। তেওয়ারা গরুচোরের দড়ি তার হাতে দিলে হ্যাঁচকা টান মারে। গরুচোর আছাড় খায়। পাঁজরে লাঠির গুঁতো মেরে তাকে ওঠায় লক্ষ্মণ। জোর গলায় বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলে—শালা! মাগী ধরলেও তো বুঝতাম একটা কম্ম করলি। নয়তো গরু!

এই কথায় থানাসুদ্ধ রোদ ঝকমক করে মেঘের ফাঁকে। বড় ঘর থেকে খাটিয়া ছেড়ে সেপাইরা উঁকি দিতে এসেছে দরজায়। মুখে চাপা হাসি। লক্ষ্মণ আর তেওয়ারীজী গরুচোর ও ফাইল নিয়ে চারা খেজুরগাছের আড়ালে রাস্তায় নেমেছে। মধুবাবু পা দোলান। বোবা মেয়েটির কাপড়ের তলায় এভিডেন্স খুঁজতে পেলে আর কিছু চায় না কলম। ডিরেক্ট এভিডেন্স। আনমনে দারোগা বলেন—ভুজঙ্গ ডাক্তারকে ডাকতে হবে।

ওদিকে গোপেন সল্লার কানের কাছে ঝুঁকে বলে—কে, কে?

সল্লা পিঙ্গল চোখে একবার মেয়েকে দেখে ফুঁপিয়ে বলে—কে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কে?

এবার সল্লা মেয়ের সঙ্গে বোবার ভাষায় ভঙ্গী করে। মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকায় আর কাপড় চোষে। সল্লা কাঁদতে কাঁদতে বলে—মুখে বাক নেই, বলতে পারে না গো, হতভাগীর মরণ নেই। কে সব্বোনাশ করলে গো! এই গাজোলে কার মাথায় চিংরি পোকা (শ্রীহরি নামে পোকা) কামড়ালে গো!

বিকটমূর্তি গোপেন ধমকায়—চোওপ্! বিনিনামে মামলা হয় না!

সেই রুদ্র চাহনি দেখেই সল্লা ভড়কে কান্না থামায়। চোখ নাক গাল মুছে পা ছড়িয়ে বসে। শান্ত স্বরে বলতে থাকে—যতীন মাস্টারের বউটা বিয়োল। আঁতুড়ের কাজ সারতে মাঠে গেলাম। তা'পরে দীঘিতে ডুব দিলাম। মাস্টারের বাড়ি গেলাম। বললে, চাট্টি খেয়ে যাও—বেলা গড়িয়েছে। খেলাম। মেয়ের জন্যে একথালা ভাত দিলে, তাও নিলাম। তিন কাঠা চাল দিলে। পাঁচসিকে পয়সা দিলে। তাই সব নিয়ে ঘরে গেলাম। যেয়ে দেখি, মেয়ে আমার···ও দারোগাবাবু গো! আমার লিদুষী বাপহারা দুধের বাচ্চা গো!

আবার কেঁদে ওঠে সে। মধুবাবু হাই তুলে ওঠেন। —মাগীকে সামলাও গোপেন। নামটা জেনে নাও। ইয়ে—আমি এট্টুকুন গড়িয়ে নিই। যা হয় কারো।

তিনি পাশের ঘরে গেলে গোপেন সল্লার কানের কাছে মুখ এনে বলে—নাম বল্ না, নাম।

—হ্যাঁ, নাম। ···গোপেন আঙুল দেখায়।—রেপ কেস। ছ বচ্ছর।

সল্লা মাথা নাড়ে। দুবার নেড়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে লাফ দেয়। মেয়ের চুল ধরে গর্জায়—অত করে সাধছি, লোকটা কে চিনিস না হারামজাদী? তবু মুখে রা খুলল না—এত বড়টা কাণ্ড?

বলেই ঠাস করে এক চড়। মেয়ে মুখ ঘোরায়। আর সল্লার আঁচল থেকে ক্ষুনি কয়েকটা ডিম পড়ে ভেঙে যায়। থলথলে সাদা ও লাল হলুদ তরল জিনিসগুলো সিমেন্টের কালো মেঝেকে অশ্লীল করে ফেলে। গোপেন ক্ষেপে গিয়ে চেঁচায়—শালী ঘুষ দেবে! ঘুষের পিণ্ডি এনেছে!

সেপাইরা হো হো করে হাসে। সল্লা অপ্রস্তুত হয়ে মেয়ের চুল ছেড়ে দেয়। এবং সেই তরল জিনিসগুলো হন্তদন্ত হাতের চেটোয় তুলে আঁচলে রাখে। কাপড়টা পুরু, ময়লায় জমাট। ফুলে ওঠে।

যতটা পারে তুলে নিয়ে সে গোপেনের দিকে করুণ মুখে তাকায়। গোপেন

আবার হাসছিল। আবার কানের কাছে ঝুঁকে বলে—কী করে বুঝলি মেয়েকে নষ্ট করেছে? এ্যাঁ?

—মেয়ে যে সব দেখাল ছোটবাবু! ইশারা করে সব বললে!

—অ। তা, লোকটা কে?

—ইশারায় বলছে। মাথায় ঢ্যাঙা, আঙুলের মতো পাটকাঠি। কেমন করে এল, কেমন কী করল—কেমন করে পা ফেলে পালাল, তাও বলছে। বলছে, হাঁটু অব্দি কাপড় পরা।

—হুঁ, তোর কাকে সন্দেহ শুনি?

সল্লা তাকায়। মুখে দ্বিধার ভাব। ঠোঁট ফাঁক হয়ে থাকে। সরু সরু সাদা দাঁত দেখা যায়। সে আস্তে বলে—কাকে সন্দ করি বনকাপাসিতে? অমন লোক তো কত আছে ছোটবাবু! কিন্তুক···

—হুঁ?

সল্লা হঠাৎ জোরে মাথা দোলায়। বিড়বিড় করে বলে—না, না, না।

—এ্যাই সল্লা!

—উঁ?

—কী বলছিস?

সল্লা ফিসফিস করে বলে—ছোটবাবু, ধুলগাড়িতে ধুলফুল ফেলতে গেলাম। তখন···তখন ছোটবাবু, বাউরিপাড়ার লারাং আমাকে···আমার হাত ধরেছিল।

—নারাং বাউরি! বলিস কী?

—হাত ধরেছিল। ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেলাম। আর পিছু ফিরে দেখিনি। আমার বড্ড ভয় হয়েছিল, ছোটবাবু! মনে ভাবি এখন—লারাংই বা···

গোপেন সোজা হয়ে বসে।—কাশিম! অনাদি!

অনাদি সেপাই হাই তুলে বলে—স্যার!

—তোমরা দুজনে যাও। শালাকে নিয়ে এসো।

গোপেন ডাইরি লিখতে শুরু করে। সল্লা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে শুকনো গুগলি চোখে। একহাতে ধরা আঁচলে ডিম—এতক্ষণে রস চুঁইয়ে উরুর মধ্যে পড়ছে।···

সন্ধ্যার মুখে আবার টিপটিপানি শুরু হয়েছে। ঝোপেঝাড়ে পোকামাকড় ডাকছে! জোনাকি জ্বলছে খোকা খোকা। অদ্ভুত বাজনার মতো ট্রেন গেল স্টেশন ছেড়ে। কাজিপাড়ার মসজিদের মাথায় চড়ে নইম সেখ আজান দিল।

হরিহর রায়ের সিংহবাহিনী মন্দিরে ঘণ্টা বেজে আরতি হতে থাকল। ভাঙা ফুটো দালান, আর সারানো হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। খিড়কির দিকে গভীর ডোবা আছে। তার পাশে বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল। ঘণ্টা বাজলে জঙ্গলের বেলতলায় চকচকে মাটির বেদীতে মাটির সরায় ভাত তরকারি রেখে আসেন গিন্নিমা। একটা শেয়াল—শেয়ালরূপী দেবতা এসে রোজ খেয়ে যায়। যেদিন না খায়, বাড়ির মুখ শুকিয়ে যায়। দুপুর রাতে দালানের কার্নিস থেকে চুনবালি খসে পড়ে। ছেলেপুলের কাসি বাড়ে। রায়বাবুর বাত কটকট করে।

ভাতের সরা আর গামলায় জল রেখে প্রণাম করে গিন্নিমা তাড়াতাড়ি চলে যেতেই নারাং হামাগুড়ি দিয়ে বাঁশবন থেকে বেরুল। ভিজে বাঁশপাতায় খসখস শব্দ উঠল। বেদিটা গাজোলে কিনারায় ধসেছে কিছুটা। নারাং হাঁটু দুমড়ে জানোয়ারের মতোই চবচব শব্দে ভাত খায়। ডালভাত মাছভাজা তরকারি সব রকম। তারপর জল খায়। গলার কাছে জ্বালা, বুকে জ্বালা, ঠোঁটে নুনলঙ্কা ঠেকতেই হু হু জ্বলে যায়। অনেকটা কেটেছে। মানুষের দাঁতে নাকি বিষ থাকে। ঘা বিষিয়ে মরে যাবে না তো নারাং?

জল খেয়ে ঢেকুর তুলে সে চাপা আঃ উচ্চারণ করে। একটুখানি বসে থাকে ভিজে ঘাসের ওপর। তারপর চুপিচুপি বাঁশবনে গিয়ে ঢোকে।

বাঁশের পাতায় বৃষ্টির শব্দ। পোকামাকড় ডাকে। জোনাকি জ্বলে। নারাং চুপচাপ বসে থাকে। আস্তে, ফের চুপিচুপি বলে—আঃ! কোথায় শেয়াল ডেকে ওঠে, প্রথম প্রহর শুরু। পেঁচা ডাকে তিনবার ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও! বাঁশের বনে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ—অন্যমনস্ক হাওয়া এল এতক্ষণে। রাতের গানের মধ্যে নারাং বসে থাকে, আসরের ভিড়ে লুকিয়ে। ছোট্ট ঢেকুর ওঠে আবার। আবার সে গোপনে বলে—আঃ!

কতক্ষণ পরে সে বেরিয়ে পড়ে। ঘরে ফিরতে সাহস হয় না। ভয় এবং লজ্জা। নিজের ঘরকেও এত লজ্জা এখন! এত লজ্জা করে বনকাপাসিকে—তাই জঙ্গল ও অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ানো। বড় সরল নিতুষী মানুষ ছিল নারাং। মুখ তুলে কথা বলতেই পারত না। গতর ঘামিয়ে খাটত। অল্প কথায় জবাব দিত প্রশ্নের। সেই নারাং!

অন্যমনস্ক নারাং আনাচেকানাচে ঘুরে, কী ভেবে সন্ধ্যার বাড়ির কাছে যায়। আঃ ছি ছি ছি! বুক কেমন করে তার। বার বার জিভ কাটে আর মাথা দোলায়। আর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ভেসে আসে সন্ধ্যার কান্না। সুর ধরে দাই

মেয়েটি কাঁদছে। —আমার বোকাসোকা বাপহারা কচি মেয়ের এই সব্বোনা করে গেল রে! ওরে আমার দুধের মেয়ের গায়ে হাত দিতে মাথায় বা পড়ল না রে!···

নারাং মাথা দোলায়। পড়েছিল সল্লা, বজ্রাঘাত হয়েছিল। আর শরী শরীল বড় গাণ্ডার! ই শরীল কিছু বাছে না সল্লা, বিষম উপদ্রু! ব জ্বালা রে!···

—কে?

—আমি লারাং হুজুর, লারাং বাউরি।

—গোপেন! শালা এসেছে! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

থানার বারান্দায় হ্যাজাগ জ্বলছে। মধু দারোগা আলো চুরমার করে হাসেন গোপেন দৌড়ে বেরোয়। অনাদি আর কাশিম সেপাই হয়রান হয়ে এসে ত খেলতে বসেছিল। তারাও ছুটে আসে। এসেই বারান্দা থেকে লাফ দেয়।

নারাং ধরা গলায় বলে—আমার এট্টা কথা ছিল হুজুর!

আর কথা! অনাদির চড় তার কষার টাটকা ঘায়ে এবং কাশিমের বেটনে গুঁতো পাঁজরে, নারাং অঁক করে পড়ে যায়।

পড়ে থেকেই সে করজোড়ে বলে—আমার এট্টা কথা···

চ্যাংদোলা করে তাকে তুলে আনে ওরা। দারোগা বলেন—শাল কাপড়টা আগে দেখে নাও কাশিম। এভিডেন্স! আর···ইয়ে, যা সব কর করো হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

নারাংয়ের কাপড় দেখাদেখি হয়। কাশিম বলে—বিষ্টি সার। তার ও সেই দুপুরবেলা—এখন সাতটা বাজে প্রায়। কোন চিহ্ন নেই।

গোপেন বলে—রঘুবীরকে ডাকো। তোমাদের কম্ম নয়। তারপ আচমকা হিংস্র হয়ে চেঁচায়—অশ্লীল শব্দ। ···একটা বোবা মেয়ে, বাচ মেয়ে। শালা পাঁটার পাঁটা! দাও শালাকে ব্যাবাক খাসি কইরা।

হাজতের ফাঁকা ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে নারাং। দাঁতে দাঁত চাপে শরীল বিষম গাণ্ডার! হায় শরীল! তার সেই শরীল নিয়ে খেলা ক আইন। নারাংয়ের বজ্রাহত ঝলসানো চোখের কালো রঙ ফেটে গাজোরে টিপটিপ বৃষ্টির ফোঁটা অনর্গল টুপ টাপ টুপ টিপ টাপ, এবং বাইরেও।···

কালিকাপুরের বড় গোসাঞি

রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার। ট্রেন থেকে নেমে বড়গোসাঞি দেখলেন, তিনি একা। ছোট্ট স্টেশন। নিচু প্ল্যাটফর্ম। বিদ্যুৎ নেই, এখনও কেরোসিনের আলো। ট্রেনটা আওয়াজ দিয়ে চলে যাওয়ার পর নিঝুম সুনসান খাঁ খাঁ চারদিক। দশটা অব্দি চায়ের দোকানটাও খোলা থাকে না। শীত ও কুয়াশার ভেতর প্ল্যাটফর্মের গোটাতিনেক বাতি ভুতুড়ে চোখের মতন জুগজুগ করছিল। টিকিট দেখার জন্যও রেলের লোকের গরজ নেই।

স্টেশনঘরের বারান্দায় খোলামেলায় সিগন্যালের আপ-ডাইন দুটো-দুটো চারটে হাতল। একচোখো লণ্ঠন নিয়ে কম্বলজড়ানো সিগন্যালম্যান সেই অবলুণ্ঠিত হাতল টেনে তুলে স্টেশনঘরে ঢুকে গেল। বড়গোসাঞি একটু কেসে সাড়া দিলেন। তবু লোকটা ফিরেও চাইল না। আসলে শীত মানুষকে নিজের খোলসে ঢুকিয়ে দেয়। সরীসৃপের মতন একটা দীর্ঘ হাইবারনেশন জীব-জগৎকে নিজের ভেতর টানে।

কিন্তু বড়গোসাঞির কাছে শীত কিছু নয়, রাত বিরেতও কোনও ব্যাপার নয়। রুগীর খবর হলে যদি কথা দেন যাবেন, তো যাবেনই। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, শিল পড়ুক, যা কিছু ঘটুক। অবশ্য ট্রেন লেট করলে তাঁর কিছু করার নেই। পরনে গেরুয়া লুঙ্গি, গেরুয়া কাপড়ের পাঞ্জাবি, মাথায় গেরুয়া হনুমান টুপি—সেও পশমি নয়, আর গায়ে জড়ানো তুলোর কম্বল, কাঁধে ঝোলা, পায়ে বেঢপ গড়নের পামসু। এই দিয়েই অসংখ্য শীত কাটিয়ে দিলেন। এখন চুল দাড়ি গোঁফ পুরু ভুরু, সব সাদা। চামড়ায় ভাঁজের পর ভাঁজ, রোগা পাঁকাটি শরীর। কপালে সিঁদুরের ছোপ। গুজব আছে, বড় গোসাঞির শরীর পৃথিবীর সবরকম খারাপ জিনিস শুষে নিতে নিতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে যমও ওঁকে এড়িয়ে চলে। তান্ত্রিক প্রেতসিদ্ধ পুরুষ, শব নাকি যাঁর আহার, তাঁকে মৃত্যু ভয় পাবে, সেটা স্বাভাবিক।

মাইল দুই ধুলোর রাস্তা পেরিয়ে তবে রুগীর গ্রাম। দু'ধারে সদ্য ফসল-ওঠা ধুধু মাঠ শীতের জ্যোৎস্না ও কুয়াশায় কী এক অলীক ব্যাপকতা মনে হয়। রাস্তার ধারে হঠাৎ করে একটা ঝুপসি গাছ, কী গাছ বোঝা যায় না, টুকরো একেকটা জমাট অন্ধকারের মতন। সেখান থেকে একটা ছায়ামূর্তি ছিটকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

বড়গোসাঞি বললেন, কে গো ?

ছায়ামূর্তি ফিসফিসিয়ে অথবা সাপের হিসহিস শব্দে বলল, কী আছ দে !

না দিলে ?

কোপ খাবি।

বড়গোসাঞি হাসলেন। হুঁ কোপ না হয় খেলাম। কিন্তু পাবিটা কী ? একটা মড়ার খুলি, জড়িবুটি, আর বড়জোর কিছু খুচরো পয়সা। রুগী দেখে ফেরার পথে কোপ বসালে না হয় দুটো টাকাও পেতিস।

ছায়ামূর্তি স্থির। হাতে কী একটা দেখা যাচ্ছে, সেটাও স্থির।

মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ সেজে আছিস ! বড়গোসাঞি আরও হাসতে লাগলেন। বড়গোসাঞির চোখ রে মা ! রাতবিরেতেও সব দেখতে পায়। তবে কথা কী, এ রাস্তা ধরলি কেন ? অ্যাঁ ? কোন দুঃখে, মা ?

ছায়ামূর্তি যেভাবে গাছটার তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল, তেমনি ছিটকে চলে গেল। তারপর শূন্য ক্ষেতে কেটে নেওয়া ধান গাছের মুড়োয় খড়খড় অপস্রিয়মান শব্দ—কতক্ষণ, বহুক্ষণ। তাড়া খাওয়া প্রাণীর মতো পালিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দূরে।

বড়গোসাঞি একটু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর পকেট থেকে বিড়ি দেশালই বের করলেন। জীবনে এই প্রথম এমন অদ্ভুত হামলা। নিঃসাড় হয়ে গেছে শরীরটা। কিন্তু মন—বড়গোসাঞির মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক বরাবরই যেন ছাড়া-ছাড়া, তাই মনে একটা ছটফটানি। বিড়ির ধুঁয়োর সঙ্গে কথা বেরিয়ে গেল, কোন আবাগির বেটি গো ? এতক্ষণে দূরে একচিলতে আলো দুলতে দুলতে এই রাস্তা ধরে আসছিল। বড়গোসাঞি আড়ষ্ট পা ফেলতে লাগলেন রাস্তার ধুলোয়। যে মানুষ জীবনে কখনও ভয় কী জানেন না, তাঁর হঠাৎ এখন ভয়—ভীষণ ভয়, যেন ওই আলোটুকু দেখতে পেয়েই। অথচ অতর্কিত ওই নৈশ হামলায় একটা মস্ত জয় বলতে গেলে। সেই জয়ের সুখ নেই। কী একটা কষ্টই, এই প্রচণ্ড ভয়ের সঙ্গে। কাঁদতে ইচ্ছে করে কেন, যে-মানুষ কখনও কাঁদেননি ! ঠাণ্ডা হিম পাথুরে আঙুলে চোখের কোনা মুছলেন। লণ্ঠন নিয়ে দু'জন লোক। তাদের হাতে লাঠিসোটাও। বড় গোসাঞিকে সঙ্গ দিতে আসছিল। হরিহর গোমস্তা পাঠিয়েছেন। জানেন কথা দিলে গোসাঞিজি আসবেনই আসবেন। এত ঠাণ্ডায় কষ্ট করে দুটি লোকই ঝুঁকে তাঁর জুতোর ডগার ধুলো জিভে ও মাথায় নিল। নিজেদের নামও

জানিয়ে দিল, শম্ভু আর বলাই,। শম্ভু বলল, মনিবের নুন খাই, নিন্দে করব গোসাঞিজি! তবে ঠেলায় না পড়লে তো বেড়াল গাছে চড়ে না।

বড়গোসাঞি আস্তে বললেন, কেন?

বলাই হাসছিল, অথবা শীতের কাঁপুনিতে ওইরকম মনে হয়। হুঁ হুঁ করে অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলল, রুগীর অবস্থা সাংঘাতিক। সামলানো যায় না। গতিক দেখে গোমস্তামশাই বললেন, যেখানে খোঁজ পাস, খুঁজে নিয়ে আয়।

বুঝেছি। বড়গোসাঞি থামিয়ে দিলেন তাকে। তারপর ভাবলেন, কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা বলবেন। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করল না। অন্তত এখনও মনের যা অবস্থা, স্থির হতে পারছেন না। সময়মতো অবশ্য সকলের সামনে বিশদ বিবরণ দেবেন ঠিক করলেন। কারণ এ তাঁর একটা জয়ের ঘটনা। এটা তাঁর পসার বাড়িয়ে দেবে আরও। গুজব রটবে অনেকরকমের। কেউ বলবে অমানুষের ব্যাপার, অর্থাৎ অশরীরী আত্মার হামলা। ভূতপ্রেত তাড়ানো যাঁর কাজ, তাঁর ওপর ভূতেদের মোটেও খুশি থাকার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং হামলা তো হবেই। তার চেয়ে বড় কথা, ওই ভূত সেই ভূত, যে হরিহর গোমস্তামশাইয়ের মেয়েকে হাড়-জ্বালান জ্বালাচ্ছে বিয়ের পর থেকে। জামাই নিয়ে যাওয়ার নামই করে না।

অবশ্যি ভূতেরা কোপ বসানোর কথা বলবে কেন, কী আছে দে বলবে কেন, এগুলো রহস্য হলে তারও জবাব আছে। যার খুলি, সে ফেরত চাইতে এসেছিল। আর 'কোপ' কথাটার আধ্যাত্মিক মানেও হয়।...

বাড়িটা একতলা, পুরনো। রাতদুপুরেও বাইরের ঘরে একদঙ্গল লোক অপেক্ষা করছিল, বড়গোসাঞির কীর্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখবে—যা এতকাল কানেই শুনেছে। এই সাদামাটা লৌকিক পৃথিবীতে কখনও-সখনও অলৌকিকের একটু আভাস যারা পেয়ে আসছে, তারা সেই অলৌকিককে পুরোপুরি দেখতে পাবে। মুখগুলো বড়গোসাঞিকে দেখে স্থির হয়ে গেছে। তুলিতে ধ্যাবড়া করে আঁকা বড়-বড় সব চোখ। সেই চোখে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের স্বাবতীয় আদিম বিস্ময়। কীভাবে খবর রটে গিয়ে দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল বাড়ির সামনে। জ্যোৎস্নায় আর ঠাণ্ডায় পুরনো পৃথিবীর জরাজীর্ণ টেরাকোটা চিত্রিত মন্দিরের আদল কাপাশি গাঁয়ে এক শীতের নিশুতি রাতে ফুটে বেরিয়েছে। সবেতেই রহস্য জড়ানো এখন।

গোমস্তামশাই প্রণাম সেরে চোখে জল নিয়ে বললেন, জানা কথা, আপনি আসবেন। আর আসবেন বলেই যেন আজ সারাটা দিন যা করছে, হুলুস্থুল একেবারে। ভাঙচুর, গালমন্দ—অকথ্য। পালাতে চাইছে খালি। দশজন ধরে আটকানো যায় না, এমন অবস্থা।

বড়গোসাঞি একটু হেসে বললেন, এখন কীরকম?

ঘণ্টাখানেক হল, শুয়ে আছে চুপচাপ।

খেয়েছে কিছু?

হুঁ, দু'মুঠো মাত্র। তাও ফেলে ছড়িয়ে।

ভারিক্কি চেহারার একজন লোক রহস্যের ভঙ্গী করে বলল, গোসাঞিজি তলাটে পা দিয়েছেন। এইতেই আদ্ধেক জব্দ।

ভিড়টা শীতকাতুরে হাসতে লাগল।

বড়গোসাঞি বললেন, চলুন গোমস্তামশাই। রুগী দেখি।

হরিহর গোমস্তা বললেন, জল গরম করতে বলেছি। হাত-মুখ ধুয়ে একটু চা খেয়ে নিন আগে।

হচ্ছে। আগে রুগী দেখি, চলুন।

তিনদিকে সারবন্দি একতলা ঘর। টানা বারান্দায় থামের পর থাম। থামের আড়ালে মেয়েরা। মধ্যিখানে উঠোন। উঠোনের একধারে দুটো ধানের গোলা। অন্যধারে কুয়োতলা। সেখান থেকে শিউলির আবছা সুঘ্রাণ ভেসে এল। উঠোনে নেমে হরিহর গোমস্তা খুবই চাপা স্বরে বললেন, শুরু খিড়কির ঘাট থেকে। ওই দেখছেন খিড়কির দরজা। দরজার পর বাঁধানো ঘাট। পুকুর। ওই ঘাটে চুপচাপ বসে থাকত। হঠাৎ এক রাত্তিরে—এমনি জ্যোৎস্না ছিল, বুঝলেন? দেখি, ওই দরজাটা খোলা। ঘাটে বসে আছে কেউ সাড়া দিল না। কাছে গিয়ে দেখি ঝুমা। তারপর জানেন? হঠাৎ বিকট হেসে উঠে অকথ্য—

বড়গোসাঞি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, রুগী কোথায়?

প্রকাণ্ড সেকেলে পালঙ্কে রুগী শুয়ে ছিল চিত হয়ে। বুক অব্দি লেপ। চোখদুটো বন্ধ। একটু দূরে গাদাগোদা টেবিলের ওপর নকশাদার কাপড়ের ঢাকনা, তার ওপর সেজবাতি।

বড়গোসাঞি ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। বনেদি পয়সাওয়ালা পরিবার বলে ধারণা হল। পালঙ্কের আষ্টেপিষ্টে কারুকার্য।

প্রাচীন গ্রামীণ ছুতোররা খুব নিষ্ঠাবান আর পরিশ্রমী ছিলেন। নেটের ধপধপে সাদা মশারিটা খাটানো হয়নি দেখে বড়গোসাঞি বললেন, মশা লাগে না?

লাগে। গোমস্তামশাই আস্তে বললেন। কিন্তু বলে, দম আটকে যাচ্ছে। ছিঁড়ে ফালাফালা করার অবস্থা।

বড়গোসাঞি পালঙ্কের ধারে দাঁড়িয়ে রুগীকে দেখতে থাকলেন। বাইশের মধ্যে বয়স, পাতাচাপা ঘাসের রঙ, চোখের তলায় ছোপ, সুন্দর বলা উচিত, সেই সুন্দরের গায়ে অসুন্দরের ছায়া পড়েছে। আহারে! ঝুলির ভেতর বাঁ-হাত ভরে মড়ার খুলিটি ছুঁলেন।

তারপর ডানহাতের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে তার দুই ভুরুর মাঝখানে রাখলে সে চোখ খুলল।

চাউনি দেখে হরিহর গোমস্তা চমকে উঠলেন। এ কার চোখ?

বড়গোসাঞি ডাকলেন, মা রে! এই তাঁর ডাক। এই ডাকই মন্ত্র, লোকেরা জানে।

রুগী নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। চোখের তারা কোনার দিকে—যেদিকে বড়গোসাঞি।

হরিহর গোমস্তা সস্নেহে, একটু ব্যাকুলভাবে বললেন, ছাখো, ছাখো—কে এসেছেন! ও ঝুমা! ছাখো তো, চিনতে পারো নাকি!

বড়গোসাঞি পালঙ্কে তার পাশে বসলেন। ভুরুর মাঝখানে আঙুল তেমনি রাখা। একটু হেসে বললেন, কী? কেমন বোধ করছিস রে মা? কথা বল্ আমার সঙ্গে। আহা, বল্ একটা-দুটো কথা।

তুমি কে?

আমি? বড়গোসাঞি হাসলেন। চিনতে পারছিস নে আমাকে? দেখিসনি কখনও?

নাঃ। কে তুমি?

কামরূপ-কামিখ্যের পাহাড়ে, সেই যে রে, মন্দিরের পেছনকার বটতলায় দেখা হল। প্রণাম করে বললি, আমার মোক্ষ হয় না কেন বাবা? আমি বললাম, আবার যখন দেখা হবে। তুই বললি, উত্তরে? আমি বললাম, না—পশ্চিমে। কোথায়? গঙ্গার ওধারে। হুঁ, তাহলে সত্যি দেখা হল!...

গোমস্তা-গিন্নি বেঁচে নেই। একটি মোটে মেয়ে। বিধবা পিসির হাতে

মানুষ। সেই পিসি এখন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। বারান্দায় মেয়েদের ভিড়। সবাই দেখতে চায়, ভেতরে কী ঘটছে। এখন এই সব রহস্যময় কথা প্রেতসিদ্ধ পুরুষ কালিকাপুরের বড়গোসাঞির মুখে শুনে তারা নিঃশব্দে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে মুখ বাড়াতে চাইছিল।

গোমস্তামশাইয়ের দিদি শক্ত মানুষ। পিঠে চাপ পড়ায় ঘুরে হাত চালালেন। চটাস করে শব্দ হল। গোমস্তামশাইও শব্দহীন গতিতে তেড়ে এলেন মারমুখী হয়ে। ভিড়টা ছত্রাখান হয়ে উঠোনে পড়ল। চড়টা পড়েছিল কার মুখে, বোঝা গেল না।

আচ্ছন্ন স্বরে প্রেতিনী বলল, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

বড়গোসাঞি বললেন, ফিরে যাবি কামিখ্যে পাহাড়ে?

যেখানে খুশি।

তবে দেরি কেন রে মা? এক্ষুনি আয়, বেরিয়ে পড়ি।

সত্যি?

সত্যি না তো কি মিথ্যে? বড়গোসাঞি উঠে দাঁড়ালেন। আয়, উঠে পড়। আর—ঝুলির ভেতর থেকে মড়ার খুলিটি বের করে দেখালেন। আর এটার মধ্যে ঢোক। হুঁ—ঢুকে পড়।

প্রেতিনী সেইরকম চোখে মড়ার খুলির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ভয় করছে। বড্ড ভয় করছে। ওটা সরাও!

খি খি করে হাসলেন সিদ্ধপুরুষ। ভয় কিসের রে? নিজের জিনিসকে কেউ ভয় করে? এটা তো তোরই মাথা। এর মধ্যে তুই ছিলিস। এই ছাখ না, আমারও এরকম একটা জিনিস আছে। নিজের কপালে আঙুল ঠুকে দেখিয়ে দিলেনও।

তারপর 'ঢোক, ঢুকে পড়' বলে তার চোখের কাছে খুলিটা নিয়ে গেলে সে ধুড়মুড়িয়ে উঠে বসল। পরনে অগোছাল শাড়ি। খোঁপা ভেঙে একরাশ চুল এলোমেলো। গোমস্তামশাই হাঁকলেন, সরে যাও! সরে যাও সব। রাস্তা দাও।

ঠাণ্ডা হিম চাঁদটা এখন আকাশের মাঝখানে। উঠোন জুড়ে জ্যোৎস্না এখন আতঙ্ক। দরজায় বেরিয়ে প্রেতিনী চিকুর ছেড়ে কাঁদল হঠাৎ, আমি চলে যাচ্ছি-ই-ই! বড়গোসাঞি তার পেছনে, হাতে মড়ার খুলি। উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে মেয়েটার শাড়ি খসে গেল।

খিড়কির দরজার কাছে পৌঁছুলে গোমস্তামশাই হন্তদন্ত এগিয়ে দরজাটা খুলে

দিলেন। সামনে শানবাঁধানো ঘাট। দুধারে কলাগাছ কালো এবং ধূসর হয়ে আছে শীতের কুয়াশায়। কুয়াশা পুকুরের জলের ওপর পর্দার মতো টাঙানো। প্রেতিনী সেই পর্দাটা ফাঁক করে চলে গেল।

ঘাটের চত্বরে রেখে গেল হরিহর গোমস্তার মেয়েকে। বড়গোসাঞি বললেন, চলে গেল! গোমস্তামশাই, আপনার মেয়েকে এবার তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন। পায়ের তলায় শুকনো সেক দিতে হবে।...

রাতে ভাল ঘুম হয়নি বড়গোসাঞির। এত সহজে একটা রুগীর ভূত ছাড়ানো, এও একটা জয়। তবু গত রাতে মাঠের মধ্যে সেই হামলার কথাটা মন থেকে যাচ্ছিল না। কী একটা কষ্ট কাঁটার মতন খচখচ করে বিঁধেছে সারাটি রাত।

রাতচরা ভয়ডরহীন প্রেতসিদ্ধ তান্ত্রিক পুরুষ তিনি। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। শহর গঞ্জ গ্রাম সবখান থেকে তাঁর ডাক আসে। একবার কাটোয়ায় গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলেন। মড়ার খুলিটা বের করতেই দুই ছোকরা গুণ্ডা থ। বলেছিল, উরে ব্বাস! এ শালাও দেখি এক ধান্দাবাজ! তারপর হাসতে হাসতে চলে যায়। সেও একটা জয় বলে ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু 'শালা' আর 'ধান্দাবাজ' বলায় খুব কষ্ট হয়েছিল বড়গোসাঞির। এ কষ্ট সে-কষ্ট নয়। পুরুষমানুষ গুণ্ডা হবে, রাহাজানি করবে, ছিনতাইবাজ হবে এবং বেগতিক দেখলে কোপ বসাতে চাইবে বা বসাবেও। কিন্তু মেয়েরা কোমল জীব। তারা কেন এমন হবে?

বড়গোসাঞির সংস্কারে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে গত রাতের ঘটনা। সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য করে চা খেতে খেতে খবর নিলেন, মেয়ে ভাল আছে। ঘুমিয়েছে। এখন রান্নাঘরে পিসিমার কাছে বসে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে। হরিহর গোমস্তা খুশিখুশি মুখে বললেন, জামতাম পায়ের ধুলো দিলেই কাজ হবে। সে জন্যই তো শম্ভু আর বলাইকে পাঠিয়েছিলাম। যেখানে যে-অবস্থায় পাস, ধরে নিয়ে আয় গোসাঞিজিকে।

বড়গোসাঞি বললেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কোথায়?

টাউনে। খুব ভাল অবস্থা। জামাই কারবারি ছেলে। মস্ত ফ্যামিলি বলতে গেলে।

গোমস্তামশাই চাপা গলায় বললেন ফের, আসলে পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে। টাউনের পরিবেশে মানিয়ে চলতে পারে না। তাছাড়া আমার বেহান একটু রগচটা স্বভাবের। বাড়িতে চার-চারটে বউমা। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। বুঝলেন আশা করি।

হুঁ, সেটাই কথা। বড়গোসাঞি শ্বাস ছেড়ে বললেন। দেহে আত্মা আছে। আত্মা দুঃখ-কষ্ট পেলে দুর্বল হয়। তখন অশুভ শক্তি সহজে বাগে পায়। জামাইবাবু আসেন-টাসেন না আর?

হরিহর গোমস্তা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না। কী উদ্দেশ্য, কে জানে!

বড়গোসাঞি বললেন, সচরাচর একটা-দুটো দিন থেকে রুগীর অবস্থা দেখে তবে যাই। কিন্তু উপায় নেই। ব্রহ্মপুরে একটা রুগী দেখতে যেতে হবে। খুব সাংঘাতিক অবস্থা মেয়েটার। অবশ্যি এখনও বিয়ে হয়নি, ভাগ্যিস!

হরিহর গোমস্তা দুঃখিত ভঙ্গীতে একটু হাসলেন। একটা ব্যাপার বুঝি না। বলুন তো গোসাঞিজি, কেন এমনটা হয়?

কী?

এই ধরুন, খালি মেয়েদের ওপরই প্রেতশক্তির দৃষ্টি কেন?

আহা, অবলা জাত! বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কোমল মন।

কে জানে! বলে গোমস্তামশাই নিজে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। আমার কিন্তু উল্টো ধারণা হয়। শোনেন তো বলি।

হুঁ, বলুন।

আপনি তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। হরিহর গোমস্তা একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন। শুনেছি, তন্ত্রে শক্তিই মূলাধার। তিনি নারী। মহাকালী। অবশ্যি ওসব শাস্ত্র-টাস্ত্র আমার ভাল জানা নেই। তবে বিষয়ী মানুষ। সাংসারিক অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মেয়েদের মন যেন শক্তই। আমরা যা সইতে পারি না, মেয়েরা তা হাসিমুখে পারে। অনেক মেয়ে দেখেছি, পুরুষমানুষের কান কাটতে পারে বিষয়বুদ্ধিতে। যেমন ধরুন, বেলপুকুরের নগেনের বউ। নগেনকে চিনতেও পারেন। নগেন মুহুরি। এখন বউয়ের দৌলতে বিরাট অবস্থা।

রোদ্দুর ফুটেছে দেখে বড়গোসাঞি আলোচনা চাপা দিয়ে বললেন, এখনই উঠতে হবে। নটা পাঁচে ট্রেন। কৈ, একবার মেয়েকে দেখে যাই, ডাকুন।

হরিহর গোমস্তা পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরলেন। বরং ভেতরে আসুন না! রর ঘরে কেন? আপনি আমাদের আপনজন।

বড়গোসাঞি অগত্যা ভেতরে গেলেন।

উঠোনে সবে কয়েক খাবলা রোদ্দুর পড়েছে। কুয়োতলায় একটা মেয়ে াড়ি-থালা নিয়ে ছাই ঘষছে। পাড়াগাঁয়ের গেরস্থ ভদ্রলোকের সকালবেলার ংসার যেমনটি হয়। জমিদারি আমলে গোমস্তাগিরি করে বিষয়সম্পত্তি ভালই রে নিয়েছেন মনে হচ্ছিল বড়গোসাঞির। এই সময়টাই তাঁর মতো প্রেতসিদ্ধ রুষের একটা সংকটকাল। কারণ রুগী এখন বেগড়বাঁই করলে আটকে ড়বেন। পাওনাকড়িও আটকে যাবে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হল, সংকট নেই। কশোটা টাকা চোখ বুজে দাবি করা যায়। তবে পুরোটা পাবেন বলে মনে না। ঘোর বিষয়ী মানুষ হরিহর ঘোষ।

রুগী বড় চোখে দেখছিল। বড়গোসাঞি হাসলেন। কী রে মা? শরীর মন এখন? বলে নিজেই নিজের মুখে জবাব দিলেন, ভাল আছিস। ভালই কবি। চিন্তা কিসের? বাপের একমাত্র সন্তান। যা কিছু সবই তোর। কষ্ট যার নেই, তার কষ্ট কী? শাস্ত্রে বলেছে অন্নই ব্রহ্ম। তুই তো ক্ষময়ী রে মা!

গোমস্তামশাই বললেন, প্রণাম করো মা! কালিকাপুরের বড়গোসাঞিজি! া সিদ্ধপুরুষ।

রুগী রান্নাঘরের বারান্দা থেকে নেমে এসে নিঃশব্দে পায়ের ধুলো নিল। গোসাঞি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর খি খি করে লেন হঠাৎ।...এমন বড়লোকের মেয়ে তুই। তোর এ অবস্থা! আর কাল ত্তিরে কী হল শোন্। তুইও মেয়ে, সেও একমেয়ে। মাঠের মাঝখানে রাস্তা টকে বলে, কী আছে দে, নৈলে কোপ খাবি। এটাই তো সংসারের বড় না। অন্নের ধান্দায়—আহারে!

রুগী শুনছিল। শুধু তাকিয়ে রইল।

গোমস্তামশাই অবাক হয়ে বললেন, সে কী! আপনার ওপরও?

হ্যাঃ। বড়গোসাঞি তাচ্ছিল্য করে বললেন। শেষে বাপ বাপ করে লিয়ে বাঁচল!

গোমস্তামশাই বললেন, বড্ড বেড়েছে হারামজাদি। এবার শায়েস্তা না করলে দেখছি!

চেনেন ? চমক খাওয়া গলায় প্রশ্ন করলেন তন্ত্রবাগীশ সিদ্ধপুরুষ।

চিনি। শক্ত মুখে হ'রহর গোমস্তা বললেন। আসলে পুলিশকে হাত ক ফেলেছে। ওদিকে মুরুব্বিও ধরেছে মনে হয়। আজকাল পাড়াগাঁয়ে শ্রাস বলতে তো কিছু নেই। আগের দিন হলে পঞ্চগ্রামী করে মাথা ন্যাড়া করে— আচ্ছা, দেখছি।

একটু হাসলেন বড়গোসাঞি। আপনাকে দেখতে হবে না গোমস্তামশাই আমিই দেখব'খন। বাড়ি কোথায়, কী নাম ?

সে খবর দেওয়ার আগেই গোমস্তামশাইয়ের বিধবা দিদি ঝাঁঝালো স্বরে ব উঠলেন, নিজের কথাটা আগে বলো ওঁকে। পঞ্চগ্রামী, মাথা-মুড়োনো, দেখছি টেখছি পরে কোরো।

বড়গোসাঞি তাকালেন হরিহর গোমস্তার দিকে। গোমস্তামশাই চটতে গি হেসে ফেললেন।—আর বলবেন না। আমাকেও পাঁচটাকা গচ্চা দিতে হল একরাত্তিরে। তবে চেয়েই নিয়েছিল। কোপ মারবে বলেনি। ব্ল্যাকমেল— বলে চেপে গেলেন।

তাঁর দিদি বললেন, জব্দ করতে পারলে গোসাঞিজিই পারবেন। না ঠিকানা বলে দাও। অত ভয় কিসের ?

গোমস্তামশাই গলা চেপে বললেন, কপালীতলার কুঠো বাবুরামের বউ বাবুরাম লোকটা খারাপ ছিল না। রেলে গ্যাংম্যানের চাকরি করত কুষ্ঠব্যাধি হয়ে চাকরি গেল। কাটোয়ার ওদিক থেকে ভাগিয়ে এনেছি মেয়েটাকে।

বড়গোসাঞি দ্রুত বললেন, আর বলতে হবে না।···

তাহলে সেই ! ধুলোয় ধূসর রাস্তায় স্টেশনের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলে বড়গোসাঞি। একটা বছরে কী অদ্ভুত পরিবর্তন ! জীবিতদের স্বভাবের সঙ্গে মৃতদের স্বভাবের এখানেই তফাত। মৃতেরা একরকমই থেকে যায়। জীবিতর বদলায়। কপালীতলা স্টেশনের সিগন্যালপোস্টের কাছে শেষ হেমন্তের নিরু সন্ধ্যায় মুখ ফসকে অথবা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলেন, মরবি কেন গে মা এ বয়সে ? অন্ন জোটে না—কাজকর্ম করে খা। যদি তাও না জোটে মেরেধরে কেড়েকুড়ে খা—সেও ভাল। মরা ভাল না। মরলে ভূতপেত্নে

হবি। নিজে কষ্ট পাবি, অপরকেও কষ্ট দিবি। তার মানে আমাকেই ভোগাবি আর কী!

হাসতে হাসতে উপদেশ। ঝুলি থেকে মড়ার খুলিটাও দেখিয়েছিলেন। এই ছাখ্, এ এক আবাগীর বেটি। কামরূপ কামিখ্যের নাম শুনেছিস? সেখানকার মেয়ে। অন্ন জোটে না বলে রাতবিরেতে উঠোনের গাছে ঝুলে পড়েছিল। যাক সে-সব কথা। আসল কথাটা হল, বেঁচেবর্তে থাকতে হলে বুদ্ধিশুদ্ধি চাই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রেললাইনের ওপারে খানিকটা হাঁটলে ছোট্ট নদী কপালী। তার পাড়ে উঁচু মাটির ওপর তেমনি ছোট্ট একটা বসতি। গ্রামসমাজের নিচুতলার মানুষজনের সংসার। নদীটার তলায় এই শীতের মাসে চাপ-চাপ বালি, আব্রুহীন লাগে। একচিলতে জল ছটফটিয়ে যন্ত্রণার মতন বয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল, গত বছর শেষ হেমন্তের সন্ধ্যায় হাঁটুজল ছিল। সেই জল পেরিয়ে খাড়া পাড়ে উঠে পায়ে চলা একফালি সরু পথ ঝোপজঙ্গলের ভেতের দিয়ে এগিয়ে কুঠো বাবুরামের বাড়ি। বাড়ি মানে একটা নিচু, হুমড়ি খেয়ে পড়া ঘর মাত্র। মাটির দেওয়াল, সিটিয়ে থাকা খড়ের চাল। উঠানে একটা পেয়ারাগাছ, পঞ্চমুখী জবাফুলের ঝাড়। লম্পের আলোয় অবাক হয়ে ফুলগুলো দেখতে দেখতে কেন মাথায় এসেছিল কে জানে, এইসব সুন্দর-সুন্দর জিনিস সত্ত্বেও পৃথিবীতে অন্নকষ্ট নামে একটা ঘটনা আছে। সেই কষ্ট রেললাইনে মরতে নিয়ে যায় মানুষকে। অবশ্য কথাটা কুঠো বাবুরামকে খুলে বলেননি। শুধু ইশারায় সাবধান করে দিয়েছিলেন তার বউসম্পর্কে। তখন মেয়েটি অজ্ঞান। কোমলতা মৃত্যুর আবেগ সামলাতে পারে না। অনেক চেষ্টার পর জ্ঞান ফেরাতে পেরেছিলেন। দুটো টাকা জোর করে গছিয়ে দিয়েছিলেন।

ট্রানজিস্টারের গানবাজনা কানে এল বড়গোসাঞির। সরু রাস্তার শেষে পৌঁছে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। পেয়ারাগাছটা আছে। পঞ্চমুখী জবাঝাড়টাও আছে। কিন্তু ছোট্ট ঘরটাতে এখন টালির চাল। তকতকে নিকোনো দাওয়া। ঝকঝকে উঠোন। উঠোনে চট বিছিয়ে বিস্কুট দুটি পা ছড়িয়ে বসে বাবুরাম ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছে। বড়গোসাঞি মনে মনে বললেন, ভাল। খুব ভাল। মুখে অভ্যাসমতো ডাকলেন, মা রে!

ঘর থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল বাবুরামের বউ, এক হেমন্তশেষে যে সিগন্যালপোস্টের কাছে মরবে বলে দাঁড়িয়ে ফুঁসছিল। বড়গোসাঞি বললেন, মা রে কেমন আছিস?

বাবুরাম ঘুরে চেনার চেষ্টা করছিল, ট্রানজিস্টারের আওয়াজ কমিয়ে দিয়ে। তার বউয়ের পরনে ডোরাকাটা হলুদ-কালো শাড়ি। ছুটে এসে বড়গোসাঞির পায়ে লুটিয়ে পড়ার মতো প্রণাম করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বলল, জানতাম, বাবার দেখা পাব। তাই ঘরে আছি।

বলে ঘর থেকে একটা মোড়া এনে বাবুরামের অনেকটা তফাতে রোদ্দুরে রাখল।

বড়গোসাঞি বসে বললেন, বাবুরাম, আমি কালিকাপুরের গোসাঞিজি। সেই যে গতবছর সন্ধেবেলা—

বাবুরাম গোঙানো গলায় বলল, চিনেছি।

তারপর সেখান থেকেই ঝুঁকে দুটি বিকল হাত বাড়িয়ে নমো করল।

ওষুধ দিয়েছিলাম। খাওনি বোঝা যাচ্ছে। বড়গোসাঞি বললেন। কেন রে বাবা? বিশ্বাস হয় না?

বাবুরাম ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরে বলল, কালরোগ গোসাঞিঠাকুর। কিছুতে কিছু হবে না।

তার বউয়ের মুখটা নিচু। পায়ের বুড়োআঙুলে উঠোনের খটখটে শক্ত মাটিতে আঁক কাটছে। বড়গোসাঞি একটু হেসে বললেন, গিয়েছিলাম কাপাসির গোমস্তামশাইয়ের বাড়ি, তার মেয়েকে দেখতে। আসলে মেয়েরা যতক্ষণ অবলা হয়ে থাকে, ততক্ষণ দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা। রুখে দাঁড়ালেই সব চলে যায়। ইশারায় বলে দিলেও তো সবাই বোঝে না—কেউ কেউ বোঝে। এই আমার কথাই ভেবে ছাখ না রে মা। আমি কামরূপ-কামিখ্যের লোক। তোদের দেশে প্রায় দেখতে দেখতে বিশ-বাইশবছর কেটে গেল। ছিলাম বরগোহাঞি, হয়েছি বড়গোসাঞি। বেশ—ভাল। কিন্তু নিজের মেয়েটাকেই বোঝাতে পারিনি। উঠোনের গাছে ঝুলে—তো এই ছাখ্, এখনও তাকে সঙ্গে করে ঘুরছি।

বড়গোসাঞি ঝুলি থেকে মড়ার খুলিটি বের করলেন। ধরা গলায় ফের বললেন, কষ্ট পাওয়া মেয়েগুলোর সব কষ্ট এর মধ্যে চালান করে দিই। গোমস্তামশাইয়ের মেয়ের গুলোও দিয়েছি। এর মধ্যে অনেক কষ্ট ঠাসা। হাসতে লাগলেন বড়গোসাঞি। অবশ্য তাঁর এই হাসিতেও কষ্ট আছে। হাসির সঙ্গে কান্নার ওতপ্রোত শব্দও খুঁটিয়ে শুনলে টের পাওয়া যায় হয়তো।

খুলিটা দেখে প্রাক্তন গ্যাংম্যান অদ্ভুত হাসতে লাগল। তার বউ খুব আস্তে বলল, ক্ষ্যামা দেবেন বাবা!

বড়গোসাঞি খুলিটা ঢুকিয়ে রেখে বললেন, আসব জানতিস বললি!

ক্ষ্যামা দেবেন। ভুল হয়েছিল।

ছেড়ে দে। গাড়ির সময় হয়ে এল। উঠি।

এইসময় এক ঝাঁক মেয়ে এল, কলকলিয়ে আসা পাখিরই ঝাঁক। কারুর াখে, কারুর মাথায় ছোট-বড় পুঁটুলি। সল্লাদি, যাবে না নাকি গো আজ? াড়ির সিগন্যাল পড়েছে হুই ছাখো। বলে জবাব না শুনেই হন্তদন্ত নদীর ক ঝোপঝাড়ের ভেতর চলে গেল।

বড়গোসাঞি নিমেষে বুঝলেন ওরা চাল-চালানী মেয়েরা। বললেন. আয় ব মা! কারবার বন্ধ রাখতে নেই। যাবি তো, আয়। সিগন্যাল দিলে কী বে, গাড়ির সময় আছে।

াবুরামের বউ সল্লা—সরলা একটু হাসল। আজ থাক্। কত ভাগ্যে লেন। বসুন। নতুন এনামেলের হাঁড়ি আছে ঘরে। চালডাল দিচ্ছি। াকুড়তলায় মায়ের থানে গিয়ে রান্না করুন।

বড়গোসাঞি প্রাণ খুলে হাসলেন। কেন রে মা? তোর সোয়ামির অসুখ লে পাকুড়তলার থানে গিয়ে রাঁধব? উঠে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে সিগন্যালের কে তাকালেন একবার। ফের বললেন, ব্রহ্মপুর এই গাড়িতে না গেলেই নয়। ালে দুমুঠো খেয়ে যেতাম। তান্ত্রিক হলে মড়ার মাংসও খেতে হয়, আর এ তা অন্ন।

বাবুরামের বউ পেছন-পেছন আসতে লাগল। বাবা, রাগ করেননি তা?

সাবধানে থাকিস রে মা! খুব রটে গেছে। গোমস্তামশাই বলেছিলেন—

সে নিজে কী? লোকদের ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে পয়সা করেনি?

নদীর পাড় ঢালু বেয়ে নামার এময় ঘুরে দাঁড়ালেন বড়গোসাঞি। হলুদ-ালো ডোরাকাটা শাড়ি, বাঘিনী দেখাচ্ছে। দুচোখে জিঘাংসা। শেষ মন্তের দিনশেষে সিগন্যালের কাছে নিজের অজ্ঞাতসারে হিংস্র এক প্রাকৃতিক ক্তিকেই কি জাগিয়ে দিয়েছিলেন প্রেতসিদ্ধ তান্ত্রিক? এখন তাকে সামলায় ক? আইন আছে। থানাপুলিশ আছে। সরকারবাহাদুর আছেন। সবই াসলে নিমিত্ত মাত্র—ভড়ং। মানুষ কতকিছু দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে। থচ জীবজগৎ চলেছে আপন নিয়মে। কে কাকে সামলায়. পারে সামলাতে? ছু বললেন না কালিকাপুরের বড়গোসাঞি। কিছু বলারও নেই।

ঝিরঝিরে ছটফটিয়ে চলা জলধারাটুকু ডিঙিয়ে গিয়ে পেছনে ফের শুনলে ক্ষ্যামা দেবেন বাবা! তারও পেছনে ট্রানজিস্টারের জোরালো আওয়াজ পৃথিবীর কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে।

মহারাজা

মহারাজা কে ভাই?

মহারাজা তখন একটা সাইকেলের সামনের চাকার লিক খুঁজছিল তার মাথার ওপর চেনে বাঁধা হুকে সেই সাইকেল সামনে পা তুলে হ্রেষাধ্বনি করা ঘোড়ার ঢঙে ঝুলছিল। এনামেলের বড় একটা গামলায় ময়লা জল জলে টিউব ডুবিয়ে লিক খুঁজে সে খড়ির চৌকো চিহ্ন দিচ্ছিল। ধীরেসুস্থে মাথা একটুখানি ঘুরিয়ে চোখের কোণায় লোকটাকে দেখে নিয়ে সে বলে কেন?

আওয়াজটা ভারি। এখনই ঘুমভাঙা মানুষের। আর মহারাজার চোখের তলায় ফুলো ভাব, যা সারাক্ষণ তাকে ঘুমভেঙে ওঠা দেখায়। কিন্তু তার গলার ওই ছোট্ট আওয়াজে বাড়তি কিছু আছেই। খাঁচার বাঘ গরগর করে ওঠার মতো। নাকি পোড়ো পুরনো ঘরের দরজা খোলার মতো। আগন্তুক তাকে দেখে ভড়কে যায়। যে ছিমছাম চটুল ধূর্ত বাবুপনা সে বয়ে এনেছিল, তখনই উবে যায়। সে একটু হাসবার চেষ্টা করে। বলে, আপনি মহারাজা?

হুঁ। কী?

কথা ছিল। বলে লোকটা শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে। মহারাজার দিকে এগিয়ে দেয়।...আমি ঘোষহাটির সুলেমান। সাবরেজেস্টরি আফিসে দলিলপত্তর লিখিটিখি। দেখেও থাকবেন। আপনাদের এখানে চেনাজানা অনেক আছে। হেঁ হেঁ...নিন ভাই। শুধু আপনার সঙ্গেই চেনা ছিল না।

সুলেমান মুহুরির সিগারেটের প্যাকেট দেখে নিয়ে মহারাজা বলে, খাইনে। বলুন।

সুলেমান মুহুরি স্বভাবত চতুর মানুষ। জমিজমা সম্পত্তির ব্যাপারে কত ঘড়েল তাকে নাড়াচাড়া করতে হয়। দেখে-দেখে মানুষের অনেকখানি সে

ঝে নিয়েছে। মহারাজাকে সামলাতে কতটা কী করতে হবে, সে জানে। কিন্তু মন জানে না। যে মামলা নিয়ে এসেছে, তা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপার নয়—একেবারে অন্যরকম।

ভেবেছিল, বেশিক্ষণ বসা যাবে না এখানে। ঝটপট আঁচ বুঝে কেটে পড়তে হবে। কিন্তু বলুন শুনে টুলে বসে পড়ে সে। পিঠ থাকে রাস্তার দিকে। বিকেলের রোদ ঘরবাড়ি আর গাছপালার মাথায় চড়চড় করছে। রাস্তায় ছায়া। এ রাস্তা জাতীয় সড়ক নম্বর চৌত্রিশ। বাস চলছে। লরি চলছে। রিকশা চলছে। সাইকেল চলছে। আর মানুষ। আর বিবিধ আওয়াজ। আর বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে পেটরোল-ডিজেলের গন্ধ। শালা শান্তিই ঘুচে গেছে মানুষের জীবন থেকে! সুলেমান মুহুরি তেঁতো গেলার মুখ করে বলে, আপনার বন্ধু মাখন আমাকে চেনে। ওকে নিয়ে আসব ভেবেছিলুম। নেই। অগত্যা কপাল ঠুকে সোজা চলে এলাম। যা হয় করুন, ভাই।

মহারাজা এবার ওঠে। ছোঁড়াটা কখন গেছে বীণাপাণি স্টোর্স থেকে বিলিউশন আনতে। গাড়ি চাপা পড়ল নাকি? একবার রাস্তার দিকে ঝুঁকে দেখে নেয় সে। তার একটা হাত যেখানে পড়েছে, সেখানে ছোট্ট একটুকরো কালকাতরা মাখানো টিনে সাদা হরফে লেখা আছে: 'এখানে সাইকেল মেরামত হয়।' তার তলায় আরও বড় হরফে 'মহারাজা।' নিজের হাতেই লিখেছে। সে ঘুরে সুলেমান মুহুরিকে দেখে। লোকটার বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। চুলে পাক ধরেছে। হাড়জিরজিরে চেহারা। পানের ছোপে দাঁতগুলো কালো। ঠোঁটের মাঝামাঝি শ্বেতকুষ্ঠের মতো সাদা দাগ। দাড়িগোঁফ অন্তত দিন কামায়নি। দাড়ির খোঁচাগুলো স্রেফ সাদা। ঘিয়ে রঙের টেরিলিনের শার্টের বুকপকেটে নোট বই আছে। দুটো কলম আছে। উস্কোখুস্কো চেহারা। চেহারায় ঝড়ঝাপটার ছাপ আছে। আর ঝড়ঝাপটা না খেলে এমন করে তা মহারাজার কাছে কেউ আসে না। ওর কাঁধে ময়লা একটা ব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগটা কাগজপত্তরে ঠাসা। পায়ের ওপর পা তুলে বসে দুই উরুর মধ্যে সেটা রেখেছে। বাঁ-হাতে একটা নতুন ছাতা। এখনও মোড়কবন্দী। ডান হাতে জলন্ত সিগারেট। মহারাজার চোখে চোখ রাখতে না পেরে নিজের স্যাণ্ডেল দুটোর দিকে দৃষ্টি নামায়। মহারাজা বলে, ওয়াইফ? বলেই মুখটা ঘুরিয়ে রাস্তার দূরের দিকে ছোঁড়াকে খুঁজতে থাকে।

অমনি সুলেমান মুহুরি বাসরঘরের দরজায় লাজুক বরের মতো রাঙা হ
বলে, আপনি জানেন তাহলে? হুঁ—জানার কথা বইকি। ঢেকে-চো
রাখতে চাইলে কী হবে? আজকাল কিছুই আর চাপা থাকে না।

মহারাজা মাথা দুলিয়ে বলে, জানিনে। আমি কেমন করে জানব, বলুন

চমকে গিয়ে সুলেমান বলে, তবে?

মহারাজা একটু হাসে।...আপনাকে দেখে মনে হল। তাছাড়া কেনই আসবেন?

খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে সুলেমান হেঁ হেঁ করে একটু হাসে তারপর গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, মনে তো হবেই। মানুষের শিখতে দিন য ভাই! বেশ কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ ওই বদখেয়াল চড়ে বসল মাথায়। অনে বারণ করেছিল! শুনলাম না। শেষ বয়সের কথা ভেবেই পা বাড়ালাম। তো·

কোথাকার মেয়ে?

সোনাডাঙার।...সুলেমান প্রাণ খুলে দেবার ভঙ্গীতে বলতে থাকে।· তিন বোনের ছোট বড় দুটির বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটর বেলায় প্র হাভেতে অবস্থা হয়ে এসেছিল। শেষ সম্বলটুকু আমার শ্বশুর বেচতে এল সঙ্গে আমার ওয়াইফও ছিল। কথায় কথায়...হেঁ হেঁ, আমারও শালা বে খারাপ হয়ে গেল। তো ভাই, প্রথম-প্রথম বেশ শান্তিতে কাটল। ভাবল ঘোষহাটি ছেড়ে আপনাদের এখানেই বাড়ি-টাড়ি দেখব। থাকব। রো কাঁহাতক পাঁচ মাইল ঠ্যাঙানো যায়। তো তারপর ক্রমশ অশান্তি শুরু হল হুট করতেই ঝগড়াঝাটি। চেঁচামেচি। বাপমা তুলে শাপান্ত। শেষে একদি রাগের মাথায় চড় মেরে বসলাম। না খেয়েই কাজে চলে এলাম। ফি গিয়ে দেখি, বাপের বাড়ি চলে গেছে। মজার কথা, গয়নাগাঁটি সব রেখে এ কাপড়ে গেছে। এ হল গত মাসের কথা। তারপর গত পরশু অব্দি বারদশে হাঁটাহাঁটি করেছি। বুঝিয়েছি। সেধেছি। মেয়ের যেমন গোঁ—বাপের তেমনি। শ্বশুর শালা আবার বলে কি জানেন? আমার মেয়েকে লাঞ্ছনা একশেষ করেছ। ডিভোর্সের মামলা হবে। শুনুন কথা। আমি ডিভো দেব, না মেয়ে হয়ে ও ডিভোর্স দেবে? সে রাইট ওর আছে?

সুলেমান রাগে হাঁসফাঁস করে। বকের মতো মুণ্ডু বাড়িয়ে রাস্তায় থু ফেলে। নিভে-যাওয়া সিগারেটটা জেলে নেয়। তার হাতের কাঁপুনি দেখতে পায় মহারাজা। সে ফের ঝুলন্ত সাইকেলটার কাছে গিয়ে বসে। বাতি

টিউব থেকে রবারের টুকরো কাটতে থাকে। বলে, বয়েস কত আপনার ওয়াইফের ?

সুলেমান প্রেমিকের গাঢ় স্বরে বলে, বাইশ-টাইশের বেশি নয়। একেবারে ছেলেমানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন থাকলে কি মুখের ভাত ফেলে পালায় কেউ ? দেখতে শুনতেও পাঁচটার একটা। অন্য কোন দোষ নেই, বুঝলেন ? শুধু মেজাজ আর বোকামি।

এই সময় মহারাজার ছোঁড়াটা আসে। সলিউশানের কৌটো দিয়ে সুলেমান মুহুরিকে দেখতে থাকে। মহারাজা বলে, এত দেরি কেন রে ? বাবার বিয়ে দেখছিলি নাকি ?

ছোঁড়াটা দাঁত বের করে বলে, ইসমাইলদারা মারামারি করছিল।

কোথায় ?

হোটুবাবুর গদির সামনে।

হল নাকি কিছু ?

উঁহু। মিটে গেল।...ছোঁড়াটা হতাশভাবে হাই তুলে হাফপেন্টুলের বোতাম খুঁটতে থাকে।

দুটো চা আন।...মহারাজা বিরহী মুহুরির দিকে ঘোরে।...চা খাবেন তো ?

সুলেমান গলে গিয়ে বলে, খাবো। এই ! পয়সা নিয়ে যা বাবা !

থাক।

না ভাই ! আমিই না হয় দিলুম। এই যে। নে বাবা ! মহারাজাবাবু পান খান তো ?

মহারাজা মাথা নাড়ে। ছোঁড়াটা পয়সা নিয়ে চলে যায়। সুলেমান বলে, অনেকের অনেক বড় বড় কেস উদ্ধার করেছেন। এবার আমারটা করুন, ভাই ! এতে কোর্টকাছারি থানা পুলিশের হাঙ্গামা যদি হয়, সে দায় আমার। তবে সে চান্স নেই। লড়বে কী দিয়ে বলুন ? মুখে যাই বলুক, আমি তো দেখলুম, কচুপাতা তুলছে কোঁচড়ভরে। দেখে কী যে কষ্ট হল ! দুবেলা মাছ-মাংস দুধ-ঘি খেয়ে অরুচি ধরেছিল যেন। একেই বলে, মানুষকে কখনও কখনও ভাতেই কামড়ায়। তাই না ?

মহারাজা তেমনি ভারি গলায় বলে, আজকাল ওসব লাইন ছেড়ে দিয়েছি। পুলিশ কড়া হয়েছে। আপনি বরং আপনাদের গাঁয়ের মাথাটাথা কাউকে একবার পাঠান। ট্রাই করুন। মিটে যাবে।

সুলেমান দমে গিয়ে বলে, সে কি আর না করেই আপনার কাছে এসেছি! এখন বল বল বাহুর বল। নিদেন কথা, মহারাজাবাবু! এ মামলা আপনাকে নিতেই হবে। খরচ যা নেবেন, নিন।...

এই নিয়ে দুবার মহারাজাবাবু। মহারাজা বুঝতে পারে, লোকটা বস্তুবত জমিজমার দলিল লিখতেই ব্যস্ত থেকেছে। তার বাইরের খবরাখবর বিশেষ রাখেনি। এতেই মুশকিলে পড়ে গেছে। আর সেই মুশকিলের আসান পেতে কার মুখে শুনেটুনে তার কাছে এসে পড়েছে। শুনেই চলে এসেছে নিশ্চয়। নয়তো প্রথমে 'সেলামালেকুম' আওয়াজটা দিত। জাত-ভাই তুলে কথা পাড়ত। তবে এও ঠিক, সবাই তাকে মহারাজাবাবু বলেই ডাকে। মিলিটারি থেকে ফেরার পর কে জানে কেন লোকে তাকে বাবু বলতে শুরু করেছিল। প্রথম কিছুদিন বাবু সেজে থাকত বলে হয়তো। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি আর পায়জামার ঢঙে চিকন ধুতি পরত। মুখে স্নোপাউডার মাখত। সেন্ট ছড়াত রুমালে। সারাদিন এই বাজারে এখানে-সেখানে ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই কাটাত। যুদ্ধের গল্প করত। তখন খুব কথা বলার অভ্যেস ছিল তার। ক্রমশ টের পেয়েছিল, তার দাম দিনে দিনে বেড়েছে। অতএব তার কথার দামও বেড়েছে। তখন সে কম কথা বলতে শুরু করে। খোলামেলা হাসিকে অনেকটা গুটিয়ে আনে। যা বলে, তা করার হিম্মত হলে মানুষের চেহারায় দুর্গের আদল ফুটে ওঠে। তার ভেতরে ঢোকা কঠিন। দূর থেকে দেখে লোকে ভয় পায়।...

এত সব ইয়ার বন্ধু, তবু মাঝেমাঝে দুর্দিনও গেছে মহারাজার। পুলিশের চাপ এসেছে। ইয়াররা তখন কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। মহারাজা মিলিটারিতে কিচেনবয় ছিল। নেহাত মিলিটারি কথাটার খাতিরেই সে আক্কেলসেলামি দিয়ে কোনরকমে পার পেয়েছে। তারপর কিছুদিন বেশ ভাল ছেলে হয়ে এটা-ওটা নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। চুড়ি সাবান ফুলেল তেলের ছোট্ট দোকান করেছে। কখনও ছোটখাট রকমের আলুর কারবার। কখনও মরশুমে আমকাঁঠাল চালানদারি। তারপর মাস দুই কসাই হয়ে খাসির মাংস বেচত। বাজারের শেষে বাঁকের মুখে নীচু বকুল গাছ। তার ডালে অমনি হুকে কাটা খাসি ঝুলিয়ে রাং সিনা গর্দান টুকরো টুকরো করত। মুখটা ছিল তখনও এমনি গম্ভীর। কিন্তু পোষায়নি শেষঅব্দি। বাকিতে মাংস বেচে পকেটের নগদ টাকা বের করে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে খাসি কেনার অনেক হুজুত।

বাকিতে খেয়ে লোকে রটাত, মাংসে ভেজাল চালায় মহারাজা। দুচারজন তার হাতে পিটুনি না খেয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিল অবশেষে।

কিন্তু একটা কিছু আইনমাফিক নিয়ে থাকতে হবে। আর হাঙ্গামাহুজ্জত ভাল লাগে না। তাই সাইকেল মেরামতের কাজ নিয়েছে। সে নিজে ছোট-খাট সারাইয়ের কাজ করতে পারে। বড় আর জটিল কাজের জন্যে একজন মিস্তিরি রেখেছে। আজ সে আসেনি। তাই বলে কাজ বন্ধ রাখা যায় না। লিক সারাতেই একগাদা সাইকেল জমেছে সকাল থেকে। ছোঁড়াটাও খুব খেটেছে। এক কৌটো সলিউশান শেষ দুপুর হতে-হতে।...

সুলেমান মুহুরি ততক্ষণে আরও দমে গেছে। খরচের কথা শুনে মহারাজা যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেল। পকেটে যা আছে তার বাইরে হাঁকলেই হয়েছে। টাকাটা নিজের নয়। সবে বর্ষা নেমেছে। জমি বিক্রির বাজার এখন একটু মন্দা। ভাদ্র-আশ্বিনে বাজার উঠবে। অভাবী লোকের তখন দম যায়-যায় অবস্থা। নিজেকে বাগ মানাতে পারে না। বেচে দেয় সবুজ ধানসুদ্ধ ক্ষেত। বর্ষায় চাষ দেবার সময় ভেবেছিল, চার-পাঁচটা মাস কোনরকমে সাঁতরে পার হয়ে যাবে। পারে না। সময় তখন কাছিমের মতো হাঁটে। আর সুলেমানদের তখন দলিল লিখতে-লিখতে আঙুল ব্যথা। পকেট ভারি হয়ে ওঠে। এখন পকেট প্রায় খালি বললেই চলে—বিশেষ করে সুলেমানের। বউ পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে এই অবস্থাটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।

তবে বেশি সুখ সইল না মাগীর, বাপের জন্যে তো দেখেনি চোখে। বাপ কিনা বেগুন বেচে খায়। আবার বড়াই করে বলে, আমরা খান্দানী মিয়াঘর। বলে—খোদার মার খাচ্ছি। নৈলে কি এ বাড়ির মেয়ে তুমি পেতে? ঘোষ-হাটিতে মেয়ে দিয়েছি—এতেই আত্মীয়কুটুম্বের মধ্যে বদনামের শেষ নেই। দেখলে তো বাবাজী? বিয়েতে রাগ করে কেউ এলই না!

এল না ওটা বিশ্বাস করেনি সুলেমান। এসে বেগুনপোড়া চুষত নাকি? বিয়ের বরযাত্রীবাবদ খাওয়া-দাওয়া সব খরচ তাকেই দিতে হয়েছে। শ্বশুর এক পয়সা ঠেকায় নি। কোত্থেকে ঠেকাবে? এই বর্ষায় ঘরের খড়ের চালের যা অবস্থা। বাপবেটি রাত কাটায় কীভাবে সুলেমান টের পেয়েছে। অথচ মাগীর রাজশয্যায় ঘুম হল না! ভূতের কিল একেই বলে।...

সুলেমানের তেঁতো মুখের সামনে হাফপেন্টুল পরা ছোঁড়াটা এসে চায়ের

গেলাস ধরে। তখন মিষ্টি হাসে সে। না হেসে উপায় নেই। গুণ্ডাটাকে রাজী করাতেই হবে। সে অন্যদিক থেকে চেষ্টা করে। বলে, যাক্‌গে। কাজের কথা তো হচ্ছে। মহারাজাবাবুর বাড়িটা এখানে কোথায় ভাই?

মহারাজা চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে আচমকা বলে, দেখুন—দুশো টাকা লাগবে।

আর দুশো টাকার ঘা খেয়ে সুলেমান মুহুরির হাতের গেলাস নড়ে ওঠে. তার মুখে হাসি ছিল। এখন সেটা কালো-কালো কয়েকটা দাঁত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, গুণ্ডা তো এমনি হয়। তোমার-আমার মতো হলে সে গুণ্ডা হবে কেন; এই মহারাজা নাকি এগাঁ ওগাঁ গিয়ে জমিজমা দখল করে দেয়। সঙ্গে ক'জন মাত্র চেলা থাকে। বোমা নিয়ে যায় ব্যাগভর্তি। বন্দুক পিস্তলও নাকি থাকে. আজকাল লোকে গাঁয়ের লাঠিয়ালদের ডাকে না। লাঠির কারবার উঠে গেছে। বোমার কারবার আজকাল। মাঠের আলে দাঁড়িয়ে দুমদাম বোমা ফাটালেই অন্যপক্ষ পালিয়ে বাঁচে। গাঁয়ের দুষ্টরা বোমা চিনেছে। পাইপগান পিস্তল চিনেছে। লাঠিয়ালের বদলে গুণ্ডা কথাটা এসে বসেছে। আগের দিন হলে সুলেমান এ শালার কাছে আসত না। পাড়ার যোয়ান ছেলেদের জুটিয়ে চলে যেত সোনাডাঙা। দিনদুপুরে হাসমতের মেয়েকে ধরে নিয়ে আসত। কিন্তু সোনাডাঙার অবস্থাও গেছে বদলে। উঠতি মাস্তান জুটেছে কিছু। তাদেরও নাকি বোমা-পিস্তল আছে। সেই ভয়েই মহারাজার কাছে আসা। কিন্তু দুশো টাকা!

সে করুণমুখে বলে, দুশো? বড় বেশি হয়ে গেল না মহারাজাবাবু?

ওসব কাজ আজকাল করিনে। নেহাত বলছেন, তাই।···মহারাজা উঠে গিয়ে জলন্ত বাল্বটা সুইচ টিপে জেলে দেয়। ফের বলে, পুরোটা অ্যাডভান্স লাগবে। সঙ্গে আপনাকেও থাকতে হবে। ব্যস। এক কথা। বলুন।

জাতীয় সড়ক নম্বর চৌত্রিশের চেহারা বদলেছে ততক্ষণে। ছায়া ঘন হয়েছে। আলোর ছটা ঝিলিক দিচ্ছে। সবরকম আওয়াজ আরও গম্ভীর হয়েছে। আর ওদিকের বাঁক থেকে মোটরগাড়ির জোরালো আলো এসে মহারাজাকে ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে। তখন সুলেমানের মনে হচ্ছে, শালা আর কসাই। খাসি কেটে মাংস বেচার কথাটা তাহলে ঠিকই শুনেছে। তো এমনিতেই জবাই হয়ে আছে সুলেমান মুহুরি।

প্রায় চোখ বুজেই সে বুকপকেট থেকে নোটবই বের করে। তারপর কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, তাই সই। কিন্তু···

কী বলতে চায় বুঝে মহারাজা কথা কাড়ে।…বেইমানী করিনে। কাজ না হলে ফেরত দেব।

দুখানা একশো টাকার নোট বের করে সুলেমান। টাকাটা লক্ষ্মীর খাতে যাচ্ছে। কোনরকমে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারলে দেখা যাবে। দরজায় তালা দিয়ে রাখবে। পাশের বাড়ির দজ্জাল বুড়িটাকে পাহারায় বসাবে। আগের দিনে পালিয়ে যাওয়া বউ ধরে আনলে ওই ঝুলনবাড়িই তাকে বশ মানাবার দায়িত্ব নিত। এখনও বুড়ি কমজোর হয়নি। নিজের বেটার বউদের হেস্তো দেখিয়ে জব্দ রাখে। ব্যাপারটা তাকে বলে কয়েই এসেছে সুলেমান। বুড়ি বলেছে, আমি এখনও মরিনি। একবার এনে জিম্মা দে। দেখবি ঠিক হয়ে যাবে বাপের বেটি। চুল পাকিয়ে ফেললাম না?

যদি ফলিডল-টল খায় রাগের বশে?

বুড়ি বলেছে, ফলিডল খাওয়া মেয়ে নয়। আমি বউমানুষ চিনি।

যদি গলায় দড়িটড়ি দেয়?

কাঁটা মার্! দেবে কখন? তুই এনে তো দে।…বুড়ি পান খেতে খেতে ফোকলা দাঁতে হেসেছে। মেয়েমানুষ পুরুষের গায়ের জোরে বশ। তুই যে মেয়েমুখোর হদ্দ।

সুলেমান নোটদুটো মহারাজার হাতে গুঁজে দেয়। মহারাজা হাওয়াই শার্টের বুকপকেটে রাখে। তারপর বলে, বলুন—কবে যাবেন?

টাকা দিয়ে সুলেমান বদলে গেছে। চঞ্চল ধূর্ত আর সাহসী চেহারা। ফিসফিস করে বলে, আজ রাতে পারেন না? এমনভাবে বলে, যেন টাট্টু ঘোড়া। শ্যামলা মুখে রক্ত জমেছে। চোখদুটো জ্বলছে। আলোয় কালো দাঁতগুলোও ঝিকমিক করছে।

মহারাজা একটু ভাবে। তারপর বলে, ঠিক আছে। আপনি ততক্ষণ চেনাজানা কোথাও বসুন। ন'টা নাগাদ ওই চায়ের দোকানে আসবেন। আমি থাকব।…

কোণের দিকে দড়িতে প্যান্ট ঝুলছে। লুঙি রেখে প্যান্টটা পরে নেয় মহারাজা। এখন তাকে সত্যিকার ভদ্রলোক দেখাচ্ছে। চিরুনী বের করে চুল আঁচড়ায়। তার চেহারাটি সুন্দর। মিলিটারিতে থাকার সময় বয়স ছিল মোটে ষোল-সতের। গোরারা পাছায় চিমটি কাটত। বর্মার এক বাঁশের জঙ্গলে সে এক গোরার বুকে কুকরি বসিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যিস, তখনই

আচমকা জাপানীরা হামলা করল। ওদের ঘাড় দিয়েই গেল খুনখারাবিটা। ফ্রন্টে গুলিগোলার মধ্যে ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে রুটি বিসকুট আর চকোলেট দিয়ে আসত সে। খুব ভালবাসা পেত। কিন্তু সে ভালবাসার গতিক ভাল ছিল না। মিলিটারিতে থাকার সময়ই তার মানুষের ওপর দৃষ্টিটা খারাপ হয়ে যায়।

এমন কুদৃষ্টি নিয়ে জীবনে থিতু হয়ে বসা যায় না। তিরিশ বছর বয়স হয়ে এল। ঘরে বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই। না ভাই না বোন। বাবা ছিল পোস্টমাস্টার। এলাকাটা চোর ডাকাতের। খুনখারাবি লেগেই আছে। বেচারা পোস্টমাস্টার ডাকাতের হাতে মারা পড়েছিল। তখন মহারাজার বয়স মোটে পাঁচ। তখনও মহারাজা হয়নি, সবাই জানত খোকা বলে। মায়ের সঙ্গে ভিক্ষে করে বেড়াত। পরে পেটের জ্বালায় মা নিকে করে। সৎবাবা লোকটা ছিল দরজী। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। ক্লাস এইটে স্কুলের ছেলেরা থিয়েটার করেছিল। তাতে একটা ছোট্ট পার্ট করে ধন্য হয়েছিল খোকা। দু নম্বর মাত্র সংলাপ। সেলাম করে বলতে হবে, আদেশ করুন মহারাজা। তারপর, আসি মহারাজা এবং প্রস্থান এর পর সে পাকাপাকি ভাবে মহারাজা হয়ে যায় এখন বোঝে, পার্টটা খুব হাস্যকর হয়েছিল।

সৎবাবা অকালে মারা পড়ল। মা আবার ফিরে এল নিজের বাড়িতে। অত বড় ছেলে আর ভিক্ষে করবে কী! মা ভিক্ষে করে ফের। মহারাজা মনের দুখে ঘর ছেড়েছিল। ঘুরতে-ঘুরতে মিলিটারিতে। মিলিটারি তাকে শক্তিমান করেছিল। যুদ্ধমানুষের ইজ্জত কাড়ে—আবার উল্টে ইজ্জত উপহার দেয়। মহারাজা তার জীবনে দেখেছে। যুদ্ধের আওয়াজ তার কানে লেগে আছে। হাতবোমা ফাটিয়ে চোরা পিস্তল ছুঁড়ে সে মানুষের যুদ্ধের শক্তি অনুভব করতে চায়।

একদিন তার বড় সাধ ছিল, রংরুটের দলে ভর্তি হবে। সুযোগও তার গিয়েছিল। হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেল। কিচেনস্টাফ বরখাস্ত বিলকুল। তার সেই সাধ মেটেনি। এখন সে নিজেও অন্য রকম হয়ে গেছে। আর কিছু ভাল লাগে না। ক্লান্তি আসে সহজেই। হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে যায় সে ভিক্ষে করে বেড়াত মায়ের সঙ্গে। আর অমনি চোয়াল শক্ত হয়েছে। রাস্তায় বোমার আওয়াজ দিতে দিতে দলবল নিয়ে অকারণ ছুটেছে। লোককে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। লোকে ভেবেছে, কাদের সঙ্গে হাঙ্গামা হচ্ছে নিশ্চয়। পরে মহারাজা

সঙ্গীদের নিয়ে হাসাহাসি করছে। ভয় না পাইয়ে দিলে সুবিধে হবে না। সঙ্গীরা বলেছে, জয় মহারাজা!

এই ছোঁড়াটা তার ছেলেবেলার প্রতীক। প্রাণ ভরে ভালবাসে, তাই। জুতো জামা প্যান্ট কিনে দিয়েছে। ছোঁড়াটা বাজারের রাস্তায় ঘুরে মানুষ হচ্ছিল। বাবা-মায়ের খোঁজখবর জানে না। বাসস্ট্যাণ্ডে নাকি জন্ম।……

খোকা!

উঁ?

সত্যদা সাইকেল নিতে এলে দিবি কেমন? আমি আসছি।…মহারাজা পা বাড়ায়। ফের ঘুরে বলে, এবেলাও বাড়ি থেকে খাবারটা এনে দিবি ভাই। ঘুরে আসি।……

ঘোষহাটি পশ্চিমে, সোনাডাঙা পুবে। রাস্তাঘাট কাঁচা ওদিকে। বর্ষায় কাদা জমেছে। মাঠেও চাষ পড়েছে। জলকাদা প্রচুর। অতএব আলপথই ভাল। ঘন ঘাস গজিয়েছে। ভয়টা শুধু সাপের। সুলেমান মুহুরির টর্চ আছে। সাপের কামড়ে এখন মরতে চায় না সে। কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ের সামনে টর্চের আলো ফেলছে সারাক্ষণ। তার পিছনে মোট তিনটি লোক। সুলেমানের সংশয় ঘুচছে, না চেঁচামেচি বড্ড হবে। গাঁয়ের গুণ্ডাগুলো এসে পড়লেই বিপদ। এই তো মোট তিনজন—মহারাজা বাদে অন্য দুজনে নেহাত ছোকরা। পারবে তো শেষঅব্দি?

দু মাইল দূরত্বের মাঠ পেরোলেই সুলেমানের সেই শ্বশুর গাঁ। মাঠের মাঝামাঝি একটা কাঁদর। গ্রাম আর মাঠের বাড়তি জল ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে ভাগীরথীর বুকে। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্রীজ রয়েছে। তার তলায় এই কাঁদর ছোটখাটো নদী হয়ে গেছে।

কাঁদরের জলের হিসেব মুহুরি জানে! বার দশেক এই জল মাপতে হয়েছে তাকে। পাড়ে বটগাছ। সেই গাছের নিচে পৌঁছে মহারাজা বলে, গ্র্যান ছকে নিই তপু, বোস। ইস্মাইল, এবার একটা সিগারেট দে। টানি!

মুহুরি জন্ত সিগারেট বের করে আহ্লাদে। এরা যেমন বাঘ, এদের দলে তারও এক বাঘ হতে ইচ্ছে করে। বলে, গাঁয়ের শেষে বাড়ি। সব তো বলেইছি। উঠোন খোলা তিনদিকে—পাঁচিল ধসে গেছে। একদিকে ঘর।

যা গরম পড়েছে, বাইরেই বাপবেটি শোবে। কিংবা বাপ শোবে বাইরে, বেটি ঘরে। গরমের ভয়ে দরজা দেবে না। ঘরে জানলা-টানলা তো নেই। ছোঁ মেরে মুরগী ধরার মতো···বুঝলেন তো?

মহারাজা টের পায়, লোকটার আর সবুর সইছে না। লোকটা খিকখিক করে হাসছেও। পালিয়ে যাওয়া মুরগীর গলায় ছুরি চালাতে ওর হাত নিসপিস্ করছে। ঘুরঘুটি অন্ধকারে মহারাজা নিঃশব্দে হাসে। আকাশের তারা ঢেকে চাপ চাপ মেঘ ঘুরছে। বৃষ্টি হলে ভালই। দূরে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। বাতাস ধরে আসছে যেন। সে চাপাগলায় বলে, তপু, ইসমাইল, শোন! সুলেমানমিয়া বরং গিয়ে শ্বশুরকে ডেকে ওঠাবেন। ওনার ওয়াইফও তখন ঘরে থাকলে বেরোবে। তারপর আমরা যাব। কেমন? ···

সুলেমান একটু ভেবে বলে, তা মন্দ হবে না। তবে চেঁচামেচি হলে···

মহারাজা বলে, চাক্কুটাক্কু দেখলে চুপ করে যাবে দেখবেন। অনেক তো দেখলাম।·····

কাঁদরে একবুক জল। আগে মুহুরি সব খুলে আণ্ডারপ্যাণ্ট পরে নেমে যায়। হাত ছয়েক চওড়া। ওপারে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে টর্চের আলো দেখায়। স্রোত আছে—তবে তীব্র নয়। গঙ্গায় জলের চাপ বেড়েছে, হয়তো তাই। তিনজন 'গুণ্ডা' আণ্ডারপ্যাণ্ট পরে নেমেছে। চাপা গলায় কীসব বলছে আর হাসাহাসি করছে। সুলেমানকে নিয়ে বরাবর ঠাট্টাতামাশা করছে, সেটা সুলেমান বুঝেছে। কিন্তু করে নে শালারা! তোদের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছি। তারপর যে গাছের বাকল সেই গাছে লাগবে। তখন তোদের ধার কে ধারে?

বাকি এক মাইল পেরোতে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামল। মুহুরির হাতে ছাতা আছে। ছাতা খুলে মহারাজাকে ডাকে। মহারাজা বলে, ঠিক আছে চলুন।

মালমসলা ভিজে যাবে না?

বোমা-টোমা এনেছে ভাবছে। বোমা। কী হবে? মহারাজা শুধু বলে, না।

গাছপালার মধ্যে ঢুকে বোঝা যায় গ্রামে এসে পড়েছে। মহারাজারা ভিজে একাকার হয়েছে। তবু হাসাহাসি ভোলে না। আকাশে মেঘের ডাক বারে বারে। বৃষ্টি বাড়ছে যেন। কয়েক পা এগিয়ে সুলেমান টর্চ বন্ধ করে। ফিসফিস করে বলে, ওই যে! আপনারা ঘরের ওপাশে আসুন। ভিজবেন না।

বাড়িটা অন্ধকার আর বৃষ্টিতে ঠাহর হয় না। ডানদিকের ছাঁচতলায় মহারাজাদের রেখে মুহুরি খোলা উঠোনে দাঁড়ায়। বিদ্যুতের ছটায় ছাতা

াথায় মূর্তিটা ভারি অদ্ভুত লাগে। তারপর তার মিষ্টি সশব্দ ডাক শোনা যায় -কিন্তু বোঝা যায় না, কী বলে ডাকছে।

তারপর পাল্টা আওয়াজ শোনা যায়। এবং আলো জ্বলে। আলোটা করোসিন কুপি। মহারাজা উঁকি মেরে দেখে, বারান্দায় মশারি থেকে এক ড়ো বেরিয়েছে। মুহুরি তার মুখোমুখি। বুড়ো ঘোলাটে চোখে তার দিকে াকিয়ে আছে। হতভম্ব যেন। তারপর মশারির একটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে াসে কেউ—চোখ জ্বলে যায় মহারাজার। আলথালু চুল, জামাবিহীন শরীর, াড়িটা কোনমতে পেঁচানো আছে। বেরিয়েই চেরা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, াবার এসেছ তুমি? ছোটলোক! জানোয়ার! বেরিয়ে যাও—নয়তো লাক ডাকব। দালাল! শয়তান! লোচ্চা!

মুহুরি পাল্টা চোখ রাঙিয়ে বলে, চলে এস এক্ষুনি। তোমাকে নিতে াসেছি।

মুহুরির বউ পাশ থেকে একটা কাঠ কুড়িয়ে নেয়। তারপরই মেরে বসে। ুলেমান গর্জে ডাকে, মহারাজাবাবু! কপালে রক্তের ছোপ তখনই। সে ড়িং বিড়িং নাচতে থাকে। তখন মহারাজা যায়। তপু আর ইসমাইলও ায়। দুজনের হাতে ছোরা। আহত মুহুরি ফুঁ দিয়ে বুড়োর হাতের লম্ফ নিবিয়ে দেয়। তারপর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোথায় বাজ পড়ে। ধস্তাধস্তির াওয়াজ ওঠে। একটি মেয়েলি চিৎকার উঠেই থেমে যায়। তারপর মহারাজা াকে, চলে আসুন।

মুহুরি টর্চ জ্বেলেই নিবিয়ে দেয়। বাঘ অমনি করেই শিকার ধরে এবং বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার বউ চুপ করে গেছে কেন সে বুঝতে পারে না।

বুড়ো ভাঙা গলায় হাঁউমাউ করে চেঁচায় এতক্ষণে। বৃষ্টি আর মেঘের াকে সে-আওয়াজ ঘুমন্ত মানুষের শোনা সম্ভব নয়।

মুহুরি একলাফে আগু নিয়েছিল। টর্চ সাবধানে জ্বেলে সে আগের মতো পথ দেখায়। মহারাজা তার বউকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে শুইয়ে রাখার ভঙ্গীতে নিয়ে চলেছে। সন্দিগ্ধ মুহুরি বার বার পিছু ফিরে বলে, হুঁশ আছে তো? দেখবেন আবার। মরেটরে যায় না যেন।

মহারাজা ধমক দেয়। চলুন না!

কাঁদরের ধারে গিয়ে সে মুহুরির বউকে দাঁড় করিয়ে দেয়। এতক্ষণে মুহুরি টের পায় মুখে রুমাল জড়িয়ে রেখেছিল। রুমাল খুললে তার বউয়ের আটকানো

কান্না বেরিয়ে পড়ে। মুহুরি মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গর্জায়—খবর্দার! চো—
—প! জবাই করে ফেলব।

তারপর সে হাত বাড়িয়ে হাত ধরতে গেলে লাথি খায় এবং আছাড়ও একেবারে কাঁদরের জলে পড়ে যায়। টাল সামলাতে পারেনি। বৃষ্টিটা থেমেছে তপু আর ইসমাইল হি হি করে হাসে। সুলেমানের ব্যাগসুদ্ধ ডুবেছে। (বিড়বিড় করে কী বলছে। মহারাজা গম্ভীর গলায় মুহুরির বউকে বলে, নামুন নয়তো আবার…

মুহুরির বউ পালাতে চেষ্টা করে। অমনি মহারাজা তাকে দুহাতে তেমা করে তুলে নেয়। তবু মুখে রুমাল গোঁজে না। বউটি হাত পা ছোড়ে। মুহু জল থেকে চেঁচায়—ডুবিয়ে মারুন শালীকে। আমার হুকুম! খুব ব দিয়েছে মাগী!

ইসমাইল আর তপু নেমে গিয়ে বলে, গাঁয়ে আলো দেখলাম দাদু উঠে পড়ুন।

ওরা তিনজন পাড়ে ওঠে। বটতলায় দাঁড়িয়ে সুলেমান মুহুরি জ সবধানে টর্চের আলো ফেলতে গিয়ে টের পায় কলকব্জা বিগড়েছে। জলে ডু গিয়েছিল টর্চটা। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। কাঁদরের জলে কী সব শ হয়। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, কী হল মহারাজাবাবু?

এক বুক জলের ওপর মুহুরির বউয়ের চোখ দুটো চকচক করছে। কি তখন আশ্চর্য শান্ত।

দূরে গাঁয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। ওরা চারটি মানুষ হনহন করে মা পেরোচ্ছে। মহারাজা মুহুরির বউয়ের একটা বাহু ধরেছে এবার কিন্তু বাধ পাচ্ছে না। জাতীয় সড়ক নম্বর চৌত্রিশে ওঠার আগে খেলার মাঠ। এদিকটা কোন আলো নেই। হঠাৎ বউটি ছিটকে মহারাজার পা দুটো জড়িয়ে মাথ ঠুকতে থাকে। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। মহারাজা একটু হেসে বলে, আঃ! ক হচ্ছে! আমার পা ধরে কিছু হবে না ভাই! ধরতে হলে আপনার স্বামী পায়ে ধরুন। মেয়েছেলেকে ঘরকন্না না করে তো পার নেই!

মুহুরি বউ কান্নাজড়ানো গলায় ফুঁসে ওঠে। ও জানোয়ার! অমানুষ ওর সঙ্গে আমি আর ঘর করতে পারব না। আপনারা জানেন না, (কেমন লোক।……তারপর আবার কেঁদে ওঠে। বলে, আপনি আমাকে বাঁচান।

মুহুরি আবার মেঘডাক ডাকতে যাচ্ছিল, মহারাজা তাকে থামিয়ে বলে, কেন ভাই ?

কেন ? বউটি আকাশের দিকে মুখ তোলে।…খোদা জানেন, যদি মিথ্যে বলি, জাহান্নামে যাব। ও আমাকে বেশ্যাগিরি করতে বলে। পয়সাওলা লোক এনে ঘরে বসিয়ে খাওয়ায়। আর……আর…কেন জানেন ? ও পুরুষ নয়।

সে হাঁপায়। সুলেমান মুহুরি কয়েক মুহূর্ত কাঠ। তারপর নড়বড়ে ভেজা ধুতিজড়ানো ঠ্যাং নেড়ে গর্জায়, লাথি মারব। মুখে লাথি মারব।…অশ্লীল গাল দিতে থাকে সে।

বউটি কান্নার দম টানে। বলে, ও আমাকে কিরে দিয়ে বলেছে—আমার কথা যদি কাকেও বলিস, অকাট কিরে রইল—তুই আমার মাগ নোস, মা। বিচার করুন আপনারা। বিচার করুন। আর, কেন আমি পালিয়ে এলাম ? সে রাতে আমাকে কার সঙ্গে শুতে বলেছিল, জিজ্ঞেস করুন—খোদা আপনাদের ভাল করবে।…সে ফের কান্নায় ভেঙে পড়ে। শয়তান জমিজমার লোভে আমার ইজ্জত বেচতে চায় !

মহারাজা এতক্ষণে ভারি গলায় বলে, কী বলছে বে শালা ? জবাব দে।

সুলেমান পাথরের মূর্তি সঙ্গে সঙ্গে।

মহারাজা এক পা বাড়িয়ে ফের বলে, কী বে ? মুখে রা নেই কেন শালার ? অ্যাই ইসমাইল ! ওকে শুইয়ে দে' তো এখানে—দেখি। তপু চাকুটা দে।

সুলেমান মুহুরি আচমকা একবার লাফ দেয়। লাফ দিয়ে বউয়ের দিকে আঙুল তুলে বলে—তালাক তালাক তালাক। তিন তালাক।

তারপর ঠিক তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো প্রাণভয়ে মাঠ পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

মহারাজার মা দরজা খুললে মহারাজা বলে, বাকসো খুলে একটা কাপড় বের করো তো মা !

কেন রে ?…তারপর বুড়ি অবাক !…ও কে ? কে ও ?

অত কৈফিয়তে কাজ কী তোমার ? কাছে নিয়ে শোও। ক্ষিদে আছে কিনা জেনে নাও। আর শোন, সোনাডাঙার হাশমত মিয়ার মেয়ে। যেন বেইজ্জতী না হয়।

তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

দোকানঘরে শুতে।

বুড়ি ভাল করে দেখে নিয়ে একটু হেসে বলে, ভালঘরের মেয়ে বলে তো মনেই হয়েছে। খোকা, একে তুই কোত্থেকে আনলি বাবা ?

মহারাজাও হাসে।···আনলাম। বরাবর সবার জন্যে ধরে আনি, এবার নিজের জন্যে। মহারাজার ঘরে মহারাণী থাকবে না ? তিন তিনটে সাক্ষীর সামনে সত্য তালাক খেয়েছে বেচারা। একশোটা দিন পালতে হবে। এই একশোটা দিন আমি দোকান ঘরেই শোব।

তখন বুড়ি চিবুকে হাত রেখে সস্নেহে বলে, কেঁদো না। তোমার নাম কী মা ?

ভয়

শুকনো কাঠ কণ্ঠনালীতে ঘৃণার তেতো স্বাদ নিয়ে সে ফিরে আসছিল নির্জন সভ্যতাবিহীন মেঠো পথে।

সূর্য ডুবে যাবার পরও যে আশ্চর্য সুন্দর এক আলো এদেশের মাঠে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, দিন যেন চলে যেতে যেতে কী মনে পড়ে যায় বলে একবার পিছু ফেরে এবং আড়চোখে খুঁজে নিতে চায় কিছু ফেলে গেল নাকি—সেই ধূসর শান্ত আলোয় অবশেষে তার সব ক্ষোভ জলেপুড়ে গিয়ে এক দীর্ঘপ্রশ্বাস বেরিয়ে গেল। ফুলে ওঠা শিরাগুলো ঢিলে হল আবার। মুখ উঁচু করে সে তেজী ঘোড়ার মতো তাকাল সামনের দিকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকল। রহস্যময় এবং পরিব্যাপ্ত করুণা সেই দিনশেষকে নিশ্চয় বলে থাকবে—'এখন এখানে সবই ক্ষমা করা যায়', বিনা প্রতিবাদে সে তাই মেনে নিল এবং জনৈক ষষ্ঠী দত্ত আর তার রোগা ছেলেটিকে ক্ষমা করে দিল।

আর তার মনে এখন দুঃখ নেই, অভিমান নেই, ঘৃণা নেই। সে এখন শান্ত সজ্জন নির্বিকার আর উদাসীন মানুষ। একটা উঁচু মোটা আলপথে যেতে যেতে দুধারে উষর ক্ষেত, কয়াখর্বুটে কাশঝোপ, বোবা রোগা দুএকটা গাছ আর কোন সন্ন্যাসীর মতো ধীরগামী শেয়াল, কিছু পাখি—যারা অবচেতনার নৈঃশব্দ্যে

ড় যায় গভীর ও সুদূরতায়, দেখতে দেখতে কখন সে এসে পড়ল এক সরু-
ীর ধারে। তখন করতলের রেখাগুলো একেবারে আবছা হয়ে গেছে।

পায়ের নিচের আচমকা এই নদী তাকে যতটা না অবাক করল, নদীর
ায় কী এক নড়াচড়া অতর্কিতে তাকে তার বেশি ভয় পাইয়ে দিল।
ীতে এখন মোটামুটি অস্পষ্টতা—যা অন্ধকারের প্রথম স্তর। দূরের ঢাকের
দর মতো ওই অন্ধকার, যেখানে যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল। নদীর কিছু ভাটির
কে জঙ্গল আছে। বাঘ শুওর হায়েনার উপদ্রব শোনা যায় মাঝে মাঝে। সে
টু কেঁপে উঠল। চোখের সামনে পলকে পলকে হলুদ লাল নীল ভয়ের
লিক, আর তার উরু দুটো অবশ হয়ে গেল। ওটা একটা প্রাণী, তাতে ভুল
ই। ঝিরঝিরে একফালি স্রোতে আবছা শব্দ উঠছে—সম্ভবত জল খাচ্ছে
ণীটা। তার মনে হল, জল খাওয়া শেষ হলেই ওটা টের পেয়ে যাবে যে

একজন সত্যিকার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এবং একটা কিছু ঘটবেই।
শালা মানুষ! আবার কথাটা তার মাথার মধ্যে ভেসে উঠল। মানুষকে
ার জন্তুরা তো কম দুঃখে ঘৃণা করে না! তার ঠাকুর্দার কাছে শুনেছে:
ার জন্তুরা বাসা ছেড়ে বেরোবার আগে মনে মনে ঈশ্বরকে বলে নেয়—যেন
ায়ের সামনে না পড়ি হে বিধাতা পুরুষ।

তার মনে অভিমানটা ঠেলে এল আবার। খা, খেয়ে ফেল্ এই শালা
ষকে! এ মানুষের কোনও দাম আছে? সবসময় ঠকে ঠকে গো-ঠকা হয়ে
দছে! মহুলার গোহাটে দত্তদের বাবা-বেটায় মিলে আজ যা ঠকান ঠকাল,
া লেখাজোকা নেই। গাঁয়ে ফিরলেই তো রাত পোহালে আবার চোখে
খ পড়বে। তার আগে ভগবান, তুমি এই অমূল্য নিধিদুটোকে গেলে অন্ধ
া দাও।

নদীটার খাত আন্দাজ হাত পঁচিশ চওড়া। সুতোর মতো এই নদী,
ছে দূর উত্তরের বিশাল বিল থেকে, মিশেছে আরেক বিশাল বিল পেরিয়ে
বারে গঙ্গায়—তার কাছেই এক শহর, কাটোয়া। জীবনে এই প্রথম সে
তমতো শহর দেখে এল। তার ঠাকুর্দা বলতেন—'কাটোয়া? হেথা কুথা?
তো বদ্ধমানের কোলে।' ছড়ার মতো নেচে নেচে এই কথাটা সারা
াবেলা সে উচ্চারণ করেছে। আজ সেই পুরনো স্বপ্নের অন্তর্গত শহর থেকে
াংসে ফিরে আসছে সে—কিন্তু কী রামঠকান ঠকেই ফিরছে এতক্ষণ।
া বাপেবেটায় রেলগাড়ি চেপে 'কাঁথাচাপা ধকড়চাপা···কাঁথাচাপা ধকড়চাপা'

শুনতে শুনতে ঘুর পথে গাঁয়ে পৌঁছে গেল! শালা মানুষ! লে. খেয়ে লে আমাকে! তাও বাপঠাকুর্দার নাম থাকবে—খেল তো বাঘেই খেল। আর কি না মরদজনা যে, সে বাঘের হাতে মরবে না তো কি বিছানায় লেজেগোবরে হয়ে মরবে? হুঁ, ঘরে বউ ছেলেপুলে এল না এ জন্মে। নয়তো আরো কয়েকপুরুষ গল্প করে বলে বেড়াত—আমার বাবা বাঘের হাতে মরেছিল বটে!

সে অবশ উরু নিয়ে এইসব কথা ভাবছিল। পা তুললেই জন্তুটা টের পাবে. তবে সেজন্যেও নয়—আসলে তার নড়াচড়ার শক্তিই ছিল না। 'বাঘছাঁদ' বলে একটা কথা আছে। মানুষের পায়ে অদ্ভুত অদৃশ্য এক ছাঁদ জড়িয়ে যায় ফাঁসের মতো। যেমন নাকি অজগর সাপের দৃষ্টি লেগে হরিণের বাচ্চা যায় আটকে। দম বন্ধ করে সে প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষা করতে থাকল অন্ধকার খাত থেকে কয়েকটা ধারালো নখ তার এই বাইশবছরের চাপাআশাআকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখ ভরা পুরুষবুককে ফেড়ে ফেলবে। এবং তার বোবায়-ধরা গলা থেকে পৃথিবীর উদ্দেশে আর একটিও কথা ছুঁড়ে দেওয়া যাবে না।

কিন্তু হঠাৎ অন্ধকার খাতে সব নড়াচড়া আর ছলছল জলের শব্দ গেল থেমে।

একপলকের জন্যে সেইমুহূর্তে তার চোখে পড়ল সুতলি নদীর ওপারে সরু এক ফালি চাঁদ।

নিচের সজীব সত্তা পাখি উড়ে যাওয়া বেত-লতার মতো সরল ও আকাশ-মুখী হল।

একটা কিছু পিছু ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বালিহাঁসের ঝাঁক—ওয়াক্ ওয়াক্…আঁক ওয়াক্…

কেউ গোপন ভয়ে ধরাপড়া গলায় আধোআধো চেঁচিয়ে উঠল—কে! কে ওখানে?

মুহূর্তে তার বিভ্রমের হলুদ মৌতাত ছিঁড়ে তাকে পথ দিল সামনে। খুব স্পষ্ট আর ভরাটস্বরে সে বলে উঠল—মানুষ!

নিচে অন্ধকারে খিলখিল হাসি কেউ অকপটে হাসল। —মরণ! আমি কি অমানুষ বলেছি নাকি?

উঁচু পাড় থেকে দৌড়ে নামে সে বিপুল জলের বেগে। নিচের মূর্তিটা একটু সরে দাঁড়ায়। আগে সে হাঁটু ভাঁজ করে বালিতে বসে এবং দু হাতে আঁজলা করে জল খায়। আঃ! খিদেয় পেট খালি—জল বুকে খিল ধরিয়ে দেয়! সে কাশতে থাকে।

—মানুষের গলায় জল আটকাল নাকি!

শান্তভাবে ঘুরে শোনে সে। তারপর হাফ শার্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—তা, এই 'তিনসাঁঝের' বেলায় মেয়ে মানুষের একাদোকা যাওয়া হবে কোথা শুনি!

—বাবলতলি কাপসা।

—আমি যাব পলাশগা।

শুনেই মূর্তিটি খিলখিল করে ফের হাসে।—ওই 'যেথা মাগীরা মোড়লী করে মন্‌সেরা বাঁদর?'

মেয়েটির জিভ তো বড্ড ধারালো। পলাশগা নিয়ে প্রচলিত ছড়াটা দিব্যি শুনিয়ে দিল। একা মেয়ে, গলার টানে মনে হয় যুবতী, আর টানটান শরীর, সাহসের তুলনা হয় না! এই নিরালা মাঠঘাটে একা পাড়ি দিচ্ছে ভরা সন্ধ্যা-বেলা, বুকের পাটা দেখে তাক লেগে যায়। সে বলে—মুখ আছে বলার, বলুক। তবে কি না, এমন জায়গায় এমন সাহস ভালো না। কত রকম ভালমন্দ মানুষ থাকতে পারে।

—পারে বইকি। তবে আমিও কি না সৈরভী। কাপসার 'সাতভেয়েদের' নাম শোনা থাকলে ভালো, বেশি বলব না। সৈরভী তাদেরই বোন।

বুকটা ধাড়স করে ওঠে। ওরে বাবা! এ তল্লাটে 'সাতভেয়েদের' নাম শুনলে সাপও সুড়সুড় করে গর্তে ঢুকে লুকোয়। ডাকাতকে ডাকাত, লাঠিয়ালকে লাঠিয়াল। জাতে সদ্‌গোপ। অল্পস্বল্প জমিজমাও আছে। এক দঙ্গল দুধেল গরু মোষও আছে। বিশাল সব চেহারা, মোষের পিঠে চেপে বিলেজঙ্গলে যখন যায়, মনে হয় কোন রাজা কী সেনাপতি চললেন যুদ্ধে। তাদের বোন! হুঁ, তাছাড়া আর কার সাধ্যি থাকবে এমন ঘোর সন্ধ্যায় একা নির্জন মাঠে পথ চলতে?

—কী? মানুষের যে বোবা ধরে গেল। যাবে তো, পা ফেলুক আগে-পাগে। ভয়ে ভিরমি গেল নাকি!

একটু চাপা হাসে সে। বড় বাচাল এই সাতভেয়েদের বোন। —না, ভয় কিসের? আমি তো কোন দোষের দোষী নই। সাতভেয়েদের বোনকে কখনও চোখেও দেখি নাই। এখনও দেখি না। দেখলে কথা ছিল বটে।

আলো জেলে দেখার সখ হয় নাকি?…আবার হাসে সে। আঙুল তুলে চাঁদের ফালি আর নক্ষত্র দেখায়।—ওই ঝিলিকটুকুতেই দেখে নেওয়া যায়—তবে কি, চোখ থাকলেই হল। কই, পা ফেলুক।

পা বাড়ায় সে। ওপাড়ে উঠে গেলে সামনের পথ ও পৃথিবী অনেকটা স্বচ্ছ লাগে এবার। মেয়েটি বাচাল, কিন্তু তার গলায় সুর আছে। খালি মনে হয়, চারু মাষ্টারের বেহালা। পিছনে সেই নিঃশব্দ বেহালা নিয়ে হাঁটে সে। কয়েক পা চলে বলে—তা সাতভেয়েদের বোনের এমন করে আস হচ্ছে কোত্থেকে ?

—তার আগে শুনি, মানুষটা কাদের ?

মানুষটা কাদের মানে, জাত কী বা বংশ-পরিচয় কী। একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রশ্নে। কিন্তু সামলে নিয়ে বলে দেয়—দত্তদের।

—ওরে বাবা ! পলাশগাঁর দত্তরা যে পয়সাওয়ালা মানুষ ! তা হলে রেলে না চেপে এমন হাঁটাপথে ক্যানে ? ক্যানে এমন খালি পা ?

কী দৃষ্টি চোখের ! পা খালি, তাও দেখতে পেয়েছে। সে আনমনে জবাব দেয়—আর বোল না। আদ্যাকালীর মন্দিরে ঢুকলুম, তো ফিরে দোরগোড়ায় এসে দেখি, অমন নতুন জুতোজোড়া লোপাট।

হাসতে লাগল পিছনে সে এক আবহসঙ্গীত। —ওম্মা ! তাই নাকি ? তা আদ্যাকালীর মন্দির তো সেই কাটোয়ায় ?

—হুঁ। তা ছাড়া আর কোথায় ?

—শহর জায়গা। আবার কেনা গেল না ?

—গেল না। রেলের টাইম হয়েছিল, তাড়াহুড়ো দৌড়ে টিশিনে গেলুম তো রেলও ছেড়ে দিলে। তখন রাগ হল। রাগের বশে হাঁটা শুরু করলুম ···বলে মুখ উঁচু করে চাঁদের ফালিটা দেখতে দেখতে শুকনো হাসে সে।

—খুব রাগী মানুষ তো তা হলে !

—তুমিই বল না, রাগ হয় আর না হয়। তার ওপর ষষ্টিদত্ত···

—কে, কে ? ষষ্টি দত্ত ? ওই যার বাড়ি এডেডা আছে—টিপলে গান বেরোয় ?

অজ্ঞতা দেখে হাসে সে।—এডিও।

—ওই হল, এডিও।

ষষ্টি কাকা আর তার ছেলে গোপাল করল আরেক কাণ্ড। গোহাটে একটা ভাল গরু কিনতে···

—কাটোয়ায় গোহাট কোথা ? সে তো মহলার ঘাটে।

এ তো সব খবরই রাখে দেখা যাচ্ছে। ঢোক গিলে বলে—মানে, আগে

মহলা গিয়ে গরু দেখা হল। পছন্দ হল না। তো ষষ্টিকা বললে—কাটোয়া হয়ে যাই একবার। তাই গেলুম। কেনাকাটা করবে বলল।

—তাই বটে। তারপর?

—আর বোলো না। আপন কাকা কী বলব বলো? পয়সাকড়ি সবই তো ওনার কাছে ছিল। ওই যে বললুম, মন্দিরে ঢুকলুম—আর ভিড়ে ওনাদের হারিয়েও ফেল্‌লুম!

খুব হাসতে লাগল আবার।—ওম্মা! জুতো হারাল, আবার কাকাও হারাল!

—হ্যাঃ!

—তাপরে?

—তাপরে আর কী! না খাওয়া না দাওয়া—শালা এই মাঠে মাঠে চলে আসছি!

একটা মিঠে—যেন মৃদু করুণ মূর্ছনা বেহালায়, চাপা প্রশ্বাস শোনা যায় পিছনে।—আহা! তাহলে তো খুব কষ্ট মানুষের!

—আমাকে অমন মানুষ-মানুষ করা কেন? আমার নাম কৈলাস।

—আমার মরণ! পরপুরুষের নাম ধরে ডাকতে আছে নাকি? তাতে আমার ভাশুরের নামে নাম।

একটু চুপ করে থেকে সে বলে—সাতভেয়েদের বোনকে তাহলে দুটো কথা শুধোই?

—একশোবার। কথা বলতে বলতে হাঁটলে পথ পলকে ফুরিয়ে যায়।

—শ্বশুরবাড়িটি কোথায় হচ্ছে?

—পাঁচগুঁর হাট।

—তা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এমন করে ছাড়লে? এই সন্ধেবেলা একাদোকা?

—যার দাদারা সাতভেয়ে, তাকে যমেও ছোঁবে না।

—তাহলেও একটা নিয়ম তো আছে! ঘরের বউ!

—তোমার বুঝি সন্দ হচ্ছে?

—হচ্ছে।

—কী হচ্ছে, শুনি?

—সোয়ামীর ওপর রাগ করে পালিয়ে আসছ না তো?

একটু চুপ করে থাকে—তারপর ধরা গলায় দুতিনবার 'তা' শব্দটা উচ্চারণ করার পর হঠাৎ ফুঁপিয়ে, ফুঁসে ওঠে—যদি আসি! আসবোই তো। এসেছি। হুঁ—ভাত দেবার ভাতার লয়, কিল মারার গোঁসাই! না খেয়ে না খেয়ে পিত্তি পড়ে জ্বর হবে, আর ওই খাটুনি। বলো, কেউ পারে এ সোমত্ত বয়সে?

—হুঁ, পারে না! কতরকম সাধআহ্লাদও থাকে মেয়েদের।

—আর সাধ আহ্লাদ! আজ একবছর বিয়ে হল—না পেলুম না একখানা ভাল কাপড়, না একটা বেলাউস! না দিলুম পায়ে আলতা! শুধু পেট পেট করে···সামলে নিয়ে আবার বলে—আমার বড় কষ্ট, কাকে বলি গো!

—দাদাদের বলনি কেন? তাহলে তো ভালই শাস্তি দিয়ে আসত।

হিসহিস করে বলে—বলব। এ্যাদ্দিন বলিনি! এবার গিয়ে বলব। তারপর কী হবে, বুঝতে পারছ?

—পারছি, তুমি বলো।

এক অদ্ভুত হাসিকান্নায় মাখামাখি করে কথাগুলো বলা হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রতিহিংসার আবেগ ঝরে। মনে হয়, অন্ধকারে জোনাকির মতো দুই চোখ আদিম হিংসায় রিং রিং করে জ্বলছে। —সাতভেয়েদের বোনের গায়ে হাত! সারা পাঁচগুঁর হাট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আসবে না? হড়কা বানের মতো, খরার হা হা আগুনের মতো গিয়ে তছনছ করে দেবে না সব সুখের সংসার! আমার দাদারা হাঁক ছাড়লে পিথিমি থরথর করে কাঁপে। আমার দাদারা পাহাড় হয়ে ধসে! হুঁ, তাদের বোনের গায়ে হাত? তাদের বোনকে না খেতে দিয়ে-দিয়ে মেরে ফেলা?

আবেগে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। পথে থেমে যায়। দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদতে থাকে অন্ধকারে। ওর কষ্টকে অনুভব করতে পারে সে—দত্তবাড়ির কৈলাস। আর সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কেঁদো না! যার অমন সাত সাতটা পাহাড় দাদা, তাকে কাঁদা মানায় না!

কান্নার মধ্যেই ফুঁসে ওঠে মেয়ে। কী মানায়, শুনি?

মুখ টিপে হাসে সে, দত্তবাড়ির কৈলাস। —হাসি।

একটু চুপ করে থেকে বলে—সাতভেয়েদের বোনের শরীলটা কি অক্তমাংসে গড়া লয়? সাতভেয়েদের বোনের মোন কি পাথর?

—না, তা লয় বটে।

—তবে?

—তবে কী···অন্যমনস্ক দত্তবাড়ির কৈলাস ঘোড়ার মতো মুখ তুলে নক্ষত্র দেখতে দেখতে বলে—তবে কী, এই নিরালা সনঝেবেলা সব মিথ্যেমিথ্যি লাগে। সব কষ্ট দাগ কাটে না। বলো, এই আঁধার যেমন—তার দাগ কি শরীলে লাগে? আমার তো লাগে না।

একথায় অমন দুর্দান্ত ও মহাপরাক্রান্ত সাতভেয়ে যারা, তাদের আদরের বোনটি খুব শান্ত হয়ে যায় হঠাৎ। আস্তে, ধীর উচ্চারণে, অস্ফুটস্বরে বলে—না, তা লাগে না বৈকি!

কৈলাস, সে দত্তবাড়ির, উঁচু মুখে কয়েকটি পা বাড়িয়ে প্রায় পাশে গিয়ে বলে—এই যে আমি, দত্তদের আদরের ছোট ছেলে, না খাওয়া না দাওয়া কষ্ট করে হাঁটছি। কিন্তু বাড়ি গিয়ে উঠলেই কতরকম ভালমন্দ খেতে পাব। আরামে ঘুমোবার বিছানা পাব। চাকরবাকরকে ডেকে বলব, পা টিপে দে। মাথার কাছে চাবি টিপব, কলের গান বাজবে। শুনতে শুনতে ঘুমোব। ···স্বপ্নাচ্ছন্ন বিহ্বল কণ্ঠস্বরে সে বলে যায়, যেন এই সৈরভীর থেকে অনেকটা দূরে চলে যায় ভেসে, অন্য এক জগতে। সে ঢোক গিলে ফের বলে—তখন আর মোনেও থাকবে না যে একটা দিন বড্ড কষ্টে কেটেছিল। আর তুমি···

—হ্যাঁ, আমিও উঠোনে পা দিয়ে ডাকব, দাদা! এক দাদাকে ডাকলেই সাত-সাতটা মুখ সাড়া দেবে। তা' পরে···

—তা পরে তুমিও বাসি পেটে কত ভালমন্দ খাবে, ঘুমোবে।

সৈরভী, দোর্দণ্ড প্রতাপ সাতভেয়েদের বোন, হঠাৎ ফিক করে হাসে। —কিন্তু একটা কথা মোনে থাকবে আমার, চিরটা কাল।

—কী?

—মুখে কি বলতে পারি? বুঝে লাও, তুমি তো পুরুষ মানুষ।

—বুঝলুম। আমারও থাকবে।

অনেক চাপা সুখে সেই এক-বোন-পাগলের মতো সৈরভী বলে ওঠে—পথ তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গিয়েছিল এক নিরালা সনঝেবেলায়, হাজার কোশ রাস্তা দণ্ডেই শেষ। এখন আমি বাঁয়ে ঘুরি, তুমি যাও ডাইনে।

দত্তকুলোদ্ভব কৈলাস থমকে দাঁড়ায়। ফালি চাঁদটা কখন হারিয়ে গেছে। নক্ষত্রের আলোয় কিংবদন্তীখ্যাত আলপথ শেষ হয়েছে সামনে পায়ের কাছে। কাঁচা সড়ক চলে গেছে ডাইনে বাঁয়ে পলাশগাঁ থেকে বাবলতলী-কাপসা। আর হঠাৎ এই সন্ধ্যারাতের পথটা সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করে নড়ে ওঠে। পা

বাক্যাতে গা কাঁপে। বোবা ধরে যায় গলায়। জিভ শুকনো খড় হয়ে ওঠে। শেষ হয়ে গেল এক্ষুণি এক্ষুণি সবটুকুই? সৈরভী, এই নামের সৌরভ ঝাঁঝালো হয়ে, মৌমাছির মতো, মগজে ভনভন করে। না জানি সাতভেয়েদের বোনের কেমন মুখ, কেমন ওই শরীল, গন্ধতেলের শিশির মতো নিটোল, নাকি ধুতরো ফুলের মতো পলকা হাল্কা, নাকি দুপুরবেলার দেখা দূরের কাশবনের মতো চুলের ঝারি নেমেছে পিঠে, গা ছমছম করা বন্যতা?

—কী হল গো দত্তবাড়ির ছেলে, থমকালে ক্যানে?

—উঁ? না, ভাবি।

—কী ভাবো গো?

—রাত পোহালে রোদ্দুরে চিনতে পারব, নাকি পারব না, তাই।

—ও, এই কথা। কেমন হাসে সৈরভী, চারুবাবুর বেহালা বাজে।

—তুমি কিছু ভাবো না, সৈরভী?

—হুঁ, ভাবি। শুধু এই কথাটা ভাবি, পরকে ঠকাতে গেলে নিজেও ঠকতে হয়। কৈলাস দু পা এগোয় সাহসে—ই কথাটার মানে?

—মানে? জানিনে মানে। বলেই আচমকা সৈরভী বাঁয়ে ঘোরে। প্রায় পিছলে চলে যায় দূর থেকে দূরে। পলকে পলকে অন্ধকারে মিশে যেতে থাকে মূর্তিটি।

আর কৈলাস একবার চেঁচিয়ে ডাকে—সৈরভী!

কোনও সাড়া আসে না। নিজের ডাকটা নিজেকেই ঠাট্টা করে। হুঁ, কুখ্যাত মহাবলী সাতভেয়েদের বোন, তাই এমন নিদয়া মেয়ে! বেশি উদ্যোগ করলেই কে জানে দাদাদের নাম ধরে ডেকে ফেলবে। সর্বচর লোকগুলো কখন কোথায় থাকে বলা যায় না, কৈলাস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কিন্তু কথাটার মানে বলে গেল না। পরকে ঠকাতে গেলে নিজেও ঠকতে হয়। এই বাক্য তাকে এখন ধোপার পাটে ভিজে কাপড়ের মতো আছাড় মারতে থাকে। সে মনে মনে ছটফট করে, বাঁয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। ইচ্ছে করে মেয়েটাকে দৌড়ে গিয়ে আটকায়, তীব্র কণ্ঠস্বরে এই প্রথম প্রহরের জনহীন অন্ধকার ফালাফালা করে বলে—ই কথাটার মানে বলে যাও, নয় তো ছাড়ব না, আমার জীবন মরণ সমিস্তে! কিন্তু ও যে সাতভেয়েদের বোন! পলকে সাপিনী হয়ে ছোবল দিতে দেরি করবে না।

আর ক্রমশ একটা অদ্ভুত ভয় তাকে চেপে ধরতে থাকে। কোনও অসম্মান

করে বসেনি তো ওর? কোন পলকা হাল্কা টুকরো কথায় মনের চাপা ইচ্ছে কি লোভের গন্ধ বেমক্কা ছড়িয়ে যায়নি তো? সাতভেয়েদের রাজ্য চারদিকে ছড়ানো। তাই বুক কাঁপে। জীবনে বেঁচে থেকে সাধআহ্লাদ নিয়ে সবাই কাটাতে চায়, এ জীবনটায় তো সুখও বড় কম নেই। এবং গুরুতর অস্বস্তিতে সে বিড়বিড় করে মনের ভেতর: ক্ষ্যামা করে দিও সাতভেয়েদের লক্ষ্মী বোনটি, অলেয্য কিছু বললে। পরক্ষণে ফের স্বগতোক্তি করে: তবে কী, মানুষকুলে জন্মো, যুবো বয়েস! ইচ্ছেকে এমন নিরালা পথে বাগ মানাতে পারে কে? যদি না পেরে থাকি, ক্ষ্যামা দিও লক্ষ্মীটি।

আরও অদ্ভুত ভাবনায় আক্রান্ত হয় সে। যদি হঠাৎ এখন সাতভেয়েরা কেউ এসে পড়ে বলে—এ্যাই শালো! আমাদের যোবতী বোনটিকে একা পেয়ে কী মন্দ কথা বলেছিস? মুষড়ে পড়ে কৈলাস। করযোড়ে মিনতি করতে থাকে, মনে মনে—দাদারা, তাকে আমি ভুলেও মন্দ কথাটি বলি নাই।

তারপর সেই গুরুতর ভয়-ভাবনার খোঁচা খেতে খেতে সে এবার ডাইনে কাঁচাসড়কে প্রায় তাড়াখাওয়া শেয়ালের মতো দৌড়তে শুরু করে। সৈরভীর উল্টোদিকে সে প্রাণভয়ে পালাতে থাকে—যেন বিস্মৃতিতে। যেন এমন আশ্চর্য ঘটনা কোনদিন ঘটেনি তার জীবনে, যেন এমন বিপর্যয়কর আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে কখনও আর তাকে অপ্রস্তুত হতে হয়নি।

অনেকটা গিয়ে একবার হাঁফ নেবার জন্যে দাঁড়ায়। হুঁ, সাতভেয়েদের মানী বোন এককাপড়ে পাঁচণ্ডীর শ্বশুরবাড়ি থেকে এমন করে পালিয়ে এল, তার সাক্ষী রইল সে—এটাও তো সাতভেয়েদের কাছে দুস্তরমতো আপত্তিকর ঘটনা। ওদের পারিবারিক খিটকেলের জলজ্যান্ত সাক্ষী কি না কৈলাস! সহজে ছেড়ে দেবে না শালারা! এবং এটা আবিষ্কার করতেই ফের সে প্রাণভয়ে দৌড়তে শুরু করে।

কিন্তু খানিকটা গিয়েই সে ফের থামে। তবে কি না, সে কৈলাস দত্ত-বাড়ির। ঢুঁড়ে হন্যে হোক না সাতভাই ডাকাত, পলাশগাঁর দত্তবাড়িতে কোন শালা কৈলাস নেই। আছে ষষ্ঠিচরণ আর তার ছেলে। আছে তাদের জ্ঞাতিপাঁতি। কৈলাস সেথা নেই, থাকবার কথাও নয়। এক কৈলাস আছে বটে, সে জেতে বাউরি—তার বাবার নাম রক্ষাকর বাউরি, থাকে ঢেলাইচণ্ডীর ওদিকে বাউরিপাড়ায়, পলাশগাঁয়ের পুবে ঝাড়া ক্রোশটাক মেঠোপথ। সেই কৈলাস গরু চেনে এবং সেই কৈলাস আজীবন রাখাল।

তবু মন খচখচ করে। কথাটার মানে কী? 'পরকে ঠকাতে গেলে নিজেও

ঠকতে হয়!' রক্ষাকর বাউরির ছেলে কৈলাস মুখ উঁচু করে এবার সকাতরে চেরা গলায় গান গেয়ে ওঠে :

রাধে লো তোর আঁধার ঘরে বেড়াল ঢুকেছে এ এ···এ

দই খেয়েছে ভাঁড় ভেঙেছে মজা লুটেছে···এ···এ···এ

তারপরই হঠাৎ থেমে যায়। তার মনে হয়, একটা এরকমই আঠালো পিছল ও ভিজে ব্যাপার ঘটতে পারত, ঘটল না। শরীল ফাটিয়ে বটগাছের আঁকুর গজাবার কথা ছিল, গজাল না। সম্ভাবনাগুলো খালি অন্ধকার মাঠের আকাশে ওড়াউড়ি করে পালিয়ে গেল, নামল না। কৈলাস কান পেতে যেন পাখার শব্দ শুনতে শুনতে প্রচণ্ড বেগে রুখে ঘুরে দাঁড়ায়, উল্টোদিকে। কতক্ষণ এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে।···

তখন সৈরভী রাস্তায় যেতে যেতে ঢোক গিলছে। ছাড়াছাড়ি হতেই খুব দৌড়েছে, তাই হাঁপাচ্ছে। সে নিজেকে বলছে, হুঁ, তোর বড় ডর সৈরভী। অমর্ত বাগ্দীর মেয়ে তুই, কাঁকড়াগুগলি খাওয়া শরীল—তাকে বড় ডর। কী জানি, যদি এই শরীল ফাটিয়ে মুখিয়ে ওঠে তেজী নিষিদ্ধ বটের আঁকুর! তাই অমন পটাপট মিথ্যে বললি দত্তবাড়ির ধনীমানী ছেলেটাকে!

তবে কথা কী, পাঁচগুঁর হাটে শ্বশুরবাড়ি, এটা মিথ্যে না। ওরা হাড়মাস কালি করে ফেলেছিল, সেও মিথ্যে না। সৈরভী হাসতে গিয়ে হঠাৎ টের পায়, আজ তাকে কী পরাক্রান্ত সুখ থেকে কেউ যেন অবিশ্বাস্য জোরে সরিয়ে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কাঁপাকাঁপা আঙুলে মাথায় এক ফালি ঘোমটা টানে সে। তারপর ঘুরে দাঁড়ায় উল্টোদিকে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে।···

বোধ

খবর পেয়েই ছোটবাবু খোলা ছাদে উঠে গিয়েছিল। তারপর নাগাদ দুপুর তাঁকে মোড়ায় বসে বন্দুক সাফ করতে দেখা যাচ্ছিল।

একটা বাঁধের ওপর ছোটবাবুর একতলা দালান আর খামারবাড়ি। চার-

পাশে সবুজ ধানের মাঠ। সোনামুখি নদী থেকে মহুয়া বিল অব্দি একনজরে দেখা যায় ছাদ থেকে। জলের ওপর পাখিদেরও দেখা যায় ঝাঁক বেঁধে উড়তে। কোথাও মেছুনী কাঁধে জাল নিয়ে চলেছে। কোথাও দু-একজন চাষা হুমড়ি খেয়ে ধানের ক্ষেতে পড়ে আছে সারা দিন।

তার ওপারে রেললাইন। দুপাশে টানা কাশ-কুশ-শরবন নিয়ে শহরের স্টেশনে চলে গেছে। এই ছাদটা থেকে রাতের দিকে অত দূরের সিগনাল পোস্টে লালনীল আলো জলজল করতে দেখা যায়। সরকারী বনদপ্তর ওদিকে রাতারাতি একটা বনভূমি গজিয়ে না তুললে শহরও দেখা যেত এক সময়।

এইটে ভাবতে কেমন ঘোর লাগে। ছোটবাবুর খামারবাড়ির চারপাশে এক যুগ আগে একটা সত্যিকার বনভূমি ছিল। হিজলভাঁট-কাঁটাবাবলা আর বহু মাইল জোড়া কাশ-কুশ-শরের বিস্তীর্ণ জঙ্গল। হরিণ ছিল। বাঘ ছিল। ছিল বুনো শুয়ার, ময়াল, পাহাড়ী অজগর আর বুনো মানুষদের ডেরা। তারও আগে এই লাটটা নাকি দ্বারকা-সোনামুখি-শঙ্খিনী নদীর করধৃত শ্বেতপদ্মের মত স্বাভাবিক জলাধার। পলি জমে জমে বছরের পর বছর ওই অরণ্যকে সৃষ্টি করেছিল।

অরণ্য নির্মূল হল এখানে। ওখানে বনদপ্তর হিসেব কষে পত্তন করল নতুন এক অরণ্য। এবং সত্যিকার অর্থে যা বিভীষিকাময় হিংস্রতায় পূর্ণ নয়।

এখানেও নয়। এখন ফসলের মাঠে শরৎকালীন রোদ দেখতে দেখতে ছোটবাবুর কেবলই মনে হয় উৎসব আসন্ন।

আর সেই আসন্ন উৎসবের মুখে খবরটা হাওয়ার আগে ছুটে এল। ছোটবাবু ব্যস্তভাবে বন্দুকটা সাফ করতে থাকল। ছাদ থেকে চারপাশে সতর্ক লক্ষ্য রেখে মনে মনেও নিজেকে প্রস্তুত করে নিল সে।

অনেক দিন আগে একবার এমনি হানা দিয়েছিল। অনেক ফসল নষ্ট হয়েছিল তাতে। জখমও হয়েছিল বেশ কয়েকজন—তাদের মধ্যে দুজন পরে মারা গিয়েছিল। খামারবাড়ির অদূরে এই বাঁধের ওপর চাষীদের বসতিগুলিতে তাই একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েরা ঘর থেকে বেরচ্ছে না। পুরুষেরা হাতে অস্ত্র নিয়েও মাঠে নামতে সাহস পাচ্ছে না। সে এক মূর্তিমান মৃত্যু—স্বয়ং যমরাজের বাহন। ঈশান কোণে শঙ্খিনী নদীর আশেপাশে দেখা গেছে। সেখান থেকে পালিয়ে-আসা লোকগুলিই খবর এনেছিল। তার আগে এসেছিল ওর মালিক। বেঁটেখাটো কালোকুচ্ছিত লোকটা বলেছিল—একটুও

টের পাই নি এমনি করে ক্ষেপে যাবে। তাহলে ওকে বাথানে নিয়ে যেতাম ছোটবাবু। কবে-কবে ও মা হবার বয়স পেয়ে গেছে কে জানত!

তার মুখেই শোনা গেছে, ইতিমধ্যে জনাদশেক জখম হয়ে গেছে ওদিকটায়। আর সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে ও আগের সেই মোষটার মত মেয়ে-পুরুষ বাছে না। শিশুদেরও রেহাই দেয় না। বিশেষ করে লাল জামা-কাপড় দেখলে তো পৃথিবীকে শিঙের আঘাতে টালমাটাল করে ফেলে।

একটা মদ্দা বলবান মোষ দরকার। লোকটা সেই তল্লাসে বেরিয়েছে। যাবার পথে খবরটা এলাকার বড়কর্তা ছোটবাবুকে দিয়ে গিয়েছিল।

একেবারে সোনালী রঙ। শিঙ দুটি ঘোর বাঁকানো। হৃষ্টপুষ্ট ভাজা একটা কুমারী মোষ। ছোটবাবু বন্দুকে এক জোড়া কার্তুজ ঠেসে ছাদ থেকে এক সময় নেমে এল। বারান্দায় মৌটুসী পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। জানু অব্দি খোলা। শাড়িটা ঠিক মত পরতে পারে না আজও। অত সুন্দর ব্লাউসটারও বোতাম খোলা।

মৌটুসী বন্দুক সাফকরা সেই কালিঝুলিমাখা ন্যাকড়াগুলি নিবিষ্ট মনে চিবুচ্ছিল। ছোটবাবুকে দেখে একবার চোখ তুলে হাসল।

অভ্যাসমত তেড়ে মারতে গিয়ে ছোটবাবু হঠাৎ থামল। এই হাসিটা কেমন আশ্চর্য লাগে। জীবনে যে কোনদিন একটুও কাঁদতে জানল না—সে নিশ্চয় মানুষ নয়। তার হাসি তো অর্থহীন। স্মৃতির ভেতর দিকে গিরিবালাও নিঃশব্দে অস্ফুট হাসছে অকারণ। রাণীচকের পৈতৃক দালানবাড়িতে সেই ছবিটা আজও দেয়ালে টাঙানো আছে। কতবার ভেবেছিল এখানে নিয়ে আসবে। শিয়রে ঝুলিয়ে রাখবে। অথচ রাণীচক গেলেই যেন রাজ্যের কাজ এসে তাকে অন্যদিকে ঠেলে দেয়। মনে থাকে না।

গিরিবালা মরে গেলে এই বাঁধগুলি তৈরি হয়েছিল। ফলে সে ছোটবাবুর ফসলের মাঠ দেখে যেতে পারে নি। দেখেনি জীর্ণ প্রাচীন দালানবাড়ির ক্ষয়-ধরা সত্তা কেমন করে এই দূর হিজলের মাঠে নতুন গড়ে ওঠার রূপ পেল। ঐশ্বর্যে সাহসে সুখে অপরূপ হয়ে উঠল। অনাবাদী দুর্গম অরণ্য দেখে গিয়েছিল গিরিবালা—যার থেকে একটি কানাকড়িও আয় নেই রায়পরিবারের উত্তর-পুরুষের অংশে। গিরিবালা দারিদ্র্যকে দেখেছিল শুধু। মাতাল লম্পট জুয়াড়ি ছোটবাবুকে ঘৃণা করতে করতে শেষ মুহূর্তে একবার স্বীকার করে গিয়েছিল—তোমাকে ভালবাসতাম। ও আমার মুখের ঘৃণা; মনের নয়। হয়ত আজ

সুখের দিনে সে তার সেই গোপন ভালবাসাকে ছোটবাবুর ফসলের মাঠের মত—প্রতিটি ইচ্ছার শিশিরবিন্দু দিয়ে সাজিয়ে দিত।

একটা নেপথ্য কাঁটা ফুটে থাকা এটুকু। ছোটবাবুর সব মনে পড়ে।

মৌটুসী হবার পরেই গিরিবালা ধসেপড়া দালানের এক কোণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। মা-মরা মেয়ে। দেখাশোনার কেউ নেই। ছোটবাবু তখন হিজলের মাঠে ফসলের স্বপ্ন দেখছে। কোর্ট-কাছারি শহর দলিলদস্তাবেজ নিয়ে ব্যস্ত। হামাগুড়ি দিয়ে মাটি ইট-কাঠের টুকরো খেয়ে মানুষ হচ্ছিল মৌটুসী। একদিন দেখেছিল সে আস্ত একটা সাপ ধরে মুণ্ডুটা চিবোনর তালে। ভাগ্যিস সেটা হেলে সাপ। কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত ছোটবাবু তাকে তুলে আছাড় মেরেছিল। বেশ কিছু সময় চুপচাপ পড়ে ছিল মৌটুসী। মরে যায় নি, এই এক আশ্চর্য। এক সময় চোখ খুলে তার উদ্ভট হাসি। ঘোর নিঃশব্দ। শুধু চোখের হাসি। সে কাঁদতেই জানে না।

ছোটবাবু কাঁদতে পারে নি। তাই দারুণ জোরে সেও হেসে উঠেছিল সেদিন। প্রাচীন বিবর্ণ দালানের ফাটলধরা ছাদে তার অট্টহাসির প্রতিধ্বনি এখনও যেন কান পাতলে শোনা যায়।

এই হাসিটা ছিল এক আবিষ্কারের।

মৌটুসী যেন প্রকৃতির এক অদ্ভুত তামাশা। জীবন যে এমন অসংলগ্ন কিম্ভূত কিছু হয়, তার কোন সাক্ষ্য নেই। ওই কেঁচোটাও সহজাত বৃত্তি বশে চলাফেরা করতে জানে। আক্রান্ত হলে ছুটতে জানে। সর্বোপরি সে তার শত্রুকেও চিনতে জানে। শামুক, পিঁপড়ে, সাপ, বিছে, কাঁকড়া···প্রাণী যত নীচু স্তরেরই হোক, পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়া তাদের সহজাত ক্ষমতা। এমন কি অ্যামিবাও নির্দিষ্ট নিয়মে চলার জন্য সতত প্রস্তুত। কিন্তু মৌটুসী? ওর আহার নেই, নিদ্রা নেই, আপন-পর ভেদ নেই—একেবারে সকল সম্বিতের বাইরে যেন। কোনও নিয়ম তার জন্যে সৃষ্টি করা হয় নি। জোর করে খাইয়ে দিতে হয়। ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয়। চিনিয়ে দিতে হয় কোনটা কী। কারণ একটা সাপ আর এক টুকরো বিস্কুটে কী পার্থক্য তা সে বোঝে না।

এমনি করে নিয়মহীনতার মধ্য দিয়ে বয়স পাচ্ছিল মৌটুসী। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার সময়ও তার জীবনে এল। অথচ নির্বিকার। ডুবে যাবার ভয়ে খালের জলে নামতে নিষেধ করা হয়েছিল। একদিন দেখা গেল, ঠিকই নেমেছে। তারপর উঠে আসছে শাড়িখানা জলে খুইয়ে। ছোটবাবু ছুটে গিয়ে ছড়ির

আঘাতে তার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। তখন ওই উদো কোত্থেকে একটা কাপড় জড়িয়ে দেয়। হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। মারধরের সময় উদোটাই যা বাঁচায়। হয়ত উদোর ভাষাটা মৌটুসী এই সবের মধ্য দিয়ে কিছু বুঝে থাকবে। ক্রমশ দেখা যাচ্ছিল—উদো বুঝিয়ে দিলে কিছু করা-না-করার তফাৎটা মৌটুসী একটু-একটু বুঝেছে। ছোটবাবু খানিক আশ্বস্ত হয়েছিল। মাঠের দিকে চলে গেলে আগের মত মৌটুসীর সম্পর্কে উৎকণ্ঠায় থাকতে হত না তাকে। জানত—উদো তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।

মৌটুসীও যেন উদোর মুখোমুখি কেমন পোষা প্রাণীর মত গুটিয়ে যায়। ছোটবাবু ভেবেছিলেন ওটা ভয়। মারধর যার কাছে অর্থহীন ব্যাপার, আদর-সোহাগও যে বোঝে না, উদো হয়ত তার কোন গোপন চেতনা-কেন্দ্র আবিষ্কার করেছে,—সেখানে উদো রীতিমত একটা সাড়া সৃষ্টি করে থাকবে। আর সেই সাড়াটাই ভয়ের আকারে দেখা দিচ্ছে।

না! এর বেশী কিছু বোঝে নি ছোটবাবু। কিন্তু বুঝতে হল ক্রমে-ক্রমে।

টাটকা খাঁটি দুধ পাবার জন্যে গুটিকয় গাভী পুষেছিল ছোটবাবু। পরে দেখা গেল খামারবাড়ির লোকজনের খিদে মেটানোর পরও বাড়তি থেকে যায়। শহরে চালান দেওয়া যায়। পয়সা আসে। এবং পয়সাকে যে অবহেলা করে নি সে, তার প্রমাণ এই দূর প্রান্তরে বসতি, ফসলের মাঠ, মামলামোকর্দমা।

উদো ওই পরিচর্যার ব্যাপারেই ছোটবাবুর হাতে আসে। মা-বাপ নেই. তিনকূলে কেউ নেই। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যার খুশি একপেট খাইয়ে দিয়ে তাকে পাহাড়প্রমাণ কাজের বোঝা চাপালে সে পিছপা নয়। নির্বিবাদে খাটে। মারধোর হজম করে। খানিক কাঁদে। তারপর গা-গতর ঝেড়েমুছে বড় বড় দাঁত খুলে হাসে। হাঁটলে মনে হয় আস্ত ভালুক থপথপ করে চলেছে।

অর্থাৎ কোনও কোনও দিকে ওই মৌটুসীর যোটক।

উদোর শরীরও আস্তে আস্তে ভয়ালদর্শন হয়ে উঠছিল। এখানে হিজলের মাঠে প্রচুর বিশুদ্ধ হাওয়া-বাতাস। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে দুর্বার বন্যতা। নিরাবরণ এই ব্যাপকতা মানুষকে শক্তি দেয় প্রতিরোধের। নদীর গাঢ় গেরুয়া জল পাগলা মোষের গতিবেগ নিয়ে আষাঢ়ে যে প্রচণ্ড স্রোত সৃষ্টি করে, মানুষের শরীরে তার কিছু রেখে যায় যেন। তারপর শরৎকালের স্বচ্ছ-হয়ে-ওঠা জলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হয় কোন এক সার্বভৌম সম্রাট।

ঠিক তাই-ই। ছোটবাবু যেমন ভাবে নিজেকে।

উদো তার সার্বভৌমত্বটুকু ছোটবাবুকেও জানাতে ব্যস্ত হচ্ছিল যেন। ডাকলে সে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াচ্ছিল—বামুন, ওদিকে আমার কাজ রয়েছে না ?

ছোটবাবু বরং কৌতুক অনুভব করছিল। টের পাচ্ছিল এটা ঠিক অবাধ্যতা নয়। বয়সের দেমাক। ছোঁড়াটা যৌবনে পৌঁছেছে এবার।

তবু সবটা বোঝার বাকী ছিল।

কদিন আগে ছোটবাবু দেখেছিল—খড়ের স্তূপের এক প্রান্তে উদো আর মৌটুসী খুবই ঘনিষ্ঠভাবে বসে রয়েছে। মৌটুসীর একটা হাত উদোর কর্কশ কুচ্ছিত পিঠে—অন্য হাত দিয়ে সে ধানের কচি থোড় বের করে চিবোচ্ছে কোঁচড় থেকে। উদো হাতমুখ নেড়ে কী সব বোঝাচ্ছে তাকে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ছোটবাবু।

চুপিচুপি সরে এসেছিল। কী জানি কেন ক্রোধটা খুব দানা বাঁধছিল না। বরং কী একটা অভিমান তাকে গিরিবালার স্মৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। সারাটা রাত ছোটবাবু ঘুমোতে পারে নি।

এ যেন চুপিচুপি একটা গুরুতর দুষ্কর্ম লালন করার ব্যাপার—যার আবরণ তুলে দেখতে নিজেরই ভয় করে। দিনের পর দিন যা পরিণতির পথে চলেছে। তা শুভ কি অশুভ ঠিক টের পাচ্ছে না।

ছাদ থেকে নেমে এসে ছোটবাবু তখন খামারবাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ডাকল—ও উদো, উদো !

উদো সাড়া দিয়ে বলল—এই তো আছি।

বড় বড় দাঁত খুলে সে হাসছে। ছোটবাবুর গা জ্বলে গেল দেখতে দেখতে।—দাঁতগুলো ঢাক দিকি ব্যাটা! একটা মোষ ক্ষেপেছে শুনেছিস ?

—হ্যাঁ।

—বাইরে-টাইরে বেরোস নে। আর দেখিস, মৌটুসীও যেন বেরোয় না।

উদো মাথা নাড়ল।

বন্দুক হাতে ছোটবাবু বেরিয়ে গেল।

বাঁওড়ের দিকে চলতে থাকল সে। সকালে আরশাদ শিকারীকেও খবর দেওয়া হয়েছে। তাক করে বন্দুক ছুঁড়তে তার জুড়ি নেই।

প্রশস্ত নালার আকৃতি জায়গাটা। বর্ষায় জল জমে। এখন শুকিয়ে গেছে। ঘন ব্যানা আর কাশ গজিয়েছে নরম মাটিতে। কাশফুলের ওপর চক্রাকারে

ছোট ছোট পাখি উড়ছে। কাঁটাবাবলার ডালে বসে একটা শামুকখোল পায়ে ঠোঁট ঘষছে। এই শরৎকালে ঘাস আর ভেজামাটির অদ্ভুত গন্ধ ছড়ায় চারপাশে। যতদূর চোখ গেল, ছোটবাবু আরশাদ শিকারী অথবা মোষটাকে খুঁজছিলো।

হঠাৎ সুমুখে কাশঝোপটার ওপর করকর করে একঝাঁক পাখি উড়ে গেল। তারপরই ঝোপটা ভীষণ নড়তে থাকল। ছোটবাবু চমকে উঠেছিলো। মাত্র হাতদশেক দূরে সেই সোনালী রং-এর মোষটা থমকে দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি।

পলকে সমস্ত শরীরে যেন মূর্ছার মতো একটা দুরন্ত ঘূর্ণি ছোটবাবুকে অস্থির করেছে। চোখ বুজে মাথার মধ্যবিন্দু লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপল সে। জলন্ত বারুদের চিৎকারে হিজলের মাঠ প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দিল চারপাশে। এই শব্দটাই নিজেকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

মোষটাও ভয় পেয়ে গেছে। শিং উঁচু করে ধানের ক্ষেত ভেঙে ছুটে চলেছে সোজাসুজি। ছোটবাবু অনুসরণ করল। এই অনুসরণে হিংস্রভাব কিন্তু প্রকট ছিল না।

খালের পারে খামারবাড়ি।

ছোটবাবু দেখল মোষটা ওদিকেই চলেছে। তার বুক কেঁপে উঠল দেখতে দেখতে। মৌটুসী কি গেট খুলে বাইরে বেরিয়েছে?

খাল পেরিয়ে মোষটা বাঁধে উঠেছে ততক্ষণে। খামারবাড়ির সুমুখে ঢালু জমিটায় ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর ছোটবাবু দেখল উদো একটা প্রকাণ্ড কাটারি হাতে ছুটে এল।

ছোটবাবু চিৎকার করতে গিয়ে হঠাৎ থামল। অদ্ভুত একটা সূক্ষ্ম কৌতুকের বোধ মাথার ভিতরদিকে সাপের মতো ফণা তুলে কাঁপছে। বিষধর সাপ।

ফের সে ডাকবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু উদোর কোপ খেয়ে মোষটা পিছিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পরক্ষণেই সে দারুণ গর্জন করে ছুটে গেল শিং নেড়ে। উদোকে তুলে ছুঁড়ে ফেলল পেছনদিকে।

ছোটবাবু বাঁধের উপর থেকে দেখতে দেখতে কেমন নিরাসক্ত হয়ে পড়ছিল যেন। তার ডেকে বলতে ইচ্ছা করছিল—ওটা যা হবে রে উদো, ওকে কেন মারতে গেলি মিছেমিছি? এই শব্দগুলি তার জিভে খসখস করছিল। অনুশোচনা হচ্ছিল, বন্দুক ছোঁড়ার জন্য। কি দরকার! ওর মালিক শীগগিরই একটা মন্দা মোষ জোটানোর চেষ্টা করছে। শান্ত হয়ে যাবে সোনালী মোষটা।

খুব ক্লান্তি বোধ করছিল ছোটবাবু। চোখের সুমুখে উদোকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখে তার মনে হল, উদো তার কৃতকর্মের ফল পেয়েছে। ছোটবাবু হঠাৎ যেন ক্ষেপে যাচ্ছিল এসব ভাবতে। দারুণ অশ্লীলভাবে গালাগালি করতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু আরো একটু এগিয়ে সে দেখল, উদো মোটেও কাবু হয়নি। বরং সেও হিংস্রভাবে গর্জন করে পেটটা এক হাতে চেপে ধরে ফের কাটারি তুলেছে।

—একটা জানোয়ার, পাষণ্ড, শয়তান! দাঁতে দাঁত চেপে ছোটবাবু কথাগুলি বলল।

দ্বিতীয় আঘাতে মোষটা নিদারুণভাবে আহত হল। এবার সে এত জোরে গর্জন করে উঠল যে কানে তালা ধরে যায়।

তারপর ছোটবাবু যে দৃশ্য দেখছিল, মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গিয়েছিল। মৌটুসী গেট খুলে ছুটে আসছে। শরীরের আবরণ খসে গেছে। উন্মাদের মতো মৌটুসী ঠিক জন্তুর ভাষায় চাৎকার করে মোষটার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। উদো সরে গেছে তফাতে। রক্তাক্ত শরীরে হাঁফাচ্ছে জিভ বের করে। মোষটাও কাবু হয়ে পড়েছে। মাথা নীচু করে এবার সে মৌটুসীর দিকে ছুটে গেল। ছোটবাবু বন্দুক তুলেছিল। মাছিটার সঙ্গে একাকার করে দেখল মিলনোন্মত্তা জন্তুকে। সে ঠিক করতে পারছে না কিছু। ট্রিগারে হাত রেখে নিশ্চল হয়ে গেছে। তার সমস্ত সত্তায় মৌটুসী ও মোষটা এক হয়ে গেছে লক্ষ্যে।

পরমুহূর্তে বন্দুকের আওয়াজ। পেছন থেকে আরশাদ শিকারী বলল—কী ব্যাপার? কার্তুজ ভেজা ছিল নাকি? ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম

ছোটবাবু শুধু ঘাড় নাড়ল।

সুমুখে সোনালী মোষটা পড়ে রয়েছে। তার পাশেই উদো। দুজনেই রক্তাক্ত শরীরে হাত পা ছড়িয়ে নিজ নিজ বীভৎসতাকে প্রকট করছে।

মৌটুসী দাঁড়িয়ে আছে দুটি মৃতদেহের মাঝখানে তেমনি স্তব্ধ। ছোটবাবু তার হাত ধরে টানল।—ঘরে আয়।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল সে। মৌটুসী—সেই জড়ভরত মেয়ে বোধ-বিবেকহীন মৌটুসী—নাকি অন্য কেউ? ছোটবাবু নিষ্পলক দেখতে থাকে। আর তাই লক্ষ্য করে আরশাদ শিকারী চাপা স্বরে বলে—আপনার বেটি কাঁদছে।

সাজ ভেসে গেছে

'আজ্ঞে সার, নাম মইলোবাস, নিবাস সাকিন মাদারহাটি, পোস্টোআপি গোকরোণ, থানা কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ…'

—'ভাল। কী চাই?'

—'আজ্ঞে, সাহায্যো!'

—'সাহায্য? কেন? কিসের?'

—'আজ্ঞে সার, বেউলোর দলের।'

ব্লকের সরকারী সমাজ শিক্ষা সংগঠক ভুরু কুঁচকে তাকান।—'আবার কী?'

সঙ্গে এসেছে মতি চৌকিদার। সবিনয়ে হেসে বুঝিয়ে দেয়, 'বেউলানখি পালা সার। পেচণ্ড বান-বন্যেয় সাজের বাকসোপেঁটরা সব ভেসে গিয়ে দেখুন না, দরখাস্তে অঞ্চলপ্রধান সব নিকে দিয়েছেন। মইলোবাস, দরখাস্ত আগে দাও সারকে।'

অফিসার বাবুটি কলকাতার মানুষ। সবে চাকরি পেয়ে এই অখদ্যে জায়গা এসেছেন। খিকখিক করে হাসেন।—'তাই বলো। তা কী নাম বললে যে—মইলোবাস স্যাক, সার।'

অফিসার তাকান লোকটির দিকে। বছর বিয়াল্লিশের মধ্যেই বয়স সম্ভব বিশাল শরীর। গায়ে ময়লা হাতাগুটানো রঙীন পানজাবি, পরনে মালকোঁচা ধরনে ধুতি—এলাকার মাটির হলদে ছোপলাগা, পায়ে রবারের ফাটাফুটা স্যাণ্ডেল এবং কাঁধে তেমনি শ্রীহীন ঝোলা। লোকটার গায়ের রং তামাটে, খাড়া মস্তো নাক, বড় বড় কান, টানা চোখে হতচকিত বিহ্বলতা, রূপ তিনটে ভাঁজ। একমাথা বাবরী চুল। তিনি ফের হাসেন—'তুমি তো শিল্পী তাহলে। আর্টিস্ট! হ্যাঁ?'

মতি হাসে। মইলোবাসও সাহস পেয়ে হাসে। মতির সলাতেই এসেছে মতি বলে—'হুকুম পেলে এক আসর গেয়ে দেবে, সার। কিন্তু পেচণ্ড বানে…'

মইলোবাস যুগিয়ে দেয়—'সাজ ভেসে গিয়েছে।'

অফিসার আরামে হেলান দিয়ে বলেন—'তো মইলোবাসটা… বলো তো?'

পিছন থেকে তৃতীয় একজন, সে একেবারে তরুণ, কালো বেঁটে ও
চ্ছিত চেহারা, পরনে ধুতি ও নীলচে হাফশার্ট, ব্যাখ্যা করে দেয়—'নাম
র মওলা বখ্‌শ। অশিক্ষিত লোক সব। কেউ ডাকে মৌলবাস, কেউ
ইলোবাস।'

—'তুমি কে?'

—'আমি সার বাহাসতুল্লা। দলে বৈয়ালি করি।'

—'এ্যাঁ?'

এসব আঞ্চলিক টার্ম ভদ্রলোকের জানবার কথা নয়। মতি সব ব্যাখ্যা
রে। বৈয়ালি বা বইয়ালি করা মানে প্রম্প্‌ট করা। বাহাসতুল্লা অল্পস্বল্প লেখা-
ড়া জানে। সে পালায় হাতেলেখা মস্তো খাতা থেকে প্রম্প্‌ট করে আসরে।
খন তাকে মাথায় হারিকেন চাপিয়ে আলো দেয় যে তার নাম নগেন
গী। আঙুলে সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটে জ্বর হয়েছে বলে আসতে পারে নি।
নের জল নেমে গিয়ে খালে-জলায় এখন বেশ মাছ হচ্ছে।

দরবার করতে আরও সব এসেছে। যে বেউলো সাজে, তার গায়ের রং
লো। হাল্কা গড়ন। মুখে মেয়েলি ছাঁদ। বছর পনের-ষোল বয়স হবে।
ম অমূল্য, জাতে বাউরী। আর লখিন্দর? সে না এসে পারে? দল-দল
রেই তার বউ পালিয়েছে। তালাক দিতে হয়েছে। কারণ শ্বশুর লোকটা,
য়াজী সম্প্রদায়ের। তাদের কাছে গানবাজনা হারাম—নিষিদ্ধ। বিয়ের
াগে জামাই দলের নিছক 'সাপোর্টার' ছিল। হঠাৎ আগের লখিন্দর খুনের
মলায় জেলে ঢুকল। ঢুকল তো ঢুকলই। ফিরতে বুড়ো হয়ে যাবে। তখন
াজো নতুন নথাইকে। লখিন্দর বা নথাই হবে সুপুরুষ—ঢলঢল রূপলাবণ্য,
সরে তাকে দেখাবে দ্বারকানদীর আদিম বিশুদ্ধ আকাশের সেই প্রকৃত চাঁদ
াদারহাটির ধরণী তহশিলদার আজও বিশ্বাস করেন, সেই চাঁদে আমেরিকান
রাশিয়ানদের বাবার সাধ্যি নেই পা বাড়ায় এবং সোনাই ফকির হুঁহুঁ হেসে
লেছিল—'এ চাঁদ কি সে চাঁদ বটে মানিকরা?') সেই চির অলৌকিক চাঁদ
চবে আসরে, চাঁদসদাগরের চোখের মণি! আর চারু মাস্টারের বেহালা শুনে
রন্দির বিধবা মেয়েটা তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। আসরে তখন বিপুল
ন্যাৎস্নায় হাজার বছরের গ্রামীণ বিষাদ জেগে উঠবে। সে কি সহজ কথা?
াজো সেই আদরের নথাইকে। নথাই মিলেছিল। আকাশ আলি নাম।
াপের নাম আব্বাস হাজি। হজ করেছে—দাঁত পড়েছে। মোড়ায় বসে

শণের দড়ি পাকায়। ছেলে নথাই সাজে তো কী করবে? যৈবনে মানুষ বুনো ঘোড়া। বয়স হলে তখন তৌবা করে মক্কা যাবে। ব্যাস!

আকাশ আলি হিরো। তাই তার চুলে তেল বেশি। গায়ে আদ্দির পানজাবি—কিন্তু কুঁচকে জড়োসড়ো। হাতে ঘড়িও আছে। হজে গিয়ে বাপ এনেছিল। পায়ে কাদায় ভূত কাবুলি চপ্পল।

কিন্তু সে বড় লাজুক। পিছনেই আছে। দরজার কাছে। আর আছে 'নারাণবাবু' তবলচী। বাবু মানে বাবুবাড়ির গাঁজাখোর উড়ুক্কু মাস্তান ছেলে। বাড়ি পাশের গাঁয়ে। ভদ্রলোকের গাঁ। বাবা ননী মুখুয্যে পোস্টমাস্টার ছিলেন। ছেলে নারাণ ক্লাস ফোরেই বেরিয়ে পড়েছে, স্বাধীনতার স্রোতে ভাসমান। মদতাড়িগাঁজাভাং জমিয়ে টেনেছে এই বয়সেই। কিন্তু সেও শিল্পী ছেলে। তবলায় ঠুংরীগাইয়ে ওস্তাদ হাবল গোঁসাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গোঁসাই বলেছিলেন—'আয় শালা, সঙ্গ ধর।' কিন্তু সমফাকের মুখে গোঁসাইয়ের থাপ্পড় মারা অভ্যেস। একে তো সব সময় মাথার মধ্যে ভোঁ বাজে। অগত্যা নারাণ জুটেছে বেউলো দলে। ব্লক আপিসে দলের সঙ্গে রিপ্রেজেন্টেশনে এসেছে। কারণ সঙ্গে একজন বাবুটাবু থাকা ভালই, যদি পাত্তা দেন ওনারা।

অফিসার বলেন—'তাহলে তুমিই চাঁদ সদাগর?'

মইলোবাস সলজ্জ মাথা নাড়ে। মতি বলে—'শুধু তাই না সার, ও ছিল একসময় এলাকার সেরা পালোয়ান। মালামোতে ওর জুড়ি ছিল না। সাতখানা মেডেল আছে ঘরে। লতুন গামছা যে কত পেয়েছিল, হিসেব নেই। মৌরীগার বাবুরা পেতলের ঘড়া দিয়েছিলেন। ওনাদের গাঁয়ে হায়ার করে এনেছিল পচ্ছিমে পালোয়ান। ভকতরাম নাম। তাকেও ধুলোপিঠ করেছিল আমাদের মইলোবাস। কিন্তু শরীলে ব্যামো ঢুকল। এখন ভেতরটা ঝাঁঝরা।

অফিসার কেমন করে জানবেন এসব? খরার দুতিনটে মাস বৃষ্টির আশায় গাঁয়ে-গাঁয়ে মালামো হয় দিনক্ষণ দেখে। একজোড়া ঢোল বাজে। ঢোলের বোল ভারি মজার:

ঢোল্ টিপাকাঠি টিপ্ টিপাং
ওই শালাকে চিৎপটাং···

জড়াজড়ি দুই জোয়ান মাটিতে দাপাদাপি তুলেছে, গগন-পবন দুভাই ঢুলি তাদের ঘিরে দ্রুততালে বাজাতে থাকে···চিৎপটাং···চিৎপটাং চিৎপটাং···এবং একজন চিৎপটাং হলেই ঢোলে তেহাইয়ের শ্বাসছাড়া আওয়াজটি ওঠে—

ভুজ্জুম্! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে হাজার গ্রামীণ মানুষ: এই ও-ও-ও। গাঁয়ের বউঝি চমকে উঠেই হাসে। হাসিটি হাজার বছরের।

একদা মইলোবাস ছিল পালোয়ান। পালোয়ান ছাড়া চাঁদ সদাগর মানাবে কেন? সওয়া হাত বুকের ছাতি না হলে কেমন করে বেরোবে ও ভয়ঙ্কর গর্জন: 'সাবধানে চ্যাংমুড়ি কানী!'

মাথায় লাল ঝলমলে পাগড়ি, গায়ে লাল রেশমি বেনিয়ান রাংতার কাজ করা, পরনে মালকোচাকরা লাল কাপড়, আর হাতে হিন্তালের লাঠি। উঁচু হয়ে থাকা মুখ, পাকানো বিশাল গোঁপ, কপালে লাল ফোঁটা—সাজঘর থেকে হুংকার দিতে দিতে আসরে আসে—'জয় শম্ভো! জয় শম্ভো!'

—'বলো হে চাঁদ সদাগর, একবার পার্ট বলো শুনি!'

মতি শশব্যস্তে বলে—'নজ্জা করছে সার। সরকারী আপিস বটে কি না। আসরে হলে…'

—'উঁহু, একবার তো শুনি। নৈলে কেমন করে বুঝবো যে সত্যি আছে তোমাদের বেহুলার দল?'

সমস্যা বটে। মতি বলে—'তিন-পুরুষের দল, সার। নিবাস আলি গোমস্তা পালাটা নেকেছিলেন আমার কত্তাবাবার আমলে। সেই খাতা এখনও আছে। তা থেকে নকলে নিয়ে চলছে। বিশ্বাস না হলে এনকোয়ারি করে আসুন।'

বৈয়াল বাহাসতুল্লা বলে—'আমার দাদো এখনও বেঁচে আছে, সার। তার মুখেই শুনবেন। ছেলেবেলায় তিনি বেউলো সাজতেন! তেমন বেউলো আর হবে না সার। মৌরীতলার বাবুদের কেষ্টযাত্রার দল ছিল। ওনারা দুবছর আটকে রেখে রাধিকে করেছিলেন। শেষে গাঁসুদ্ধ লোক আসর থেকে তুলে নিয়ে আসে। খুব হ্যাঙ্গামা হয়েছিল সার। বাঁশির মতো গলা, আর চেহারাও সার তেমনি। এখন দেখলে মিথ্যে লাগবে।'

বিরক্ত অফিসার বলেন—'ঠিক আছে। দেখব'খন। কিন্তু হবে কিনা বলতে পারছি না। এখন এসব ব্যাপার আপাতত বন্ধ।'

মইলোবাস অভিমানে মুখ খোলে আবার।—'লক্ষ্মীনারাণপুরের মনিরুদ্দি কেষ্টযাত্রার সাজ কিনতে টাকা পেয়েছে। বাবুদের যাত্রার দল তো সব গাঁয়ে টাকা পাচ্ছে। মনিরুদ্দি আমার ভাইরাভাই সার। সে বললে তোমরাও পাবে। তাই এলাম। আসতাম না—বানে যে সাজের বাকসো ভেসে গেল। মাদারহাটিতে এক বুক পানি হয়েছিল, এনকুরি করুন। করে দেখুন!'

অফিসার তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন। তারপর একটু হেসে বলেন—'চৌকিদার, তুমি কিসের পার্ট করো বললে না তো?'

মতি চৌকিদার—সে সরকারী লোক, পরনে রাজপোশাক, তার দাপটে মাদারহাটি থরথর করে কাঁপে। তারও কালো মুখে লজ্জার রং ঝলকে ওঠে। মাথা নীচু করে বলে—'আমি সার সঙাল। সঙ দিই। কমিক পার্টও করি। লেজ লাগিয়ে হনুমান সাজি। চাঁদ সদাগরের লৌকো ডুবিয়ে দিই। আবার ফটিকচাঁদ কুম্ভকারও সাজি। কখনও বিবেকও হই। গান গাই।'

—'বাঃ! তাহলে তুমিই একটা গান শোনাও।'

—'আজ্ঞে?'

সকৌতুকে অফিসার বলেন—'না শোনালে দরখাস্ত পড়ে থাকবে, চৌকিদার।'

অগত্যা একটু কেসে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে মতি সলজ্জ হেসে বলে—'বরঞ্চ ফটিকচাঁদের গানটাই গাই, সার।'

—'বেশ, গাও।'

মতি আচমকা লাফ দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গেয়ে ওঠে: 'ও কে ডাকলে রে ফটিকচাঁদ পিসে/আষাঢ় মাসে চাক ঘোরে না রইয়েছি বসে/ওকে ডাকলে রে—এ-এ এ/...

আপিসসুদ্ধ তোলপাড় অমনি। এ-ঘর ও-ঘর থেকে কেরানীবাবুরা বেরিয়ে আসেন। বিডিও সায়েব বাইরে। কৃষি অফিসার উঁকি মারেন। প্রৌঢ় হেডক্লার্ক বিরক্ত হয়ে গজগজ করেন। কিন্তু ফাইলের একঘেয়েমি হঠাৎ এক আজগুবি ঘটনার তলায় চাপা পড়ে তো মন্দ না। ভিড় জমেছে বারান্দা অব্দি। আরে বাবা, এতো শহরের কেতাদুরস্ত আপিস নয়। মাঠের মধ্যে একতালা কিছু দালান। পিছনে খাল। দিনমান চাষাভুষো লোকের আনাগোনা। আবহাওয়াটাই এ রকম। মিছিল, দাবিদাওয়া, রিলিফ, সেচ, সার, কত রকম ফিরিস্তি। তার সঙ্গে কালচার। হ্যাঁ, ফোক কালচার। জাতীয় সড়কের ধারে এই বাঁজাডাঙায় এক সময় ফণিমনসা কেয়া ঝোপ আর বাজপড়া তালগাছ ছিল। সেখানে এখন এই সব বাড়ি আর ফুলবাগিচা। ইউক্যালিপ্টাসের চিরোল পাতা কাঁপে হাওয়ায়। খালের সাঁকোতে জিপের চাকা ঘটঘটাং আওয়াজ তুলে কংক্রিটে গিয়ে উধাও হয়। মাথার ওপর বিদ্যুতের তার। দূর মাঠের দিগন্তে বিশাল মঞ্চের সারি। ফলকে লেখা আছে 'এগারো হাজার ভোল্ট, সাবধান'।

নীচে মড়ার মুণ্ড আর দুটো আড়াআড়ি হাড়। তার আশেপাশে চাষা লাঙল ঠেলে—উরর্‌র্‌র্‌ হট্ হেট্ হেট্…

ততক্ষণে চাঁদ সদাগরও তৈরি। মতির সাহসে সাহস। সামনে এক পা ডিয়ে দৈত্যের মতো লোকটা বিকট গর্জে বলে উঠেছে: 'খবর্দার চ্যাংমুড়ি নী! প্রাণ যদি চলে যায়, পুবের সূর্যু যদি ওঠে পচ্চিমে, শিব ছাড়া ভজব —পস্টো কথা কহে দিলাম। দূর হয়ে যাও! দূর দূর দূর……' এবং রপর যেন পোজপশ্চার দেখিয়ে বুকের পাশে হাত চেপে চুপ করে গেছে।

হো হো করে হাসেন বাবুরা। কেউ-কেউ বলেন—বরং বেহুলার গান নাও হে! বেহুলা কই? আসে নি?

বাউরির ছেলে অমূল্য একটু কেসে এক কানের পেছনে হাত রেখে য় ওঠে:

একো মাসো দুয়ো রে মাসো
তিনো মাসো যায় রে সোনার কমলা॥
জলে ভেইস্যে যায় রে সোনার কমলা॥
ও কী, জলে ভেইস্যে যায় রে
সোনার কমলা॥'

সত্যি বড় মিঠে গলা। সুরে আদিম আবেগ আছে একটা। দুয়েকজন র ফোক সঙের বাতিক আছে। তাঁরা অভিভূত হন। একজন বলেন—মাগো পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরাও এগুলা গাইত। আর গাজীর গানও ছিল। ন আমরা সব পোলাপান! এক্কেরে এইটুকথানি!'

সমাজশিক্ষা সংগঠক বলেন—'রিয়েলি, আমার ধারণাও ছিল না এসব। লমানরাও বেহুলা-কেষ্টযাত্রা করে? মাই গুডনেস্। শরৎ চাটুয্যের ওই গহর ছিল। ভাবতুম, নিছক গুল! অথচ……ভাবা যায় না!'

মাদারহাটির বেহুলা দলটি মুখ তাকাতাকি করে। ছ' মাইল জলকাদার ভেঙে এসেছে। সময়টা হেমন্ত। রোদ এখনও কড়া। দরদর করে ঘাম য়। সবুজ মাঠ এবার পলির রঙে হলুদ। পচা ধানপাতার কটু গন্ধ াচ্ছে। গাঁয়ে ফিরে এক দফা কটু-কাটব্য শুনতে হবে বুড়োদের। আর ছু বলার কথা ছিল না? সাজ কেনার সাহায্য চাইতে গেলে এই দুঃসময়ে? -ঘরে মুখ চুন, খড়িপড়া চেহারা, রিলিফের পথ চেয়ে উসখুস করছে প্রতীক্ষায়। র এই দুঃসময়ে কিনা বেউলো দলের সাজ ভেসে গেছে, সাহায্য চাই? লক্ষ্মী-

নারাণপুরের মনিরুদ্দি মাস্টার কেষ্টযাত্রার সাজ সাহায্য পেয়েছে, ভাল কথ সেখানে তো বানবন্যা হয় নি। ডাঙা দেশ। শুখা-খরা নেই। ক্যানেলে জলে চাষ হয়। তাই বলে ডুবো দেশ মাদারহাটির তো এ সখ মানায় না—

তবে সে জন্যে এদের মুখ তাকাতাকি নয়। সার যে গহরের নাম করলে তাই শুনে। তার সঙ্গে চাটুয্যেও বললেন। এতেই সব প্রাঞ্জল হয়েছে। নয় গাঁর গহর আলি পাক্কা ছড়াদার অর্থাৎ কবিয়াল। তার গুরু চাটুয্যে বটে তবে শরৎচন্দ্র নন—পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণবাবু এখন বুড়োমানুষ। তার ওপর সেব গাজনে নিজের বেহাইয়ের নামে (কেলেঙ্কারির) সঙের গান বেঁধে জামাই চট এবং মেয়ের দুর্ভোগ বাধিয়ে বসেন। শেষ অব্দি মেয়ের মাথায় হাত রে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই শেষ। ওদিকে গহরের রবরবা বেড়ে যায়। গ গহরেরও এবার বরাত মন্দ। নতুন গা ডুবেছে। গহর বুক চাপড়ে কেঁদেছে সদ্য কিনে আনা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানাও সর্বনাশা দ্বারকা ভাসিয়ে নি রামায়ণ-মহাভারত গেল যাক্। ওস্তাদ চাটুয্যে বলেছেন—আমাদের—আমা গুলো নিয়ে যেও। পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, প্রভাসখণ্ড চে চিন্তে কদিনে ধারে যোগাড় করেছে রমজান দোকানীর কাছে। দোকান কারবার নুনতেলের। যৌবনে সখ ছিল ছড়াদার হবে। হতে পারে নি কিন্তু শাস্ত্র-পুরাণতত্ত্বে মহা ধুরন্ধর সে। বড় বড় কবির আসরে প্রথ কবিয়ালদেরও আসর থেকে উঠে আচমকা এমন প্রশ্ন করে, ঘোল খাইয়ে ছাড়ে এদিকে সন্ধ্যার নমাজের আজান শুনলে মাথায় টুপি দিয়ে মসজিদে যায়। ত তিন ছেলেও এ সব তত্ত্বে বিশারদ। বোলানের দল করেছে। তারা আস প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চায়। পাল্টা কাবু হলে বাপের কাছে দৌ আসে।...হ্যাঁ গো, কুশঘাসের জন্ম কিসে বলে দাও তো শিগগিরি? রমজ হেসে বলে—বরাহ অবতারের তিন গাছা লোম তুলে রেখেছিলেন মহামু বাল্মীকি। তাই থেকে কুশ। তবে পাল্লাদারকে শুধোস তো বাবা, আদি যখন নিরাকার, তখন ভগবান ভাসলেন বটপত্রে। বটগাছ নিরাকার ব্রহ্মা তাহলে এল কোত্থেকে? এমনি সব পৌরাণিক রহস্যের জগতে বাস তাদে একখানা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বন্যায় ভেসে গেলে একটা রহস্যময় ভূভাগ হারি গেল সামনে থেকে। সবে সৃষ্টি বর্ণনাটা পড়া হয়েছিল গহরের। এই দুর্লভ দশটা টাকা পাবে কোথায়?

তল্লাটে একখানা আছে বটে, তার খোঁজ গহর রাখে। শুনুটির মুকু

রাজবংশীর। একবার মেডেল আর কলা আসরে ঝুলিয়ে কবির লড়াই চলেছে ঈশানপুরের মেলায়। বিপক্ষ কবিয়াল প্রশ্ন করেছে, ব্রহ্মার কন্যার নাম কী? জবাব জানে না গহর। রসিক শ্রোতা মুকুন্দ আসরেই বসে ছিল। বলেছিল—নামটা আমো জানি। পেটে আসছে, মুখে আসছে না। ঘরে শাস্তর আছে আমার। না বলতে পারলে কলা পাবে গহর। কাকুতি মিনতি করে মুকুন্দকে রাজি করাল। দুজনে চুপিচুপি শেষরাতে জলকাদা ভেঙে গুমটি গেল। লম্ফ জেলে নামটা খুঁজল। হুঁ সন্ধ্যা। দুজনে আসরে ফিরল আবার। গহর সেবার মেডেল পেয়েছিল। সেই থেকে দুজনে বড় ভাব। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুকুন্দ প্রাণ গেলেও বই হাতছাড়া করবে না।

এসব খবর কিছু গোপন থাকে না তল্লাটে। গাইয়ে-বাজিয়েদের কাজ মানুষ নিয়ে, মানুষের সঙ্গে। আবেগবান হৃদয়। সহজেই সব গলগল করে উগরে দেয়, সমস্যা বা সুখদুঃখ। কে না জানে সর্বনাশা বানের পর গহর হাহাকার করে বলে বেড়াচ্ছে, আমার মাগ ছেলে ভেসে গেল না কেন? আমি ভাসলাম না কেন? হায় রে হায়, আমার বুকের নিধি ভেসে গেল···

তাহলে কি সরকার বাহাদুরের দয়া হয়েছে হতভাগা ছড়াদারের প্রতি? মাদারহাটির সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা মুখ তাকাতাকি করে। খুশি হয়। আশা জাগে। মতি চৌকিদার বলে—'গহর টাকা পেল, সার?'

শুনেই অফিসার হো হো করে হাসেন। এত জোরে হাসেন! দলসুদ্ধ চোখে পলক পড়ে না। এ হাসি কিসের বোঝে না তারা। একটু পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তিনি বলেন—'গহরকে চেনো?'

মতি বলে—'চিনি সার। লতুন গাঁর। উঠ তি কবেল। ভাল গায়।'

অতি গম্ভীর অফিসার মাথা দুলিয়ে বলেন—'সে গহর নয়। যাক্ গে, শোন! এখন তো ফ্লাড্ রিলিফের সময়। এখন কালচারাল ব্যাপারে টাকা-পয়সা দেওয়া আপাতত বন্ধ। কয়েক মাস যাক্। এসো। দেখব'খন।'

সকাতরে মইলোবাস বলে—'সামনে মাসে লবান্ন হবে সার। তখন বায়না পাব। কী নিয়ে গান করব?'

—'নবান্ন?' উনি একটু হাসেন আবার। 'ধান তো পচে গেছে। নবান্ন কিসের?'

পণ্ডিত বুঝে মতি ব্যাখ্যা করে—'ডুবো দেশে বান হয়েছে। কিন্তু ডাঙাদেশে

তো ধান হয়েছে সার। সেখানে লবান্ন হবে। মাদারহাটির বেউলো না শুনে লবান্ন হবেই না। খুব নামকরা দল। অঞ্চলে পেধান…'

অফিসারটি ঘড়ি দেখে বিরক্ত হল এবার।—'যারা বায়না দেবে, তাদেরই বলো গে না বাবা! আপাতত কোন উপায় নেই। আচ্ছা, তোমরা এস। আমি বেরোব…'

সামনে অঘ্রাণ। এবার অঘ্রাণে ডাঙাদেশে অর্থাৎ উঁচু মাটির এলাকায় শুভদিন বেছে-বেছে নবান্ন উৎসব হবে গায়ে-গাঁয়ে। হিন্দু-মুসলমান সবারই উৎসব। মুসলমানরা জামাই আনবে। কত খাওয়া-দাওয়া হবে। হবে না শুধু মাদারহাটি—নতুন গা—ন' পাড়া—রামেশ্বরপুর এলাকার বানভাসা গাঁগুলোতে। পচা ধানের কটু গন্ধে বাতাস ভরা এখানে। বাবুরা লঙ্গরখানা খুলেছেন ইতিমধ্যে অনেক জায়গায়। টেস্ট রিলিফের কাজও চলছে অল্পস্বল্প। মাদারহাটির কাদা এখনও শুকোয় নি। ধসে যাওয়া ঘরের উঠোনে অনেক পরিবার খয়রাতি তেরপলের তলায় বাস করছে। কিছু জোতজমিওলা গেরস্থর উঁচু ভিটের বাড়ি এখনও টিকে আছে। বেউলো দলের দু-চারজনেরও দৈবাৎ টিকেছে। ঘর গেছে স্বয়ং চাঁদ সদাগরের। তার ঘরেই ছিল সাজের বাক্স। গাঁয়ের শেষে ঢালু জমিতে তার বাড়ি। নিশুতি রাতে আচমকা বিলের জল হু হু করে এসে ধাক্কা মেরেছিল। কোনমতে বউ আর চার-পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চাকে জানে বাঁচাতে পেরেছিল। তার প্রায় সবই ভেসে গেছে। কিন্তু গতর আছে যখন, সব করে নেবে। আবার ঘর বানাতে পারবে। জমিতে চৈতালি ফলাতে পারবে। তাই সে নিয়ে ভাবনা নেই—ভাবনা সাজ ভেসে গেছে। দেড়-দুশো টাকার কমে এ বাজারে পুরো সাজ হবে না। কিছুটা চাঁদায়, কিছুটা কয়েক আসরের বায়নার টাকা জমিয়ে আগের বছর নতুন সাজ কেনা হয়েছিল। হারমোনিয়াম তবলা ঢোল কত্তালগুলো ভাগ্যিস ছিল আকাশ আলির বাড়ি। উঁচু ভিটে তাদের। সামনের খামার বা উঠোনটাও উঁচু। সেখানে বৃষ্টিহীন রাতে 'রিহার্স্যাল' চলে। তাই ও বাড়ি ছিল যন্তরগুলো। যদি সাজের বাক্সটাও রাখা হত সেখানে, এই বিপদ ঘটত না। তবে এখন আর পস্তে কী হবে?

বিনিসাজে গাইতে গেলে কেউ শুনবেই না পালা। কেন শুনবে? নগদ পাঁচ টাকা বায়না, তিন ধামা মুড়ি, আধ টিন গুড়—তার ওপর বিড়িও আছে। দূরের গাঁ হলে তো ডাল ভাতও খাওয়াতে হয়। এত সব খরচ করে লোকে

সাজের ঝলমলানি দেখবে না? তা ছাড়া তলোয়ার? হায় হায়! ও দুটোও বাক্সের মধ্যে ভরা ছিল! মুকুট ছিল। ঝকমকে ত্রিশূল ছিল। বল্লম ছিল। পুঁতির মালা ছিল। হা বাবা আল্লা ভগবান! এর চেয়ে চাঁদ সদাগরকে ভাসিয়ে নিলি না ক্যানে?

মাঠের পথে দলটা গাঁয়ে ফিরে চলেছে। হতাশ, ক্লান্ত, চুপচাপ। মইলোবাস মাথাটা ঝুলিয়ে হাঁটছে সবার পিছনে। তার মনে অপরাধবোধ প্রচণ্ড। তার ঘরেই তো সাজের বাক্স ছিল। এখন ব্যর্থ দরবারের পর সেই অপরাধবোধ আরও তীব্র হচ্ছে। চাঁদ সদাগর সে। তার আত্মায় দাঁড়িয়ে আছে এক অহঙ্কারী উদ্ধত বিশাল পুরুষ—ক্রমশ দিনে দিনে সে তাকে দেখতে পেয়েছে। আসরে জনমণ্ডলীর সামনে যখন সেই ভিতরের পুরুষ পা ফেলে হাঁটে—সাজঘর থেকে আসরে, তার মনে হয় কাকেও পরোয়া করার নেই। গায়ে সাজ চড়ালে দফাদার কনস্টেবল দারোগা এস-ডি-ও ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাবৎ সরকারী ব্যক্তি ও ক্ষমতাকে সে গ্রাহ্যই করবে না! আর তখন সে তো এ যুগের মানুষ নয়। তখন তার সাত ছেলে সাত-সাতটা বাণিজ্যতরী নিয়ে সমুদ্দুরে চলেছে। তরী ডুবে যাওয়ার খবর দিয়েছে বিবেক। তো কিসের পরোয়া? জয় শম্ভো জয় শম্ভো! চ্যাংমুড়ি কানীকে পুজো করবে তাই বলে? হাতের হিন্তাল যষ্টি নাড়া দিয়ে গর্জন করেছে সে। তার ঠোঁটে ঘৃণা, চোখে ঘৃণা। হুঁ, এখন বাবুই হও, লাট বেলাটই হও—তফাৎ যাও। চাঁদ সদাগর জানে শুধু একজনকে। তিনি শম্ভু—শিব। দেবাদিদেব মহাদেব। এই ভাই বইয়াল! আস্তে। পাট মুখস্থ আছে। গায়ে সাজ চড়ালেই সব মুখের ডগায় ভেসে আসে। সাজ চড়ালেই তাকে 'সে' এসে ভর করে—যে মাথা নোয়াতে জানে না। সাজ চড়িয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পায় কঠিনতম লোহার বাসরঘর—দেয়াল ঘুরে হিন্তাল কাঠ কাঁধে নিয়ে পাহারা দেয়। হায়, সেই ঘরে ছিদ্র ছিল। সোনার নথাই নীলবর্ণ হল। চাঁদ সদাগরের মাথা ঝুলে পড়ে।—'আঃ আঃ আহা হা!'

—'কী হল হে মইলোবাস? পাট বুলো নাকি?'

মতি চৌকিদার পিছন ঘুরে বলে। কেউ কেউ হাসে। মইলোবাস বলে, 'না।'

—'কী বুলছ মনে হল?'

—'হুঁ, একটা কথা ভাই চৌকিদার।'

—'বুলো।'

এখন নিজেদের ভাষায় কথা বলছে ওরা। এ তো বাবু ভদ্রজনের সঙ্গে কথা বলা নয়, আপিস-কাছারিও নয়। এখন মাতৃভাষায় না বললে সুখ নেই। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মতি আবার বলে—'বুলো হে কথাটা!'

—'যদি সাজের বাকসোটা আকাশের ঘরেই থাকত!'

মতি ভর্ৎসনা করে—আবার উই কথা? সেই এক কথা?'

—'ই দুঃখুটা মলেও যাবে না ভাই!'

—'আবার কিনব। ভগবান মুখ তুলে তাকাক্।'

চুপ করে যায় বিশালদেহী মানুষটা। আবার ভেসে ওঠে কিছু প্রতিচ্ছবি—সামিয়ানার তলায় হ্যাসাগের শনশন শব্দ ভাসে, চারপাশে মুগ্ধ শ্রোতা, চারু মাস্টারের বেহালা বাজে করুণ সুরে। আর সাজঘর থেকে ঝলমল লাল পোশাকে হিন্তালের লাঠি নেড়ে এগিয়ে আসে চাঁদ সদাগর। কী তার রূপ! মুহূর্তে আসর চুপ। কেঁদেওঠা বাচ্চার মুখে মায়ের থাবা পড়ে। জয় শম্ভো! জয় শম্ভো! যেন আকাশে মেঘ ডাকে।—…'সাজের বাকসোটা!'

—'আবার? তুমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, মইলোবাস। সাবোধান।'

আবার চুপ। ক্রমশ মাঠ ধাপে ধাপে নেমে গেছে নাবাল অঞ্চলের দিকে। দেখতে দেখতে সূর্যও ডুবেছে। ধূসর আলোয় দূরের গ্রাম কালো হয়ে আসছে। ধানপচার গন্ধ, পলির গন্ধ, মরা জানোয়ারের হাড়গোড়ের গন্ধ। নাক ঢেকে দলটা চুপচাপ চলতে থাকে। সবার পিছনে মইলোবাস।

এবং একটু পরেই—'আঃ আহা হা হা!'

মতি একবার ঘোরে। কিন্তু কিছু বলে না। কী বলবে? হাহাকার তো তার বুকেও কম জমে নেই। ডাঙাদেশে নবান্নের মরশুম এবার তাদের ফাঁকা যাবে। অন্য দল এসে গাইবে। তারা হবে শ্রোতা। গভীর ঈর্ষায় চনমন করবে। ফটিকচাঁদ কুমোর তার মতো করুক না, কে করে! তার মতো হনুমান সাজুক না, কে সাজে!

আবার পিছনে ডুকরে ওঠা চাপা আক্ষেপ—আঃ হা হা হা!

মতি চৌকিদার অফিসারকে বলছিল—এখন শরীলে ব্যামো। ভেতরটা ঝাঁঝরা। ঝাঁঝরাই বটে। সাত বছর ধরে মইলোবাস চাঁদ সদাগরের পার্ট

চলে আসছে। এ সাত বছর সে মালামো লড়ে নি। সাত বছর আগের জ্যৈষ্ঠে তার শেষ লড়াই হয়েছে গঙ্গার পূর্বপারের প্রখ্যাত কুস্তিগীর মোহিনীবাবুর সঙ্গে। কী সব মারাত্মক প্যাঁচ জানত মোহিনীবাবু! এমন ভাবে ফেলে দিল যে তারপর বাড়ি ফিরে থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠে। প্রথমটা গ্রাহ্য করে নি। পরে বুকে ব্যথা বাড়লে ডাক্তার দেখিয়েছিল। বুকের ছবি তুলতে হয়েছিল। পাঁজরের একটা কাঠি ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা পাঁজর নিয়ে সে সাত বছর কাটাচ্ছে। কলজেতেও একটু দাগ পড়েছে। এখনও গতর খাটাতে মাঝে মাঝে টাটানি টের পায়। বোঝা তুলতে কষ্ট হয়। জোরে চেঁচাতে গিয়েও দম আটকায়।

অথচ যেদনি থেকে চাঁদ সদাগরের সাজ গায়ে চড়াল, যেন ভাঙা ঝাঁঝরা শরীলের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক বিশাল শক্তিধর পুরুষ। যতক্ষণ সাজ গায়ে থাকে, ততক্ষণ সে সেই বীর্যবান দুর্ধর্ষ পুরুষ। মেঘের মতো হাঁকলেও দম আটকায় না। আসরে দেবী মনসার সামনে ভাঙা পাঁজরে হাতের থাপ্পড় মেরে সগর্জনে বলে—'সাতটা পুত্রসন্তান আমার, সাতখানি বক্‌খের পাঁজর। ভাঙবি তো ভাঙ রে বুড়ি চ্যাংমুড়ি, তবু কভু ভুরুক্ষেপ নাই!' সামনের মাটিতে জোরে লাথি মারে সে। টেরই পায় না কলজেটা চড়াৎ করে ওঠে কি না। কিন্তু আসরের পর দিনে মাঠের জমিতে হাল বাইবার সময় হঠাৎ খামচানি ব্যথা বুকের মধ্যিখানে—হাত চেপে সে বলদ ডাকায়—ইরর্‌র্‌র্‌ হেট্‌ হেট্‌

সেই ব্যথাটা এতক্ষণে অন্ধকার মাঠে জেগে উঠেছে। মইলোবাস ককিয়ে উঠছে পাঁজরে হাত চেপে—'আঃ হা হা হা!'

মতি ভাবছে সাজের বাকসোর দুঃখে ককাচ্ছে লোকটা, বাহাসতুল্লাও তাই ভাবছে। আকাশ আলি, নারাণবাবু—আর সবাই। জলকাদায় পা ফেলার শব্দ উঠছে। চারদিকে জোনাকি উড়ছে। দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। খালে এক কোমর জল। একে-একে পার হয়ে যায় সবাই। ওপারে বাঁধ। জায়গায়-জায়গায় ধসে গেছে। আর মোটে এক মাইল দূরে গাঁ। বাঁধে উঠে মতি চৌকিদার বলে—'এস, বিড়ি খেয়ে লিই।'

দেশলাই জ্বালে কেউ কেউ। বিড়ি ধরায়। বৈয়াল বলে—'চাঁদ সদাগর! বিড়ি লাও হে!'

মতিও ডাকে—'কই হে নথাইয়ের বাপ! ধুঁয়োমুখ করো!'

আকাশভরা নক্ষত্রপুঞ্জ এই হেমন্তের রাতে। বাঁধের ওপর শুকনো মাটিতে

বসে পড়েছে সবাই। নক্ষত্র দেখতে দেখতে বিড়ি টানছে। পাশে ব
রেখেছে। কাপড় উরুর ওপর গোজা—যা জলকাদা! নিচে ঘন পাট
বন্যায় গলা অব্দি ডুবেছিল। অন্ধকার পাটবনের ওপর জোনাকির আ
আকাশ আলি দেখতে দেখতে ডাকে—'পিতাঠাকুর, উই ছাখো তুমার সা
আবার মুখ তুলে আকাশ দেখে আকাশ আলি বা লখিন্দর হাসতে হা
ডাকে—'পিতাঠাকুর হে! পরবে নাকি উই সাজ? নক্সাখানা দেখ!'

রসিক মতি রসিকতায় সাড়া দিয়ে বলে—'তুমার পিতাঠাকুরের নাল
পছন্দ। সেবারে খাগড়ার বাজারে সাহাবাবুর সাজের দোকানে আমার প
হল একখানা জামা। ওইরকম কালোর ওপরে সোনালি কাজকরা। বুই
খাঁটি বেলবেট। আমি বুললাম—দাম? তো পঞ্চাশ টাকা। তো বুল
মইলোবাস, টাকা থাকলে ই সাজটাই লিতাম। তুমাকে যা মানাত!
ঘাড় নেড়ে বুললে—আমার নাল রং পছন্দ!'

বৈয়াল বলে—'পালোয়ান। লাল রঙেরই ভক্ত!'

আকাশ ফের ডাকে—'কই বাপ পিতাঠাকুর, নখাই এত ডাকছে, কথা ব
না ক্যানে?'

তারপর খোঁজ পড়ে যায়। সবাই ডাকাডাকি করে। দলে তো
কখন পিছিয়ে পড়েছে দেখ দিকি! মতি চেঁচিয়ে ডাকে—'মইলোবাস
হেই—ই—ই...'

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জলকাদার পৃথিবীতে ডাকটা কেঁপে কেঁপে মি
যায়। ওই পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে কোথায় একা থেকে গেল এক অভিম
ক্ষুব্ধ সাজহীন বিশাল মানুষ?

ফটিক কুম্ভকার, নখাই আর বৈয়াল খালের জলে নামে। পাড়ে
তিনজনে একগলায় ডাকে—'হেই-ই-ই-ই...'

আলের পথে পা বাড়াতেই ঠোক্কর খেয়ে মতি পড়ে যায়। চেঁচিয়ে ও
—'মইলোবাস! ও মইলোবাস! পড়ে আছ ক্যানে ভাই? কী হল তুমার
কী হয়েছে?'

নখাই দেশলাই জ্বালে। মুখের ওপর। ঠোঁটের দুপাশে রক্ত নি
হাঁফাচ্ছে বিশাল সেই পুরুষ—নাকি বিশাল সেই পুরুষের খড়মাটির টাট
সাজহীন। অনেক কষ্টে বলে—'পা পিছলে পড়েছিলাম।...আমি বাঁচব
হে...বাঁচব না!'

মতি কেঁদে কেটে বলে—'রেতের বেলা জলকাদার রাস্তায় অমন করে হাঁটে ভাই? বুয়েছি, বুয়েছি! উই কথাটাই তুমাকে খেলে হে! উই ভাবনাটাই তুমার বিনেশ কল্লে! আঃ হা হা!

তিনজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে চলে চাঁদ সদাগরকে। পাঁজরভাঙা, কলজেয় দাগধরা শরীর থেকে গভীরতর দুঃখের মতো রক্ত গড়ায় কষ বেয়ে। এবার প্রকৃতি নিজের হাতে তাকে শেষবার লাল পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন। তবু সে বিড়বিড় করে বার বার—'সাজের বাকসোটা ভেসে গেল হে! সাজের বাকসোটা…'

নাগিনী ছন্দ

খবর ছিল, ওঁর বেহালা শুনে ফিংফোটা জ্যোৎস্নায় সাপ এসে ফণা তুলে নাচে। তাই, আমি শশীর সঙ্গে তারকবাবুকে দেখতে গেলুম।

গাঁয়ের পাশে রেলরাস্তা থাকলেও সাপ ছিল অসংখ্য। সভ্যতার বিরুদ্ধে ব্যর্থ লড়াই করার সাক্ষী তাদের থ্যাতলানো শরীর প্রায়ই দেখতে পেতুম রেলের দুপাশে পড়ে আছে। আর এই শশীর এক ভাই সাপের কামড়ে মারা পড়েছিল ছেলেবেলায়। শশী বলত, তার ভাইটি বাঁচলে আমার বন্ধু হত সেই, শশী নয়। কারণ শশীর বয়স আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী।

এই কথা বলাতে শশীর আর আমার মধ্যে একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়ে গেল, শশী তা টের পায়নি। আমি পেতুম। মাঝে মাঝে শশীর দিকে তাকিয়ে ভাবতুম, এ শশীটা আমার মনের মতো নয়। তার সেই মরা ভাইটির জন্যে অদ্ভুত একটা বিচ্ছেদের দুঃখ অনুভব করতুম। আর শশীর সঙ্গ ধরার দরুন আমিও আমার মনের মতো নই মনে হত। কয়েকটা বছর ফেলে পিছনে হাঁটতে আমার কী যে কষ্ট হত! তা না হলে তো শশীর নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না।

তাই আমার ভয় হত, ঠিক ঠিক সময়ের আগে যে আমি বুড়িয়ে যাব এবং মৃত্যু হবে ত্বরান্বিত—তা ওই শশীর কারণে। শশীর ভাই বাঁচলে এটা হত না। সাপ, শয়তান সাপ! যে তোদের ঠোঁটে রেখেছে মৃত্যুর পরোয়ানা, তাকে আমি ক্ষমা করব না।

রেলরাস্তার একপারের গাঁয়ে পাটচাষ তদারককারী সরকারি লোক আমার

বাবার সঙ্গে আমি থাকি আর শশীরা থাকে। অন্য পারের গাঁয়ে যার বেহাল শুনে সাপ নাচে, সেই তারকবাবু থাকেন। বাবার কাছে চলে আসার কয়েকদিন পরই ওই খবর শুনে শশীর সঙ্গে তারকবাবুকে দেখতে গেলুম।

একটা পুরানো ভাঙাচোরা বাড়িতে তারকবাবু থাকেন। চারদিকে তার অগোছাল ছোটবড় উঁচু নিচু গাছপালা। নানা ধরনের ঘাস। সরু পায়েচলা পথটার ওপর ঘাসের লকলকে আঙুল ঝুঁকে আছে। আর গাছপালারও চেহারায় জংলী রাক্ষুসে ঝাঁকড়মাকড় ভাব। পাঁচিল ছুঁয়ে চারপাশের লোভের ও ষড়যন্ত্রের কয়েকশো আঙুল কাঁপছে। হাওয়া দিচ্ছে উস্কানির ভঙ্গিতে। ফিসফিস ষড়যন্ত্র যাচ্ছে শোনা।

এ কোথায় এলুম শশী!···

অস্বস্তিতে বলে উঠলুম। শশী বলল, কেন? বেশ নিরিবিলি জায়গা। আরটিস্টের পক্ষে উপযুক্ত। তাই না? তবে দেখে পা বাড়াস। শালা, সবখানে শুধু সাপের রাজত্ব।

আরও একটু ভয় বাড়ল। বিকেল তরতর বয়ে চলে যাচ্ছে। আবছায়া ঘন হচ্ছে। এরই মধ্যে পোকামাকড় চাপা ডাকতে লেগেছে। পাখিদের ডাক থেমে যাবার তর সইছে না। এরই মধ্যে রাত তার দুই একটা জিনিস আগাম পাঠিয়ে কিউতে জায়গা দখল করতে চাইছে। চারপাশে একটা অধৈর্যের ভাব চনমন করতে দেখেছিলুম। উত্তেজনা পেয়ে বসছিল আমাকে।

জীবনে সেই প্রথম টের পেলুম প্রকৃতি কী জিনিস। এতটুকু জায়গা খালি পেলেই তার আগ্রাসী হাত এসে দখল করে ফেলে। আমি পা তুললেই সেইখানটা তার নাগালে চলে যেতে দেরি সয় না। তার যত সব কাচ্চাবাচ্চা এসে ঘরকন্না-খেলাধুলা করতে থাকে। ঘাস পোকামাকড় আর সাপেরা হুড়মুড় করে এসে পড়ে। আমি এতটুকু অসতর্ক হলেই তার দ্বারা আক্রান্ত হই। তাই ভাবলুম, এই আরটিস্ট ভদ্রলোকের কী হবে! চারদিক থেকে ওঁকে ঘিরে ফেলল যে! উনি কি সব জেনেও চুপ করে থাকেন—নাকি জানেনই না?

সেই সময় হঠাৎ টের পেলুম যে, সারাক্ষণ বেহালা বেজেছে, আমার কানেই আসেনি। শশী আমার দিকে চোখ টিপল। আমিও ইসারায় জানালুম, হুঁ, শুনছি।

শশী বলল ফিসফিসিয়ে, একটা কথা। এখানে এসেছিলুম জানলে বাবা আমাকে বকবেন। খবর্দার, কাকেও বলবিনে।

তারপর সে দরজায় টোকা দিল। আমি তারকবাবুর নেপথ্য বেহালা শুনছি। মাথায় অদ্ভুত সব ভাব আসছে। উনি কি খুব বিপন্ন? ওই সুরে বিপন্নের আর্তনাদ আছে কি? পরেই মনে হচ্ছে, নাকি এ আনন্দের চাপল্য—নাকি বন্দীর বন্দনা? আবার মনে হল, নাকি শুধু অভ্যাস, হাতেরই!

শশী আবার বলল, তুই কিন্তু হাঁ করে তাকিয়ে থাকবিনে। একটু স্মার্ট হোস।

একটু হাসলুম শুধু।

উনি নিজে থেকে কথা না বললে মুখ খুলবিনে।

ফের হাসলুম শুধু।

তখন শশী বলল, ভ্যাবলা কোথাকার।

আমার অনেক লোভ তখন। আজ রাতে জ্যোৎস্না উঠবে। তারকবাবুর বেহালা শুনে সাপকে এসে নাচতে দেখব। সেই সাপ—যা শশীর ভাইকে মেরে ফেলেছিল। সেই সাপ-যে আমার শত্রু। আমি তখন কি করব? মনে হল, এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করার বয়স আমার এখনও হয়নি। ষোল বছর বয়সে এসব কিছু করতে যাওয়া ঝুঁকি আছে। অবশ্য, শশী পারলেও পারে। কিন্তু সে কিছু করবে না, কারণ, সে বোধ তার নেই-ই। আমার আছে। সারা গায়ে চোখ ফোটার মতো ওই বোধ ষোল বছর বয়সটাকে কাঁসর ঘণ্টার মতো বাজাচ্ছিল।

যে দরজা খুলল, তাকে দেখে শশীর বারণ ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলুম। তারকবাবুর বউয়ের কথা শশী আমাকে বলেছিল। আমার ষোল বছর বয়সটা এমন যে প্রেম-ভালোবাসা কী বোঝে না, শুধু যৌনতার হাত বাড়িয়ে মেয়েদের ছুঁতে চায়। তারকবাবুর বউকে দেখে সে চুপিচুপি যৌনতার আঙুল তুলতে গেল। পলকে মনে হল, কী যেন পাব—কী যেন পেতে যাচ্ছি—শশী নিছক বাজনা শুনতে আর আমিও সাপের নাচ দেখতে আসিনি জ্যোৎস্না রাতে।

তারকবাবুর বউ একটু হেসে দরজার পাশে দাঁড়াল। শশী আমার হাতটা ধরে টানল। দুজনে ভিতরে গেলুম। পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। পরের ঘরটায় ঢুকে দেখি, গদিওয়ালা সেকেলে বিশাল খাটের ওপর একজন কালো-কুচ্ছিত বেঁটে গুঁফো লোক গেঞ্জি গায়ে আর লুঙ্গি পরে বসে আছে। তার কাঁধে বেহালা টানটান, ছড়টা আনাগোনা করছে, চিবুক বেহালায় বেঁধা এবং সে চোখ তুলে আমাদের দেখল মাত্র। আমরা দুটো মোড়ায় বসে পড়লুম।

এই তারকবাবু! ইমেজ ছিল, ভেঙে গেল। তারকবাবুর বউ বারান্দার দিকে চলে গেল। আমি ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখছিলুম। দেয়াল টুটাফাটা, ময়লা আলনায় কিছু কাপড়-চোপড় আছে। তাকভর্তি শিশি বোতল। এককোণে টেবিল আয়না। খাটের তলায় কিছু বাক্সপেঁটরা। দেয়ালে, দেব-দেবীর ক্যালেণ্ডার আর বাঁধানো কিছু ফটো আছে। আরেকটা তাকে পেতলের ছোট্ট খাটে দেবতা, গঙ্গাজলের পাত্র, ধূপদানি, এইসব। একপাশে একটা কালো হারমোনিয়ামের বাকসো আর ডুগিতবলা রয়েছে। তার পাশে একজোড়া পেতলের কিংবা কাঁসার তৈরী জঙ—চামটিবাঁধা বকলেসওয়ালা। কে নাচে?

বাজনার সুরে মন লাগছিল না। তখন কতসব বাজনা তো শুনতে পাই রেকর্ডে, রেডিয়োতে। কত আশ্চর্য সব সুর। তারকবাবুর বাজনায় তেমন চমক ছিলই না। তেমন মিষ্টতাও ছিল না।

একটু পরেই তারকবাবুর বউ হারিকেন জ্বেলে টুলে রেখে গেল। জানলার বাইরে সন্ধ্যা এসে গেছে। জানালার রডে লতাপাতা উঁকি দিতে দেখলুম। আর কয়েক ইঞ্চি এগোলে তারা বিছানা ছুঁতে পারে। আবার তারকবাবুর বউ এল ট্রে নিয়ে। তিন কাপ চা, একটা প্লেটে চানাচুর। শশী আমার দিকে চোখ টিপে হাসল। আমিও।

তাই দেখে এতক্ষণে বাজনা থামাল তারকবাবু। বেহালাটা বিছানায় রেখে একটু হেসে বলল, আয় শশী। অনেকদিন আসিস নি।

শশী বলল, শরীর ভালো ছিল না তারকদা, এ মণ্টু—এখানকার এগ্রিকালচার অফিসের এক ভদ্রলোকের ছেলে। তোমার বাজনা শুনতে এল।

তারকবাবু বলল, তাই বুঝি? চা খাও, ভাই।

লোকটির অমায়িকতা মুগ্ধ করল। চেহারায় উল্টো। শশী বলল, স্টেশন-বাবুর টিউশনিটা ছেড়ে দিলেন কেন?

তারকবাবু নাকের ডগা কুঁচকে জবাব দিল, পোষাল না ভাই! সাতমাসে হাত দিয়ে সরগম উঠল না। নিজেরও তো একটা চক্ষুলজ্জা আছে। তাছাড়া—মেয়েটা···

শশী বলে দিল, হ্যাঁ—মেয়েটার আজকাল ভীষণ বদনাম শুনছি।

তারকবাবু চোখ নাচাল।···হুঁ, খালাসিটা—মানে অলক যদ্দিন না ট্রান্সফার হচ্ছে, তদ্দিন ওর কিস্যু হবে না। ঠারেঠোরে স্টেশনবাবুকে বলতে গিয়েই

তো তেড়ে মারতে এল আমাকে। ওরে শালা! আমি তারক ব্রহ্মচারী—বেহালা বাজিয়েই যেন খাই!

শশী বলল, অলককে আমরা ঠুকব ভাবছি, তারকদা।

ঠুকবে? ···তারকবাবু চাপা গলায় আর ভুরু কুঁচকে বলে উঠল।···তাই ঠোকো শালাকে। শালা বেতামিজ কাঁহাকে। দাও শালার বাপের নাম ভুলিয়ে। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ের···

তারকবাবুর বউ তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছিল। এবার ফোঁস করে বলল, আর ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েটি বুঝি সতীসাবিত্রী? ঠুকতে হলে ওকেও ঠোকো—তবে না!

শশী হাসতে লাগল।··· হুঁ বউদি ঠিকই বলছে। কিন্তু মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া যায় না যে!

তারকবাবু ঝুঁকে হিংস্রমুখে বলল, চুল কেটে নাও না মেয়েটার।

শশী বলল, চুল কাটব?

হুঁ—উ। একটা কাঁচি নিয়ে গিয়ে—বুঝেছ? কচাকচ্ কচাকচ্ দাও চুল কেটে।

তারকবাবুর বউ ভেংচি কেটে বলল, হুঁ—গুরুমশায়ের পরামর্শ নাও!··· বলে চলে গেল বারান্দার দিকে।

তারকবাবুর ইমেজটা এবার ফের বদলেছে আমার সামনে। কিন্তু মজা পাচ্ছিলুম। এই শশী, তারকবাবু, তারকবাবুর বউ একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ কথা বলবার পেয়েছে। আমার অবশ্য কিছু নেই। আমি বহিরাগত। আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করল।···আপনি চমৎকার বেহালা বাজান তো! তারকবাবুকে বললুম।···এত ভাল লাগছিল! এমন কতদিনই শুনিনি। অপূর্ব!

তারকবাবু চেহারা পাল্টে মৃদু হাসল।···শশী, তবলা নে। আয়।

শশী উঠে তবলাবাঁয়া নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। আমি অবাক হয়ে বললুম, তুই তবলা বাজাতে পারিস শশী? বলিসনি তো!

শশী জবাব না দিয়ে তবলায় চাপা বোল তুলতে থাকল। তারকবাবু ছড়ে মাঞ্জা দিয়ে টানতে থাকল তারের উপর। তখন আমি বললুম, নাচে কে?

কেউ জবাব দিল না আমার কথার। ওরা জোর জাঁকজমকে বাজনা জুড়েছিল। সে বাজনা আর থামবার লক্ষণ নেই। দরজার বাইরে খোলা

বারান্দা দেখা যাচ্ছে। সেখানে জ্যোৎস্না পড়েছে। উঠোনের ওপাশে কালো গাছপালা একটু হাওয়া দুলতেই জ্যোৎস্না গড়াচ্ছে শব্দহীন। এই তেলতেলে জ্যোৎস্নায় চাপা চাকচিক্যে সারাক্ষণ সাপেরা—অজস্র কিছু চকচকে কিছু আলো কিছু আঁধারময় সাপেরা ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে মনে হল। হাজার হাজার সাপ। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি, চলাফেরা চারপাশে। কীভাবে বাড়ি ফিরব ভেবে পেলুম না। একবার ঘরের ভিতর হারিকেনের আলো দেখছিলুম—আবার বাইরে তাকাচ্ছিলুম। বাইরে জ্যোৎস্নাময় পৃথিবী—গাছপালা ইত্যাদির ওপর পিছল জ্যোৎস্না, এবং তাদের ওপর হাওয়া এসে পড়ায় অবিকল হাজার হাজার সাপকেই দেখা যাচ্ছিল। তাহলে কি তারকবাবুর বেহালার সঙ্গে এইসব অলৌকিক সাপ জুড়ে দিয়েই খবর তৈরি হয়?

একসময় একটু ঝুঁকে দেখি, বারান্দার ধারে রোয়াকে বসে আছে তারকবাবুর বউ। চুপচাপ। একটা উরুর ওপর, অন্যটার কনুই উঁচু রোয়াকে ভর করে করতল গালে রেখেছে। কী ভাবছে—কাই বা করছে মহিলা? খুব রহস্যময় মনে হল।

কিছুক্ষণ পর এদের বাজনা থামল। তখন ফের আমি জঙ দুটো দেখিয়ে বললুম, কার?

ওগো, একবার এদিকে এসো। শোনো। তারকবাবু ডাকল।

তারকবাবুর বউ এল না। শশী বলল, থাক্। সেই গৎটা বাজান। রে সা নি রে সা···

তারকবাবু তবু ডাকতে লাগল বউকে।···এদিকে এস গো! ও সরমা! শুনছ? আহা, এসই না!

ওর নাম সরমা? সরমা এসে বলল, কী?

আমাদের অফিসারবাবুর ছেলে তোমার নাচ দেখবে বলছে!

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, আপনি নাচেন বউদি? বাঃ! একবার নাচ দেখান না!

তারকবাবু বলল, ওর সামনে সংকোচ কিসের? ও আমদের ছেলের মতো। নাও—এসো।

সরমা ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবছিল।

তারকবাবুর মুখটা কেমন হয়ে এল। বলল, আঃ, কী ঢং করছ? জঙ নাও না!

সরমা এবার কেমন হেসে আমার দিকে তাকাল।…আজ আমার শরীরটা ভালো নয় ভাই। কাল এসো, কেমন? কাল তোমাকে নাচ দেখাব।

তারকবাবু নিষ্ঠুর মুখে বলে উঠল, আবার ও কাল তোমার নাচ দেখতে আসবে। এখন এমন চমৎকার মুডটা এসে গেছে আমার! জঙ বাঁধো!

শশী তবলায় লহরা বাজিয়ে বলল, হ্যাঁ বউদি। আমারও। দারুণ মুড। বোল শুনে টের পাচ্ছ না?

তবলা বাজতে থাকল। বেহালা বাজতে লাগল। সরমা কিন্তু চুপচাপ ঠোঁট কামড়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিজেকে অপরাধী মনে হল আমার। বললুম, থাক। কালই হবে। আজ আপনার শরীর খারাপ যখন।…

তখন তারকবাবু গর্জে উঠল।…কী, হচ্ছে কী? পেটের ছেলের সামনে ছেনালিপনা হচ্ছে! জঙ বাঁধো বলছি।

হ্যাঁ—শশী বলেছিল, আরটিস্ট মানুষ। মুড বলে একটা ব্যাপার আছে। সরমা ঝুঁকে পায়ে জঙ বাঁধতে লাগল।

বেহালা শুনলুম। তবলা শুনলুম। এবং জঙের ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে নাচও দেখলুম।

বেদেরা ডালা খুলে লেজ ধরে সাপ টানে। সাপ বেরিয়ে এসে ফণা দোলায়। বেদে লাউখোলের নাগিনবাঁশী বাজায়।

খবর ছিল, তারকবাবুর বেহালা শুনে জ্যোৎস্নারাতে সাপ নাচে। তাই শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। দেখলুম। ভালোমন্দ কী বলব? বেদেরা তো নাচায়। দেখেছি। কিছু মনে হয় না।

ফেরার পথে শশী বলল, না নাচলে তারকদা কী করত জানিস? মেরে দম বের করে ফেলত। বউদি ওর ছাত্রী ছিল একসময়। তখন থেকেই মার খাওয়ার অভ্যেস আছে।…তারপর শশী হাসতে হাসতে বলেছিল, মাইরি, শালা তারকদাটা কী ঢ্যামনা জানিস? মেয়েটাকে বাজনা শেখাতে গিয়ে বের এনেছিল।…

পাশের রেলরাস্তায় সভ্যতার বিরুদ্ধে ব্যর্থ লড়াই করা সাপের থ্যাঁতলানো দুভাগ শরীর পড়ে থাকতে দেখতুম।

একদিন সরমার ন্যাংটো শরীরটাও রেলপাটির দুপাশে দুভাগে পড়ে থাকতে দেখলুম। তার লড়াইটা কার বিরুদ্ধে, কেমন করে হল, এসব বলার জন্য গল্প লিখতে আমি বসিনি। আসলে আমার কোন বক্তব্যই নেই। এই নিতান্ত একটা অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক রিপোর্ট—যার শেষ কয়েক লাইন হচ্ছে :

সাপুড়েরা নাগিনবাঁশি বাজায়, আমরা সাপকে নাচতে দেখি। সাপবিজ্ঞানীদের মতে সাপ কিন্তু সত্যি সত্যি নাচে না। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ফণা তাক করতে থাকে। ওই তার ছোবল মারার ভঙ্গী। বিষদাঁত ভাঙা অসহায় সাপের ওই আক্রমণোদ্যত ভঙ্গী দেখে আমরা বোকার মতো ভাবি সাপটা নাচছে। ঠোঁট থেকে মৃত্যুর পরোয়ানাটা কেড়ে নিলে সাপ আর বাতাসে দুলন্ত লতায় তফাত কী ?

জুলেখা

সে আমার হাফপেন্টুলপরা সময়ের কথা, যখন প্রবীণদের মনে হত একেকটি দুর্দান্ত দৈত্য এবং দিনের নির্দোষ বৃক্ষলতা সূর্যাস্তের পর নির্দয় রহস্যে ভরে যেত। চারপাশে ঘটত অনেক সন্দেহজনক ঘটনা। ভয় করতাম অনেক কিছুকেই। আর সেই ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করত যে, তার নাম ছিল কালু। কালু ছিল একটা কালোরঙের দিশি কুকুর। তার ছোট্ট শরীরটা ছিল যেন একটা সাইরেনযন্ত্র। সে আমাদের বাড়ি আসার পর থেকে দরমার মুর্গিচুরি বন্ধ হয়েছিল। তাই প্রথমদিকে তাকে ছিবেন্না করা হলেও পরে সে আদরযত্ন পেতে শুরু করেছিল।

বাড়ির আয়তনের তুলনায় আমাদের সংসারটা ছিল ছোটই। বাবা মা, আমি আর জুলেখা নামে একটি মেয়ে, এই চারজন মোটে মানুষ। একটা গাইগরু, তার বাছুর আর একদঙ্গল মুর্গি—যাদের মাথায় ছড়ি ঘোরানোর জন্য ছিল এক তাগড়াই মোরগ, জুলেখা যার নাম দিয়েছিল বাদশা।

জুলেখার ডাকনাম ছিল জুলি। আমার সেই হাফপেন্টুলের বয়সে জুলি শাড়ি ধরেছিল। আমার জন্মের পাঁচবছর আগে জুলির বয়স ছিল মোটে দুই। প্রতি শীতে উত্তরের পদ্মা-এলাকা থেকে যে গরিব মানুষেরা দলবেঁধে রাঢ় এলাকায় ভাত খাওয়ার লোভে ছুটে আসত, তারা নিজেদের বলত 'মুসাফির'

এবং অন্নের জন্য সেই অভিযানকে তারা বলত 'সফর'। সেবার মাঘমাসের এক বৃষ্টির রাতে দলছাড়া হয়ে এক মুসাফির মা ও তার দুবছরের মেয়ে আমাদের দলিজঘরের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। ভেদবমি হয়ে মা শেষরাতে মারা গেল, আমার দয়ালু দাদু তার সদ্‌গতি করেন। বাচ্চা মেয়েটি আমাদের বাড়িতেই থেকে যায়। অতটুকু মেয়ের চুলের বহর লক্ষ্য করে দাদু তার নাম রাখেন 'জুলেখা'—কেশবতী।

কী অবিশ্বাস্য বিশাল ছিল তার চুল! সেই চুলের বিশালতা আমাকে ভীষণ টানত। জুলির চুল ধরে আমি ঝোলাঝুলি করতাম। চুলের ভেতর লুকিয়ে পড়ে মাকে দিতাম কুকি। খিড়কির ছোট্ট পুকুরে সেই চুল ধরেই আমি সাঁতার কাটা শিখেছিলাম। আসলে জুলি হয়ে উঠেছিল আমার ক্রীড়াভূমি। সে ছিল আমার নির্ভরযোগ্য সিঁড়ি। নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে তার চেয়ে ভাল বুড়ি কল্পনা করা যায় না। আর এমনি করে দিনে দিনে তার শরীরের অনেকটা আমার চেনা হয়েছিল। আসলে জুলি ছিল আমার বহুবার পড়া ভূতের গল্পের বই, যার গল্পটা পুরনো হয়ে গেলেও ভূতটা রহস্য দিয়ে বার বার কাছে টানে।

জুলি অনেক গল্প জানত। তার কাছেই রাতে আমাকে শুতে দেওয়া হত। জুলি চাপা গলায় গল্প শোনাত। তবে শর্ত ছিল, আমাকে ক্রমাগত হুঁ দিয়ে যেতে হবে। হুঁ বন্ধ হলেই সে ডাকত, 'অঞ্জু! ঘুমোলে?' তারপর খোঁচা-খুঁচি করে জাগানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে বলত, 'না শুনলে আমার কী?' গল্পটা ভাল না লাগলে আমার এই ছিল চালাকি। কিন্তু কোনো-কোনো রাতে টের পেতাম তার গল্প বলার মুডই নেই। খাপছাড়া করে একটুখানি শুনিয়েই আমাকে কাছে টেনে পিঠে হাত রেখে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলত, 'ঘুমোও। ভোরে ইস্কুলে যেতে পারবে না। তখন ভাবিজি মুখ করবেন।'

সে মাকে বলত ভাবিজি, বাবাকে বলত ভাইজান। একরাতে সে আমাকে খুব কাছে টেনে নিলে তার বুকের অদ্ভুত কোমলতা আমাকে চমকে দিয়েছিল। আমি সেই কোমলতা হাত বাড়িয়ে খোঁজার চেষ্টা করতেই সে পিঠে থাপ্পড় মেরে ফিসফিসিয়ে উঠেছিল; 'ছিঃ! আমি তোমার ফুফু (পিসি) হই না?'

আমি তো ভীষণ—ভীষণ অবাক। নাস্তিক বাবার ঔদাসীন্যে আমার খৎনা দিতে দেরি হয়েছিল। খৎনা দেওয়ার পর বালিশে হেলান দিয়ে আমাকে বসিয়ে রাখা হলে জুলি আমার মুখে সেদ্ধ ডিম গুঁজে দিচ্ছিল আর সান্ত্বনা

দিচ্ছিল, কেঁদো না! কালই ঘা শুকিয়ে যাবে।' সে আমাকে দুহাতে তুলে নিয়ে খিড়কির ঘাটে জলে নামিয়ে হাতের তালুতে জল ঠেলে-ঠেলে ক্ষতস্থানে ঢেউয়ের ঝাপটানি দিত। দ্রুত ঘা সেরে যাওয়ার জন্য এটাই ছিল প্রচলিত পদ্ধতি। মাঝে মাঝে আঁচল টেনে কামড়ে ধরে সে লজ্জারও ভান করত। সে ঘাটের কাঠে বসে থাকত এবং কিছুই দেখছে না এমন ভঙ্গিতে হাসি চাপত। কখনও সে সাবধানে ঘায়ের অবস্থা পরখ করে বলত, 'আর দুটো দিন।'

ঘা শুকিয়ে সব স্বাভাবিক হয়ে গেলেও সে বলত, 'লাগছে না তো?' ব্যথা নেই শুনে সে ফোঁস করে যে নিঃশ্বাসটি ফেলেছিল, এতকাল পরেও তা কানে লেগে আছে। তার কাছে আমার লজ্জার কিছু ছিল না।

এই জুলি বাড়ির যে-সব কাজ করত, তা বাঁদিরাই করে থাকে। কিন্তু তাকে বাড়ির মেয়ের মতোই দেখা হত। তার বিয়ের বয়স বাড়ছিল দেখে বাবা ভেতর-ভেতর পাত্র খুঁজতেন। কোনো পাত্রই পছন্দ হত না মায়ের। মা ছিলেন খুব খুঁতখুঁতে মেয়ে। বলতেন, 'যে ঘরেই ওর জন্ম হোক, খান্দানি বাড়িতে মানুষ হয়েছে। মুনিশখাটা ঘরে গিয়ে থাকতে পারবে? কষ্ট হবে না?'

বাবা রাগ করে বলতেন, 'কোন খান্দানি ঘরের ছেলে ওকে বিয়ে করবে? লেখাপড়া জানে?'

মা দ্বিগুণ রেগে গিয়ে বলতেন, 'শেখাওনি কেন লেখাপড়া? কর্তব্য ছিল না তোমার?'

বাবা দমে গিয়ে বলতেন, 'তুমি শেখালেই পারতে। অল্পস্বল্প একটুখানি হলেও অন্তত—'

মা একই সুরে বলতেন, 'আমি তোমার সংসার সামলাবো, না কাউকে ক খ —ভারি আমার বলেছ!'

তবে দুজনেই দেখতাম ভীষণ পস্তাতে শুরু করেছিলেন ওকে লেখাপড়া শেখানো হয়নি বলে। জুলেখা ওই সময়টাতে খুব আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কাতর চোখে তাকিয়ে সে আঙুল খুঁটত। একদিন আড়ালে আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, জানো অঞ্জু, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে? আমি কিন্তু বিয়েই করব না দেখবে।'

'কেন জুলি?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলাম ওকে। 'কেন তুমি বিয়ে করবে না?'

জুলি আস্তে বলেছিল, 'আমি কারুর বাড়ি থাকতে পারব না। আমার খুব কষ্ট হবে।'

'বিয়ে কী জুলি?'

জুলিও খুব অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ফিসফিস করে বলেছিল, 'তুমি ছাড়া আর কারুর পাশে আমি শুতে পারব না। আমার লজ্জা করবে খুব।'

'বিয়ে করলে পাশে শুতে হয়? সত্যি বলছ?'

'হুঁ।' সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল। 'পাশে শোবার জন্যই তো বিয়ে।'

'কেন পাশে শুতে হয়, জুলি?'

অমনি জুলি আমার পিঠে থাপ্পড় মেরে বলেছিল, 'বলতে নেই। ছিঃ! আমি তোমার ফুফু হই না?'

তারপর যত দিন যাচ্ছিল, জুলির বিয়ে কেন্দ্র করে যেন একটা সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছিল। প্রায়ই দেখতাম বাবার সঙ্গে মায়ের কথাকাটাকাটি চলেছে। মা খেপে গিয়ে বলেছেন, 'মেয়েটা তোমার গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে তো? ওকে যেমন করে হোক, না তাড়িয়ে শান্তি নেই। নৈলে কোন আক্কেলে তুমি ওই আধবুড়ো ল্যাংড়া-ভ্যাংড়া লোকের বাড়ি ঠেলতে চাইছ?'

বাবা বলেছেন, 'কী মুশকিল! বদরু তো খানদানি ঘরের ছেলে। মিলিটারিতে বাবুর্চির চাকরি করত। জাপানিদের গুলি লেগে একটা পা জখম হয়েছিল। রীতিমতো সরকারি পেন্সন পাচ্ছে। এদিকে খাসি কেটে হাটবারে ভালই কামাচ্ছে। তুমি ওকে ল্যাংড়া-ভ্যাংড়া বলে ঠাট্টা করো না। দুনিয়া ঘুরে খায় বদরুদ্দিন।'

বদরুর একটা পা ছিল না। সে ক্র্যাচে ভর করে হাঁটত। হাটবারে তাকে দেখতাম রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা নিমগাছের ডালে রক্তাক্ত খাসি ঝুলিয়ে ছাল ছাড়াচ্ছে। তার চেহারায় একটা নিষ্ঠুরতা ছিল। অথচ সে যখন হাসত, তখন তাকে ভদ্রলোক দেখাত। সম্ভবত সে যুদ্ধের সময় ফ্রন্টে ছিল এবং যেন নিজেও যুদ্ধ করেছে সেইটাই বোঝাতে চাইত চেহারায় একখানা নিষ্ঠুরতা চাপিয়ে। বাসে বা ট্রেনে নাকি তাকে ভাড়া দিতে হত না। বাসে বা ট্রেনে চাপার সময় সে তার মিলিটারি উর্দিটি গায়ে চড়াত, আর তখন তার সেই বহিরঙ্গের নিষ্ঠুরতাটা যেন ভয়াল হয়ে উঠত।

এমন একটা লোকের পাশে গিয়ে জুলিকে শুয়ে থাকতে হবে, ভাবতেই রাগে

দুঃখে আমার কান্না পাচ্ছিল। আমি জুলির আরও কাছ ঘেঁষে থাকছিলাম। বাড়ির পেছনে ছোট্ট পুকুরটার পাড়ে আমাদের বাগান ছিল। জনহীন দুপুরবেলায় সেই বাগানে আমরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতাম। আব কালুও ছিল আমাদের সেই ষড়যন্ত্রের এক শরিক। আমরা দুজনে কালুকে খুব প্ররোচনা দিতাম,' বদরুর বাকি পাখানাও যেন সে কামড়ে খেয়ে ফেলে। কোথাও বদরুকে দেখামাত্র চুপিচুপি কালুকে লেলিয়েও দিয়েছি। কিন্তু কালু হতচ্ছাড়া ওকে যেন প্রাক্তন যোদ্ধা ভেবেই সম্মান জানাত লেজ নেড়ে। ক্রমশ কালুর ওপর আস্থা খুইয়ে একদিন জুলি মাথার ওপরকার লম্বাটে একটা ডাল দেখিয়ে বলেছিল, 'ল্যাংড়া বদরু আসুক না বিয়ে করতে। এসে দেখবে আমি ওখান থেকে ঝুলছি! এক হাত জিভ বের করে চুল এলিয়ে—' বলে সে সত্যি জিভ বের করে একটা ভয়ানক ভঙ্গী করেছিল।

আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। বলেছিলাম, 'ধুৎ! বিচ্ছিরি দেখাবে।'

'দেখাবেই তো। দেখে বদরুর বিয়ের সাধ ঘুচে যাবে।'

একটু ভেবে বলেছিলাম, 'উঁহু। ওকে বিশ্বাস নেই। তবু বলবে বিয়ে করব।'

জুলি হেসে অস্থির। 'আর কী করে করবে? তখন আমি তো মরে গেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ফুঁপিয়ে উঠে বলেছিলাম, 'না, না।' আর জুলি সেই জনহীন দুপুরবেলার বাগানে আমাকে বুকে চেপে নিঃশব্দে কতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করেছিল। কালু আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ব্যথিতভাবে লেজ নাড়ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে তাকে দেখে মনে হয়েছিল, দৈত্যদের পৃথিবীতে আমার আর জুলির মতো কালুও এত অসহায়!

বাবা আমার কোমলহৃদয়া মাকে যখন অনেকটা নুইয়ে ফেলেছেন, গন্ধে গন্ধে খোঁজ নিতে এসে পড়েছে হুরমতি নামে এক নাচুনি—যার বগলে সবসময় একটা ঢোলক আটকানো, এমন কী পাশের বাড়ির হাতেমের বউ এসে হলুদবাটার জন্য শিলনোড়া চাইছে, সেই সময় একদিন ডাকপিওন একটা পোস্টকার্ড দিয়ে গেল।

বাবা পোস্টকার্ডটা হাতে করে বাড়ি ঢুকে ঘোষণা করলেন, 'ডেপুটি সাহেব আসছেন।' সঙ্গে সঙ্গে একটা হিড়িক পড়ে গেল। মা দৌড়ে গিয়ে পোস্টকার্ডটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রায় চিকুর ছাড়লেন, 'ভাইজান আসছেন! ভাইজান আসছেন!' তারপর বড়ো বড়ো চোখে চিঠিটা দম আটকানো ভঙ্গিতে পড়ে নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করলেন। 'জুলি! ও জুলি! শিগগির হাসুর মাকে খবর দে! আর

শান, ছোট্টুকে বলে আসবি।' জুলি পা বাড়াতেই ফের চিকুর ছাড়লেন, অ্যাই বাঁদরমুখী! আরও শোন্। পর মেলে দিলে সব কথা না শুনেই।'...

আমার মায়েরা ছিলেন সাত বোন এক ভাই। মা সবার ছোট, আর ভাইটি সবার বড়ো। সেই ছিলেন ইংরেজ আমলের এক পরাক্রান্ত ডেপুটি। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তাঁর একটাই বাতিক ছিল, পালাক্রমে বোনদের খোঁজখবর নিতে যাওয়া। তিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং ছেলেরাও ছিল লায়েক। মেয়েদের পাত্রস্থ করে ফেলেছিলেন জীবনের সুদিনে। তারা দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে বোনদের প্রতি তাঁর স্নেহের মাত্রা ছিল প্রগাঢ় ও বিপুল। ট্রেন থেকে নেমে এলেও যেমন গতিবেগ ঘোচে না, রিটায়ার করার পরও তাঁর দেহমন থেকে তেমনি আমলাতন্ত্রের গতিবেগটি ঘোচেনি। পালে বাঘ পড়ার মতো এসে পড়তেন বাড়িতে। আমার বাবা ছিলেন স্কুলমাস্টার। গ্রামের স্কুলে ইন্সপেক্টর আসার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তিনি তাঁর ডেপুটি শ্যালককে বাইরে-বাইরে ঠাট্টা করলেও ভেতর-ভেতর খুব সমীহ করে চলতেন। কারণ ওই জাঁদরেল প্রাক্তন আমলার দরুন গ্রামে তাঁর প্রভাব বাড়ত। বাবা বলতেন বটে, 'নাও! ডেপুটিসাহেব ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছেন', কিন্তু তাঁর ন্যালাভোলা বাড়ি আর অগোছাল সংসারকে ব্যস্তভাবে সাজিয়ে ফেলতে মায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতেন।

আমার ডেপুটি মামা 'ডিসিপ্লিনে'র খুব পক্ষপাতী ছিলেন। পান থেকে চূণ খসলে চটে যেতেন। তাগড়াই আর ফর্সা পাঠান চেহারার মানুষ। কাঁচাপাকা একরাশ চুলদাড়ি। পরনে শাদা ঢোল পাঞ্জাবি-পাজামা, পায়ে কালো পামসু, হাতে সারাক্ষণ একটা বেতের মোটা ছড়ি। উত্তরোত্তর ধর্ম তাঁকে যত টানছিল, তত শরীর থেকে অসংখ্য চোখ গজিয়ে উঠছিল যেন। ডিসিপ্লিন, পরিচ্ছন্নতা আদবকায়দা এসব জিনিসের দিকে অসংখ্য সেই চোখে লক্ষ্য রাখতেন এবং প্রত্যেকটির পেছনে শাস্ত্রীয় সমর্থন দাঁড় করাতেন।

তিনি আসছেন শুনে আমাদের বাড়িতে সাজো-সাজো রব পড়ে যেত। দরদরজার চটের পর্দাটা বদলানো হত। দেয়াল, সিলিং মেঝে ঝাড়পোঁছ করে তকতকে রাখা হত। উঠোনের ইঁদারাতলায় তৈজসপত্রের পাহাড় জমিয়ে হাসুর মা বালি আর ছাই দিয়ে আড়ংধোলাইয়ে লেগে যেত। মা জুলিকে নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে কাজে নামতেন। মাঝে মাঝে কী করতে হবে, খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। শোবার ঘরের সব দেয়াল ঢেকে ছবি

লটকানো মায়ের শখ। পত্রিকা থেকে রঙীন ছবি ছিঁড়ে নিয়ে বাবাকে বাঁধিয়ে আনতে বলতেন শহর থেকে। ডেপুটি ভাইজানের অনেকগুলো ফটোও বাঁধিয়ে এনে জায়গামতো লটকেছিলেন। সেই ঘরে মাকে অন্যরকম দেখাত। স্বপ্নাচ্ছন্ন এক মুসলিম যুবতী, বাইরের পৃথিবীতে যার পা ফেলা বারণ, সে বাইরের পৃথিবীর রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ অনুভব করার জন্য নিজের ঘরে তাকে প্রতিফলিত করতে চাইত। সেই মাথাকোটা আকুলতার ছাপ মায়ের চোখে ফুটে উঠতে দেখতাম। ওটাই ছিল তাঁর শ্বাস ফেলার জগৎ। কিন্তু ডেপুটি মামা এলেই ওই জগৎটাকে ফেলে রেখে তাঁকে বেরুতে হত। ডেপুটিমামার আবির্ভাবে মায়ের মধ্যে বহু সূক্ষ্ম পরিবর্তনও আমি লক্ষ্য করতাম। গলার স্বর কত খাদে নামানো যায়, আগে থেকে তাই প্র্যাকটিস করতেন। কারণ ডেপুটিমামার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, মুসলিম স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বাড়ির বাইরে পৌঁছুনো বারণ। শাড়িটিও শরিয়ত মতে পরা চাই। তাই প্রচণ্ডভাবে গায়ে জড়ানোর ফলে মায়ের হাঁটাচলার অসুবিধে হত। কিন্তু উপায় নেই। আছাড় খেয়ে পড়লে জুলি হাসি চাপতে পারত না। তাকে বকতে গিয়ে মাও হেসে ফেলতেন। তবে ওই সময়টাতে মাকে বড় সুন্দর দেখাত। ভক্তিমতী, পরিচ্ছন্ন নম্রস্বভাব আর লাজুক। আমি হঠাৎ-হঠাৎ মাকে মুখ তুলে দেখে আর যেন চিনতেই পারতাম না।

আর আমার উদাসীন স্বভাবের বাবা মানুষটিও বদলে যেতেন। পরিষ্কার কাপড়-জামা পরতেন। হাবেভাবে আভিজাত্য ফোটানোর চেষ্টা করতেন। মধুর কণ্ঠস্বরে আমাকে ও জুলিকে তুমি বলে সম্ভাষণ করতেন। আসলে ডেপুটি মামার জন্য বাড়িজুড়ে একটা থমথমে পবিত্রতা, ছিমছাম একটা স্নিগ্ধতা ফুটে উঠত। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখলে পুরনো একতলা জীর্ণ বাড়িটাকে মনে হত বড় গম্ভীর আর সম্ভ্রমউদ্রেককারী। তাই বার বার বাড়িটাকে তফাত থেকে দেখতে যেতাম এবং মুগ্ধ হতাম।

আমাদের সাদামাটা সংসারকে এভাবে সম্ভ্রান্ত করে তুলতেন ডেপুটিমামা। পাড়াজুড়েও তাঁর আসার আগেই তখন হিড়িক; 'ডিপ্‌টি সাহেব আসছেন! ডিপ্‌টি সাহেব আসছেন!' প্রবীণেরা এসে খবর নিয়ে যেতেন কখন তাঁর শুভপদার্পণ ঘটবে। স্টেশনে গরুর গাড়ি পাঠানোর দায়িত্ব তাঁদেরই কেউ নিতেন। কেউ পাঠিয়ে দিতেন ধামাভরা পোলাওয়ের চাল। কেউ দিয়ে যেতেন এক বোয়াম ঘি—এমন কী মোরগ পর্যন্ত।

এসব উপহার সামগ্রী তাদের সেন্টিমেন্ট রক্ষার জন্য এবং ডেপুটি সাহেবের মুখ চেয়েও ফিরিয়ে দেওয়া হত না। তখন তাঁর সম্ভ্রমের পালিশে সারা মুসলমান পাড়া ঝলমলিয়ে উঠেছে। এর একটা বিশেষ কারণও ছিল। একসময়ে স্বদেশী আন্দোলনের ঠেলায় ইংরেজ সরকার মফস্বলের আমলাদের তথাকথিত 'গঠনমূলক' কাজে লেলিয়ে দিতেন। ডেপুটি মামার দেহ-মনে যে গতিবেগের কথা বলেছি, এই গঠনমূলক কাজের ব্যাপারটা ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। তবে রিটায়ার করার পর ধর্ম এবং অন্যান্য কারণে তাঁর তৎপরতা একান্তভাবে মুসলিম সমাজমুখী হয়ে ওঠে, যাকে তিনি বলতেন 'কওমি খিদ্‌মত' অর্থাৎ জাতির সেবা। আমাদের গ্রামের মুসলিমদের মধ্যে জিন্নাসাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বকে তত বেশি খাওয়ানোর ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও (কারণ ডেপুটিমামা রাজনীতি অপছন্দ করতেন এবং ইংরেজদেরই ভাবতেন দেশের ত্রাণকর্তা) শেষ পর্যন্ত কওমি রেজারেকশান-গোছের একটা উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। মসজিদে মাইনেকরা মৌলবী রেখে বালকবালিকাদের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁরই উপদেশে। ছোটখাট বিবাদের ফয়সালা তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকত। লোকেরা বলাবলি করত, 'এবার ডিপ্‌টিসাহেব এলেই গহর আর এরাদুর কাজিয়াটা মিটে যাবে।' কিংবা 'ইনু যে তার গরিব ভাগ্নের হক মেরে খাচ্ছে, সেটারও একটা আস্কারা হয়ে যাবে।' ডেপুটি সাহেব এসে মসজিদে ভাষণ দিয়ে লোকগুলোকে এমন উত্তেজিত করে ফেলতেন যে তারা গঠনমূলক কাজের খোঁজে পিলপিল করে বেরিয়ে পড়ত। ঝুড়ি-কোদাল-কাটারি নিয়ে রাস্তা মেরামতে লেগে যেত। ডোবা-পুকুর থেকে কচুরিপানা সাফ করে ফেলত। মাঠের ইদগার সংস্কারে মেতে উঠত। সরকারের কাছে তাদের হয়ে দরবার করারও সুবিধে ছিল তাঁর। আর এসবের ফলে ডেপুটিসাহেব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো গ্রামের লোকেরা ভাবত, একবার ডেপুটি হলে মানুষ সারাজীবনই ডেপুটি থেকে যায়। জুলি চুপিচুপি আমাকে বলত, 'জানো অঞ্জু, ডিপ্‌টিভাইজান মেজেস্টেরের হাকিম ছিল? শুনে আমার তো হাতপা কাঁপছে তখন থেকে।'

'হাতপা কাঁপছে কেন?'

জুলি চোখ বড়ো করে বলত, 'মেজেস্টরের হাকিম কি যে-সে?'

হেসে অস্থির হয়ে বলতাম, 'মেজেস্টরের হাকিম কী বলছ তুমি? মামুজি তো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।'

জুলি আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলত, 'ও মা! তাই বুঝি? আমি ভাবি মেজেস্টরের হাকিম!'

দের অজ্ঞতা দেখে অবাক হতাম না। আমার পড়ার বইয়ের পাতা খুলে সে অন্ধের চোখ দিয়ে দেখত। তার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন আটকে যেত আবেগে। একবার একটা ছবির ভেতর সেই প্রথম মানুষের মুখ চিনতে পেরে তার শরীর জুড়ে থরথর আনন্দের উচ্ছ্বাসও আমি দেখেছিলাম। তারপর থেকেই যেন সে মায়ের শোবার ঘরের দেয়ালে মায়ের মতোই একটা পৃথক জগৎ আবিষ্কার করতে শিখেছিল। সুযোগ পেলেই সে আমাকে সাথী করে নিয়ে ওঘরে ঢুকত। একটার পর একটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াত। আমি বুঝিয়ে দিতে গেলে সে কাঁধে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠত, 'চুপ করো তো!' তারপর ডেপুটিমামার ছবির সামনে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরেই জিভ কেটে মাথায় কাপড় চড়িয়ে ঘোমটা দেওয়ার ভঙ্গী করত। এটা মেয়েদের শরিয়তি শালীনতার রীতি।

ডেপুটিমামা এলে তাঁকে জলের গ্লাস, চায়ের কাপপ্লেট পানমশলার রেকাবি এসব পৌঁছে দিতে হত জুলিকে। সে প্রচুর ঘোমটা টেনে এবং প্রচণ্ডভাবে শাড়িটাকে শরীরে লেপটে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে এগিয়ে যেত দলিজঘরে। দলিজঘরে বাইরের লোক থাকলে সে দরজার এধারে পর্দার আড়াল থেকে ভিতুকণ্ঠস্বরে নিয়েযাওয়া জিনিসটার নাম উচ্চারণ করত। অথচ ওইসব লোকের সামনে মাথা খুলে অগোছাল শাড়ি পরেই সে ঘোরে।

ডেপুটিমামা অনেকসময় শুনতে পেতেন না কথার খেয়ালে। তখন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হত আর মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে জিনিসটার নাম আওড়াতে অথবা আস্তে করে কাশতে হত। তবু ভেতর থেকে সাড়া না এলে সে বিব্রতমুখে আমাকে খুঁজত। তখন আমি গিয়ে তার মুশকিল আসান করতাম।

ডেপুটিমামাই প্রথম জুলির বয়সের দিকে বাবা ও মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, 'মেয়েটা বিয়ের লায়েক হয়েছে। আফটার অল পরের মেয়ে। ওকে আর ঘরে রেখো না।' পরের বার এসে জুলিকে দেখে ফের বলেছিলেন, 'এখনও ওর বিয়ে দাওনি? আবদুল্লা! হুম্মা! তোমরা আগুন নিয়ে খেলছ। হুঁশিয়ার!'...

জুলি সেই কথা আড়ি পেতে শুনেছিল। তার ক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেনি। কিছুদিন পরে কালুর সঙ্গে বাগানে লুকোচুরি খেলছি, জুলি পেয়ারাগাছে ঠেস দিয়ে বুড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কালুর আগে

আমি বুড়ি ছোঁয়ামাত্র ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। খাপ্পা হয়ে বললাম, 'ফেলে দিলে আমাকে?'

জুলি গাল ফুলিয়ে বলল, 'ছুঁয়ো না আমাকে। জানো না আমি আগুন, হাতে ফোস্কা পড়বে?'

রাগটা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। এমন মজার কথায় না হেসে পারা যায় না। আমি ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। 'আগুন? নাও—পোড়াও! পোড়াও পোড়াও আমাকে।' আমি ওর শরীরকে ওতপ্রোতভাবে খামচে টানাটানি করে, এমন কী ওর বুকে ঢুঁ মারার মতো মাথা গুঁজে এবং ওর বিশাল চুল ধরে ঝুলোঝুলি করে বলতে থাকলাম, 'আগুন? আগুন তুমি? বলো আগুন?'

জুলি ধপাস করে পা ছড়িয়ে বসে কেঁদে ফেলল। তখন অপ্রস্তুত হয়ে সরে গেলাম। কালু আমার পাশে এসে দাঁড়াল। বৃক্ষতলে এলোচুলে শোকাকিনী জুলির দিকে দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম।

সে রাতে জুলি কোনো গল্প বলছিল না। উঠোনে একবার কালু সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে ডেকেই চুপ করে গেল। পেছনের তালগাছটায় খড়খড় শব্দ হতেই আমি ভাবলাম, একটা পরী আকাশ পথে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে তালগাছের মাথায় বিশ্রাম নিতে নেমেছে এবং সেটা টের পেয়েই কালু আস্তে ঘেউ করে উঠেছে। ভয়ে জুলির কাছ ঘেঁষে গেলাম। সে চিত হয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ ঘুরে আমাকে বুকে টেনে নিল।

তো সেবার বসন্তকালে যখন ল্যাংড়া মিলিটারি বদরুর সঙ্গে জুলির বিয়ের কথা মোটামুটি ঠিকঠাক হয়ে এসেছে, সেইসময় ডেপুটিমামার আবির্ভাব ঘটল।

জুলি যেমন, তেমনি আমিও বুঝতে পেরেছিলাম, জুলির আর উদ্ধারের আশা নেই। বিশেষ করে বদরু সে বেলা নিজেই এসে খাসির মাংস দিয়ে গেল। তার চেহারার নিষ্ঠুরতাটা ঘষেমেজে কোমল দেখাচ্ছিল। ডেপুটিমামাকে যখন অভ্যর্থনা করে গরুর গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে, তখন তাকে মিলিটারি পোশাকে দেখে আমি শিউরে উঠলাম। ডেপুটিমামা তাকে চিনতে পেরে বললেন, 'কী বদরুদ্দিন, কেমন আছ?'

বদরু একপায়ে সোজা হয়ে খট করে স্যালুট ঠুকল এবং বলল, 'ভাল আছি স্যার। আপনি ভাল তো?'

দ্রুত আমার মাথায় ভেসে এল বাগানের আমগাছের সেই ডালটার কথা—কিছুদিন থেকে লম্বা ছড়ানো সেই ডাল খুব জ্যান্ত হয়ে জুলিকে খুঁজছিল। সবকিছু ফেলে বাগানে ছুটে গেলাম। ডাকলাম, 'জুলি! জুলি!' কালুও ভয়ার্ত স্বরে একবার ঘেউ করে ডাকল। খুঁজে না পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখি, জুলি বারান্দার তক্তাপোশে গালিচা বিছোচ্ছে। বাড়ি ঢুকে ডেপুটিমামা আগে ওখানে এসে বসবেন। 'নাশতা-পানি' খাবেন। তারপর যাবেন দলিজঘরে। সেখানে প্রবীণদের ভিড় জমবে। ইজিচেয়ারে বসে তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন ডেপুটিমামা। ছড়িটি পাশে ঠেকা দেওয়া থাকবে।

জুলির চোখে চোখ পড়লে সে একটু হাসল। হাসতে পারল দেখে অবাক লাগছিল। তারপর চমক খেলাম তার কপালে কাচপোকার টিপ দেখে। সেদিন সারাদুপুর খিড়কির পুকুরে তাকে একটা কাচপোকা ধরতে সাহায্য করেছিলাম ভেবে একটু পস্তানিও হল। আর সে সুন্দর করে চুল বেঁধেছে, গত ইদের ডোরাকাটা শাড়িটা বের করে পরেছে। মায়ের ভঙ্গীতে খোঁপায় ঘোমটা আটকে রেখেছে (মুসলিম কুমারীদেরও ঘোমটা দেওয়া নিয়ম)। সে কি জানে না ল্যাংড়া মিলিটারিটা সেজেগুজে দলিজঘরের সামনে এসে পৌঁছেছে? আমি ওকে কথাটা জানিয়ে দেব ভাবলাম, কিন্তু সুযোগই পেলাম না। ডেপুটিমামা দরাজ গলায় ডাকতে ডাকতে বাড়ি ঢুকছিলেন, 'অঞ্জু! অঞ্জু কোথা রে?' আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে একটু হেসে বললেন, 'হ্যাল্লো মাই বয়! কত বড়োটি হয়ে গেছ তুমি! চেনাই যাচ্ছে না—অ্যাঁ?'

প্রথা অনুসারে এগিয়ে গিয়ে পদচুম্বন করলে মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। এবার মায়ের পালা। মা পদচুম্বন করে উঠেছেন, হঠাৎ আমার পেছন থেকে কালুর সাইরেন শুরু হয়ে গেল। সে এই প্রথম ডেপুটিমামাকে দেখেছে।

কালুকে বাবা তাড়া করলেন। কিন্তু তার চেঁচামেচি বন্ধ হল না। এমন কি আমিও তাকে বকে দিলাম। তবু সে গ্রাহ্য করল না। খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে চিকুর ছাড়তে থাকল।

ডেপুটিমামার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তখন কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পরে বারান্দার তক্তাপোশে গালিচায় বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অঞ্জুর কোন ক্লাস হল এবার?'

'ক্লাস সিক্স।'

'মাশ আল্লাহ্! সাবাস!' ডেপুটিমামা মিটিমিটি হেসে চাপা স্বরে বললেন, কুকুরটা কার?'

শুনতে পেয়ে মা ঝটপট বললেন, 'কারুর না। কোত্থেকে এসে জুটেছে। রাত্তিরে বাড়ি পাহারা দেয় বলে—'

হাত তুলে মাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলো তো অঞ্জু, আমার একটা কুকুর আছে ইংরেজিতে কী?'

ভেবেচিন্তে বললাম, 'মাই হ্যাজ এ ডগ।'

ডেপুটিমামা অট্টহাস্য করে বললেন, 'আবদুল্লা! হুস্না! শোনো তাহলে —মাই হ্যাজ এ ডগ!'

বাবা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'সারাদিন পড়াশোনা নেই—খালি কুকুর নিয়ে খেলা! আই হ্যাভ এ ডগ।'

ডেপুটিমামা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'আবদুল্লা, তুমি তো বাবার এথিস্ট্। খোদাতালা মানো না, নমাজ পড়ো না। তোমাকে বলা গেল। হুস্না, তুমি শোনো!'

মা ঘোমটা একটু টেনে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'বলুন ভাইজান!'

'ইসলামি শাস্ত্রে আছে, কুকুর পোষা না-জায়েজ (অসিদ্ধ)। বিল্লির ঝুটো হয় পাক, কিন্তু যে-বাড়িতে কুকুর থাকে, সে-বাড়িতে রাতবিরেতে ফেরেশতা (দেবদূত) ঢোকেন না।'

বাবা ফিক করে হেসে বললেন, 'খোদা তো সব দেখতে পান। ইন্সপেকশনে ফেরেশতা পাঠানোর দরকারটা কী?'

ডেপুটিমামা চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে বলিনি। তুমি তো নামে মুসলমান, ভেতরে হিন্দু।'

বাবা বললে, 'সে কী! আমাকে তো এথিস্ট্ বললেন এক্ষুনি! আবার হিন্দু বানিয়ে দিলেন?'...

বাবা তাঁর এই ডেপুটি শ্যালকের জন্য গর্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে ছাড়তেন না। তর্কটা অনিবার্যভাবে ইংরেজিতে পৌঁছে যেত। তখন একটা আশ্চর্য আবহাওয়ার সঞ্চার ঘটত বাড়িতে। মা মুখ টিপে হেসে কাজ করে বেড়াতেন, কিন্তু কান থাকত সেদিকেই। জুলি ফ্যালফ্যাল করে

তাকিয়ে থাকত। আমি গর্বিত মুখে লক্ষ্য রাখতাম। বাড়িটাকে আরও সম্ভ্রমে গম্ভীর করে তুলত ইংরেজি ভাষা। মা মাঝে মাঝে ফিসফিস করে বলতেন, 'কোন সাহসে লাগতে যাওয়া? ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—তার সঙ্গে! একি স্কুলমাস্টারি?'

তবে শেষপর্যন্ত বুঝতে পারতাম, একজন প্রাক্তন ডেপুটি আর এক স্কুল মাস্টারের তর্কটা নিছক শ্যালক-ভগ্নীপতির আড্ডাবিলাস। অবশ্য দলিজে যখন এই ব্যাপারটা ঘটত, তখন সেটা আমাদের পরিবারের গভীরতর খান্দানিরই প্রতীক হত এবং প্রভাব ফেলত। লোকেরা হাঁ করে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

কিন্তু স্কুলমাস্টারের নাস্তিক্য সম্পর্কে প্রাক্তন ডেপুটির বিশ্বাস এমন পাকা-পোক্ত ছিল যে সেজন্য আমাকেও একবার ভুগতে হয়েছিল। সেবার তর্কের শুরু আমার নাম নিয়ে।

ডেপুটিমামা বলেছিলেন, 'ছেলের নাম তো মরহুম সন্-বাবাজি রেখে গেছেন। তুমি হলে হিন্দু নামই রাখতে।'

বাবা বলেছিলেন, 'ভেবে দেখলে ওটা হিন্দু নামও। অঞ্জুমান আর অংশুমান একই।'

ডেপুটিমামা বাঁকা হেসে বলেছিলেন, 'হুঁ, বেঅকুফের কানে একইরকম শোনাবে বটে!'

বাবা জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'ভাইজান! আমি বলছি শুনুন। অঞ্জুমান ফার্সিতে হল জ্যোতিষ্ক—শাইনিং স্টার। আর সংস্কৃতে—'

'তোমার মাথা! অঞ্জুমান বা আঞ্জুমান হল সভা—মজলিশ।'

'আহা, সে তো যোগরূঢ়ার্থে। অঞ্জুমান হল জ্যোতিষ্ক আর আঞ্জুমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলী।'

'যোগ-ফোগ আমি বুঝি না!'

'না বোঝাটাই তো আপনাদের সমস্যা।' বাবা দুঃখিত মুখে বলেছিলেন। 'ফার্সি অঞ্জুমান আর সংস্কৃত অংশুমান একই শব্দ। অংশুমান মানে যা অংশু বা কিরণ ছড়ায়। আসলে প্রাচীনযুগে ইরান আর ভারতের লোকেরা একই ভাষায় কথা বলত। ফার্সিতে যা নমাজ, সংস্কৃতে তাই নমস্।'

ডেপুটিমামা থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আগড়ম-বাগড়ম ছাড়ো! ছেলের খৎনা দিয়েছ?'

মা তো আড়ি পেতে বেড়াতেন। ঝটপট বলেছিলেন, 'কবে দিয়েছি ভাইজান! সে তো পাঁচবছর বয়সেই।'

'আমাকে দাওয়াত করো নাই!'

'আপনি তো তখন কুমিল্লায় পোস্টেড।'

বাবা বলেছিলেন, 'মনে করে দেখুন, চিঠি গিয়েছিল।'

ডেপুটিমামার সন্দেহ কিন্তু ঘোচে নি। সেদিনই দুপুরবেলা দলিজঘরে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। দুপুরের খাওয়ার পর বাড়ি তখন নিঃসাড়। সেদিন ছিল ছুটির দিন। বাবা ভাত ঘুম দিচ্ছেন। মা খিড়কির দোরে গিয়ে বসেছেন আর জুলি তাঁর চুলে চিরুনি চালিয়ে উকুন খোঁজার ভান করছে। আমি উঠোনের কোণায় লেবুতলায় একটা খেলা খুঁজছি। এমন সময় দলিজ-ঘর থেকে চাপা গম্ভীর ডাক ভেসে এল, 'অঞ্জু! কাম হেয়া।'

ভেতরে গেলে আবছা আবছা আলোয় ডেপুটিমামা ফিসফিস করে হেসে বললেন, 'তোর সত্যি খৎনা হয়েছে?'

লজ্জায় কাঠ হয়ে বললাম, 'হুঁউ।'

'কাছে আয়।'

যাচ্ছি না দেখে ধমক দিলেন। তখন কাছে গেলাম। ডেপুটিমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ফাঁস না বোতাম?'

বুঝতে পারছি না দেখে আমার জামা তুলে বললেন 'ফাঁস!' তারপর একটানে ফিতের ফাঁসটা খুলে আমার হাফপেন্টুল নামিয়ে দিলেন এবং ক্ষুদে জিনিসটাকে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'অলরাইট! ফাঁস আটকে ফ্যাল। আর এই নে বখশিস। খেলগে, যা।'

বখশিসটা একটা অবিশ্বাস্য আধুলি এবং আমার হাফপেন্টুলের বয়সে তার প্রচুর দাম। তবে লজ্জায় এ কথা কাউকে বলিনি। জুলি, যার কাছে আমার গোপনীয় কিছু ছিল না, তার কাছেও না।...

ল্যাংড়া-মিলিটারি বদরুর সঙ্গে জুলির বিয়ের কথা চলার সময় ডেপুটিমামা এসে সামান্য একটা প্রাণী কালুকে শত্রু ভেবে বসবেন, কল্পনাও করি নি। কালু ছিল আমার সারাক্ষণের সঙ্গী। সে আমার সঙ্গে স্কুলেও যেত। যতক্ষণ স্কুলে থাকতাম, তার আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করার ইচ্ছে থাকত। কিন্তু বোর্ডিংয়ের

রান্নাঘরের কাছে আড্ডা দিত যারা, তারা তাকে পছন্দ করত না। তাড়া করে আমাদের পাড়ায় ঢুকিয়ে রেখে যেত! স্কুল থেকে ফেরার সময় তার সঙ্গে ঠিকই দেখা হয়ে যেত কবরখানার কাছে। বাড়ি ফিরে তাকে না দেখতে পেলে আমি অস্থির হব, কালু জানত। আর জুলিও কালুকে ভীষণ ভালবাসত। আমি, জুলি ও কালুর একটা পৃথক জগৎ ছিল। সেখানে আমরা তিনজন পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকব না। ডেপুটিমামা এসে যখন ফতোয়া জারি করলেন, কালুকে তাড়াতে হবে, আমার ও জুলির মুখ শুকিয়ে গেল।

আমরা সে-বেলা বাগানে গিয়ে চুপিচুপি পরামর্শ করলাম, কীভাবে কালুকে বাঁচানো যায়। তবে জুলি বলল, 'কথাটা কিন্তু সত্যি। রাত্তিরে কালু চ্যাঁচায় কেন অত, এতদিনে বুঝলাম, জানো অঞ্জু?'

'কেন, জুলি? ফেরেশতা আসে বলে? ফেরেশতা কেমন বলো তো?'

জুলি জানত। বলল, 'তোমার বইয়ে লেখা নেই? শাদা ফিট্ কাপড়-পরা। মাথায় শাদা পাগড়ি। আঁধারে জ্বলে যেন।'

'কেন আসে?' আসলে আমি রাগ করে কথা বলছিলাম। আসবার দরকারটা কী?'

'বাড়ির মানুষ ভাল, না মন্দ তাই দেখতে।'

'আমরা তো ভাল।'

'ভালই তো। আমরা কি ল্যাংড়া হারামির মতো খারাপ? আমরা কি কারুর গলায় ছুরি চালাই?'

খুব অবাক লাগছিল, ডেপুটিমামা আর কালু দুজনেই তাহলে রাতের আগন্তুক ফেরেশতাকে দেখতে পায়, আর কেউ পায় না! পেলে তো কবে সেকথা বলত। মা না, বাবা না, জুলি না, পাশের বাড়িয় হাতেম না—এমনকি মৌলবিসাহেবও না। আমাদের বাড়ি ওঁর খাওয়ার পালা পড়লে কালু ওঁকে দেখে চেঁচামেচি করেছে। তবু তো উনি বলেন নি কালু রাতের ফেরেশতাকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না? ডেপুটিমামার এই অসামান্য ক্ষমতা আমাকে ওঁর সম্পর্কে আরও ভয় পাইয়ে দিল। সেই বয়সে প্রবীণেরা এমনিতেই দৈত্যের মতো উঁচু আর বলবান,ডেপুটিমামাকে তাঁদের চেয়েও উঁচু আর ক্ষমতাশালী দেখতে পেলাম। জুলি ও আমি ভেবে-ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না কালু বেচারাকে কীভাবে রক্ষা করব।

প্রথম রাতেই ডেপুটিমামা কালুর চিৎকারে খেপে গিয়েছিলেন। সকালে চোখমুখ লাল করে বললেন, 'হারামি কুত্তা সারারাত ঘুমোতে দেয় নি। ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। হি মাস্ট বি পানিশড্!' তাঁর ইংরেজি গর্জনে বাড়ি গমগম করছিল। আর কালুও কেন কে জানে, ওঁকে দেখে খেপে গিয়েছিল। সারাক্ষণ চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিল। কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছিলাম না। যতবার তাকে বাগানে ঠেলে দিই, বাড়ি ঘুরে সে দলিজঘরের কাছে যায় আর চিৎকার করে। বেলা বাড়তে বাড়তে দলিজঘরের সমাবেশে ডেপুটিমামার ফরমান জারি হল। তারপর আঁতকে উঠে দেখলাম, যোয়ানমদ্দ একদঙ্গল লোক পরোয়ানা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মা চুপ করে থাকলেন। শুধু বাবা বোকার মতো হেসে বললেন, 'কোনো মানে হয়? ভাইজানের যত বয়স হচ্ছে, তত যেন পাগলামিটা বেড়ে যাচ্ছে। ঘরে ছবি থাকলেও নাকি ফেরেশতা ঢোকে না। তার বেলায় তো উচ্চবাচ্য নেই?' মা অমনি চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'থামো তুমি!'

লোকগুলোর হাতে লাঠি, বল্লম, চটের থলে, প্রকাণ্ড ঝুড়ি পর্যন্ত। আরেকবার দলিজঘরের সামনে কালু চেঁচাবার জন্য গিয়ে পড়তেই তারা হইহই করে তাকে তাড়া করল। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। জুলি এসে আমাকে টেনে ঘরে ঢোকাল। আশ্বাস দিয়ে বলল, 'পারবে না। কালু খুব চালাক। ডিপুটিসাহেব কদিন আর থাকবেন? চলে গেলেই কালু বাড়ি ফিরবে দেখো।'

তখন দূর থেকে দৈত্যদের বিকট চিৎকার ভেসে আসছিল। চিৎকার আরও দূরে মিলিয়ে গেলে জুলি আমার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ছিঃ। কাঁদে না! তুমি এখন বড় হয়েছ। কাঁদা মানায় না তোমার। এই ছাখো না, আমার মাথার সমান হয়েছে তোমার মাথা।' সে আমার গালে গাল ঠেকিয়ে উচ্চতা দেখাল। তারপর আমাকে অবাক করে আমার গালে চুমু খেল। তারপর সেই আবছা আঁধারে ভরা ঘরে আমার শরীর নিয়ে সে যা সব করতে থাকল, তা তার সান্ত্বনারই প্রকাশ।

তারপর আর কালুকে দেখতে পাইনি। পাড়ায় না, তার প্রিয় ভ্রমণক্ষেত্র কবরখানাতেও না, গ্রামে না—কোথাও না। আমার জীবন থেকে কালু হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো। কেউ আমাকে বলতে চাইত না কালুর কী হল। কিন্তু শুধু কালু না, পাড়ায় ফেরেশতা ঢুকবে না বলে লোকেরা পাড়ার সব

কুকুরের পেছনে লেগেছিল। এভাবে কুকুর-শূন্য হওয়ায় ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে লোকেদের বাড়ি ঢোকার সুযোগ পেয়েছিলেন। বেগতিক দেখে মন্দ লোকেরাও ভাল সাজার চেষ্টা করে থাকবে। শুধু মুর্গিচোর কিন্তুর কথা আলাদা। একরাতে কিন্তু এসে মায়ের দরমা থেকে 'বাদশা'কে নিয়ে গেল। বাড়িতে চুপিচুপি হাহাকার পড়ে গেল। বাদশাকে মা তাঁর ডেপুটি ভাইজানের বিদায়-ভোজের জন্যই নাকি রেখেছিলেন, অন্যদের ওপর ছড়ি ঘোরানো তম্বি করার জন্য নয়। জুলি আমাকে আড়ালে বলেছিল, 'এই তো শুরু হল। আরও কত কী হবে। দেখি না ডিপটিসাহেবের ফেরেশতা কাকে বাঁচায়।'

তবে একথাও ঠিক যে ফেরেশতা বাড়ি ঢোকায় জুলি তাঁকে নালিশ জানানোর সুযোগ পেয়েছিল। আমাকে শুনিয়েই ফিসফিসিয়ে বলত, 'বাবা ফেরেশতা! আর যার সঙ্গেই হোক, ওই ল্যাংড়াভ্যাংড়ার সঙ্গে যেন আমার বিয়ে না হয়।'

এই শুনতে শুনতে এক রাতে আমি ওকে বলে ফেললাম, 'জুলি! আমি যদি বড় হতাম, আমিই তোমাকে বিয়ে করে ফেলতাম।'

শোনামাত্র আমার মুখে হাত চেপে জুলি সেই পুরনো ধুয়ো তুলে বলে উঠল, 'ছিঃ! আমি তোমার ফুফু হই না?'

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হয়েছিলাম। বদরুর সঙ্গে বিয়ের কথাটা কেন যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। তাহলে সত্যি কি রাতের ফেরেশতা বাগড়া দিয়েছেন জুলির প্রার্থনায় মন গলে গেছে বলে?

এবার ডেপুটিমামা অন্যবারের চেয়ে বেশিদিন ধরে আছেন। গোড়াতেই বলেছি, আমার সেই বয়সে চারপাশে ঘটত সন্দেহজনক সব ঘটনা, যার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারতাম না। বাড়িতে যেন তেমন কিছু ঘটছিল। মায়ের মুখে থমথমে ভাব। বাবার সঙ্গে ফিসফিস করে কীসব আলোচনা করেন। বাবা গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যান। বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটান। মা কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে আস্তে ডাকেন, 'জুলি, শুনে যা।' কিন্তু জুলি কাছে গেলে বলেন, 'থাক। পরে বলব। ছাখ তো, ভাইজান চা-ফা খাবেন নাকি? আর শোন্ ওঁর গেঞ্জি ময়লা হয়েছে বলছিলেন। চেয়ে নিয়ে আয়।'

এক সন্ধ্যায়, তখন বসন্তকাল, মা নামাজ পড়তে বসেছেন, বাবা গেছেন হিন্দুপাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, ডেপুটিমামা গেছেন মুসজিদে, আমি পড়তে বসব কি না ভাবছি, জুলি আমায় হাত ধরে খিড়কি দিয়ে বাগানে

টেনে নিয়ে গেল। তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ও অঞ্জু! জানো কী হয়েছে?'

'না তো। কী হয়েছে জুলি?'

'ভাবিজি তার ভাইজানের সঙ্গে আমার বিয়ে লাগিয়েছে।'

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'মামুজির সঙ্গে?'

'চুপ, চুপ।' জুলি আমার মুখে হাত চাপল। 'ভাবিজি বলছে, ভাল থাকবি। উনি একা থাকেন। দেখাশোনার কেউ নেই। ডিপটিসাহেবের বউ হবি। মান বাড়বে।'

জুলি ধরা গলায় বলতে থাকল ফের, 'ভাবিজি বলছে, ডিপুটিসাহেবের ছেলেমেয়েরা তো সব পাকিস্তানে আছে। জমিজমার ভাগ নিতে কেউ আসবে না। সব তুই পাবি।' জুলি হু হু করে কেঁদে উঠল। 'সব আমি পাব—ঘরবাড়ি, জমি সম্পত্তি। ছপ্পর খাটে পা ঝুলিয়ে আমি বাঁদির বেটি বেগম সঙ্গে বসে থাকব।'

মা ডাকছিলেন, 'জুলি! জুলি!' মায়ের কণ্ঠস্বর চাপা এবং স্নেহে কোমল। জুলি চোখ মুছে আস্তে আস্তে চলে গেল। সন্ধ্যার বাগানে আমি একা দাঁড়িয়ে। আমগাছটা থেকে মুকুলের মউমউ গন্ধ অন্ধকারে। সারাদিন যেসব পাখি ডাকাডাকি করে, তারা চুপ করে আছে, যেন কিছু ঘটতে চলেছে। আর যা বৃক্ষলতা এমন অন্ধকারে নির্দয় রহস্যে ভরে ওঠে, তাদের সব রহস্য ফাঁকাই হয়ে গেছে। তাদের নিষ্ঠুরতাও জুলির ব্যর্থ প্রণয়কামী ল্যাংড়া মিলিটারিটার মতো কোমল হয়ে ভিজে যাচ্ছে—আমি নিঃশব্দে কাঁদছিলাম। ইচ্ছে করছিল তুমুল চেঁচামেচি করে বলে দিই, 'জুলি আমার। একদিন বড় হয়ে আমিই তাকে বিয়ে করব।...

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করলাম, কালু তাহলে ঠিকই চিনেছিল। যে প্রাণী অন্ধকার রাতের ফেরেশতাদের দেখতে পায়, সে সত্যি চেনে এবং তার পকেটে লুকিয়ে রাখা কালো সিন্দুকটিও টের পায়।

জুলি আমাকে সেরাতে আদরে আদরে অস্থির করে ফেলছিল। সে আমার গালে ঠোঁট রেখে ফিসফিস করে অনর্গল কথা বলছিল। সে বলছিল, শিগগির-শিগগির তুমি বড় হয়ে ওঠ। সোনার ছেলেটা! তুমি যদি বড় হতে, কি সাহস পেত আমাকে বিয়ে করার?' সে দুহাতে আমার মুখটা আঁকড়ে ধরে আবেগে ছটপট করে বলছিল, 'ছোটবেলাকার মতো আমার নাক চুষে

দাও। আমার গাল কামড়ে খেয়ে ফেলো।' আমি চুপচাপ দেখে সে কাত হয়ে চুল খুলে সেই চুল ছড়িয়ে আমাকে ঢেকে দিতে দিতে বলছিল, 'আমার এই চুলগুলো তুমি কত ভালবাসো! এই নাও, তোমাকে চুল দিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। ফেরেশতা এসে শুধোবে, অঞ্জু কোথায় গেল, তার নাম লিখব খাতায়? আমি বলব, পারো তো খুঁজে নাও। সে কী মজা হবে বলো তো?' তারপর সে আমার মাথাটা টেনে আমাকে চুলের তলায় লুকিয়ে দিল।...

আমার দয়ালু দাদু দুবছরের অনাথ মেয়েটির বিস্ময়কর চুলের বিশালতায় মুগ্ধ হয়ে তার নাম রেখেছিলেন জুলেখা—কেশবতী।

সেই কেশবতীর চুলে স্বাধীনতার প্রথম সুগন্ধ টের পেয়েছিলাম। যে-সুগন্ধ অবশেষে এক বসন্তকালের বাগানে সন্ধ্যার অন্ধকারকে মাতিয়ে আমার তুচ্ছ একরত্তি জীবনের রন্ধ্র দিয়ে ঢুকে চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শিশিরের ফোঁটার মতো। ভিজিয়ে দিয়েছিল রহস্যের নিষ্ঠুরতাগুলিকে।

জুলির কাছেই পেয়েছিলাম স্বাধীনতার প্রথম সুঘ্রাণ। বলেছিলাম, 'আমাকে বড় হতে দাও।'

কিন্তু দৈত্যের মতো পরাক্রান্ত এক প্রাক্তন ডেপুটি প্রথমে কালুকে পরে জুলিকে আমার জীবন থেকে মুছে দিলে আমি বাকি জীবনের জন্য একলা হয়ে গেলাম।...

পায়রাদের গল্প

এত উজ্জ্বল রোদের দিনে পৃথিবীর কাছে অনেক ভালো জিনিসের প্রত্যাশা থাকে। সম্ভবত সে কারণেই সব শোনার পরেও সুখোর মনে হচ্ছে, আরো কিছু বাকী থেকে গেল। হয়ত বাবার সামনে সেগুলো বলা যায় না, সুখোর ভঙ্গীটা এইরকম। এদিকে-ওদিকে তার বিষণ্ণ চাউনি—তবে উড়ন্ত ঘর-পালানে পায়রা খোঁজে যেমন, তেমনটি নয়। অনেকটা রোদ গায়ে নিয়ে সুখো বার বার থুতু গিলছে। ভগ্নদূত ছেলের উপর মমতায় প্রসন্ন সুধাংশু গলা ঝেড়ে বলল—শুনছ? এক গেলাস জল দাও।

কুসুম রান্নাঘর থেকে তখনও বেরোয় নি। গনগনে উনুনে ভাতের জল টগবগ করে ফুটছে। চাল দেবার মন নেই। সে এক-গা ঘামের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ভ্যাপসা গরমে কেবল স্নান করবার সাধই জাগে। তাতে সেই শেষ রাতে হুড়মুড় করে ওঠা, তারপর কান্নাকাটি, চোখ দুটো লাল, খুব জ্বালা করছে। স্বামীর ডাক শুনে সে তাকাল। শাড়ির পাড়ে চোখের নিচেটা ও নাক মুছল। শেষে উঠল। কুঁজো থেকে জল গড়াতে গিয়ে হয়ত হাতটা থেমেছিল। তখন দেরি দেখে সুধাংশু বিরক্ত হয়ে বলল—এক গেলাস জল আনতে রাত কাবার হবে যে!

মাথার ঠিক নেই, তাই দিনকে রাত বলা। কখনই বা ঠিক থাকে সুধাংশু? এমন উল্টোপাল্টা অনেক সময় সে বলে ও করে। মিলিটারী পেনসনের টাকা এলে বকসী লিখতে পাকড়াশী লিখে সই করে ফেলে। ডাকপিওন বলে—এই মরেছে রে, সেনাপতি মশায়ের মাথা খারাপ হয়েছে।

—উঁ? বলে সুধাংশু বিপন্ন চোখে তাকায়! ছেঁড়া ফাটা খাকি জামার হাতায় হাত ভরে পাঁজর চুলকোয়। ছারপোকা পেলে বাইরে এনে টিপে মারে।

আঙুলে রক্ত চটচট করে। সেই রক্তমাখা আঙুল দেখে সে কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ থাকে।

একসময় যুদ্ধে ছিল। যুদ্ধ করুক বা না করুক, সে কারণেই সে যোদ্ধা। এবং ডাকপিওনের শিল্পবোধের গুণে সুতরাং সে সেনাপতি। সেনাপতির এই ভুল-ভাল কথায় কিছু অনুমান করে ডাকপিওন যদি শুধোয়—তা এই সুধাংশু পাকড়াশীটি কে?

—অ। তাই লিখলুম নাকি? যেন ছেলেমানুষের মত ভাঙা দুধের দাঁত মুখে সুধাংশু হাসে। আহা, লোকটি বড় ভাল। যুদ্ধে গেলে বা অগত্যা মানুষ মারলেই যে মানুষ মন্দ হয়ে পড়বে, এমন কথা নেই।

এই মানুষ সুধাংশু। খোঁচা-খোঁচা আধপাকা দাড়ি গোঁফ, রুক্ষ কটা চুল, গায়ে কবেকার মিলিটারী হাফশার্ট—ছেঁড়া ফাটা যাই থাক, বেশ পুরু, শীত গ্রীষ্মে সমান আরামদায়ক। ধুতি হাঁটু অবধি গুটিয়ে সে যখন হাঁটে, দেখলে মনে হয়, চারপাশে অবিশ্রান্ত গুলি-গোলার বর্ষণ ভেদ করে এগিয়ে চলেছে একটি মানুষ। ভ্রূক্ষেপহীন, লক্ষ্যবিহীন। নিরস্ত্র দুটি হাত দু পাশে ঝুলছে। যে যুদ্ধক্ষেত্রে হাঁটে, সে সৈনিক ছাড়া কী হতে পারে। দু' পাশে দুটি বড় বড় হাত ঝুলিয়ে সুধাংশু হাঁটে। যেন যুদ্ধে আর সাধ নেই। কোথায় যেতে

কোথায় পৌঁছয়। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। বলে—তাই তো! ভুল দেখিয়ে দিলে বলে— অ!

সেই সুধাংশুর তিন মেয়ের নাম বকুল, মুকুল, পারুল। আসল নাম অবশ্য একটা আছে। তবে ওই ডাকনামের মধ্যেই তারা টিকেছে। জল যেমন পাত্র অনুসারে রূপ পায়, এই নামগুলোর মধ্যেও তেমনি একটি করে রূপ তারা পেয়েছে। তাই কদাচিৎ আসল নাম উঠলে হকচকিয়ে যাওয়ার কথা। বাপ সুধাংশুই বলে—জ্যোৎস্নাকুমারী? সে কে রে?···বকুল সামনে দাঁড়িয়ে তখন লিখখিল করে হাসলে বেচারা রীতিমত অবাক হয়।—মেয়েটি কে গা, চেনা-চেনা ঠেকছে!

মেজ মুকুল—তার নাম স্নেহলতা। ছোট পারুল—তার বেলায় যেন সব স্নেহ ফুরিয়ে গিয়েছিল বাপমায়ের মন থেকে। প্রথাসিদ্ধ লৌকিক কাকুতি বহন করা সেই কুখ্যাত নাম আন্নাকালীই রাখা হয়েছিল। তায় পারুল অতি দুরন্ত মেয়ে। দারুণ ছটফটে স্বভাব। হাড়জ্বালানী যাকে বলে। কিন্তু আন্নাকালীতে তার মাথাব্যথা ছিল না। সতের বছর বয়সে সে যখন ছোড়দি-মেজদির মত বরের কথা ভাবছে, এমন কি লুকিয়ে অচেনা নায়কের প্রতি প্রেমপত্রের মুসাবিদা করছে, তখন স্পষ্ট হরফে সই করছে, ইতি অভাগিনী পারুল। বোনেদের দু' বছর করে বয়সের তফাত। মেয়েদের কাছে এটা স্বভাবত কোন প্রশ্ন নয়, সে-কারণে স্বপ্নসাধ নিয়ে যা কিছু আলোচনা করবার তারা একত্রই করেছে। তবে পারুলের একটা আলাদা ব্যাপার ছিল। সেটা যেন তার যত্নে রাখা গোপন রত্ন। মনের অন্ধকার তাকে এক রূপকথার সিঁদুরকৌটো, ছোড়দি-মেজদি তার নাগাল পায় নি। পক্ষান্তরে বকুল জেনেছে, মুকুল কাকে চায়। মুকুল জেনেছে, বকুলদির মন কোথায় দস্তখতে বাঁধা আছে। পীড়াপীড়ি করলে পারুল বলেছে—ধেৎ, ওসব আমার ভালো লাগে না। দিদিরা চুল খামচে বলেছে—তবে কী ভালো লাগে তোর? পারুল মুখ টিপে হেসে বলেছে—পায়রা ওড়াতে।

সবার বড় সুখেনের ওই নেশা। পায়রা তাকে ম্যাট্রিক অবধিও এগোতে দেয় নি। চলতে চলতে হঠাৎ যেন নীল আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রের ভিতরকার দলছুট পোখরাজ দেখে সব ছেড়ে সে তার পিছনে সাত সমুদ্র তের নদী তেপান্তর পাড়ি দিতে চলে গেল। সেই যাওয়া তার সমানে চলেছে। পথে ঘাটে মাঠে যেখানেই হাঁটুক বা যেভাবেই থাক, চোখ দুটি আকাশের দিকে

ফেরানো। হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছড়ে, আঙুল মচকায়, তবু চোখ ফেরে না নিচে। কেমন করে কবে একদিন মুণ্ডুটা আকাশের দিকে কাত হয়েছিল, মুণ্ডু আর ঘোরে নি। (সুধাংশু বলে মা দুগ্‌গার পায়ের নিচের অসুর যেমন) এইরকম দেখে এক সন্ন্যাসী সুখেনকে বলেছিল—যা ব্যাটা, তুই পাবি। তা সত্ত্বেও মা কুসুম গাল দেয়—ওই ধেড়ে বাঁদরটাকে শুধোও তো, এমনি করে দিন যাবে ওর? শুনে সুধাংশু পস্তায়—সত্যি, সুখোটা যে একেবারে নাগালের বাইরে চলে গেল।

কিন্তু কে বাইরে গেল, তার খাঁটি প্রমাণ শেষ রাতে পাওয়া গেছে। মা বাবা দাদাদিদিদের অবাক করে, লজ্জা দিয়ে ও যেন্নাপিত্তি নিয়ে ছোট পারুল হঠাৎ রাত থেকে ঘরে নেই। চিরদিন একালষেঁড়ে মেয়ে—তক্তাপোশে ছোড়দি-মেজদি এক দিকে, সে অন্য দিকে শুয়েছে। গরম বলে কুসুম বারান্দায় সুধাংশুর পায়ের কাছে এসে শুয়ে ছিল। সুখেন একতলার ছাদে মাদুর পেতেছিল। আশ্চর্যের কথা, অন্য রাতে সবায় বলেছে—পোড়া চোখে ঘুম নেই একেবারে। আজ তারা কালঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল! অন্যরকম কিছু বলা যেত। কিন্তু তার আগেই উদো দত্ত পাড়ায় হইচই করে ফেলেছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেল না। তাঁর স্টেশনারী দোকানের সেই ছোকরা কর্মচারী প্রমথ রাতারাতি কোথায় কেটেছে। ক্যাশবাক্সের টাকাকড়ি নিয়ে গেছে। আর যা সব নিয়েছে, তার হিসেব হচ্ছে: একটি বড় কৌটো পাউডার, একটা স্নো, এক শিশি আলতা, পুরো এক বাক্স গন্ধসাবান, বৃহৎ কেশতৈল·· ইত্যাদি। উদয় দত্ত মশায়ের চশমাটা ড্রয়ারে ছিল। সেটাও নিয়ে গেছে। দত্ত বলছেন—নিলি নিলি, বেশ করলি। তা আমাকে আবার কানা করে গেলি কেন হারামজাদা? বুড়োমানুষের চশমা তোর ছেলেমানুষ চোখের কী কাজে লাগবে শুনি? নিছক রসিকতা, না বদমাইশি এটা?

আর পারুল? সেও নিয়েছে কিছু। তবে গরীব বাপের সংসার। নিয়েছে তিন বোনের একটি মাত্র সুটকেসটাই। তার ভিতর তিনজনেরই কাপড়চোপড় আর যা-যা সব ছিল। বিস্ময় ও কেলেঙ্কারির লজ্জা ঘুচিয়ে বকুল আর মুকুল গুমরে গুমরে কেঁদেছে। কুসুম গর্জে উঠেছে চাপা স্বরে—হতভাগী, যাবি তো নিজেরখানাই নিয়ে যা। দিদিদের ন্যাংটা করে গেলি কেন?

ন্যাংটো হওয়াই একরকম। ক'দিন পরে শ্যামচাঁদের মেলা। ময়দানে সার্কাস আসবে, ম্যাজিক আসবে, সিনেমা আসবে। তার উপর কুসুমের দাদা

অমরেন্দ্র ক'দিন আগে একটা সুখবর এনেছিল ভাগ্নীদের জন্যে। ভাল সম্বন্ধ। সামনে মাসের দোসরা-তেসরা দেখতে আসছে। বড়-মেজ-ছোট, যে-কোন একটা পছন্দ হবেই। এবং সেদিকে পারুল বেশ চোখে-ধরা মেয়ে।...এখনও খবর পায় নি অমরেন্দ্র। সুধাংশুর বিশ্বাস ছিল, মেয়ে স্টেশন থেকেই কেটে পড়বে। বেশী করলে চেঁচামেচিতে তো ও কম যায় না। রাজ্যের লোক জড়ো করবে। তখন, হারামজাদাকে অ্যায়সা মার মারা হবে...

এই ভেবে সে সকালবেলা ছেলেকে তিন মাইল দূরের রেল স্টেশনে পাঠিয়েছিল।

রোদের তাপ বেড়েছে টের পেয়ে তারপর সুধাংশু ঘরে ঢুকেছে। ঘরে পৈতৃক নড়বড়ে নকশা-কাটা খাট আছে একটা। তার ওপর গা মেলে শুয়েছে সে। নড়তে-চড়তে ইচ্ছে করে না। অনেকরকম চিন্তা একসঙ্গে মাথার ভিতর—বাইরে থেকে ঘরে ঝড় ঢুকে যেমন সব তছনছ করে। এইটুকু সামলাতেই সে ক্রমশ কোণের দিকে সেঁটে যাচ্ছে।

সুখো কি মিথ্যে বলল তাকে? নিজের ছেলে—বাপকে আবোলতাবোল বোঝাবে, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে ঔরসটৌরস ব্যাপারটা নেহাত পাষণ্ডের আব্দার। অনেক দেখেছে সুধাংশু। দেখতে দেখতে চুল সাদা হয়ে এল, দাঁত নড়বড় করতে লাগল—জন্মমাত্র সবাই নিজ নিজ তালে যে যার দিকে পাশ ফেরে। সুধাংশুর ফের সুখোকে ডেকে জানতে ইচ্ছে করে. স্টেশনছুট গাড়ির জানালায় সেই মেয়েটিই যে পারুল নয়, সে বুঝল কিসে? কপালে আধখানা চাঁদের দাগ আছে পারুলের। বেশ কিছু দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেত। সুধাংশু তো অনেক দূর থেকে সনাক্ত করতে পারে দাগটা। আট-ন মাসের পারুল, কচি মেয়ে পারুল, কী দুরন্ত ছটফটে মাছের মত পিছল সে, সুধাংশুর হাত পিছলে পড়ে গিয়েছিল উঠোনে। কপাল কেটে সারা মুখ রক্তে ভাসছিল। সুধাংশু সবে ছুটিতে বাড়ি এসেছে। তার বুক মেয়ের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। এবং তারপর যতবার বাড়ি এসেছে, অপরাধীর মত বিনম্র আচরণে সে ছোট্ট পারুলের ক্ষতচিহ্নটাকে অজস্র আদর দিয়েছে। ওই চিহ্ন যুদ্ধের মাঠেও তার ঘুম কেড়েছিল। সুখো সেটা চিনতে পারল না!

অনেক সময় চোখের ভুল অবশ্য হয়। তাতে সুখোর চোখ। আকাশ

দেখে, না রেলগাড়ি ; দলছুট পোখরাজ, না পারুল—এও এক সমস্যা। বরং সুধাংশু যদি নিজে যেত। সুধাংশু যুদ্ধের মাঠে হাবিলদারী কমাণ্ড হাঁকবার সুরে গর্জাত—অ্যাই হারামজাদী মেয়ে, শীগগীর নেমে আয় বলছি।…পারুল বলত—কে তুমি যে, বলামাত্র নেমে যেতে হবে?…(তাই বলত পারুল? বলতে পারত? পারত। ওরা সব পারে।)…পারুল, আমি তোর বাপ।…বেশ তো। বাপ আছ, বাপই থাকো। বাপের মান নিজেই রাখ। (ইস, এ কেমন কথা! বরং সুধাংশু নরম হবার চেষ্টা করল।)…এমন করে যেতে নেই মা। যাবি তো ভালোভাবেই যা।…এর চেয়ে ভালোভাবে যাওয়া আর কী আছে বাবা? ভালোভাবে যাওয়া মানে তো দিদিরা শাঁখ বাজাবে, মা উলু দেবে, আর তুমি হাতে হাতে সঁপে দেবে মেয়েকে ; এই তো? বরং এখনই দাও না। দিদিদের শাঁখে নিশ্বাস কুলোবে না, মা উলু দিতে গিয়ে আর দুটি মেয়ের দিকে চেয়ে থেমে যাবে। ছোড়দি-মেজদির চোখ মাড়িয়ে, মায়ের দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে ভেসে যাওয়ায় আমার সুখ হবে না। তার চেয়ে এই বেশ ভালো। কেলেঙ্কারির ঘৃণার মধ্যে ডুবে ছোড়দি-মেজদি তাদের ঈর্ষা ধুয়ে ফেলবে।…ঈর্ষা! সুধাংশুর চোখ পিটপিট করতে লাগল। সুধাংশু দেখল, সে জলে ভেসে যাচ্ছে। স্নেহের জলে। তা হলে গেলই পারুল! এই জলেই ভেসে গেল। ছোট মেয়ে কাপড় পরতে শেখবার পর সুধাংশুর চাকরি গেছে। একখানা ভালো কাপড় কিনে দিতে পারেনি। মেয়েদের কতরকম সাধ আহ্লাদ থাকে। একটুও মেটাতে পারেনি। সুতরাং যেতে দাও। যাক্। তত্রাচ সুধাংশুর হাতের থাবা শূন্যে কী খোঁজে? কে কী নিয়ে পালিয়ে গেল? সারা জীবন ধরে তার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত একটার পর একটা, যৌবন, সাধ, সুখেন…একমাত্র পুত্রকেও…। সুধাংশুর হাবিলদারী হাতটা অসহায় কুঁকড়ে একটা কিছু খুঁজছে। সেই বন্দুকটা। চাকরি ছেড়ে আসবার সময় যেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। চোখ দুটিতে পাথরের উপর শিশির জমে ওঠবার মত জল জ্যাবজ্যাব করছে। বন্দুকটাও কেড়ে নিয়েছিল! অপমানের পুরনো পাথর বুকে নিয়ে সুধাংশু চোখ বোজে।

ওদিকে সুখো জল খেয়ে বেরিয়েছে। সোজা আমবাগানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। সামনে রুক্ষ মাঠ, নদীর চর। উজ্জ্বল খর রোদে অজস্র ভাঁজ

পড়েছে সবখানে। ভাঁজে ভাঁজে রোদের সাদা শতরঞ্চি খোলা হচ্ছে। সে ছায়ায় মাথা বাঁচিয়ে গনগনে নীলরঙা আকাশ দেখছে। আস্তে আস্তে একটা সিগ্রেট টানছে। রীতিমত সিগ্রেটই, বিড়ি নয়। এবং বিড়ি নয় সিগ্রেট তা বোঝবার জন্যে মধ্যে মধ্যে আঙুলের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে।

প্রবোধ একটা মুসকি এনেছে কোত্থেকে। নীলচে ডানা, গলার কাছে চিকন সবুজ আর সিঁদুরে দুটো চাকা। খয়েরী ঠোঁট। পা দুটো মারাত্মক লাল। সব সময় থাকে থাকে পাপড়ি মেলা ফুলের মত ফেঁপে থাকে পায়রাটা। প্রবোধ বলছিল, সব ভালো। বুঝলি সুখো, সবই ভালো। চরকিবাজি দেখলেও তাক লাগে। কেবল দোষ হচ্ছে, দারুণ বোমকানা। উড়ে গেলে আর বোম চিনতে পারে না। তাই ঘর-ছাড়া করি নে।

সুখোর একটা আছে। নাম রেখেছে হীরা। সেও প্রবোধের মুসকির মত বোমকানা। বুদ্ধি করে বোমের মাথায় একটুকরো সাদা ন্যাকড়া ঝুলিয়েছিল। উড়ন্ত হীরা পাকসাটে তার কাছে আসে, কিন্তু পরক্ষণেই ভয় পেয়ে সরে যায়। নারকেল গাছের মাথায় গিয়ে বসে। বেচারার ছটফটানি বেশ টের পায় সে। শেষ উপায় হচ্ছে সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করা। সন্ধ্যেয় আগুন জ্বাললে তখন হীরা নেমে আসে। আগুন ওদের চোখ ধাঁধায়। সুতরাং পাছে আগুনে এসে না পড়ে, তার জন্যে সতর্ক হতে হয়। ফলে হীরাকে একরম ঘরবন্দীই করে রেখেছে। ঘরে বসে হীরা মনের সুখে বকম বকম করে।

আর, সুখোর মনে পড়ছিল, হোসেন কাঠুরে নদীর ওপারে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখে, ডালে একটা সুন্দর মেটেরঙের দুবাজ বসে আছে। হোসেন অবশ্যি ওর জাত চিনত না—শত্তুর বাজকে আশ্চর্য কৌশলে ফাঁকি দিতে পারে ওরা। অথচ কী ঘর-পোষা পাখি, হোসেন গাছকে সেলাম করে যেই প্রথম কোপ মেরেছে, অমনি কাঁধে এসে বসেছে সে। কানের কাছে ডানা মারছে। হোসেন হেসে কেঁদে বাঁচে না।

পক্ষীরূপী তুমি কে বাছা? অ্যাই আমি কোপ বাঁধলুম, এ জন্মে আর লয় বাপধন। ছোটবাবুর গাছ। ছোটবাবু এসে ধমক দিলে হোসেন কাঁধে কুড়ুল আর পায়রা সহ বাড়ি ফিরে আসে। ঘরে হা অন্ন, তত্রাচ সে আর গাছের গায়ে কোপ বসায় না। মজুর খাটবার সুযোগ না পেলে ভিক্ষেও করে। পথে যখন হাঁটে, কাঁধে সেই ধূসর রঙের দুবাজ। তার পায়ে সাধের রুপোলী ঘুঙুর। পথে

ঘুঙুরের আলতো শব্দ পেলে চোখ বুজে বলা যেত, কাঠ-কাটার ব্যাটা যাচ্ছে।

এখন অবশ্যি হোসেনের ঘরে একদঙ্গল পায়রা। মাটির ভাঁড় ভরতি ছোলা মটর গম। তবে গরীব মানুষ, পেটের দায়ে মধ্যে মধ্যে বিক্রি করে দু-একটা। দানীং সে একটা লটকন বেচবার ফিকিরে আছে। দাম হেঁকেছে পুরো দশ টাকা। বলেছে—ইচ্ছে হলে নাও, নয় তো না। প্রবোধ বলে এসেছে—ব্যাটা যেন রাজখদ্দের পাবে। হোসেনের সামনে দশ টাকার নোট ধরলে হোসেন বলবে, অই দেখ গো, আমার পাখি যে কিনবে, সে রাজার ব্যাটা রাজপুত্তুর। লোভে সুখেনের চোখে ঘুমের পোকা নেই। প্রমথকে টাকার জন্যে মুখ ফুটে বলেছিল। প্রমথ দিতেও চেয়েছিল। কিন্তু হতভাগিনী পারুলটা সব তছরূপ করে ফেলল। স্টেশনে এই সিগ্রেটটা দেবার সময় প্রমথ বলল—ভাবিসনি, কোন কষ্ট হবে না। আর দেখ, তোর-আমার ফ্রেণ্ডশিপটা যেন নষ্ট না হয়। গিয়ে চিঠি দেব। ট্রেনটা এত তাড়াতাড়ি ছাড়ল, প্রমথের দেশলাই নিবে গেল হাড়াহুড়োয়, বেশ বাতাস দিচ্ছিল শেষরাত থেকে।—তা সুখো, এবার ওই বাজী নেশাটা ছাড় দিকি। দিদিদের বে দিতে হবে না? বাবা বুড়ো হয়েছেন। টেলিগ্রাফ তারের ওপারে কী একটা উড়ে আসছিল, দেখতে গিয়ে ট্রেনের চাকা কয়েক হাত গড়িয়ে গেছে। পারুল, পারুল তো কথা বলল না এতক্ষণ। পাশে পাশে হাঁটতে থাকল সুখো। ডাকল—পারুল, এই পারুল! তখন পারুল বামটার ভিতর থেকে মুখ বের করল। কী ঠাণ্ডা শক্ত মুখ! ঝড়জলের পর পৃথিবীকে যেমন দেখায়। সে বলল—পায়রা-ফায়রার নেশা ছেড়ে দিও। মা-বাবা দিদিদের প্রণাম দিও। কখন কোন ফাঁকে সিঁথিটা বিশ্রী লাল করে ফেলেছে, ব্যাপারটা সুখেনের কাছে রীতিমত ধাঁধা। সে প্রায় ছুটতে ছুটতে বলছিল—আয়না সেই সঙ্গে? মাথাটা কী বিচ্ছিরি হয়ে গেছে রে! ঠিক তখনই একটা খালাসী আচমকা তার পেটে গুঁতো মারে—এই উল্লুক, তফাত যাও। বৈমন সুখেনের চোখের সামনে দশটা টাকা আর পারুলকে নিয়ে প্রমথর ট্রেনটা চলিয়ে গেল।

কী একটা উড়ছে, দূর গভীর নীল রঙের উপর সাদা ফুটকি। লক্ষ করতে গিয়ে হঠাৎ চোখ জ্বালা করে। কচলালে জল উপচে আসে। সুখেন বোঝে, দূর দেখবার চেষ্টা বৃথা। সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

এদিকে পাশের ঘরে বকুল জানালার পাশে চুপচাপ বসেছে। মুকুল বাক্স হাতড়ে কী দেখছে। কখনও ঘরের অন্ধকার কোণগুলোয় তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে থাকছে। কখনও উঠে গিয়ে তাক হাতড়াচ্ছে। বকুল দেখেও দেখছে না বা জানতে ইচ্ছে করছে না। সে তার শাড়ির আঁচল শক্ত করে কোমরে জড়িয়েছে; খোঁপা ডাঁটো করে বেঁধেছে। বাইরের বাগানে নিরিবিলি তিন বোনে ঝুলকুল খেলত—তার মানে একজন নিচে, অন্য দুজন গাছের ডালে : লাফ দিয়ে মাটি ছোঁবার পথে নিচের জন তাদের কাকেও ছোঁবে, নয়ত থাকো ফের মড়ি হয়ে ধুলোয় ঘাসে, তখন বকুল এইরকম আঁটোসাঁটো হয়ে উঠত। এখন যে সে বাইরে তাকিয়ে আছে, তার চাউনিতে সেইরকম ক্ষিপ্রতা আর চাঞ্চল্য। চোখের কালো মণি দুটি জলে কাচপোকার মত নড়ছে। ভুরু কুঁচকে আছে; তার একটা হাত জানুর উপর ঘুমন্ত কুকুরের মত চুপচাপ, অন্য হাত মরচে-ধরা রঙ ধরেছে। আর মুকুলের শাড়ি অগোছাল। জলে ঢেউ ওঠাপড়ার মত তার শাড়িটা কাঁপছে। আঁচল মেঝেয় লুটোচ্ছে। বার বার ঘষা খাচ্ছে আসবাবপত্রে। বুকের উপর খাঁজে খাঁজে চন্দ্রবোড়া সাপের মত আঁকাবাঁকা স্তব্ধ পাথরের হার—যার একটুখানি দেখা যাচ্ছে। এবং কানে হিজলফুলের শীষের গড়নের সাদা পুঁতির ফুল—সেটা দুলছে, হিজল ফুলের শীষ যেমন বাতাসে দোলে। তার চিবুকে ঘাম, নাকের ডগায় ঘাম, কপালে ঘাম। ঠোঁটের উপরের ঘামটা সে বার বার জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে। ওর নাকটা একটু লম্বাটে, বকুলের মত চাপা নয়। অবিকল মায়ের নাক, বাকি সবই বাবার। ব্যস্ততায় মায়ের নাকের ফুটো যেমন ফোলে, মুকুলেরও ফুলছে। পুরনো সাদা ময়লা একটা ব্রেসিয়ার কখন থেকে তোরঙ্গে মুখ বাড়িয়ে ছিল। দ্রুত লম্বা আঙুলে জড়িয়ে যেতেই মুকুল সেটা বাঁ হাতে তুলে শূন্যে দোলাচ্ছিল। তারপর ঠোঁট কুঁচকে সেটা তক্তপোশের নিচে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলল।

চকিতে মুখ ফিরিয়ে বলল—কী রে?

—ওর সেইটে।

—কী?

ফিক করে হেসে ফেলে মুকুল—কাঁচুলি না কাঁচুলি। তারপর পায়ের কাছে চোখ রাখে। গুচ্চের ক্লিপ, সেফটিপিন, ভাঙা মাথার কাঁটা, গিল্টির লকেট, টিপবোতাম। একটা ভাঁজ-করা কাগজ খোলে সে। পরক্ষণেই বকুলের কোলে ছুঁড়ে মারে। বকুল ফের চমকে উঠে বলে—কী?

—তোমার বন্ধুর ঠিকানা।

—কার? বকুল ব্যস্তভাবে ভাঁজ খোলে। তারপর চোখ বুলিয়ে নেয়। ফের বলে—ও সুষমার বরের ঠিকানা। আস্তে আস্তে কাগজটা মুঠোয় দলা পাকিয়ে যেতে থাকে। সে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে কাগজটা।

এই সময় দু'হাত তক্তপোশে ভর করে মুকুল ঝুঁকেছে। তার পিঠটা ভীষণ কাঁপছে। সারা শরীরও নড়ছে—দু' পাশে অদৃশ্য ঘুরন্ত ভারী চাকার বেগ থাকলে যেমন কাঁপন হয়। বকুল সাঁত্ করে উঠে এসে ওকে ধরল।—কী রে, হাসছিস? কেন? হাসছিল মুকুল। হাসতে হাসতে তার কোমর থেকে কাপড় খুলে যায়। একটা ডাঁটালো সূর্যমুখীর পাপড়ি খসে গেলে যেমন দেখায়, একমাথা অগোছাল চুল, রোগা শরীর, শাড়ি খসে-পড়া মুকুলকে সবজে সায়া আর খয়েরী আঁটো ব্লাউজে সেইরকম দেখাচ্ছিল। তখন বকুলেরও হাসি পায়। সে পেট টিপে জোর শব্দ করে হাসে—উঃ মরে গেলুম রে থামবি? এই মুকুল!

মা কুসুম রান্না সামলে স্নানের জন্যে তৈরী হয়েছিল। এ ঘরে কাপড় নেবার জন্যে আসছিল সে। ধাড়ী মেয়েদের এমনি হাসতে দেখে তার মাথায় গরমি হঠাৎ ফেটে যায়। আগুন জলে ওঠে। সে দাঁতে দাঁত চেপে দুই মেয়েকে প্রচণ্ড মারতে শুরু করে। মার খেয়ে ওরা তক্তপোশে উবুড় হয়। ফুঁপিয়ে কাঁদে। তারপর কুসুম বেরিয়ে ঘাটের দিকে যায়। ঘাটে উমাশশী তাকে বলে—অ বউ, চণ্ডী আসে নি এদিকে? চণ্ডী-ফণ্ডী কেউ আসে নি। বাড়িতে এমন কাণ্ড। বাইরের লোক আসবার আর মুখ নেই। তাতে চণ্ডী—

শুধু চণ্ডী কেন? অবনী? অবনী ভোরের গাড়িতে কলকাতা থেকে এসেছে। দোকানের কাপড়চোপড় কিনে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীকে হাওলা করে দিয়েছে। ট্রাকে আসবে। অবনী এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে তার মা বলেছে—ও অবু, শুনছিস খিটকেলে কাণ্ড? রাতজাগা লাল চোখে অবনী কতক শুনেছে, কতক শোনে নি। কিন্তু শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা সাপ চলে গেল। চোয়াল এঁটে ফের ঢিলে হল। কষা থেকে লাল মুছে সে একটু হেসেছে।—পারুল? তাই বলো। ফের ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা ছিল। কিন্তু ভাবনা ধরে গেল। বকুলের জন্যে কিছু জিনিসপত্র আছে ব্যাগে। এসব ক্ষেত্রে বরাবর যেমন হয়েছে, বকুলের মা বলেছিল—কলকাতা যাচ্ছ অবু, বকুলের জন্যে একটা পিঠকাটা ব্লাউজ এনো দিকি। দাম এখন দেবার একটু অসুবিধে আছে—উনি

বেরিয়েছেন। কখন ফেরেন ঠিক নেই। তা বাবা অবু···। দাম কোন দিনই দেওয়া হয় না। অবনী চাইতেও পারে না। চাইবার পাত্র সে ঠিক নয়। নতুন নতুন ফ্যাশান যা বাজারে ওঠে, দেখা মাত্র কুসুমের মেয়েরা সটান কুসুমের কাছেই কথাটা তোলে। কুসুম বলে—অবুর দোকান রয়েছে। ও আসুক, এলে বলে দেখব'খন। কষ্টের সংসার, ঘরে সব সোমত্ত মেয়ে, কতরকম সাধ-আহ্লাদ থাকে এ বয়সে। কুসুম হয়ত ভাবে—এতে দোষ কী? পাড়াসম্পর্কে দাদা বই নয়। তা ছাড়া এমনি নিচ্ছি না, দাম কোন না কোনদিন শুধেই দেব। তবে অবনীর বাবা একটা যখ। অবনী মাঝে মাঝে ফাঁপরে পড়ে। খাতাকলমে স্টকের মাল নিখুঁত গোনা আছে। কম হলেই অবনীকে ধমক। তখন সে চোখ বুজে সুধাংশু জ্যাঠার নাম করে। এইসবের দরুন খাতায় হিসেব টানা হচ্ছে—একুনে তিপ্পান্ন টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র। পয়লা বোশেখের লাল নোটিস গিয়েছিল। বকুল সেটা অবনীকে ফেরত দিয়েছে। সন্ধ্যায় তিন বোন সেজেগুজে হালখাতা করে এল। মিষ্টি আনল এক ঠোঙা। মাঝখানে কিছু টাকা অবনীর খসল। এখন অবনী কেবল বাবার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে। যম ছায়া মাড়ায় না কিপটে বুড়ো যখটার।

কলকাতা থেকে এসে অবনীর ঘুম যেটুকু হবার হয়ে গেছে। সে উবুড় হয়ে শুয়ে দু পা আঁকশি করে শূন্যে নাচাচ্ছে। সুধাংশুকে সে মিলিটারী পোশাকে সশস্ত্র দেখছে। সামনে তারকাঁটার বেড়া। সুধাংশু এবার ঠিকই কুকুর চিনেছে। কুকুর দেখলেই গুলি করবে।

চণ্ডী আপিস কামাই করেছিল আজ। সকালে উঠেই নাকি তার শরীর ম্যাজম্যাজ করছিল। সাইকেলে চেপে রোজ তিন মাইল দূরে রেল-স্টেশন ছোটো, ফের ট্রেনে চেপে দশ মাইল শহরে পাড়ি দাও—বছরে এই একটা দিন নাইবা নিয়ম মানল! মা উমাশশী পাড়ার 'টেলিগ্রাম', সকালে বেরিয়েছে। গ্রাম নিঃশব্দে তোলপাড় হচ্ছে। চণ্ডী বেরিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল। তার দিকে সকলে এমন তাকিয়ে থাকল যে, কয়েক বাজি তাস পিটেই সে গ্রামছাড়া হেঁটেছে। ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে চলে গেছে। তরমুজের ক্ষেত দেখে তার তেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু সাদা তরমুজ পছন্দ হয়নি। তখন অল্প জলে পা ভিজিয়ে সে ওপারে বুনো জামের জঙ্গলে ছায়ায় গিয়ে বসেছে।

নানারকম উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটাতে ইচ্ছে করছিল তার। সে ভাবছিল, হঠাৎ এখনই গ্রীষ্মের শুকনো নদী কূলে কূলে ভরে উঠলে তার বাড়ি ফেরা হবে না। তখন সে কী করবে? কখনও ভাবছিল, পাশ থেকে হঠাৎ সাপ বেরিয়ে কাটলে কী কী সব ঘটতে পারে। এমন কি একরকম অদ্ভুত ভূমিকম্পের দৃশ্যও সে কল্পনা করছিল। ধরা যাক্, সামনের পলিমাটি ফাটিয়ে আচমকা এক সাধুর আবির্ভাব। সাধুবাবা বললেন—ব্যাটা, কী চাই তোর? চণ্ডী বলল—আজ্ঞে? তারপর ভাবনায় পড়ে গেল। কী চাই তার? কাপড়চোপড়? টাকাপয়সা? মেয়েমানুষ? ওই সামান্য জিনিস—যা এমনিতেও পাওয়া যায়, চেয়ে নিজেকে মহাপুরুষের সামনে ছোট করা কেন? চাওয়া দিয়েই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা উচিত। তা হলে কী চাইবে সে? মনে আমার শান্তি নেই সাধুবাবা। শান্তি দাও। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এ জিনিসটাও রামাশ্যামার মত চাওয়া হয়ে গেল।...তা হোক, এইটাই বেশ দরকার তার।...কিন্তু তার দোনামনা দেখে সাধুবাবা ওদিকে উধাও। একেবারে হাওয়া!

চণ্ডী ভাবল, মরুক গে। শুধু শান্তি নিয়ে কী হবে! গেছে গেছে, আপদ চুকেছে। আচ্ছা, মুকুল যদি হঠাৎ দুম করে মরে যায়? মরা তো কঠিন কাজ নয়। গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লেই হল। তখন চণ্ডী কী করবে। সে যদি মনের দুঃখে বিবাগী হয়, অভাগিনী মায়ের লাঞ্ছনার চরম ঘটবে। না, বিবাগী হওয়া তার উচিত নয়। কিন্তু মুকুল মরবে—তারও তো একটা কিছু করা উচিত। কাঁদবে লুকিয়ে? ধ্যেৎ, সেও খুব বিচ্ছিরি দেখায়। সাতাশ বছরের যুবক কাঁদবে কী! চণ্ডী দেখল, মুকুল মরলেও তার কিছু করার নেই। নিজেকে এত অসহায় আর অবিবেকী লাগল যে, চণ্ডী নিজের মৃত্যুর কথাই ভাবতে লাগল। সত্যি তো, চুটিয়ে প্রেম চালানোর পক্ষে যথেষ্ট পুঁজি যার নেই, খালি হাত পা নিয়ে মেয়েদের কাছে যাবার কোন মানেই হয় না। তার চেয়ে চণ্ডী মরে যাক। না—কেন, চণ্ডীকে তো এমন দিব্যি দেওয়া নেই যে, সে মরবে না। চণ্ডী চিত হয়ে শুল। আকাশ দেখতে লাগল। এখন আকাশ ছাড়া তার সামনে পিছনে কোথাও আর কিছু নেই।

উঠোনের আকাশে একসঙ্গে অনেক ডানার শব্দে প্রথমে সুধাংশু চমকাল, তারপর কুসুম। শেষে বকুল আর মুকুল। সবারই চোখ খড়ি খড়ি, চাউনি

ঘষা। সুধাংশুর হাতে সকড়ি, কুসুমের হাতে ডালের হাতা। বকুলের চুলে চিরুনি আটকানো। আর মুকুল সবে ভেজা কাপড় বদলে নিচ্ছিল। শুকনো আধখানা ভেজা আধখানায় ঢাকা তার শরীর। সবাই আকাশ দেখতে লেগেছে। কড়া রোদে উঠোনে সুখেন দাঁড়িয়ে আছে। তার মুণ্ডুও আকাশে ঘোরানো। সে হাততালি দিচ্ছিল। গনগনে গরম নীলে ঝকঝকে এক ঝাঁক পায়রা উড়ছিল ঘূর্ণিপাকে। বাঁশের লম্বা বোমটা দারুণ দুলছিল। সুধাংশু বলল—অসময়ে ছেড়ে দিলি ?

কেউ জবাব দিল না। সবার চোখ এখন আকাশে। পায়রারা উঠে যাচ্ছে আর যাচ্ছে। নীল রঙটা সর্বগ্রাসী হাঁ-এর মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। মাথার উপর কী শত্তুর নিয়ে পৃথিবী বেঁচে আছে !

সে সময় অবনী জানালার ফাঁকে তাকিয়ে আছে উবুড় হয়ে। সুধাংশু জ্যাঠার বাড়ির ওপর তার চোখ ছিল। সুখো অসময়ে সব ছেড়ে দিলে ? কালবোশেখীর দিন—ঝড়বাদল ওঠে যদি ! আর নদীর ধারে চণ্ডীও দেখতে পায় ! পায়রাগুলোর বেশ মজা। চণ্ডীর চোখের পাতা দেখতে দেখতে ভারী হয়। তখন ভিতর দিকে সেই পায়রাগুলো উড়তে থাকে। দৃষ্টির থাবায় আস্ত আকাশটা তুলে এনে ভিতরে গুঁজে দিয়েছে।

কেবল একটা ফিরে আসছিল। সেই বোমকানা পোখরাজ হীরা। রাগে সুখেন ঢিল ছুঁড়ল। হীরা ভয় পেয়ে দূরে সরে গেছে ! ফের সুখেন ঢিল ছুঁড়লে সে আরো দূরে চলে গেল। এ বাড়ির সবাই জানল, সব পাখিই একসময় আদর নিতে ঘরে ফিরবে, কেবল হীরা পথ চিনতে পারবে না।

কবির বাগানে

গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নায় নবাবী আমলের সেই পুরনো শহরে যে না হেঁটেছে, জীবনে তার কত কী বাদ পড়ে গেছে, জানে না সে। নদীর আকাশে ভুতুড়ে চাঁদ অনেকবার অনেকে দেখে থাকবে, যার ধূসর আলোয় প্রেমিক-প্রেমিকাদের মনে হয় ইচ্ছা-মৃত্যুর শরশয্যায় নীরবে প্রতীক্ষারত—কিন্তু সেই শহরের পাশে নদীর বাঁকের মুখে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আমি যাদের দেখেছিলাম, তারা উল্টোটাই চেয়েছিল—মৃত্যু নয়, দারুণ টগবগে জীবন। তারা জীবনের তেজী

ঘাড়াগুলোর জন্য অপেক্ষা করছিল। অথচ, শেষ অবধি এসে গেল এক কালো
ংয়ের টাট্টু, তার নাম মৃত্যু।

হ্যাঁ, এইরকম কবিতা দিয়েই গল্প শুরু হল, বলা যায়। সেটাই স্বাভাবিক
ছিল। কারণ আমার এই গল্প এক কবিকে নিয়ে। তিনিই বলেছিলেন,
এই মফস্বল শহরটার পত্তন প্রাচীন নবাবী আমলে। আজ এর সারা গায়ে
ত্যুর দাঁতের দাগ। এর ইট-কাঠগুলোয় ক্ষয়ের প্রচুর রেখা। সারারাত
ারাদিন ঘুণপোকা একে কুরে-কুরে খায়। আমি তো ভয়ে ঘুমোতেই
ারি নে। ঘুণপোকার একটানা শব্দ শুনে বুক ঢিপঢিপ করে। মনে হয়,
আমারই মগজ কুরে-কুরে খাচ্ছে ওরা। তাই বড ভয় হয় বাবা, কখন কী
রে ফেলি!'

কবির বয়স ষাটের ওধারে। আমি তাঁর নামও শুনিনি কস্মিনকালে। অথচ
সই শহরে তাঁকে বিশেষ করে যুবকরা দেখছিলাম কবি বলে খাতির করে
বং তাঁর দারিদ্র্যের জন্যে সরকারের মুণ্ডুপাত করে। নদীর বাঁকের ফলে
হরটা যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে একটেরে কবির বাসস্থান। এক
াহিত্যসভায় গিয়ে অনেকটা রাতে যখন একটি ছেলের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছি,
ার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, বলছিল—'কবিকে দেখতে যাচ্ছেন নাকি? যান, দেখে
াসুন—ওই তো ওঁর বাড়ি।'

খুব অবাক লেগেছিল ব্যাপারটা। প্রথমত, একবেলার অনুষ্ঠানে আমাকে
াবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করতে দেখেই কি শহরের তাবৎ লোকের তাক
লগে গেল? এবং আমাকে চিনে রাখল? দ্বিতীয়ত, শহরের এক নির্দিষ্ট
গায়গায় পৌঁছলে ওরা কেন ধরে নিল যে আমি ওদের কবিকে দেখতে যাচ্ছি?
তীয়ত, এখানে একজন কবি আছেন, তা আমার জানাও নেই—এবং কেউ
লেও নি এর আগে। যাই হোক, সঙ্গী ছেলেটির দিকে সপ্রশ্ন তাকাতেই
দ বলেছিল, 'ও হ্যাঁ—আপনাকে বলা হয়নি স্যার, এখানে কবি জগমোহন
াড়ুজ্যের বাড়ি। ওই যে—ওখানটা।'

শুধু বলেছিলেম, 'তাই বুঝি?'

ছেলেটি বুদ্ধিমান। বলেছিল. 'আপনারা কলকাতার সাহিত্যিকরা ওঁকে
চনবেন না। তাছাড়া বড় কাগজে ওঁর কবিতা তেমন একটা বেরোয় নি।
। কিছু লিখেছেন মফস্বলের কাগজে। নিজের খরচায় খানকতক বইও বের
রেছিলেন একসময়।'

'কেমন লেখেন ?'

'তেমন কিছু না। তবে এখানে সবাই ওঁকে ভালবাসে। কবিতা পড়ে ক'জন জানিনে—কবি হিসেবে খাতির করে খুব।'

'চল না, আলাপ করে আসি।'

ছেলেটি একটু ইতস্তত করেছিল।…'যাবেন ? কিন্তু…'

'কিন্তু কী ?'

'সহজে ছাড়বেন না—ভীষণ বক-বক করেন। তাছাড়া…'

'তাছাড়া ?'

ও কেমন হেসেছিল।…'কিছু না—চলুন।'

কবি জগমোহন বাঁড়ুজ্যের বাড়ি এভাবেই আমার যাওয়া হয়েছিল। কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আর, সত্যি বলতে কী, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও আমার হল—যার ফলে জীবনকে অনেকটা আলাদা চোখে দেখতে শিখলাম।…

দু-পাশে আগাছার জঙ্গল, মধ্যে এক চিলতে সিঁথির মত রাস্তা, তারপর কবির একতলা সেকেলে বাড়িটা। ধারে-কাছে কোন বাড়ি নেই। টিমটিমে একটা বাল্‌ব জ্বলছে বারান্দায়। ঘরের ভিতরও সেইরকম আলো। ছেলেটি চাপা গলায় বলল, 'অনেক ধরাধরি করে কবির জন্যে ইলেকট্রিক লাইনটা গত বছর পাওয়া গেছে। তবে সেটা দেবুর জন্যেই। দেবু হল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের ছেলে। ও নিজেও কবিতা লেখে কি না।'

এমন কবিতাগতপ্রাণ শহরের কথা আমার জানা ছিল না। খুব খুশি হলাম। যে যুগে ফিল্মস্টার, গাইয়ে, খেলোয়াড় আর রাজনীতিকদেরই রবরবা ও খাতির, সে যুগে একজন কবিকে এত মনে রাখা নিশ্চয় বিস্ময়কর ব্যাপার।

কবি মানেই গরীবমানুষ, এটা আমাদের ভাবনায় স্বয়ংসিদ্ধ। জগমোহনবাবুর বাড়িতে বিজলী আলো দিয়ে সেই গরিবী হটানোর বদলে যেন হাট করে খোলা হয়ে গেছে। সেকেলে সরু ইটের দাঁত বের করা নোনাধরা দালানটা সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ভ্যাংচাল। বারান্দার ভাঙাচোরা দশা দেখেও খারাপ লাগল। তবে বিজলী আলো যখন দেওয়া হয়েছে, কয়েক বস্তা সিমেন্ট দিতেও অনুরাগী শহরবাসীরা কার্পণ্য করবেন না নিশ্চয়।

বারান্দায় উঠে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। একটি চৌদ্দ পনেরো বছরেরমেয়ে হাসিমুখে বলল, 'এস অমুদা।'

অমু অর্থাৎ আমার সঙ্গী ছেলেটি কিন্তু আমাকে ঠেলে দিল সামনে। মেয়েটি অবাক চোখে আমাকে দেখতে দেখতে একটু পাশ দিল। ভিতরে যেতেই কোণার দিকের খাট থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক—তাঁর মুখে ঘন বিশৃঙ্খল গাঁফদাড়ি আর মাথায় প্রচণ্ড চুল, লাফিয়ে উঠে বসলেন। তারপর বাজখাঁই চেঁচালেন, 'কে, কে? কী চাই এ্যাঁ? কী চাই এখানে?'

আমি হতভম্ব। অমু হন্তদন্ত হয়ে খাটের কাছে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল, ইনি আপনাকে দেখতে এসেছেন কবিজেঠা!'

বুঝলাম, কবি কানে কিছু শুনতে পান না। অমু বার তিনেক কথাটা বলার পর উনি একটু সংযত হলেন যেন। বললেন, 'কী কন?'

আপনকে দেখতে।'

মেয়েটি বলে দিল, 'কানের কাছে আস্তে বল অমুদা, তাহলে শুনতে পাবে।'

কবি কিন্তু শুনতে পেলেন। শুনেই মুখ ভেংচে বললেন, 'দেখতে? আমি কি চিড়িয়াখানার জন্তু—না পাঁচটা হাত গজিয়েছে যে দেখতে আসবে। ওসব মতলব ছাড়ো বাবা! সব আমি বুঝি!'

অমু মেয়েটির পরামর্শমত এবার ওঁর কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে চাপা স্বরে বলল, 'উনি একজন বড় সাহিত্যিক—কলকাতায় থাকেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

কবি আমার পা মাথা মাথাঅবধি জলজলে চোখে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সাহিত্যিক? কী নাম?'

অমু নামটা বলে দিল। তখন বললেন, 'কে জানে! আজকালকার লেখা আমি পড়ি নে! দুর, দুর! ও কি লেখা নাকি? নচ্ছারমি! বুঝলেন মশাই, আপনাদের চেয়ে ভাল কবিতা লিখতে পারে বিড়িওয়ালা পানওয়ালারা।

অমু বলে দিল, 'না কবিজেঠা, উনি গল্প-উপন্যাস লেখেন।'

কবি ফ্যাঁচ করে হেসে বললেন, 'গল্প? সে লিখে গেছে শরৎ চাটুজ্যে—তারপর আর কেউ কিছু লিখতে জানে নাকি?'

ইতিমধ্যে সেই মেয়েটি একটা মোড়া এনে দিল। 'বলল, 'বসুন দাদা।'

বসব কি না ভাবছি, কবি আঙুল তুলে ইশারা করলেন। তখন বসলাম।

সেই সময় আড়চোখে দেখলাম, ভিতরের দরজার সস্তা পর্দার ফাঁকে দুটি মেয়ের মুখ উঁকি দিচ্ছে। অমু বিছানার একপাশে বসল। কবি বালিশের পাশ থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালেন। তারপর আরামে টানতে টানতে বললেন, 'গল্প লেখা হয় তাহলে! হুঁ—ভালো। তা কলকাতা ছেড়ে এই এঁদো ভূতের শহরে কেন? প্লট খুঁজতে নাকি? দেখুন মশাই, আজকাল প্লট জিনিসটে আর পাবেন না। প্লট ছিল সে-আমলে—যখন মানুষ সৎ ছিল। আর সৎ ছিল বলেই সৎ-অসৎ-এর দ্বন্দ্ব ছিল। এখন তো সবই অসৎ—অতএব দ্বন্দ্ব নেই। তাই প্লটও নেই।'

অমু বলল, 'কবিজেঠা, ইনি আমাদের ক্লাবের ফাংশনে এসেছিলেন।'

'তোদের আবার ক্লাব আছে নাকি?'

সেই যে বিজয়া-সম্মিলনীতে আপনাকে নিয়ে গেলাম আমরা!'

'এবার কী হল? খবর দিসনি যে?'

'আপনি অসুস্থ আছেন, তাই।'

কবি খিক-খিক করে হেসে বললেন, 'নিতে এলেও কি আমি যেতাম ভাবছিস? বাড়ি ছেড়ে যাই, আর সেই ফাঁকে আমার বাগানে ভূত ঢুকে লণ্ডভণ্ড করুক। এ্যাদ্দিন বুঝতাম না যা হবার হয়ে গেছে—আর নয় বাবা! বুঝলেন মশাই, আমার বাগানের দিকে শহরের তাবৎ ভূতের বেজায় লোভ।'

পর্দার ওদিক থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বুঁচি, বাবাকে বল তো, বাইরের লোকের সামনে ওসব কী বলছেন!'

বুঁচি অর্থাৎ ঘরের মেয়েটি মুচকি হেসে কবির দিকে ঝুঁকে বলল, 'বাবা, অমিদি তোমাকে বকছে।'

কবি বললেন, 'বকছে? অমি? কেন?'

'যা-তা সব বলছ কেন?'

'কী বলছি?'

'ওই যে বাগান-টাগান—'

কবি ভীষণ হাসলেন। তারপর আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'মেয়েদের আমার সম্মানে লেগেছে, বুঝলেন মশাই? বাগান বলেছি! তা বাগান না তো কী? আমি শালা এক হতচ্ছাড়া মালী, বাগান লাগিয়েছি—ফুল ফুটিয়ে আলো করে রেখেছি—তাছাড়া কী?'

এবার ভিতর থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি মেয়ে সটান চলে এল

বর সামনে, হাত-মুখ নেড়ে বলল, 'তোমার কী হয়েছে কী? যত বয়স ড়ছে—তত অসভ্য হচ্ছ নাকি! ছিঃ! বাইরের এক ভদ্রলোকের সামনে—'

'অমি, আমাকে বকছিস?'

'হ্যাঁ, বকছি।'

'বেশ। তা চা খাওয়া না আমাদের। ওই সাহিত্যিককে দে, অমুকেও । আমরা গল্পসল্প করি।'

অমি চলে গেল তক্ষুনি। এবার এল বছর উনিশ-কুড়ি বয়সের একটি য়ে।

প্রত্যেকের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চেহারায় অপুষ্টির ছাপ আছে। তবে মেয়েটির মুখে স্মার্ট ধরনের একটা হাসি আর তীক্ষ্ণতা ছিল। সে এসে মাকে নমস্কার করে একটা খাতা আর কলম এগিয়ে ধরল।...'একটা টোগ্রাফ দিন না। কিছু লিখে দেবেন কিন্তু।'

কবি ভুরু কুঁচকে দেখে বললেন, 'সই নিবি?'

মেয়েটি ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি বকবক কোর না তো!'

কবি বললেন, 'আমার মেজমেয়ে সুমি। বি. এ. পড়ছে। আর ও হল ম—ওকে বুঁচি বলে ডাকে সবাই। মোটমাট এই তিনটি মেয়ে আমার। চি তোর কোন ক্লাস হল রে?'

বুঁচি বলল, 'ইলেভেন।'

'হুঁ—তাহলে তো অনেক এগিয়েছিস! কিন্তু তারপর?'

বুঁচি বুঝতে না পেরে বলল, 'তারপর আবার কী?'

কবি আবার ফ্যাচ করে হেসে বললেন, 'হাইজাম্প নয়তো লংজাম্প। রপর আমির মত হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে বাড়ি বসে থাকবি।'

এই সব শুনতে শুনতে আমি সুমির খাতায় সই দিচ্ছিলাম। ওপরে খলাম, 'অন্ধকার কি জানার জন্যে অন্তত একবারও ফুঁ দিয়ে আলো নেভানো চত।' এটাই আমার বেদবাক্য। অটোগ্রাফে কেউ কিছু লিখে দিতে লে এই লাইনটা আমি লিখবই। লিখে আবার অস্বস্তিতে পড়ে যাই। চাই, এ যেন একটা প্ররোচনা দেওয়া! অথচ সে মুহূর্তে ওই মুখস্থ বাক্যটাই থায় এসে যায়, নাপিত দেখলে যেমন কারো-কারো নাকি নখ বেড়ে যায়!

ওদিকে বাবার কথা শুনে বুঁচি খিলখিল করে হাসছিল। কবির মেজাজ ার হাল্কা হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। সুমি আমার মাথার পিছনে ঝুঁকে তার

খাতায় লেখা দেখছিল যতক্ষণ, কানে ও চুলে তার চাপা প্রশ্বাসের ঝাপটা লাগছিল। সে একটু সরে গেলেও সেই জায়গাগুলো সুড়সুড় করছিল। কিন্তু তার দিকে না ঘুরেও টের পাচ্ছিলাম, সে তখনও সেই বাক্যগুলো অনবরত মনে মনে পড়ে যাচ্ছে। মানে বোঝার চেষ্টা করছে নিশ্চয়। মানে বোঝা তার বয়সী শিক্ষিতার পক্ষে খুবই সোজা। তবু হয়তো ওর বিস্ময় জেগেছে কেন ওকথা লিখে দিলাম ওকে! ব্যাপারটা কি খারাপ ভাবে নেবে সুমি? আমি অস্বস্তিতে পড়ে থাকলাম। সেই সময় কবি আচমকা হাঁক দিলেন, 'এ্যাই সুমি, দেখি তোর খাতাটা!' আর ব্যস, ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ডে খিল ধরে গেল প্রায়।

সুমি বলল, 'ও তুমি কী দেখবে?'

কবি ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'দে বলছি!'

'ও তুমি বুঝবে না।'

কবি খাট নাড়া দিয়ে চেঁচালেন, 'আমি বুঝব না—তুই বুঝবি? বোবা কথা বোবায় বোঝে, তা জানিস? কবি হয়ে আমি বুঝব না, তুই বুঝবি?'

অগত্যা বিরক্ত মুখে সুমি খাতাটা ছুঁড়ে দিল। কবি সেটা আলোর দিকে ধরে তাকিয়ে থাকলেন মিনিট দুই। ঘরে ও বাইরে তখন কোন শব্দ নেই—পৃথিবীর ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে যেন। আমি একটা বিস্ফোরণ আশা করছিলাম।

কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটল না। কবি আমার দিকে হাসিমুখে ঘুরলেন। আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'আপনি খালি চোখে এখনও দেখতে পান! বাঃ'

কবি মাথা দোলালেন।...'তা আপনি যা লিখেছেন, বুঝলেন মশাই...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি আপনার ছেলের বয়সী। আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন?'

"'তুমি' বলব? বেশ।'

কবি দেখলাম, একটা বিশেষ পর্দায় কথা বললে দিব্যি স্পষ্ট সব শুনতে পান। আমি মাথা দোলালাম।...'নিশ্চয় বলবেন।'

কবি বললেন, 'তুমি যা লিখেছ—আশ্চর্য, সারাজীবন আমি তাই লিখেছি। অন্ধকার লিখেছ তুমি, আমি লিখতাম পাপ। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় পাপ করা ভাল। বোস, তোমাকে সেগুলো পড়ে শোনাই। বুঁচি, মা, খাটের নিচে থেকে তোরঙ্গটা বের কর তো!'

ই সেরেছে! এবার বুড়োর পদ্য শুনতে হবে। অমু আমার দিকে কাচু-মুখে তাকাল। আমি সুমির দিকে তাকালুম। সুমির চোখে দুষ্টুমি করছিল। তোরঙ্গটা খাটে তুলে দিল বুঁচি। সেই সময় অমি চা নিয়ে ট্রেতে। কাপগুলো পরিচ্ছন্ন ও নতুন বলে মনে হল। অমি খাটের পাশে ট্রে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল।

তারপর শুরু হল রীতিমত একটা কবিতার আসর। সে আসর শেষ হতে একটা বেজে গিয়েছিল।...

কবি জগমোহনের সঙ্গে এভাবেই আমার ভাব হয়ে গেল বলা যায়। তার পরদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁর বাড়ি নেমন্তন্ন রাখতে হল—যার দরুন কলকাতা তে বেশ দেরি হয়ে যায়।

সেদিন সকাল থেকে দুপুরে খাওয়ার সময় অবধি জোর কবিতাপাঠ ও কাব্য লোচনা হল। কবিতাগুলো ছেঁদো নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। কবির জ্ঞান খুব টনটনে। কুমুদরঞ্জন-কালিদাস রায়ের অনুগামী জগমোহন মূলত প্রাণ কবি। কিন্তু না—এসব শোনার জন্য আমি একটুও ব্যস্ত ছিলাম। কবি বলেছিলেন, বাগান বসিয়েছেন।—হ্যাঁ, সেই বাগানে ভ্রমণের গোপন নন্দ নিতেই যেন পা বাড়িয়েছিলাম। এ বাগানে তিনটি ফুল—খুব উজ্জ্বল হোক, সুগন্ধ তত থাক বা না থাক, কোথায় কী যেন রহস্য থমথম করছিল দের পাপড়ির নিচে। যেমন প্রথমে বুঁচির কথাই ধরা যাক। ওর ভাল ম নমিতা। কাল রাত একটায় যখন ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছি, কে ও পিছু ডেকে ফিসফিস করে কী বলেছিল। তারপর অমু পকেট কে কী একটা দিতেই ও দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। অমুকে জিগ্যেস করলে সছিল, 'ও কিছু না।'

তারপর সকালে যখন আমি ও-বাড়ি গেলাম, মিউনিসিপ্যালিটির য়ারম্যানের ছেলে দেবুকে দেখলাম ভিতরে অমির সঙ্গে গল্প করছে। একটু র সে বেরিয়ে গেল। কবি তখন কবিতা পড়ায় ব্যস্ত। চোখ তুললেন না।

দুপুরে খাওয়ার পর সুমি হাত ধোবার জায়গায় হঠাৎ চুপি চুপি আমাকে ন বলল, 'ফুঁ দিয়ে আলো নেভাতে বলেছেন—কিন্তু আপনি নিজে কখনও কি ভেবেছেন?'

সে আমার হাতে জল ঢালছিল। খানিকটা জল এসময় ছলকে ওর কাপড়ে গিয়ে লাগে। আমি সেই নিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠায় জবাবটার ব্যাপারে পাশ কাটানো সম্ভব হয়।

এই তিনটে প্রসঙ্গ একসঙ্গে আমার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আলো নিভিয়ে অন্ধকারের স্বাদ কি সুমি কখনও নেয় নি? হয়তো ওকে আমি খুঁচিয়ে সচেতন করে দিয়েছি বড় জোর। তাই ও যেন অস্থির হয়ে পড়েছে। আর বড়বোন অমিতা এমনিতেই গম্ভীর স্বল্পভাষিণী মেয়ে। সবসময় একা ভিতরের ঘরেই কাটাচ্ছে। সংসারের ঝক্কি একা সে সামলাচ্ছে দেখছিলাম। বুঁচি আমাকে বার বার অমুর কথা জিগ্যেস করছে। অমু নিশ্চয় এসে যাবে। যাই হোক, বাগানের মালী ভদ্রলোক অর্থাৎ কবির অগোচরে অন্ধকারের দাঁত ক্ষয়ের দাগ কেটে এ বাড়ির ভিত আলগা করে ফেলছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

জগমোহন অসুস্থ মানুষ। খাটে বসেই একা খেলেন। তারপর ভিতর থেকে আমি খেয়ে এলে বললেন, 'বলছিলাম কী, এখন ট্রেন ধরলে কলকাতা পৌঁছতে তো রাত্রি হয়ে যাবে। বরং আজ থেকেই যাও, বাবা। কাল ভোরে ট্রেনে যাবে। কেমন?'

বুঁচি উৎসাহে অধীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ দাদা, তাই থেকে যান।'

আমি বললাম, 'না না—অনেক কাজ আছে। ক্ষতি হয়ে যাবে।' অথচ ভিতর থেকে একটা প্রতিবাদ উঠে আমার কণ্ঠস্বরকে দুর্বল করে ফেলল।

কবি বললেন, 'কোন কথা শুনব না! আজ রাত্রিবেলা এক অদ্ভুত কাণ্ড হবে—বুঝেছ? তোমাকে নিয়ে চলে যাব—সোজা নদীর চড়ায়। জ্যোৎস্না আছে চমৎকার। আহা, নদীর বালিতে বসে কাব্যচর্চার মত সুখ আর কিছুতে নেই।'

অগত্যা থাকতে হল। কাব্য আলোচনা নিয়ে আমার মাথাব্যথা কোনকালেই নেই। কবির বাগানের গভীর রহস্যে তলিয়ে যাবার সাধ আরো প্রবল হল এই যা। মন্দ কী, যদি পেয়ে যাই কোন উপন্যাসের থিম।

কথা বলতে বলতে কবি চিৎ হয়ে নাক ডাকাতে থাকলেন। ভিতর থেকে অমি বলল, 'ওঁকে জিগ্যেস কর তো বুঁচি, শোবেন নাকি। শুলে বিছানা করে দে।'

খাওয়ার পর ঘুমোনো অভ্যাস আছে। বুঁচি বিছানা করে দিয়ে বেরোল।

তারপর সুমি এসে মেঝের একটু তফাতে বসল। একটু হেসে বলল, 'সত্যি ঘুমোবেন, নাকি একটু ডিসটার্ব করব?'

না—না। ডিসটার্ব আর কী! বলুন না, কী বলবেন।'

'আচ্ছা, আপনারা যা সব লেখেন, সত্যি ঘটনা—না বানানো?'

লেখকদের প্রতি সেই চিরকেলে প্রশ্ন। হেসে বললাম, 'আপনার কী মনে হয় শুনি?'

'বানানো।'

'তাহলে তাই।'

'কেন—সত্যি ঘটনা লেখেন না কেন?'

'পাচ্ছি কোথায় বলুন? পেলে তো লিখি।'

'আমি একটা দিতে পারি। কিন্তু…'

'কিন্তু কী?'

একটু ইতস্তত করল সুমি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে তাহলে দশটা টাকা দিতে হবে!' এবং বলার পর চাপা হেসেও ফেলল।

বললাম, 'এ আর কী! দেব!'

'উঁহু—আগে দিন। তারপর বলব।'

আমি রসিকতা ভেবে একটুখানি বোঝাবুঝি করলাম। কিন্তু সুমি সত্যিসত্যি টাকা না পেলে সত্যি ঘটনাটা বলবেই না। তখন ব্যাগ বের করে একটা দশটাকার নোট ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। মুহূর্তে আমাকে তাজ্জব করে ও টাকাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ব্লাউজের ভিতরে লুকিয়ে ফেলল। এসময় ওর মুখের রংটা কেমন চাপা দেখাল, শ্বাসপ্রশ্বাসও দ্রুত হচ্ছিল, যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছে ও।

এবং আমিও। ব্যাপারটা যে মোটেই রসিকতা নয়, টের পেয়ে গেছি।

কিন্তু চট করে সেটা সামলে নিয়ে বললাম, 'তাহলে বল তোমার সত্যিকার ঘটনা।'

সুমি সাদা মুখে একটু হাসল।…'মুখে বলতে লজ্জা করবে। আমার খাতায় সব লেখা আছে। খাতাটা আপনাকে দিচ্ছি।'

সে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাবার খাট ও ভিতর ঘরটা দেখিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'যেন কাকেও বলবেন না।'

তক্ষুনি একটা পাতলা ছেঁড়াখোঁড়া একসারসাইজ বুক এনে আমার হাতে গুঁজে দিল সে। তেমনি রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'খবর্দার। এখানে নয়! আপনার ব্যাগে রাখুন—ফিরে গিয়ে পড়বেন।'

খাতাটা আমি চোরের বমালের মত ভারি হাতে নিলাম। ব্যাগে ভরে ফেললাম। আমার নার্ভাসনেসটা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ব্যাগে রাখার পর দেখি সুমি পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। ভাতঘুমটা পণ্ড হয়ে গিয়েছিল—আর এল না। খাতাটা খুলে দেখার জন্য তীব্র কৌতূহল হচ্ছিল। চোখ বুজে পড়ে থাকলাম। সুমির টাকা নেওয়ার কারণটা কী? কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। ক্রমশঃ আমার মাথায় কী সন্তর্পণ একটা ইচ্ছা কিংবা লোভ জেগে উঠল। তাকে কি পাপ বলব? মনে হল, আমি একটা নিষিদ্ধ জায়গায় ঢোকার জন্যে খুব গোপনে গুড়ি মেরে এগোচ্ছি।...

বিকেল হতে না হতে কবি জগমোহন বুঁচি ও সুমির সাহায্যে একটা শতরঞ্চি, সেই ছাপানো বই এবং কবিতার পাণ্ডুলিপি বোঝাই বাক্স আর একটা হারিকেন নিয়ে বেরোলেন। লাঠি হাতে খুব আস্তে হাঁটছিলেন ভদ্রলোক। অমু নামে ছেলেটির আর পাত্তা পেলাম না। কিংবা ওদের ক্লাবের কেউ আর খোঁজখবর নিল না আমার। সেটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল।

গ্রীষ্ম বলে নদীতে জল তেমন নেই। মাঝামাঝি একফালি তিরতিরে হালকা স্রোত বইছে, পায়ের তলাটা তাতে ভেজে মাত্র। সোনালি বালির চড়ায় কবি তাঁর সম্পত্তি নিয়ে বসলেন। তারপর মেয়েদের বললেন, 'মাঝে মাঝে আমাদের চা দিয়ে যাবি। আর—খবর্দার, ঘর ছেড়ে এক পা-ও নড়বিনে। হাড় ভেঙে দেব তাহলে। সাবধান।'

সুমি আর বুঁচি আড়ালে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। তারপর শুরু হল কবির কবিতাপাঠ। আমি সিগ্রেট খাচ্ছি (কবির হুকুম নেওয়া হয়েছে) আর নিসর্গদৃশ্যে চোখ রেখেছি। মন পড়ে আছে কবির বাগানের তিনটি ফুলের দিকে। কোন পাপবোধ আর টের পাচ্ছি না। শুধু মনে পড়ছে, সুমি আমার কাছে দশটা টাকা নিয়েছে।

হয়তো আমাদের মনে এক স্বার্থপর কৃপণ বিষয়ী বুড়ো আছে। নাকি এক কুকুর আছে, যার নাকে টাকাপয়সার ঘ্রাণ মাংসের চেয়ে তীব্র। ঘুরে ঘুরে

শুধু মনে পড়ছে নোটটাকে। এ কি আমার জিত হল, না হার? সুমি কি কাল আমাকে?

ইতিমধ্যে বার দুই সুমিরা চা এনে দিয়েছিল। হাতের রেখা সন্ধ্যার অন্ধকার এখন মুছে দিল, কবি হারিকেন জ্বাললেন। অবশ্য পিছনে চাঁদ উঠছিল। নদীর বুকে খোলামেলায় হুহু হাওয়া বইছিল। শরীর আরাম পাচ্ছিল প্রচুর, কিন্তু মনে অস্থিরতা—বাগানের ফুলগুলো দুলছিল আর দুলছিল। এবং রাত্রির আদিমতা তাদের গন্ধকে হাজারগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বাগানের পক্ষে এমন আগড়হীনতার অবাধ সুযোগ কখনও আসে নি, তাই এখানে ষড়যন্ত্র চলেছে কিসের।

একসময় হঠাৎ কোত্থেকে একটা দমকা বাতাস এসে হারিকেনটা নিভিয়ে দিল। কবি অস্ফুট কাতরোক্তি করলেন, 'ওই হল তো!' তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদ দেখে বললেন, 'গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না বড্ড ধোঁয়াটে। শরৎকাল হলে দেখা যেত। তবে এখন কিছুক্ষণ বাস্তব কাব্য চাক্ষুষ করা যাক। কী বল?'

উনি বিড়ি জ্বাললেন। তারিয়ে তারিয়ে টান দিতে দিতে ফের বললেন, 'দেখছ? কী সুন্দর দৃশ্য! চাঁদ, জ্যোৎস্না, নদীর স্রোতে কেমন ঝিকিমিকি, বাহা! পৃথিবী যে এত সুন্দর, এত চমৎকার জায়গা—শালারা টের পায় না, এটাই আশ্চর্য। এইসব সময় শহরের শালারা কী করে জান? সব মালফাল খেয়ে দমাইসি করে বেড়ায়। আর বোল না বাবা। আমি একসময় পাপকে ছুঁয়ে দেখতে বলতাম, আজ পাপ এখানে আষ্টেপিষ্টে বানের জলের মত ঢুকে গেছে। কাকে বিশ্বাস করব? কাকে শ্রদ্ধা করব—স্নেহ করব? সব মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব ব্যাটা ঠক, জুয়াচোর, মতলববাজ। মেয়ে তিনটিকে যে কী কষ্টে দুহাতে আগলে রেখেছি, কহতব্য নয়। সবসময় ছোকরাগুলো হানা দেবার তালে থাকে। আমি একটাকেও বাড়ির ত্রিসীমায় পা বাড়াতে দিই না। অবশ্যি, দুএকজনের কথা আলাদা। তারা আমাকে সত্যিকার শ্রদ্ধা করে বলেই পাত্তা দিই।'

কবির এসব কথা শুনছিলাম, কিংবা শুনছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, কবির বাগানে এই জ্যোৎস্নারাত্রে কি জীবনের সেই সাদা তেজী বল্‌গাছাড়া ঘোড়াগুলো ঢুকে পড়েছে?

কিন্তু একটা কিছু বলা উচিত বলেই মুখ খুললাম।...'না, না। আপনাকে এখানে সবাই কবি বলে খুব শ্রদ্ধা করে দেখলাম।'

'কী দেখলে ?'

'শ্রদ্ধা করে সবাই।'

কবি জ্যোৎস্নায় মুখ উঁচু করে হাসলেন, 'কচু! সব আমার বাগানের দিকে চোখ রেখে কথা বলে। তুমি জান না, মেয়ে তিনটে না থাকলে কোন শালা কি ভুলেও আমার নাম মুখে নিত ? ও আমি বেশ জানি। সারাদিন শালারা এসে জ্বালাতন করার তালে থাকে। জন্মদিনে ফুল-টুল নিয়ে আসে সন্দেশও আনে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী, আমি জানিনে ? এই সেদিন একদল এসে বললে, আপনার বই বের করব—কবিতাগুলো দিন। আমি তক্ষুনি ভাগিয়ে দিলাম। বুঝলে কি না—ওই ছেলে আমার বাগানে ঢোকার মতলব! থুঃ থুঃ! সব পচে ভুটভুট করছে বাবা। এ এক অভিশপ্ত শহর সেজন্যেই তো ওই কবিতাটা লিখেছি :

বাগানে আমার ফুটিয়াছে ফুল
করিয়াছে রূপে আলো
গন্ধে মাতিল চৌদিক তাই
আসিছে ভ্রমর কালো।'

কবিতাটা বলার পর হঠাৎ 'আসছি' বলে লাফ দিয়ে উঠলেন জগমোহন লাঠিটা নিয়ে নড়বড় করে পা বাড়ালেন। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'কী হল হঠাৎ ?'

'আসছি। তুমি বোস তো বাবা!' বলে উনি জ্যোৎস্নায় কেমন হন্তদন্ত হয়ে এগোতে থাকলেন। আমার ভয় হল, পাড়ে ওঠার সময় আছাড় খেয়ে না পড়েন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে আছি। তারপর কবির ভাঙা গলায় চিৎকার শুনতে পেলাম। কিছুটা দূরে মেয়েদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছেন। আমি আর বসে থাকা সঙ্গত মনে করলাম না। সব পড়ে রইল। এগিয়ে গেলাম কিন্তু কাছাকাছি কোথাও দেখতে পেলাম না ওঁকে। হতভম্ব হয়ে ওঁর বাড়িতে গেলাম। কিন্তু বাড়ি একেবারে আলোবিহীন। একটা পোড়ো হানাবাড়ির মত দেখাচ্ছে। ভয় হল, অশরীরি ভূতগুলো আমাকে পেয়ে বসবে।

না—সারা শহর অন্ধকার, অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফেল যাকে বলে। তবে অন্ধকার বলা ভুল, জ্যোৎস্নায় ভাসছে শহরটা। তাকে ধূসর কবরখানা দেখাচ্ছে। কবির বাড়ির দরজায় ডাকলাম, 'সুমি, সুমি!' কোন সাড়া পেলাম না। ব্যাপার কী কোথায় গেল সব ?

আস্তে আস্তে আবার নদীর দিকে গেলাম। চড়ায় নামবার সঙ্গে সঙ্গে কাকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। একি গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে? অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম, 'কে?' অমনি মূর্তিটা আমার দিকে এগিয়ে এল।

ঠাহর করে দেখি, সুমি। সে হাঁপাচ্ছে। আমাকে দেখে রুদ্ধশ্বাসে বলল, বাবা ডাকছিলেন না? কই?'

'কী ব্যাপার বল তো তোমাদের? কোথায় ছিলে?'

সুমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওইখানে—বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।'

'সুমি!'

'আমি যাই! বাবা ক্ষেপে গেছে।'

'সুমি, শোন!'

'আঃ, যা বলবার, তাড়াতাড়ি বলুন।'

'বুঁচি, তোমার দিদি—ওরা সব কোথায়?'

'কেন? বাড়িতে নেই?'

'না।'

'তাহলে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমি যাই!'

আমার সেই চাপা লোভ এতক্ষণে আচমকা বেরিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড হঠকারিতায় ওর একটা হাত ধরে ফেললাম। সুমি একটা অদ্ভুত লাস্য দেখিয়ে আমার বুকে ভেঙে পড়ার ভঙ্গীতে ছিটকে এল।...আঃ, কী হচ্ছে? বাবা এসে পড়বে যে!'

অবশ্য সুমিকে আমি চুমু খেতে পারতাম, কি না...কিন্তু পরমুহূর্তে কী একটা ঘৃণা, নাকি আক্রোশ, নাকি অসহায়তা, আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলল—মাথায় বাড়ি মারার মত আঘাতে নেতিয়ে দিল। কবির বাগানের এই দৃশ্যটিকে জ্যোৎস্নার রাতে খুব ধূসর পুরনো একটা বাতিল জিনিস মনে হল। তাছাড়া, আলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে অন্ধকারের স্বাদ পাবার মত সাহসী ও ঝুঁকি নেওয়ার মত পুরুষ হয়ত নই। যা খাতায় লিখেছি, তা নিছক বাণী। হাত ছেড়ে দিলাম। সুমি চলে গেল।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিলাম। সেই জায়গাটা এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন হল দেখছি। খুঁজতে খুঁজতে একখানে গিয়ে দেখি, কে একজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

কবি জগমোহন! কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! কী ব্যাপার? এখানে কী করছেন?'

কবি কোন জবাব দিলেন না। তখন দেখি, আশ্চর্য, ভদ্রলোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে এখানে কাঁদছেন।

কী বলা উচিত, মাথায় এল না। শুধু ডাকলাম, 'কবি!'

জগমোহন মুখ ফেরালেন!…'কী বললে? কবি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জগমোহন আস্তে আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ—কবিই বটে। কবি ছাড়া প্রেম ভালবাসাকে আর কে-ই বা শ্রদ্ধা করবে? আমি প্রেমকে খুব বড় মূল্য দিই বুঝলে বাবা? কিন্তু না না—যা ঘটছে, তা তো প্রেম নয়, মোহ—রক্তমাংসের লোভ। তা কুৎসিত। তা পাপ। আশ্চর্য, আমিই শখ করে বলতাম, পাপকে মাঝে মাঝে ভালবাসতে হয়। অথচ বাস্তবে তা আজ সইতে পারলাম কই। এখন জানলাম, শুধু মিথ্যের বোঝা নিয়ে আমরা জীবন কাটাই। শেখানে একরাশ বাজে বুলি মাত্র। তা না হলে কেন একাজ করে বসলাম? কেন আমি অমিকে—ও হো হো!'

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন জগমোহন। ভাঙা গলায় ফের বলে উঠলেন, 'ওঃ, অমি—আমার বাগানের সেরা ফুল! তোমরা আমাকে ফাঁসি দাও।'

বিকট এই চিৎকার। কিন্তু নদীগর্ভে উদ্দাম বাতাসের দরুন দূরে কেউ হয়তো শুনতে পাচ্ছিল না। ওঁকে সামলানো উচিত ভেবে আমি যখন ওঁর হাত ধরলাম, তখনই দ্বিতীয়বার চমক খেলাম। ওঁর সাদা পাঞ্জাবির হাত জুড়ে এবং হাতে থকথকে বা চিটচিটে কিছু লেগে রয়েছে। পরক্ষণে ওঁর পায়ের কাছে চোখ গেল। অমনি জ্যোৎস্নায় ঝকমক করে উঠল একটা লম্বা বাঁকানো কিছু…তা যে ইস্পাতের কোন ধারালো অস্ত্র, বুঝে নিতে একটুও দেরী হল না। গলার স্বর চাপা হয়ে গেল আমার। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'আপনি কাকে খুন করে এলেন জগমোহনবাবু?'

কবি জগমোহন রক্তাক্ত হাতে নাক ঝেড়ে বললেন, 'অমি—অমিকে!'

—

কাঁটলে ঘাটের বুড়োবাবু

হুজুর পাটনীর ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটাকে এই সেদিনও রেললাইনে কয়লা কুড়োতে দেখেছেন আদিনাথ। খালি গায়ে ছেঁড়া হাফপেণ্টুল পরে ঘুরত। সব সময় নিচের দিকে চোখ, সামনে বা পিছনে হুইসল দিতে-দিতে কালো রঙের সর্বনাশটা এগিয়ে আসছে, সে খেয়াল নেই। স্টেশনঘরের উঁচু বারান্দা থেকে আদিনাথ বাঁজখাই চেঁচাতেন—এ্যাই! এ্যাই!

আদিনাথের এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। রেললাইনের দিকে চোখ পড়লে প্রথমে ওই মেয়েটাকেই খুঁজতেন। আর চাঁদঘড়ি খালাসি সিগন্যালের হাতল ঘ্যাচকা টানে নামালে সেই শব্দে আদিনাথ চমকে উঠতেন। প্রায় গেল-গেল ভঙ্গীতে বেরিয়ে এসে আপ-ডাউন ডাইনেবাঁয়ে ঘুরে সিংহাবলোকন করতেন। ছোটবাবু অর্থাৎ এ এস এম শিবশম্ভু বলতেন—বড়বাবুর খুলির ভেতর গণ্ডগোল আছে।

মেয়েটা কী আনমনা ছিল ভাবা যায় না। কিন্তু তার চেয়েও লক্ষ্য করার ব্যাপার আদতে ও কুড়োত কী? আদিনাথ নিচু প্ল্যাটফর্মে এদিকওদিক দৌড়াদৌড়ি করে ডবলিউ টি পাকড়াতে গিয়ে আড়চোখে দেখতেন ছোট্ট ঝুড়িতে কয়লা আছে নামে মাত্র—খালি রঙীন কাগজের টুকরো, বাতিল টিকিট আর সিগারেটের রাংতা কিংবা ছেঁড়াফাটা প্যাকেট। বাড়ি ফিরে বাপের কাছে নিশ্চয় ঠেঙানি খায়। আদিনাথ ভাবতেন। খাওয়া উচিত বই কি। ভাগ্যচক্রে আদিনাথ স্টেশনমাস্টার না হয়ে পারঘাটার হুজুর পাটনী হয়ে জন্মালে কী নামপেঁদানি পেঁদাতেন চুলের ঝুঁটি ধরে, ভাবতে হাত নিসপিস করে এবং তাঁর ন্যাড়া রুখোসুখো শরীর সিঁটিয়ে যায়। কচি খুকীটি তো নয়। ধিঙ্গি হয়েছে রীতিমতো। কদমতলায় বসে গ্যাংম্যানরা আজকাল চোখ নাচিয়ে পাথরকুচি ছোড়ে বুকের দিকে। আদিনাথ তাও লক্ষ্য করতেন। সামনে এলে ধমক দিতেন, ভাগ! ভাগ এখান থেকে। ভাগ বলছি।

পাটনীর মেয়েটা তাঁকে গ্রাহ্যই করত না। পারঘাটায় কখনও গেলে আদিনাথ হুজুরকে শাসাতেন—তোমার মেয়েটা কবে চাকার তলায় যাবে হুজুর। ওকে বকে দিও। তো যেমন মেয়ে, তেমনি তার বাপ। হলুদ দাঁত বের

করে হুজুর পাটনী বলত—ভাববেন না মাস্টেরবাবু। সেদিকে বড্ড সেয়ান আপনাদের আশীর্বাদে।

কিন্তু কিছুতেই বলতে পারতেন না—মেয়েটাকে একটা ফ্রক-ট্রক কেন কিনে দাও না হে? আসলে এদিককার রকমসকমই আলাদা। ধিঙ্গি-ধিঙ্গি গেঁয়ে মেয়েদের খালি গায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। মেঘে মেঘে বেলা বেড়েছে সে-হুঁশ তাদের নিজেদেরও নেই, বাপমায়েদেরও নেই। অথচ্যে ক অক্ষ গোমাংস ভূতপেবেতের জায়গা। টিকিট কিনতে পর্যন্ত দরাদরি করে অনেকে ভাবা যায়? আদিনাথ কত ছোট-বড় স্টেশনে থেকেছেন, এমন স্টেশন থাকতে পারে কল্পনাও করেন নি।

লুপলাইনের এ স্টেশনটা সদ্য হয়েছে। আগে ছিল হল্ট। এলাকার জনপ্রতিনিধি যেন আসলে রোয়াব দেখাতেই খোদ দিল্লিকে সাধাসাধি করে নাকি এই কাণ্ডটি বাধিয়ে বসেছেন। এক পয়সা আয় নেই রেলের। ভাগ্যে ভোগায় যাত্রী জোটে কদাচিৎ দু-চারজনা। সেও মামলাবাজ, নয়তো ছানার কারবারী জনাদুত্তিন ঘোষের পো। তবে হ্যাঁ, জ্যান্ত যাত্রী যাই জুটুক, এবেলা ওবেলা মড়া-যাত্রী জুটবেই জুটবে। ট্রেন আসতেই বেমক্কা আচমকা ফাটানে চেঁচানি শোনা যাবে—বলো হরি। হরিবোল। বলো হরি। হরিবোল।

প্রথম-প্রথম ভড়কে যেতেন। পরে ঠাহর হয়েছিল ওই তো পেছনে শ্মশানঘাট গঙ্গার পাড়ে। তার পাশে পারঘাটা। কাজেই কাঁটলেঘাট নামে গণ্ডগোল নেই। কিন্তু বলিহারি রেলের বাকচাতুরী! হলুদবোর্ডে লেখা আছে: কাঁটালিয়াঘাট রোড! আদিনাথ এসেই এদিকওদিক হাতড়ে রোড খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। পরে শুনেছেন, সত্যি সত্যি একটা রোড আছে। তবে সেটা মাগঙ্গা পেরিয়ে কমপক্ষে এক ক্রোশ অড়হরক্ষেত, পাটক্ষেত আখের ক্ষেত একটা মজাহাজা ঝিল ইত্যাদি পেরিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেও এক ধাঁধা। ওটার সরকারী নামে মোটেও রোডটোড এমন ফালতু শব্দ নেই। ওটা হল গে ন্যাশনাল হাইওয়ে নং চৌতিরিশ! দুচ্ছাই! আদিনাথ দুঃখে হেসেছিলেন। সত্যি বড় আজব জায়গা এই কাঁটলেঘাট। এখানে নাকি সবাই মড়া। চাঁদঘড়ির কাছে শোনা কথা—কাঁটলেঘাট যাচ্ছি বললে লোকে ফিক করে হেসে বলবেই বলবে বালাই ষাট! এই বয়েসে? রেলের কলিগদের সঙ্গে দেখা হলে তাই আদিনাথও হাসতে-হাসতে বলেন—কাঁটলেঘাটের মড়া হয়েছি। মড়ার আবার ভালমন্দ থাকা কী!

আদিনাথ বরাবর কিঞ্চিৎ নীতিবাগীশ মানুষ। তাই এখানে এসে বিস্তর চোট খেয়েছিলেন এবং কালক্রমে সামলে উঠেছিলেন। পরে আর রাতের দিকের গাড়ি এলে একচোখো লণ্ঠনের আলোয় প্ল্যাটফর্মের দু মুড়ো দৌড়াদৌড়ি করে পা খুঁজে বেড়াতেন না। বলতেন—আমি কি পক্ষিরাজ ঘোড়া যে মাঠজঙ্গল ভেঙে ডবলিউ টির পেছনে উড়ব? ওসব শিবশম্ভু কিংবা চাঁদঘড়ি পারে তো করুক। চাঁদঘড়ি খালাসি পুরনো লোক। সে ওসবে নেই। একদঙ্গল শুওর নিয়েই ব্যস্ত। লাইনের ওপাশে নয়ানজুলির জলেকাদায় রাত-দুপুরেও চিলেচেঁচানি শোনা যেত—যা চাঁদঘড়ির, না তার শুওরের, আদিনাথ বুঝতে পারতেন না। আর শিবশম্ভু নতুন বিয়ে করেছে। নতুন কোয়ার্টারে নতুন বউ। তাকে গণ্য করেন না আদিনাথ।

কাজকর্ম কম। হাতে অঢেল সময়। নিঃঝুম খাঁ খাঁ স্টেশন। কাছাকাছি বসতি নেই। থাকবার মধ্যে একটু তফাতে ওই মাগঙ্গার পারঘাটার ধারে কয়েকটা কুঁড়েঘর। কাঁটলে গ্রামটা বেশ দূরে। পারঘাটার ওপাশে শ্মশানেও একটা আটচালা আর টালির ঘর আছে। শ্মশানের ঘাটবাবুর আখড়া। আদিনাথ গঙ্গাস্নানে কিংবা অবরেসবরে গিয়ে ওদিকটায় ঘোরাঘুরি করে আসতেন। নেই কাজ তো খই ভাজার মতো যা কিছু চোখে পড়ত খুঁটিয়ে দেখতেন। লোক দেখলে যেচে আলাপ করতেন। এবং এই করতে করতেই মন বসে গিয়েছিল এখানে। অভ্যাসে সব সয়। কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার, নিজের অজান্তে আদিনাথ চুলদাড়ি ছাঁটা বন্ধ করে শেষটায় নিজের চেহারাকে সন্ন্যেসী করে তুলে ছিলেন। ঘাড় পেরিয়ে গিয়েছিল চুলের ধারা। দাড়ির ডগা নাইকুণ্ডল ছোঁয়া-ছোঁয়া অবস্থা হয়েছিল। আর এই দেখে লোকেরা তাঁকে বুড়োবাবু বলতে শুরু করেছিল। দেখাদেখি শিবশম্ভু কিংবা তার বউ মিনতিও বলেছে বুড়োবাবু। আদিনাথ মনে মনে রাগতেন। মুখে হাসতেন। কিন্তু শেষ অব্দি এমন কী হুজুর পাটনীর আনমনা ধিঙ্গি মেয়েটাও তাকে বুড়োবাবু বলে ডাকতে ছাড়ল না। প্রথম-প্রথম নিরাপদ দূরত্বে কাঁচুমাচু মুখে বলত—ও বুড়োবাবু, একটা টিকিট দাও গো!

আদিনাথ তাড়া করতে গিয়ে হেসে ফেলতেন।—এঁ্যা? আমায় বুড়োবাবু বলছিস? আমি কি বুড়ো? ছাখদিকি, আমার চুল পেকেছে, না দাঁত ভেঙেছে?

আদিনাথ চুলের ডগায় স্প্রিং বানিয়েছিলেন শেষঅব্দি। সেই স্প্রিংগুচ্ছ

আলতো লম্বা আঙুলে তুলে এবং দাঁত দেখিয়ে বলতেন—এ্যাই বাঁদরমুখী! আমি কি বুড়ো?

মেয়েটার এককথা।—একটা টিকিট দাও না বুড়োবাবু।

আদিনাথ অগত্যা বলতেন—টিকিট? কী করবি টিকিট, শুনি?

মেয়েটা দূরের দিকে চঞ্চল চোখ রেখে বলত—হুই কাটোয়া যাব রেলগাড়িতে চেপে।—আমার খালা (মাসি) আছে।

আদিনাথ বলতেন—তা হ্যাঁ রে মেয়ে, রেলগাড়িতে কখনও চাপিসনি বুঝি?

মাথাটা জোরে দোলাত। রুক্ষ কটা রঙের চুল উড়ত গাঙ্গেয় বাতাসে। আদিনাথের মনটা নরম হয়ে যেত। এবং ঠিক এই সব সময় তাঁর খুলির ভেতর কিছু অদ্ভুত ইচ্ছে কিলবিল করে নড়ত। ওকে যদি একটা রংচঙে ফ্রক কিনে দিতে পারতেন! পরমুহূর্তে বেজায় লজ্জা পেয়ে ভাবতেন—আ ছি ছি! আমি কি কিছু খারাপ কথা ভাবছি? ধরো, আমি যদি বিয়েটিয়ে করেই ফেলতুম এবং একটা মেয়ের বাপও হতুম—হতুম কি না? তাহলে?

সবাই লক্ষ্য করত, কাঁটালেঘাট রোডের স্টেশনবাবু আপন মনে কী সব বিড়বিড় করেন। ঠোঁট নড়ে। দূরের দিকে তাকিয়ে কার দিকে ভ্রূ কুঁচকে যেন ধমক দেন নিঃশব্দে। আর চাঁদঘড়িও আড়ালে ছোটবাবু শিবশম্ভুকে বলত—আমাদের বুড়োবাবুর মাথায় ছিট আছে। তাই না ছোটবাবু? শিবশম্ভু বলত—সেটা এ্যাদ্দিনে বুঝলি তুই?

পারঘাটার দিকে গেলে লোকেরা আদিনাথকে দেখে কেন মুচকি হাসত, প্রথম প্রথম বুঝতে পারতেন না আদিনাথ। পরে টের পেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রাহ্য করতেন না। আর তাঁকে দেখলেই হুজুর পাটনী বাঁশের মাচায় ছেঁড়া-খোঁড়া কম্বল ভাঁজ করে বিছিয়ে বলত—আসুন মাস্টেরবাবু। বসুন। গঙ্গাদরশন করুন। হ্যাঁ গো, আজ না কাল অমাবস্যে পড়বে বলুন দিকি?

হাসতেন আদিনাথ।—তুমি মোছলমানের পো। অমাবস্যা নিয়ে করবে কী হে হুজুর?

হুজুর কপালে জোড়া হাত ঠেকিয়ে বলত—আই বাপ রে বাপ! সে কী কথা গো মাস্টেরবাবু? ও হল গে শাস্তর। গঙ্গাপুজোর দিন বিষ্টিবাদলা হবেই লক্ষ্য করেছেন—না করেন নি? তারপরে মশাই রথযাত্রার দিন? ইদিকে আকাশের অবস্থাটা দেখুন অনগ্র্ কয়ে। নামুতে মা ওপরে বাবা। মা শুকিয়ে

খটখটে হচ্ছেন। বাবার চোখে আগুন। হ্যাঁ গো, ই কলহ-খিচখিচি কবে মিটবে, সে কথাটাই তো জিগ্যেস করছি। ছিক্কিত লোক। পাঁজি কী বলছে তাই বলুন দিকি?

সেবার প্রচণ্ড খরা হয়েছিল বটে! গঙ্গা শুকোলে হুজুর পাটনীর রোজগার বন্ধ। এই অখদ্যে ঘাটে একে তো লোক পারাপার খুব কম। জল শুকোলে তার পক্ষে আরও বিপদ—টাকাগুলো গচ্চা। অনেক ধরে পাকড়ে ঘাটের ডাক পেয়েছে। ঘুষঘাষ সমেত ওর হিসেবে সাড়ে তেরোকুড়ি। হুজুর কপাল চাপড়ে ফের হা হা করে হাসত—কবে দেখবেন কাঁটলেঘাটে জুটলে যা হয় তাই হয়েছি। পিঠে শকুন নিয়ে উবুড় হয়ে মাগঙ্গায় ভাসছি। এ হুজুরকে জাতভাই ছোঁবে না মাস্টেরবাবু।

আদিনাথ জিজ্ঞেস করতেন—কেন হে? কী দোষ করেছ তুমি?

—দোষ? আকাশে চোখ তুলে পাটনী বলত। দোষ না করি, গোনাহ করেছি।

—বলই না বাবা, করেছটা কী?

—সে আনেক কথা মাস্টেরবাবু। বলি কাকে, শোনেই না কে? শোনাই খালি ওই মাগঙ্গাকে—তেনার দয়ায় কোনোগতিকে বেঁচে আছি। তেনার কোল না পেলে কবে মুখে লোহু (রক্ত) উঠে মারা পড়তুম।

এই সব বলে ফোঁসফাঁস করে নাক ঝাড়ত হুজুর পাটনী। তারপর লম্বা-চওড়া কাঁচাপাকা গোঁফটা মুছে মাথার ফেট্টি ফের জড়িয়ে হাঁক দিত—ইরানী! এ্যাই ইরানী! একবার ইদিকে আয় তো বিটি!···

আদিনাথ বলেছিলেন—মেয়ের নাম ইরানী বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মাস্টেরবাবু। যিবারে কলাবেড়ের ঘাটে ছিলুম সিবারেই মেয়ের জন্ম হল। ঘাটের ওপর চটান ছিল। সিবার ওই চটানে একদঙ্গল হাঘরে ইরানী এসেছিল। জানেন তো? ওনারা দাওয়াইপাতিয়া দেয়, হাত গুনতেও পারে। পোয়াতি বউটার হাত গুণে বললে, মেয়ে হবে। তা বললে বিশ্বেস করবেন না মাস্টেরবাবু···

—করব। করব।

—আজ্ঞে, ঠিকঠাক সেই মেয়েই হল। অবিকল ওনাদের মতন নাক মুখ চোখের গড়ন। দেখুন না—ভাল করে দেখুন। পাটনী ফের হাঁক দিয়েছিল—এ্যাই ইরি! কথা কানে যায় না হারামজাদী?

মেয়েটা খোলামেলা উঠোনটুকুতে বসে আছে দুপা ছড়িয়ে। লাউগাছের গোড়ায় রঙীন সেই সব কুড়োনোবাড়ানো জিনিসপত্তর দিয়ে দোকান সাজিয়েছে। নাকি রঙের বাজার সাজিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে আছে? আদিনাথের চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। বলেছিলেন—আচ্ছা থাক থাক। দেখতে তো পাচ্ছি।

বিটির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বাপ বলেছিল—মোনে হয় না মাস্টেরবাবু? গায়ের অঙটাও দেখুন। নেগাৎ গরীব-গুরুবো ছোটলোকের মেয়ে তো? ওদেহাওয়ায় ঘোরে। দুবেলা দানাটা পানিটা জোটে না ঠিক মতো—তাই অঙটা পুড়ে গিয়েছে। আপনার বেজ্ঞ দিষ্টি। দেখুন, ভাল করে দেখুন।

আদিনাথ আনমনে বলেছিলেন—হুঁউ দেখছি।

—মোনে হয় না মাস্টেরবাবু?

আদিনাথ তাকে বুঝি খুশি করতে চেয়েই একটু হেসে বলছিলেন, কেমন করে হল হে হুজুর? এঁ্যা?

—সেটা এক গোহ্য কথা মাস্টেরবাবু।

—এঁ্যা? গুহ্যকথা? বলো কী।

—আজ্ঞে, পোয়াতি মেয়েরা বিয়োবার ঠিক-ঠিক আগে যখন বেথা ওঠে, তখন যে মুখখানা ভাবে সেই মুখ নিয়ে ছন্তান জন্মায়। হুজুর তার গুহ্যতত্ত্ব চাপা গলায় জানিয়েছিল। মাস্টেরবাবু, ওনারা হাতটাত দেখে দাওয়াইপাতি দিয়ে পাঁচপা গিয়েছে না গিয়েছে, বেথা উঠল।

—তাই বুঝি?

হুজুর প্রায় চেঁচিয়ে একটু নড়ে বসেছিল।—হ্যাঃ পাঁচপা গিয়েছে না বেথা উঠেছে। আর মায়ের মোনে ত্যাখনও সেই আঙাপানা সোন্দর মুখখানা ভাসছে। এবারে হিসেব করুন। দুয়ে দুয়ে চার হল কি না?

—হল।

আদিনাথ হাসতে হাসতে উঠে এসেছিলেন। পরে মনে হয়েছিল, পাটনীর কথায় কিছু সত্য আছে বটে। সত্যি মেয়েটির চেহারা একটু অন্যরকম। এলাকার যা সব মুখের আদল, তার সঙ্গে মেলে না যেন। নাক মুখ চোখ, চুল, গায়ের রঙ। তারপর হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন, হুজুর পাটনী হাঘরেদের একটা মেয়ে চুরি করে আনে নি তো? হাঘরেরাই নাকি দল বাড়াতে ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে উল্টোটা হওয়া অসম্ভব নয়। আর ওই যে বলল,

পাপ বা গোনাহ করেছে বলে জাতভাই ওর মড়া গোরে দেবে না। ব্যাপারটা জানা দরকার।

সেই সময় একদিন কাঁটলে গ্রামের জহুর ব্যাপারী এল স্টেশনে। টিকিটের জানালার রডে নাক ভরে দিয়ে সে অভ্যাস মতো বলল—সালাম বুড়োবাবু। ডাউন গাড়ির লেট আছে নাকি?

জহুরকে দেখেই আদিনাথের মনে পড়ে গিয়েছিল হুজুর পাটনীর কথাটা। ডেকে বললেন—জহুর নাকি হে? কাটোয়া যাবে বুঝি? গাড়ির অনেক দেরি এখনও। এস, ভেতরে এস।

জহুর ব্যাপারী ভেতরে এল। আহ্লাদে গদ্‌গদ। এখানকার লোককে একটু খাতির দেখালেই গলে যায়। টুল দেখিয়ে আদিনাথ বললেন—বসো জহুর। খবর বলো।

তারপর একথা-ওকথার পর আদিনাথ পাটনীর কথা তুললেন।—হ্যা হে জহুর, পারঘাটার ওই হুজুরকে তো চেনো।

জহুর একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল—খুব চিনি। টাকা পয়সা ধার দিয়েছেন নাকি? খবর্দার বুড়োবাবু। মহা হারামি লোক। মনে করুন, টাকা গঙ্গায় দিয়েছেন।

—না হে, না। হুজুর টাকাকড়ি চায় নি কোনোদিন। তো লোকটার বাড়ি কোথায় বলো তো?

জহুর ব্যাপারী নাকমুখ কুঁচকে বলল—ওর বাড়ি? কোথায় বাড়ি কী বিত্তোন্ত কে জানে? তবে শুনেছি, নিমতিতের ওদিকে কোথায় থাকত। হাঘরেদের একটা মেয়ে নিয়ে ভেগেছিল। তারপর হিল্লিদিল্লি ঘুরে জান বাঁচিয়ে বেড়াত। হাঘরেরা তো সহজ লোক নয়। পেলে কলজেয় চাকু ঢুকিয়ে দেবে। তো ওই করে ছত্রিশঘাটে ঘুরে শেষে কলাবেড়ের ঘাটে নৌকায় মাঝি হয়েছিল। সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না বুড়োবাবু, শুনেছি, কলাবেড়ের ঘাটে থাকার সময় মেয়েটা খুন হয়ে যায়।

আদিনাথ চমকে উঠেছিলেন—খুন? কে খুন করল?

—সেটা নাকি জানা যায় নি। তবে কলাবেড়েওলার সন্দ নেই হাঘরেরাই হয়তো এতদিনে সুলুক-সন্ধান পেয়ে জাতনাশা মেয়েটাকে চাকু মেরে গিয়েছিল।

আদিনাথের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আহা চে!

জহুর বলেছিল—হ্যাঁ, শুনলে কষ্ট হয়। তবে আসল কথাটা কী জানেন

বুড়োবাবু? হুজুর বউয়ের লাশটা গোরে দেয় নি। গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। জাতভাইরা চটে আর না চটে বলুন? তাছাড়া মোছলমান ও কোন কম্মে? না নামাজ, না রোজা। ভুলেও পশ্চিমমুখো হয় না। চালচলনে একেবারে হাষরে নিচু জাত। বিটিটার অবস্থা তো স্বচক্ষে দেখছেন।

আদিনাথ বলেছিলেন—দেখছি।

চাঁদঘড়িকে টিকিট কাটার ঘণ্টা বাজাতে বলে আদিনাথ বারান্দায় গেলেন। জহুর পাশে গিয়ে শেষ কথা বলার মতো বলে গেল—ওই বিটি যদি কাঁটালেঘাটের এক বেশ্যা না হয়, আমার কানদুটো কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন।...

জহুরের কথাটা মনে পড়ে যেত মেয়েটাকে দেখলেই। আদিনাথের মনে একটা অসহায়তার দুঃখ খচখচ করে বিঁধত। খালি ভাবতেন, ওই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটা—টাটকা ফোটা ফুলের মতো, নিষ্পাপ আনমনা আর নির্বোধ মেয়েটা কি সত্যি নষ্ট হয়ে যাবে? আপন মনে ঘাড় নাড়তেন আদিনাথ—এ ঠিক না, এ ঠিক না। হুজুর পাটনীর এসব ব্যাপারে জ্ঞানগম্যি কম থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া সে গরীবগুরবো ঘাটমাঝি। সকাল থেকে সন্ধে নৌকো বেয়ে দিন কাটায়। রাতে শ্মশানঘাটার ঘাটোয়ারীজীর আটচালায় গিয়ে নেশাভাং করে। মেয়ে নিজে-নিজে বড়ো হচ্ছে। কোথায় তীক্ষ্ণ হুইসল দিতে দিতে কালো এক সর্বনাশ ছুটে আসছে, সে-খেয়াল ওর নেই। এটাই যত ভয়ের কথা।

নিচু প্ল্যাটফর্মে একটা কদমগাছ আছে। তার তলায় বসে দুপুরবেলা গ্যাংম্যানরা জিরোত। আর ইরানীকে দেখে দল বেঁধে চেঁচাত—ইরি! এ্যাই ইরি! অশ্লীল ফচকেমি করত। এমন কী শিবশম্ভুও কেমন চোখ নাচিয়ে কথা বলত ওর সঙ্গে। রাগে রি রি করে জ্বলে মরতেন আদিনাথ। ইরানী আনাচেকানাচে এলে বাজখাঁই গলায় ধমক দিতেন—এ্যাই! এ্যাই! আবার এসেছিস তুই? ভাগ, ভাগ এখান থেকে!

ইরানী আর তত ভয় পেত না বুড়োবাবুকে। ফিক করে হেসে একটু তফাতে সরে যেত। শিবশম্ভু হাসতে হাসতে বলত—ওকে দেখলে তাড়া করেন কেন বলুন তো দাদা? কিছু চুরিচামারি করে গেছে নাকি?

আদিনাথ গোমড়া মুখে শুধু বলতেন—ওদের আস্কারা দিতে নেই।

ব্যাপারটা আরও কিছুটা গড়িয়েছিল। দেখতেন, প্রায়ই ইরানী প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকটা থেকে আপ কিংবা ডাউন ট্রেনে সুড়ুৎ করে উঠে পড়ছে। তক্কে-তক্কে থাকতেন আদিনাথ। দেখতেন, পরের গাড়িতে তেমনি শেষ দিকের কামরা থেকে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে নেমে এদিকওদিক তাকাতে-তাকাতে তারের বেড়া গলিয়ে কেটে পড়ছে। হেসে ফেলতেন আদিনাথ। মজা করার জন্যে চেঁচাতেন—পাকড়ো পাকড়ো! ইরানী নয়ানজুলি ডিঙিয়ে ততক্ষণে পারঘাটায় চলে গেছে।

কিন্তু এমন করে কোথায় যায় মেয়েটা? নিশ্চয় পরের, কিংবা তার পরের স্টেশন অব্দি গিয়ে ফিরে আসে। আপনা আপনি বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের এ স্বভাব আদিনাথ সব লাইনেই দেখেছেন। হুজুর পাটনীর মেয়েটা নতুন কিছু করছে না। অথচ আদিনাথের কেমন কষ্ট হয়। খালি ভাবেন চোখের ওপর একটা সরল মেয়ে খারাপ হয়ে যাবে।

একদিন কথায়-কথায় শিবশম্ভুকে বললেন আদিনাথ—হ্যা হে শম্ভু, একটা কথা বলছিলুম।

—বলুন দাদা!

আদিনাথ মিথ্যা করে বললেন—হুজুর পাটনী আমার কাছে এসেছিল। মেয়ের জন্যে একটা পুরনো জামা চাইতে। তা আমি বললুম, আমি তো সংসারী লোক নই বাপু। মেয়েছেলের জামাটামা কোথায় পাব? তুমি বরং ছোটবাবুকে চেও।

শিবশম্ভু হাসল।—আমার তো মেয়ে নেই দাদা! থাকলেও সে জামা ইন্নির গায়ে হত না।

আদিনাথ খুব হাসলেন।—কেন? বউমার একটা ছেঁড়াখোড়া ব্লাউস থাকলে দিও না? গা ঢাকা নিয়ে কথা। হুজুর দুঃখ করে বলছিল, মেয়েটা সোমত্ত হচ্ছে। একটা জামা জোটাতে পারে না।

শিবশম্ভু হঠাৎ জানলার দিকে ঘুরে বলে উঠল—হা দাদা, প্রব্লেম সলভড। ওই দেখুন।

আদিনাথ ঘুরে তাকিয়ে অবাক হলেন। তারপর আশ্বস্ত হলেন। হাঁফ ছাড়ার মতো বললেন—বাঃ! বাঃ! বেশ মানিয়েছে তো মেয়েটাকে।

জানলার ওধারে ঘাসের ওপর থেকে রঙীন কাগজ কুড়োচ্ছিল ইরানী। পরনে রঙচঙে নতুন ফ্রক। এদিকে তাকিয়ে দুই স্টেশনবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি

হতেই লাজুক হাসল। আদিনাথ জানলায় মুখ রেখে বললেন—কী রে ইন্নি! নতুন জামা পরেছিস দেখছি যে? এঁ্যা? খুব মানিয়েছে রে!

ইরানী হাত বাড়িয়ে বলল—একটা টিকিট দেবে বুড়োবাবু? দেব বলেছিলে না?

—দেব, দেব। প্রমোশন হয়েছে যখন! তা হ্যাঁ রে, কে কিনে দিল? এ্যাঁ?

—উই ঘাটোয়ারীজী।

—বলিস কী?

শিবশম্ভু টরেটক্কা করতে করতে বলল—খেয়েছে! বলেই আদিনাথের উদ্দেশে জিভ কাটল।

আদিনাথ গুম হয়ে সরে এলেন। মড়ঘাটার নচ্ছার লোকটাকে তিনি ভালই চেনেন। সিধু ডোমের বউকে সেই নাকি সাজিয়েগুজিয়ে পুষছে। সিধু তো মাতালের হদ্দ।

কতক্ষণ পরে আদিনাথের মনে হয়েছিল তাহলে কি শেষঅব্দি ঘাটোয়ারীই তাঁকে হারিয়ে দিল?

এর পর একদিন নাইতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন আদিনাথ। মড়ঘাটা আর পারঘাটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বটগাছ আছে। তার তলায় বাঁশের মাচান আছে। মাচানে উবুড় হয়ে শুয়ে আছে ঘাটোয়ারীজী। আর তার পিঠে বসে ডলাইমলাই করছে হুজুর পাটনীর মেয়ে। পরনে সেই রঙীন ফ্রক। মাথায় লাল ফিতে বাঁধা। এবং দু হাতে দুটো লাল বালাও পরেছে এতদিনে। কত সোমত্ত লাগছে মেয়েটাকে। কদিনেই যেন হুহু করে বেড়ে গেছে।

বুড়োবাবুকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল—বুড়োবাবু, আমার টিকিট? ঘাটোয়ারীজী মুখ তুলে দেখে 'রামরাম বড়বাবু' সম্ভাষণ করে ফের বাঁ হাতে থুতনি গুঁজল।

আদিনাথ গোমড়ামুখে ঘাটে নামলেন। যতক্ষণ সূর্যপ্রণাম করলেন, খালি দেখেন লালহলুদ একটা বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে ফ্রকপরা কিশোরী মেয়েটা কার পিঠে চেপে ডলাইমলাই করছে। অসহ্য লাগছিল।

আর একদিন বিকেলে অভ্যাসমতো হাঁটতে হাঁটতে শ্মশানঘাটের ওপাশে বসে গঙ্গাদর্শন করছেন আদিনাথ। হঠাৎ চোখে পড়ল, নির্জন ঝাটচালার সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে ঘাটোয়ারীজী। আর ইরানী তার পিঠে বুক

রেখে পাকা চুল খুঁজছে। সিধুর বউ সেজেগুজে তাদের কুঁড়েঘরের সামনে খোলামেলায় বসে উনুনে লকড়ি গুঁজছে। ধোঁয়ার জন্যই হয়তো ব্যাপারটা তার চোখে পড়ছে না। সে-বেলা শ্মশানে মড়া আসে নি। সিধুকে স্টেশনে দেখে এসেছেন আদিনাথ। চাঁদমড়ির কাছে গাঁজা টানতেই গেছে।

আদিনাথ পারঘাটার দিকে হুজুরকে খুঁজছিলেন। একটু পরে দেখলেন, সে উদাসভাবে কোমরে দু হাত রেখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেদিনই রাতে স্টেশন ঘরে ঢুকেই আদিনাথ বললেন—শম্ভু, একটা কথা বলছিলুম।

শিবশম্ভুর ডিউটি শেষ। বউয়ের কাছে যাবার তাড়া লেগেছে মনে। পা বাড়িয়ে বলল—বলুন দাদা। ক্ষিদেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছে।

আদিনাথ একটু ইতস্তত করে বললেন—ইয়ে, সন্ধ্যেবেলা ঘাটে গিয়েছিলুম। হুজুর পাটনী কথায় কথায় বলল, ওর মেয়েটাকে ঝিয়ের কাজে রাখব নাকি? সব কাজই পারে। তো আমি বললুম, আমার দরকার নেই। একা মানুষ বরং ছোটবাবুকে বলব। হ্যাঁ শম্ভু, তোমারও তো কাজের লোক দরকার। বউমা বলছিল···

কথা কেড়ে শিবশম্ভু বলল—দাদার কি মাথা খারাপ? মোছলমানের মেয়ে রাখব কী। না—মানে, আমি ওসব মানি-টানি নে। আপনার বউমার ব্যাপার তো জানেন। ভীষণ মানে টানে।

বাইরে গিয়ে ফের ঘুরে শিবশম্ভু বলল—আর দাদা! আপনার ওই পরোপকারী স্বভাবটা এবার ছাড়ুন তো। এত ঠকেও শিক্ষা হল না আপনার?

হঠাৎ আদিনাথ ভীষণ চটে গেলেন।—থাক। পণ্ডিতী ফলিও না, পণ্ডিতী ফলিও না। মুখের ওপর যাতা বলা অভ্যেস হয়ে গেছে তোমার। বরাবর দেখছি, তুমি আমাকে ওই টোনে কথা বলো। ভেরি ইনসাল্টিং।

শিবশম্ভু গ্রাহ্য করল না। চলে গেল চাপা হাসতে হাসতে। রামধন পয়েন্টসম্যান লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকে বলল—বড়াবাবু, চাপাটি বানা চুকা। আভি আনবে, না থোড়া বাদ খাবেন? গর্ম খানে সে আচ্ছা হোতা না বড়াবাবু?

—আধঘণ্টা পরে। বলে আদিনাথ বারান্দায় গিয়ে নক্ষত্র দেখতে থাকলেন।···

এসব কথা দু বছর আগেকার। কিন্তু এখনও কয়লাকুড়োনো টুকটুকে ফর্সা আনমনা মেয়েটাকে মনে মনে দেখতে পান বুড়োবাবু আদিনাথ অগস্তী। চোখে ভাসে রেলে বালাস রেখে এক হাত পাখির ডানার মতো বাড়িয়ে তরতর করে চলেছে, আর টালখেয়ে পড়লেই আপন মনে হেসে খুন হচ্ছে। চাঁদঘড়ি ঘণ্টা বাজালে চমকে ওঠেন আদিনাথ। ডিসট্যাণ্ট সিগনাল পেরিয়ে শিস দিতে দিতে এগিয়ে আসছে কাটোয়া লোকাল ডাউন ট্রেন। ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে উঠতে—এঁাই! এঁাই! তারপর টের পান, মনের ভুল। হুজুরের মেয়ে এখন কত সেয়ানা।

শিবশম্ভুর লোক আছে ওপরে। ট্রান্সফার ম্যানেজ করে চলে গেছে। এসেছে আরেক ছোকরা ছোটবাবু বিনয় বিশ্বাস। পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছে—দাদার কত প্রশংসা শুনেছি। দেখবেন দাদা। আমি আপনার ছোটভাই।

শুনেই বুঝেছেন, শিবশম্ভুর চেয়ে এক কাঠি সরেস। তবে এখনও ব্যাচেলার। আর পয়েন্টসম্যান অলকের বাড়ি কটক জেলায়। ভাল রাঁধে-টাধে। বড়বাবু-ছোটবাবু একসঙ্গে খাচ্ছেন। দু ভাগ করা সিঙ্গল-রুম কোয়ার্টার। শিবশম্ভু বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। এখন ওদিকটা সুনসান। বিনয় খালি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে ওস্তাদ। আর চাঁদঘড়ি? সে আছে। সে স্থানীয় লোক। তার মুরুব্বী আছে মন্তো। তার শুওরের পাল বেড়েছে।

আদিনাথ রয়েই গেলেন কাঁটলেঘাটে। ধরাধরির লোক নেই। স্তোকবাক্য খালি। শেষে ধরে নিয়েছেন এখান থেকেই রিটায়ার করতে হবে। কিন্তু মনও বসে গেছে জায়গাটাতে। ইচ্ছে করে, পারঘাটার কাছাকাছি একটু জায়গা কিনে বাড়ি করে ফেলবেন। মন্দ কী। কাঁটলেঘাটের দিনকাল হুহু করে বদলাচ্ছে। এরই মধ্যে স্টেশনের পেছনে ঘাটঅব্দি কয়েকটা দোকানপাট বসেছে। ওদিকে একটা ইটখোলা হয়েছে। টালির চিমনীভাটাও হয়েছে। চোখের ওপর কাঁটলেঘাট হুজুর পাটনীর মেয়েটার মতো দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠল। উড়া কথার মতো কানে আসে, লুপলাইন ও গঙ্গার পাশে পাশে হাওড়া অব্দি পাকা রাস্তাও হয়ে যাবে নাকি।

কাঁটলেঘাটে ট্রেন বা মালগাড়ি থেকে মড়া নামার ব্যাপারটা যেমন ছিল, তেমনি আছে। কিন্তু নতুন এক উৎপাত শুরু হয়েছে চালের চোরাচালান। প্রথম-প্রথম আদিনাথ খুব তড়পেছিলেন। নীতিবাগীশ লোকের এই জ্বালা।

পরে টের পেয়েছেন, তাতেও তাঁর কিছু করার নেই। বিনয়, অলক চাঁদমুড়িরা পয়সা পাচ্ছে বোঝেন। কিন্তু করবেনটা কী? মাঝে মাঝে জংশন থেকে রেলপুলিশ আসে। কখনও এন ভি এফের ঝাঁক এসে ঘোরাঘুরি করে যায়। তখনকার মতো চাল-চালানীরা ঘাপটি পাততে পাততে যায় আড়ালে। ওরা চলে গেলে মাছির মতো ভনভন করে বেরিয়ে আসে। আদিনাথ স্টেশনঘর থেকে আগের মতো বারান্দায় বার বার গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন না। নেহাত গাড়ি পাস করাতে হলে দাঁড়াতেই হয়। অফ-ডিউটির সময় চলে যান গঙ্গার দিকে। নিরিবিলি জায়গায় চুপচাপ বসে গঙ্গাদর্শন করেন।

পারঘাটার এখন জমাট অবস্থা। হুজুর পাটনীর হাতছাড়া হয়ে গেছে কাটলেঘাট। তাতে কী? নৌকো বেচে ওপাশের মড়ঘাটের ওপর পানবিড়ির দোকান করেছে। সে-হুজুর আর নেই। তেল চুকচুকে চেহারা হয়েছে এখন। হাঁটু অব্দি গোটানো ধুতি গায়ে নীল পপলিনের হাফশার্ট আর পায়ে স্যাণ্ডেল—হুজুর যায় জংশনের বাজার থেকে মাল আনতে। বাজার সেরে বরোজ থেকে পান আনতেও যায়। রাঙা দাঁত বের করে বলে—সালাম মাস্টেরবাবু। ডাউনের লেট নেই তো?

—কোথায় চললে হে হুজুর?

—আজ্ঞে, একবার কাটোয়াবাগে যাই। মালপত্তর আনি গে।

—হ্যাঁ হে, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কবে?—আদিনাথ টেনে টেনে হাসেন। আমাদের খাওয়া পাওনা কিন্তু। দেখো বাবা, ফাঁকি দিও না।

হুজুর হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যায় একথায়। শুধু বলে—সে আর বলতে, মাস্টেরবাবু! কিন্তু আদিনাথ যখনই একথা তুলেছেন, দেখেছেন হুজুর কথাটা যেন এড়িয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটিকে অনেকবার চালচালানীদের দলে দেখেছেন। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। রাতারাতি কী আশ্চর্য বদলে গেছে চেহারা! পুরোপুরি যুবতী হয়ে উঠেছে ইরানী। দূর থেকে একদিন দেখেছিলেন, ঘাটের ধারে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। শেষবেলার রোদ পড়েছে শরীরে। আদিনাথ বিষণ্ণ মনে ভেবেছিলেন, চেষ্টা করলে হয়তো ওকে বাঁচাতে পারতেন। পারেন নি। ঘাটোয়ারী লোকটা তার আগেই ওকে গিলে ফেলেছিল। খালি মনে হয়, সময়মতো তখন যদি সাহস করে একটা ফ্রক কিনে দিতেন! আসলে আনমনা বোকা মেয়েটা টের পায় নি, তার রঙের বাজারে ক্যামোফ্লেজ করে এগোচ্ছিল

চুপিসাড়ে এক সর্বনাশ। কেউ চেঁচিয়ে ওঠেনি আদিনাথের মতো—এ্যাই! এ্যাই!

জহর ব্যাপারী বলেছিল—ও যদি কাঁটলেঘাটের বেশ্যা না হয় তো আমার কান কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন। তাই হল শেষ পর্যন্ত। জহর স্টেশনে এলে একগাল হেসে কান দেখায়। বলে—কী বুড়োবাবু হল তো! কাঁটলেঘাটে এখন মেয়েটাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি চলছে, জানেন?

আদিনাথ বলেন—তাই বুঝি? আমি ওসব সাতেপাঁচে কান পাতিনে।

—সে কথা আর বলতে? তবে কবে দেখবেন, মায়ের মতো মেয়েটা খুন হবে।

—কেন? কেন জহর?

জহর চুপকথার ভঙ্গীতে বলে—কমপিটিশন বুড়োবাবু। বুঝলেন? জোর কমপিটিশন চলছে! একদিকে ইটখোলার প্রাণকেষ্টবাবু, আরেকদিকে আমাদের গাঁয়ের সোরাবহাজির ছেলে জাফর, অন্যদিকে ঘাটের মড়া ঘাটোয়ারীজী জাফর বলেছিল, নিকে করব। দশ বিঘে জমি লিখে দেব। ইন্নি বলেছে থু থু! আমি কি অত শস্তা? জাফর শাসিয়েছে। লুঠে নিয়ে যাবে। সেই ভয়ে আর চাল বেচতে যায় না—লক্ষ্য করেছেন ইদানীং?

যায় না বটে। আদিনাথ বেশ কিছুদিন ওকে চালচালানীদের দলে দেখেননি। জহরের কাছে এসব শুনে ভেতর-ভেতর উদ্বেগ বোধ করেন রাতবিরেতে ঘাটের দিকে গণ্ডগোল শুনলে কান পাতেন। বুক কাঁপে। ভাবেন সোরাবহাজির ছেলের প্রস্তাবটা তো ভালই ছিল। কেন রাজি হল না হতচ্ছাড়া মেয়েটা? গেরস্থবাড়ি বউ হয়ে মানসম্মানে থাকত। আসলে পাপ যাকে ছোঁয়, তার মাথার ঠিক থাকে না। আর ভেবে দেখলে, জাফর ছেলেটার উদারতাও প্রশংসনীয়। জেনেশুনে ওকে বউ করে ঘরে তুলতে চাইছে! কি ওদের সমাজ তা মেনে নেবে তো?

কথাটা একদিন জহর ব্যাপারীর কাছে যাচাই করে নিলেন আদিনাথ জহর পানখেকো কালো দাঁতের ফাঁকে কাঠি খুঁচিয়ে পণ্ডিতী চালে বলল—হুঁউ! একশোবার। মৌলবীর হাতে তৌবা করলেই সাতখুন মাফ সাতঘাটের খানকিও সতীসাবিত্রী হয়ে যাবে। চলে এস, চলে এস তা খালি।...জহর খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।

আদিনাথ এইসব শুনে খুব আশা নিয়ে ঘাটে গেলেন। হতচ্ছাড়ী বোধ

মেয়েটার জীবনে একটা ভাল রকমের হিল্লে হতে পারে। এমন চান্স ছাড়তে আছে? হুজুর নেশাখোর হলেও বাপ। তা তার নিজের ঔরসে ওর জন্ম হোক বা ওকে হাঘরে ইরানীদের কাছ থেকে চুরি করেই আনুক, এতটুকু বয়স থেকে লালনপালন করেছে। আর এই আদিনাথ—যাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, জাত আলাদা, মানসিকতা আলাদা, কালচার আলাদা—অথচ সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন ফুটফুটে, ফর্সা, সুন্দর আনমনা নিষ্পাপ মেয়েটাকে, তাঁর মনেই যদি কর্তব্যবোধ জেগে থাকে—হুজুরের কেন জাগবে না? এ হচ্ছে কিনা মানুষের ভেতরকার ফাণ্ডামেণ্টাল ব্যাপার। আদিনাথ সব কথা ভাবতে ভাবতেই গেলেন।

হুজুর তার পানবিড়ির ঘাটে বসে মড়াযাত্রীদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছিল। কটু তফাতে দাঁড়িয়ে দোনামনা করছিলেন আদিনাথ। হুজুরের গল্পটা কানে আসছিল। লোকটা বরাবর আমুদে। কবে নাকি এই কাঁটালেঘাটে একটা ডা ভেসে এসে ঠেকেছিল। মড়ার গায়ে চন্দনের গন্ধ। ঘাট ম ম। সেই খবর শুনে খুব ভিড় হল। মেয়েরা এসে শাঁখে ফুঁ দিল। ঢাকীরা এসে ঢাক বাজাল। ছিরুটির ঠাকুরমশাই এসে ঘণ্টা নেড়ে মন্ত্র পড়ে জবাফুল ছুঁড়তেই ডা নড়লেন-চড়লেন। আবার ভেসে চললেন মাঝগঙ্গার দিকে। মেয়েরা উলু দিতে লাগল। খৈ ছিটোল। পয়সা বিলোল। তেমন ধুম কাঁটালেঘাটে আজঅব্দি হয়নি। তেমন মড়া আর কখনও আসেনও নি।...গল্পটা শুনে সবাই হাহো করে হেসে উঠল। হুজুরও দুলেদুলে হাসতে লাগল।

মাথায় লালফেট্টি বাঁধা, হাতে মস্তো লাঠি, বাথানের এক ঘোষের পো গাঁকে তা দিয়ে বলল—ইটার মাহাত্ম্য কী হে?

হুজুর বলল—অ্যানেক। সব পুরনো পাপ কুড়িয়ে লিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

—হুঁ, তাই বটে। আর কবে আসবেন হে হুজুরভাই? অ্যানেক পাপ জড়ো হয়েছে ঘাটে।

মুচকি হেসে চোখ নাচিয়ে কথাটা বলতেই হুজুর টাটছাড়া হয়ে বেমক্কা চেঁচাল—খবরদার! মুখ সামলে! আর লোকটাও লাঠি তুলে তড়পাল। সঙ্গে সঙ্গে হুইচই বেধে গেল। আদিনাথ কান করে শুনছিলেন। বুঝতে পারলেন না, হুজুরের হঠাৎ খাপ্পা হওয়ার কারণ কী। দুজনকে লোকেরা মধ্যস্থতা করে থামাতে চাইল। এদিকওদিক থেকে লোকেরা দৌড়ে এল। আদিনাথ ঘাবড়ে গেলেন।

কাছে এসে একটা অচেনা লোক বলল—মদমাতালের কাণ্ড, বুড়োবাবু ঘাটে সারাবেলা এরকম। চলে আসুন এখান থেকে। এ মড়ঘাটায় ভদ্রলোক আসে নাকি? ছ্যা ছ্যা!

আদিনাথকে কত লোক চেনে। তিনি কজনকেই বা চেনেন! মনটা তেতো হয়ে গেল। ধুর ধুর, তাঁর খেয়েদেয়ে কাজকম্ম নেই, ভুতের পেছনে হন্যে হচ্ছেন। তিনি কি প্রফেট, না অবতার?

পা বাড়াতে গিয়ে চোখ পড়ল, হুজুরের মেয়ে সেজেগুজে দোকানের ওপাশটায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তখন লক্ষ্য করেননি। মুখে স্নোপাউডার ধপধপ করছে। একগাদা, ভুরু ও চোখে কালি বুলিয়েছে, এবং ঠোঁটে রংও। এতক্ষণে বুঝলেন, লালফেট্টি বাঁধা লোকটার মন্তব্য এবং হুজুরের রাগের কারণটা কী।

কিন্তু মেয়েটাকে দেখামাত্র যেন চোখে কুটো পড়ল। দৃষ্টি সরিয়ে আদিনাথ হনহন করে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেন।

সেই সন্ধ্যায় অভ্যাসমতো স্টেশনঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আদিনাথ মুখ উঁচু করে নক্ষত্র দেখছিলেন। নক্ষত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ হুজুরের গল্পটা তাঁর মনে পড়ে গেল। চন্দনের গন্ধ ছড়ানো একটা মড়া ভেসে এসেছিল। কাঁটালেঘাটে সব পাপ কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গল্পটা ভারি মজার। আপনমনে খিলখিল করে হেসে উঠলেন আদিনাথ। আবার একটা চন্দনের গন্ধমাখা মড়া আসা খুব দরকার।

কিন্তু তারপর হঠাৎ টের পেলেন, শিউরে উঠলেন, নাক তুলে শুঁকতে থাকলেন, যেন সত্যি সত্যি চন্দনের গন্ধ পাচ্ছেন। শরীর ভারি বোধ হল আদিনাথের। বুক ঢিপঢিপ করল। চন্দনের গন্ধে ম ম করা সন্ধ্যারাতে বাতাস ঘূর্ণির মতো তাঁর চারপাশে পাক খাচ্ছে। তারপর শাঁখ বাজা শুনতে পেলেন। উলুধ্বনি শুনলেন। হাজার হাজার ঢাক বেজে উঠল চারদিক থেকে। ঘণ্টার শব্দ হল। আদিনাথ দুহাতে মাথা চেপে ধরে অতিক ডাকলেন—বিনয়! বিনয়! আমায় ধরো। ধরো!

আলো নেড়ে মেলট্রেন পাস করিয়ে চাঁদঘড়ি ঘুরতেই চোখে পড়ল, বড়বাবু টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়ছেন। সে চেঁচিয়ে উঠল—ছোটবাবু! ছোটবাবু

বিনয় দৌড়ে এল ঘর থেকে। অলক এল। ধরাধরি করে স্টেশনঘরে নিয়ে গিয়ে টেবিলে শুইয়ে দিল। নাকের ফুটো আর কষায় রক্তের ফোঁটা। ঠোঁট কাঁপছে। বিড়বিড় করে কী বলার চেষ্টা করছিলেন। সাতটা পাঁচের ডাউনে জংশন হাসপাতালে পাঠানোর আগেই কাঁটলেঘাটের বুড়োবাবু আদিনাথ অগস্তী মারা গেলেন। রিটায়ার করার বয়স হয়েছিল। মাস তিনেক আগেই চলে গেলেন।

ডাক্তারী মতে স্ট্রোক। কিন্তু চাঁদঘড়ির মতে, ব্যাপারটার পেছনে ভূতটুত আছে। সন্ধ্যা ঘাট থেকে ফিরলেন আর আচমকা পড়ে গেলেন মুখ থুবড়ে। নাকে, কষায় রক্ত। তাছাড়া, চাঁদঘড়ি মাকালীর দিব্যি কেটে বলেছিল, কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী বলছেন বড়বাবু? খালি বললেন, চন্দনের গন্ধ। স্পষ্ট শুনেছি। ভুল হবে কেন? কাঁটলেঘাটের এ বদনাম বরাবর আছে। রাতবিরেতে শুওর খেদাতে গিয়ে তো কষ্ট পাইনি। অবিকল চন্দনের গন্ধ

জ্যোৎস্নায় রক্তের গন্ধ

ওই রেলগাড়িটা কি দিল্লী যেত? দক্ষিণের রেললাইনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার পেটের অংশটুকু মধ্যরাতে পুড়ছিল। তখন ঠিক মধ্যরাতে যেন চতুর্দিক কালনিশার ঘোর কালো অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার হা হা হা হা আগুনের দাঁত বার করে হাসছিল। দিল্লীযাওয়া রেলগাড়ি জ্বালিয়ে দক্ষিণের ফাঁকা মাঠে কারা পালিয়ে যাচ্ছিল। দমকলের ঘণ্টা বাজছিল উত্তরের জাতীয় মহাসড়কে। ফকিরচাঁদ খামরু স্টেশনের রিকশোস্ট্যাণ্ডের তেকোণা চত্বরে চামাগুড়ি দিচ্ছিল কারণ পিছনে দুম্ দাম্ কট্ ফটাস্...এইপ্রকার কানফাটানো আওয়াজ। আওয়াজে একটা নেড়ীকুত্তা লেজগুটিয়ে পালায়। ফকিরচাঁদ খামরুর নাইকুণ্ডলের ভিতর থাবা পেতে বসে যে কুত্তাটা কাঁইকুঁই করছিল এবার বেরিয়ে পড়ে পথ দেখবার তালে, বুড়ো ফকিরচাঁদের মনে এইরূপ ভ্রম

সে আড়চোখে চেয়ে পিছন ফিরতেই স্টেশন বাজারের সব আলো মুহূর্তে নিভে গেছে

দিল্লীযাওয়া রেলগাড়ি জ্বলছিল। এই দেখে মধ্যরাতে একটি মেয়েমানুষ

হঠাৎ তার আলোর ছটায় দাঁড়িয়ে হি হি হি হি হেসে খুন। গোডাউন শেডের নীচ থেকে পিলপিল করে গোটা চার ন্যাংটো ছোট-ছোট মানুষ বেরিয়ে এসে প্যাট প্যাট করে তাকায় আর চোখ বুজে ফ্যালে বারংবার। ঠিক এইসময় ফকিরচাঁদ অদূরে পিপুল গাছের গুঁড়িতে সেঁটে থেকে বলে ওঠে—'একি আগুন? এ কী আগুন!'

'ছাখো নি তো দেখে লাও…' মেয়েমানুষটি হাততালি দিয়ে যেন হাসে। তাদের পিছনে শহর। পিছনে কলকারখানা বড় বড় চিমনি। চিমনির কালো রঙের পরে দিল্লী যাওয়ার রেলগাড়ির আগুনের চমক। পিছনের শহরে ঠিক মধ্যরাতে থেকে-থেকে বিষম চিৎকার। ফকিরচাঁদ খামরু আর সেই চারছেলের মা মেয়েমানুষ ছাখে, ঠিক মধ্যরাতে তাদের পিছনে শহরে দারুণ জাগরণ 'আহা হা, এখন মনিষ্যির ঘুমের সময়'…ফকিরচাঁদকে বলতে শুনে ছেলেপুলের মা লক্ষ্মীদাসীর ছটালাগা চোখ জলন্ত হয়—'থাম্ রে বুড়ো, বক বক করিসনে…' ফকিরচাঁদ বলে, 'হুই ছাখো আবার আগুন, থামবার যো নাই'…ছেলেপুলের মা আঙুল মটকায় পটপট করে 'মনের আগুন, বাছাদের মনের আগুনে সব জলেপুড়ে ছাই…'

জলেপুড়ে ছাই হচ্ছিল পিছনে শহর সামনে দিল্লীর রেলগাড়ি। ঠিক তা মধ্যরাত। তখন দমকলের ঘণ্টা বাজছিল ঢঙ ঢঙ ঢঙ ঢঙ। সর্বনাশের ঘণ্ট পথের উপর গুলি কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটানোর আওয়াজ। হল্লা কদাচি কদাচিৎ জলেওঠা আগুনে একদল মানুষের মুখ। হামাগুড়ি দিয়ে বে পালিয়ে আসে শহর ছেড়ে। রেললাইন পেরিয়ে মাঠের দিকে পালায়।

তারপর হঠাৎ অতি কাছে কখন আগুন জলে উঠেছে। স্টেশনঘরের ক ফাটানো বিশ্রী আওয়াজ। স্টেশনবাবু লম্বা টেবিল থেকে ধুড়মুড় করে জানালা গলিয়ে ময়দানে লাফ দিলেন। ছেলেপুলের মা ছুটে এসে ছেলেপুলেদের পালকঢাকা দিয়ে পিপুলগাছের নিচে চলে এল। বুড়ো ফকি চাঁদ খামরু একটু সরে বসল। তার গলা ঘড়ঘড় করছিল। উদ্দাম কা সামলাতে সে ক্রমাগত কাঁপছিল। আর স্টেশনের দেয়ালে গুলির আওয় শুনতে শুনতে ছেলেপুলের মা ফিসফিস করে উঠল…'আমি মধুপুরের লক্ষ্মীদা গো, মধুপুর চেনো নি, হুই যে…' ফকিরচাঁদ অতিকষ্টে বলল—'আমি পলা গাঁর রতন খামরুর নাতি ফকিরচাঁদ। আমাদের উপাধি খামরু। বড় স সাতটা খামার ছিল…'

কথা বলতে বড় সুখ এখন। যদিও চারপাশে আগুন জ্বলছে, পালানো মানুষের ইসারা পাওয়া যাচ্ছে অস্পষ্ট অন্ধকারে, যদিও ময়দানে রাতচরা ছুটো গাধা বিষম ভয় পেয়ে দৌড়ে অন্ধকারের দিকে পালিয়ে গেল, ছ্যাকরা ঘোড়া গাড়ির কোচোয়ান ইসমাইল যাত্রীদের বিশ্রামালয় থেকে ছুটে এসে জোতা থেকে তার ঘোড়াদুটিকে খুলে নিতে পারল না তাই ককিয়ে উঠছে বারংবার, ...বলতে ভালো লাগে, আমরা কে কী ছিলাম। যেন বিক্ষোভের প্রচণ্ডতার মধ্যে এই কাহিনীকে ঠাঁই দেবার প্রয়াস। যেন চারপাশের বহ্নিমান ক্ষোভের মধ্যে নিজ নিজ দাবিকে যোগ্য মর্যাদাদান করার ইচ্ছা। কিংবা...কিংবা যেন মধ্যরাতের অন্ধকার কাটিয়ে বেরিয়েপড়া লেলিহান শিখাবিশিষ্ট দীপ্তিমান মহাসূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে বিচারপ্রার্থনা—যে মহাসূর্য তার দ্বাদশ দ্বার উন্মোচিত করে ডাক দিয়েছে, এসো!

'লক্ষ্মী, লক্ষ্মীদাসী!' ফকিরচাঁদ বিড়বিড় করছে। 'আর নাম বুঝি থাকতে নাইরে মা! কী ভুল, কী ভুল!' আক্ষেপে পিঠ ঘষছে গাছে। খসখস শব্দ জন্তুর মতন। স্টেশনের আগুন থেকে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাচ্ছে। উৎকট ধুঁয়োর গন্ধ নাকে লাগে। দমকলের ঘণ্টা অতি কাছে। টর্চের আলো ময়দানে চারপাশে, বোমা ফাটল পথের ওপর। ইসমাইল কোচোয়ানের ঘোড়া দুটি নয়ানজুলিতে গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইসমাইলের চিৎকার ডুবিয়ে ফের গুলির আওয়াজ। একবার হল্লা। ফের সব চুপ। দুটো দমকল থেমে গেল স্টেশনের সিঁড়ির কাছে। যেন দাঁড়িয়ে ঠায় মজা দেখছে।

পালকে বাচ্চাদের ঢেকে মেয়েমানুষ লক্ষ্মীদাসী ফিসফিস করে বলল—'তুমি আমার বাবা, সাতজন্মের মেয়ে তোমার। ফেলে পালিয়ো না...'

'ভয় কী, চুপ করে বসে থাকো।'

'বাবা, বাবা গো!'

'বা?'

'শুধু আগুন দেখি, লোক দেখি না—শুধু চেঁচানি শুনি, লোক কই?'

ফকিরচাঁদের থলথলে চোখে রহস্য। দেখলে গা ছমছম করে। এই বুঝি তবে নাটের গুরু!

'বাবা, কথা বলছো না কেন?'

'উঁ?'

'লোকজন কই?'

'অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।'

'তুমি দেখেছ তাদের ?'

'হুঁ।'

লক্ষ্মীদাসী একটু সরে বসল। কী জানি, এই বুঝি আসল লোকটি। ন্যাংটো ছেলে চারটি কাঠ দুজানুর ওপর, পায়ের ফাঁকে আর বুকের ওপর। 'পাতকুড়ো!'

'উঁ ?'

'ঘুমোস নে।'

'ঘণ্টা ?'

'অ্যাঁ!'

'জেগে থাকিস্।'

'পল্টে!'

'মা!'

'ঘুমিও না।'

বুকেরটির পিঠে হাত বুলিয়ে কানের কাছে সোহাগী স্বরে বলল—'টাপু রে, তুই শুধু ঘুমো।'

বুড়ো একদৃষ্টে আগুন দেখছিল। মুখ ফিরিয়ে এদিকে তাকাল, অল্প হাসি অন্ধকার চিবুকের ওপর ছলছল করে কাঁপছে আলোর ছটায়। দেখে মনে হয়, মতলববাজ। লক্ষ্মীদাসী ছেলেপুলেদের শক্ত করে ধরেছে। কী জানি, হঠাৎ তুলে ছুঁড়ে ফ্যালে নাকি আগুনে।

'মা কি ভয় পাচ্ছিস্ রে ?'

'কই, না তো!'

আ মর্! আঙুল তুলে পায়ের ফাঁকের বড় ছেলে পল্টেকে দেখায় বুড়ো। ঘড়ঘড় করে বলে—'দুই রকম ছেলের একটা মড়া ময়দানে এখনও পড়ে আছে…'

'হেই বাবা, চুপ্ করো…'

'বিকেলে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিল।' ফকিরচাঁদ নির্বিকারভাবে বলে। 'সকলের আগে দুই রকম গোলগাল মুখ, ঢ্যাপসা গতর, একটা ইস্কুলের ছেলে…'

'আমার ছেলেকে ইস্কুলে দেবো না!'

'তাতে কী! আরও অনেক ছেলে ইস্কুলে যায়।'

'সেটা কি এখনও ওখানে পড়ে আছে?' লক্ষ্মীদাসী তীক্ষ্ণদৃষ্টে বাঁপাশের মাঠের দিকে তাকায়। সেই গাধাদুটি নির্ভয়ে ঘাস খাচ্ছে এখন। প্রথম চমকটা সামলে নিয়েছে। কে জানে, এখন অব্দি গাধাদুটি ক'বার একটি ইস্কুলে যাওয়া ছেলের রক্তাক্ত লাশ ডিঙিয়ে ঘাস খেল।

ফকিরচাঁদও দেখছে সেদিকটা। 'আছে। থাকবার কথা। বিকেল থেকে পুলিশ মাঠের চারপাশে বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে। বড়কর্তা না আসা অব্দি ওই ভাবে থাকবে, বুঝলে?'

'উঃ মাগো!'

'কী হলো?'

'কিছু না। বলো।'

'একপলক দেখেছিলাম। তখন দেবতা ঢলে পড়েছেন। রোদ নিবিয়ে আসছে। ছেলেটার বুকে দগদগে রক্ত—আগুন ফেটে বেরিয়ে গেছে—' ফকিরচাঁদ ফ্যাকফ্যাক করে হাসল।

'ওই রকমই। আজকাল দুধের বাচ্চাদের মনে আগুন পোষা! পল্টা ঘণ্টাকে নিয়ে অই জ্বালায় জ্বলছি না! সামলে রাখা দায়। কেবল পাতকুড়োটা বেশ শান্ত। খিদে পেলেও কাঁদে না।'

শুনে ফকিরচাঁদ এমন ভাবে হাসছে, লক্ষ্মীদাসীর গা ছমছম করে। কী মতলব কে জানে। পাতকুড়োকে সে ধরে থাকল।

'দুজন সেপাই ছুটে গিয়ে ধরাধরি তুলে আনল ছেলেটাকে। নিজ চোখে দেখলাম। কারুর হাতে দেবে না ওকে। আগে বড় কর্তা আসুন দিল্লী থেকে সেও আগামীকাল বেলা দুপুর গড়িয়ে যাবে।'

আসবে ক্যামনে? র‍্যাললাইনে আগুন যে গো?'

'ঠিক বলেছ। আসবার যো নাই। সোতরাং…'

'মড়াটা পড়ে রইল তাইলে। মা-বাবা বুক চাপড়াবে। আহা হা বুকে আচমকা ঘা খেয়ে কী বলেছিল—মা না বাবা, কে জানে!'

'মা। মাকেই ডাকবার কথা। পাতকুড়োর মত শান্ত ছেলে তো বটেই…' ফকিরচাঁদ ফ্যাকস্যাক করে হাসছে।

'আহা হা রে! ওকথা বলোনা, বলোনা'…ঘণ্টা পল্টাকে ছেড়ে পাতকুড়োকেই চেপে ধরল বেশী করে।

'কেঁদোনা লক্ষ্মীমণি, কাঁদতে নাই।'

'কাঁদিনি। আমার পাতকুড়ো যদি অমন করে·

দমকল দুটো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আগুন দেখছে। অনবরত খট্‌খট্‌ ফটাফট্‌ শব্দ, পাটকেল পড়ছে সম্ভবত। যাত্রীদের বিশ্রমালয়ের পেছনে ঘন জঙ্গল থেকে কারা ছুঁড়ছে। দমকলের লোকগুলি উবুড় হয়ে পড়ে আছে লাল গাড়ির ওপর। দেখেটেখে ফকিরচাঁদ হাসতে থাকল নিঃশব্দে। বোঝা যায়, পলাশগাঁয়ে থাকতে এই বুড়োর সারাজীবন তুখোড় রসিক পুরুষ বলে প্রসিদ্ধি ছিল।

লক্ষ্মীদাসীর চোখে অন্য দৃশ্য নেই। রেলিঙঘেরা মাঠে খাবলা খাবলা আলোর ওপর পিছলে যাচ্ছে নিষ্পলক তার দৃষ্টিটা। অন্ধকারের খাদ থেকে আলোর ঢিবিতে ফের খাদে—এইরকম একটা কষ্টকর চলাফেরা। শুধু কোথায় যেন শুধু দুটি ঘাসখেকো নিশ্চিন্ত গাধাকেই দেখতে পায়, লাশ ছাখে না। লক্ষ্মীদাসীর বুক তোলপাড়—তার ছেলের লাশ যদি পড়ে থাকত, সে এই নিশি রাতের বিক্ষোভময় পৃথিবীতে মাতৃসুলভ যন্ত্রণায় সকল বিপদ অগ্রাহ্য করে রেলিঙ টপ্‌কে মাঠের মধ্যে ঢুকে যেত। আর এই ভাবনায়, আহা, কী গরব কী প্রচণ্ড সুখ, লক্ষ্মীদাসী রেলকোম্পানীর ময়দানে রক্তাক্ত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে চিৎকার করত—'আমি এর মা!'

এবং আস্তে আস্তে তার মুখটা সোজা হল তখন। প্রাজ্ঞ জজসায়েবের বিচক্ষণতা ওতপ্রোত মুখের রেখায়, গাম্ভীর্যে অটল তার আস্থা—সে ধীর স্থিরে শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল—'ছেলেটা কী করেছিল?'

ফকিরচাঁদ মুখ ফেরাল। হঠাৎ যেন ক্ষুব্ধ। অদূরে রেলগাড়ির দগ্ধ পাটাতন থেকে দক্ষিণের হাওয়ায় স্ফুলিঙ্গ উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। উড়ে আসছে পিপুল-গাছের শীর্ষভাগে। একবার বোমা ফাটবার নির্ঘোষ, ফের কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা দারুণ গুমোট—মনে হয় টীনের গুদামঘরে বসে আছে তারা এবং গমগম করে তার ছাদ কাঁপিয়ে লক্ষ্মীদাসীকেই এ মুহূর্তে গালমন্দ করতে ইচ্ছে করে।

তা পারল না। মেয়েমানুষ. নিতান্ত অবোধ মেয়েমানুষ। ফকিরচাঁদ অন্যদিকে ফিরে সকৌতুকে বলল—'পেটে কী একরকম জন্তু ছিল, বুঝলে? মহাজন্তু। তার···'

মধুপুরের ছেলেপুলের মা হেসে বাঁচে না। এই সব বুড়োরা ঘরছাড়া হলে কী হয়? রসের জ্বালা। 'ও মা, তাই নাকি!'

'তার জন্তুটাকে নিয়ে বড় জ্বালা। নেহাত বাচ্চা বয়স, ঢাকতে জানে না।

দিলে ফাঁস করে। কারা তখন বললে, তবে বড়কর্তার কাছে যাও। সে বড়কর্তার তল্লাসে যাচ্ছিল। তারপর…'

'বেশ গল্প জানো বাপু। তারপর?'

'এদিকে বড়কর্তার লোকেরা পথ আটকেছে সঙ্গে সঙ্গে। কী জানি, পেটের জন্তু হাঁউমাঁউ করে বেরিয়ে পড়ে বড়কর্তার সুমুখে। গিলেটিলে খায় নাকি, বাস্ রে, তা হবে না।'

ঘণ্টাপণ্টা শুনছিল তাহলে। সোজা হয়ে বসেছে একেবারে। খাড়া কান, বড় বড় চোখ। ঘণ্টার বোধ করি, ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে। নালা টপকাচ্ছে কি না কে জানে—ওইরকম অভ্যেস। সে সাড়া দিয়ে বলল—'ভারী মজা।'

'মজা বেরোচ্ছে!' ফকিরচাঁদ দাদুসুলভ ধমক দিয়ে বলল…'তখন তোমার মশাই, জন্তুটাকে আগেভাগে বিনেশ করাই উচিত…দিলে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে।'

বয়স্ক পণ্টা না বলে পারল না—'আমি দেখেছি।'

লক্ষ্মীদাসী ধমকাল 'পণ্টা, জ্যাঠামি করিসনে।'

পণ্টা কানে না নিয়ে ফের বলল—'দেখেছি।'

লক্ষ্মীদাসী পিটে চাপড় মারল—'পণ্টে, তুই চুপবি?'

ফকিরচাঁদ বলল, 'যেতে দাও, ছেলেমানুষ। তবে একটু আগলে-টাগলে রেখো। গতিক ভালো না। দিনসময় সুবিধে ঠেকছে না।'

পিছনে শহরে কিংবা মাঠের ওপ্রান্তে জাতীয় মহাসড়কে ফের হল্লার শব্দ, ফের কানফাটানো তীব্র গর্জন। ঝলকে ঝলকে আগুন। স্টেশনের দমকল-দুটো আচমকা স্টার্ট দিয়েছে। পালাচ্ছে হয়তো।

লক্ষ্মীদাসী বলল—'পেটে জন্তু সবাই পুষছি। তবে কথা কী জানো বাবা ওটা বলতে নেই। ঢাকতে হয়—মা বাবার এই রকম শিক্ষা ছিল। এই যে আমাকে দেখছো, আমি কিন্তু মরে গেলেও পারবো না, জেনো। শুধু ঘণ্টা-পণ্টারা ছেলেমানুষ…'

বুড়ো বলল—'সমিস্তেটা এখেনেই।' ঠিক যেমন করে পলাশগাঁয়ের চণ্ডী-মণ্ডপে বসে সমস্যার জট ছাড়াতো, সেই ভঙ্গি অবিকল। হাতের তালুতে আন্দাজ করে ফের বলল—'ছেলেমানুষগুলো কিছু বোঝে না। কেবল চেঁচায়।'

'চেঁচায়। আজ সারাদিন চেঁচাচ্ছে। গোলমালের ভয়ে বেরোতে পারি নি, ঘণ্টাপণ্টাদের মুখের দিকে তাকানো যায় না।'

'কেঁদো না। আমার কাছে একটা পাউরুটি আছে। এই নাও।'

হাতড়ে হাতড়ে ফকিরচাঁদ পাউরুটি বের করে। ঘণ্টা-পণ্টা লাফিয়ে উঠে বসেছে। লক্ষ্মীদাসী পাতকুড়ো আর চাঁপাকে খামচায়—'ওঠ, দাদু কী এনেছে ছাখ···পাতু, চাঁপু, ওরে!'

আগুন কতরকম হয়, শীতই বা কত প্রকার! হিমবাহের মধ্যে আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে থাকার ধুম পড়ে গেছে। পাউরুটিটা যেন জ্বলছে। কাগজের মোড়ক খোলার দায় নেই। লক্ষ্মীদাসী বলে—থাম্, ওরে তোরা ব্যস্ত হস্‌নে। ভাগ করে দিই। বাবা, তোমাকেও দেব একটুখানি?'

ফকিরচাঁদের চোখে অন্যরকম দৃশ্য ভাসে। অন্ধকারে লক্ষ্মীদাসীর মুখে যেন লম্ফ জ্বলে। কিসান বৌ তার ভাতার ব্যাটা শ্বশুর-শাশুড়িকে লম্ফ জ্বেলে যেন ভাত বেড়ে দিচ্ছে। 'আহা, হা···এ কী দৃশ্য দেখি'···বুড়ো কিসান তার থ্যাবড়া খুরপীধরা হাতের চেটো অন্ধকারে তুলে কী পরখ করে। দ্বারকা—বেহুলা—বাঁকী নদীর গেরুয়া জলের গন্ধ, নাকি তাদের প্রান্তবর্তী উর্বর নরম মাটি এখনও লেগে আছে। কিংবা সেই বাবলতলীর নাবাল মাঠের কচি গমের স্পর্শ। বুড়ো বলে, 'আহা হা হা··· '

'বাবা!'

'উঁ?'

'দিই এট্টুকুন!'

'থাক্ মা, খিদে নাই।' ফকিরচাঁদ এক নিশ্বাসে বলে। 'ইষ্টিশানের সিঁড়ির কাছে বুকে হাঁটছিলাম, তখন হঠাৎ এটা ঠেকে গেল হাতে। হয়তো আরও পড়ে আছে। চায়ের দোকানটা পুড়ে গেছে, তখন বোধ করি তাড়াহুড়ো মাল সামলাতে পড়ে গেছে টান উজোড় করে।' তারপর পাতকুড়োকেই হঠাৎ খোঁচায়—'এই বাছা, যাবি নাকি?'

'না, না।' লক্ষ্মীদাসী আটকাল।···'না, না, বাবা; ও খুব শান্ত ছেলে। ওকে ঘাঁটিও না!'

বিশ্রামাগারের ওদিকে গাড়ির শব্দ। হেডলাইট নেই। গোঁ গোঁ গর্জন, তারপর ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষেছে। অমনি ভারী বুটের শব্দ, দড়বড়িয়ে সেপাইরা বুঝি নামল। পরক্ষণেই ছোটাছুটি ব্যস্ততা, গুলি ছোঁড়া অন্ধকারে, বিশ্রামাগারের ছাদে ক্রমাগত পাটকেল পড়ার শব্দ। শুনে ও দেখে লক্ষ্মীদাসী ততক্ষণে আশ্বস্ত।

পিপুল গাছের গোড়ায় সিমেন্টের চত্বরে নিচে এরা লুকিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মীদাসীর শরীরের নিচে চারটে ছেলে। বুড়ো ফকিরচাঁদ যেন নিশ্চিন্তে চিৎ হয়ে শুল। ফিসফিস করে বলল, 'চারদিক থেকে লড়াই দিচ্ছে। বড়কর্তা আসবার আগেই লাশটা ওরা কেড়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। কর্তা-টর্তার ধার ওরা ধারে না।'

লক্ষ্মীদাসীর মুখে রুটির শেষ দলাটা। গিলে নিয়ে চুপি চুপি বলল—'এত জেদ ভালো না কারুর।'

ফকিরচাঁদ হঠাৎ ক্ষুব্ধ। একটু মাথা তুলল। 'তুমি মা, একথা ভুলো না, বাছা।'

ছেলেপুলের মা নীরব সঙ্গে সঙ্গে। মুখ বুজে ভর্ৎসনা সইতে রাজী মুহূর্তে।

'ওই নামটা সবার মানসম্মান।'

'ঠিক বাবা, ঠিক।'

'ওটার জন্যে কতকাল লড়াই চলবে, তার লেখাজোখা নাই।'

এই সময় পল্টা বলল—'জল খাবো।'

শুনে ঘণ্টা বলল—'জল খাবো।'

পাতকুড়ো চিঁচিঁ করে ওইপ্রকার কী ইচ্ছে জানাল।

ফকিরচাঁদ বলল—'পালটফরমে জল আছে। কিন্তু যাওয়া ঠিক হবে না এখন। সকাল হতে দাও।'

পিপুলগাছের ঘন পাতার ভিতর হঠাৎ আগুনের ঝিলিক। প্রচণ্ড নির্ঘোষে এরা কাঠ হয়ে গেছে পলকে। ফকিরচাঁদ বাদে সবকয়টি চোখ বুজে গেছে। ফকিরচাঁদ শুয়ে থেকে দ্বারকা বেহুলা বাঁকীনদীর মাঠে শুয়ে থাকার কথা ভাবছে। ঝড় আর শিলাবৃষ্টির ঋতুতে এমনি করে ছোট্ট খড়ের কুঁড়ের ভিতর শুয়ে থেকেছে। ফকিরচাঁদের মন বলছে, চলো, চলে যাই, ফকিরচাঁদের গতর নড়ে না। কতদিন থেকে এই প্রত্যাবর্তনের সাধ মাথার ভিতর মগজ কুরে কুরে খায়, সে পা বাড়াতে পারে না। কোথাও একটা বাধার পাঁচিল, প্রচণ্ড তুফানকাঁপা নদী, হা হা হা হা ঝড়! আর শীত, এ কী শীত, বুকে দাঁত বসানো নিষ্ঠুর হিম, এ ঘোর নরক, 'আহা হা…' ফকিরচাঁদ ককায়। হঠাৎ বিষম শীত, হাড় কাঁপে থুথুর করে। ফাল্গুনের নিশিরাতে হাওয়া শিরশির করে পিপুলগাছের পাতায় পাতায়। পাতা ঝরে। শরীর গুটিয়ে ফকিরচাঁদ খামক বলে—'আহা হা হা!'

'বাবা, কী হলো? ও বাবা?'

'উঁ!'

'কথা বলছো না কেন?'

'বড় ঠাণ্ডা লাগে…'

'তা একটু ঠাণ্ডা আছে। নাকি জ্বর জ্বালা…' কপাল খুঁজে হাত এগিয়ে চলে লক্ষ্মীদাসীর!

ফকিরচাঁদ থামরু বলে—'তোমার হাতটা গরম, মা। এট্টুখানি রাখো।' তারপর পাশ ফিরে শোয়। গুলিবর্ষণ, বোমা বিস্ফোরণ, দমকলের ঘণ্টার শব্দ আগুন, ভস্মীভূত দিল্লীগামী ট্রেনের পৃথিবী ছাড়িয়ে সে দূরের দিকে চলে যায়, আরও দূরে। যেমন করে একদিন সে দ্বারকা-বেহুলা-বাঁকী নদীর প্রান্তবর্তী ফসলের ক্ষেতের দিকে থুপ থুপ করে হেঁটে গেছে।

কতক্ষণ পরে ফের সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। দিল্লীর রেলগাড়ি জ্বালানো আগুন কখন ফের নিজ বিবরে যেন আত্মগোপন করেছে। ইতিমধ্যে পূর্ব শিয়রে ভাঙা চাঁদ। রুগ্ন জ্যোৎস্না থমকানো অন্ধকারের গায়ে এসে হেলান দিয়েছে। যেন ঝড়ের ধুলোয় ম্লান কাচের ওপারে মানুষের শহর এখন রূপ-কথার মায়াপুরী।

দেখতে দেখতে ফকিরচাঁদের মনে প্রতীক্ষা—বিবরবাসী আগুন আবার বেরিয়ে আসতে দেরী কিসের? সে বুক চেপে ধরে ঘড়ঘড় করে বলে—'এইতে হয়ে গেল?' আর ভৌতিক জ্যোৎস্নায় রেলিঙঘেরা মাঠটার দিকে সে তাকায় 'লাশটা কি নিয়ে যেতে পেরেছে?' সে ফিসফিস করে বলে—'পাতকুড়ো, ঘুমোস্ নি বাছা।'

লক্ষ্মীদাসী চমকে মুখ তুলেছে। সেও যেন চ্যাপটা মোটানাকওয়ালা ইস্কুলের ছেলের লাশটাকে দেখবার চেষ্টা করছে। অথচ বার বার কেবল ঘাসখেকো সঞ্চরণশীল নির্বিকার গাধাদুটো জলছবির মতন ফুটে ওঠে। একবার মনে হয়, গাধাদুটো এ মাঠে যথেষ্ট ঘাস পায় নি। আর এ মাঠের রক্তমাখা ঘাসের ওপর হেঁটে হেঁটে হয়তো বা বড় বিমর্ষ তারা। হয় তো বা মুখ তুলে ফাটল-ধরা চন্দ্রোদয় দেখছে। কিংবা এই শহরের বুকে এখন গুরুতর শোক—এখন রাতের তৃতীয় যামে সেই শোকের স্তব্ধতায় বুঁদ হয়ে গাধাদুটি একান্তমনে বিষাদপান করছে আকাশের দিকে মুখ তুলে।

মধুপুরের ছেলেপুলের মা-হিসেবে খুবই রেগে গেল লক্ষ্মীদাসী। চাপা স্বরে ফোঁসফোঁস করে বলল, 'বাবা, ও বাবা!'

'উঁ?'

'ওই মাঠে দুটো গাধা আছে।'

'দেখেছি।'

'ওদের মরণ নাই?'

ফকিরচাঁদ হাসবার চেষ্টা করল। করে বলল—'না'

'ইচ্ছে করে পাটকেল ছুড়ে তাড়িয়ে দিয়ে আসি।' লক্ষ্মীদাসী ধুড়মুড় করে উঠল।

'উঁ হু হু হু। তা করো না।'

চাঁপাকে স্তন থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মীদাসী বলল—'বড় খারাপ লাগে কিন্তু। বুঝলে?'

ফকিরচাঁদ কী জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘণ্টাপল্টারা একই সঙ্গে ধুড়মুড় করে উঠে পড়েছে। 'জল, জল খাবো মা!'

লক্ষ্মীদাসী থাপ্পড় চালাল এলোপাথাড়ি। 'চুপ চুপ সব্বনেশে ডাকাতেরা, মরণ শিয়রে, পা বাড়াতে নাই, জানিসনে?'

ঘণ্টাপল্টারা ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে। কেবল পাতকুড়ো চুপ করেছে।

ফকিরচাঁদ বলল—'তা জল এখন খাওয়া যায়। পালাটফরমে কল আছে।'

এই শুনে লক্ষ্মীদাসী উঠল। 'এই রাক্ষস খোক্কস, ওঠ…চল্…' কিন্তু যেই উঠে দাঁড়ালো, একঝলক জোরালো আলো এসে পড়ল। তারপর জুতোর নালে ইটের চত্বরে খট্‌খট্ আওয়াজ। ব্যস্ততা আর দৌড়াদৌড়ি। কি একটা দারুণ গরম চুলের উপর দিয়ে ছুঁই ছুঁই করে ছুটে গেল আর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের বীভৎসতা। লক্ষ্মীদাসী অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে উবুড় হয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। ঘণ্টাপল্টা পাতকুড়ো একদৌড়ে বুড়োর কাছে চলে এসেছে—দুজানুতে তলপেটে মুখ ঘষছে। পাশে চাঁপা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

নাঃ, মরেনি লক্ষ্মীদাসী। বুক ঘষড়ে এগোচ্ছে। 'বাবা, বাবা গো…'

'মা…'

'আর এট্টু হলেই…'

'পালিয়ে আয়।'

বুটের শব্দ স্টেশনের ওদিকে। টর্চের আলো ক্রমশঃ বড় হতে হতে পিপুলতলার অন্ধকার জগতে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। তারপর খুবই কাছে—'কে? কারা এখানে?'

অভিজ্ঞ ফকিরচাঁদ উঠে বসে বলল—'সেলাম বড়বাবু! আমি ফকিরচাঁদ। ও লক্ষ্মীদাসী, আমার মেয়ে।'

লক্ষ্মীদাসী ঝড়ের মুখে ঝোপের মতন নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। মুখ তুলল না। যাদের হাতে তার প্রাণ যেত, আর প্রাণ গেলে ঘণ্টাপণ্টারা 'মা' বলে কাঁদত, একা, অসহায় কয়েকটি ছেলেমেয়ে এই পৃথিবীতে—তাদের দিকে তাকাতে বড় ত্রাস। জানু পাথরের অধিক গুরুভার। বুক কাঁপছে ধুক ধুক ধুক ধুক। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার বলার ইচ্ছে—'ওগো জজপুরুষেরা, দয়া করে চলে যাও'···এই ইচ্ছে পাথর আর ঠাণ্ডাভরা দেহ, দেহের সর্বত্র অবরুদ্ধ পোকার মতন নিঃসহায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ কী নিরুপায়।

'বড়বাবু, আমরা ভিখিরী। ইষ্টিশেনে ভিক্ষে করে খাই, বাবু।' ফকিরচাঁদ ফোকলা মুখ হা করে হাসছে।

'চালাকি করছো না তো?'

'আজ্ঞে না।' না শব্দটা ফোকলা হাসিতে 'লা' হয়ে গেল।

'মিছিলে এসেছিলে, লুকিও না!'

'আজ্ঞে তাও না।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর বিশ্রামাগারের ছাদে দড়বড় করে পাটকেল পড়ার আওয়াজ। তারপর শান্টিং লাইনের ওদিকে হঠাৎ এতক্ষণ পরে কোন অকেজো বগিতে আগুন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। বন্দুকের নল ঘুরিয়ে এরা ছুটল সঙ্গে সঙ্গে।

ফকিরচাঁদ বলল—'তামাশা করছে বড়বাবুদের সঙ্গে। বুঝতে পারলে গো?'

লক্ষ্মীদাসীর নীরব কান্না এতক্ষণে ফেটে পড়ল! 'বাবা, বাবা গো, যদি মরে যেতাম···'

'চুপ করো। হুই ছাখো, আবার লড়াই বেধে গেছে।'

আবার লড়াই বেধেছে। রেলিঙের পার্কটা কেন্দ্র করে শেষ রাতে এবার চরম লড়াই। চ্যাপটা মোটা নাকওলা ইস্কুলের ছেলেটির মৃতদেহ সবার চোখের ঘুম কেড়েছে। যে হাত আগুন জ্বালল, তার চোখে ওই ছবি। আর যে হাত গুলি ছুঁড়ল, তারও চোখে ওই ছবি।

পিপুলগাছের উত্তরে, ঠিক বৃত্তাকার চত্বরটার নিচেই একটা গভীর খাদ। গুড়ি মেরে এরা সেখানে এসে গড়িয়ে পড়েছিল একসময়। কারণ উপরের পৃথিবীতে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভোর রাতের অস্পষ্ট আলোয় অপেক্ষমান ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ছিল। পার্কের এককোণে গাধা দুটি তখনও ঘাস খাচ্ছিল নির্বিকারভাবে।

'পাতকুড়ো, পাতকুড়ো কই?' হঠাৎ আলো-আঁধারিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীদাসী অস্ফুট চিৎকার করল।

ফকিরচাঁদ খামরু তখন ঝিমোচ্ছিল। সে একটা স্বপ্ন দেখছিল। কিংবা দেখবার চেষ্টা করছিল। এমনি ফাল্গুনের সারাটি রাত গত বছরও সে বাবলতলীর নাবাল মাঠে তার ছোট্ট গমের ক্ষেতে কাটিয়েছে। এমনি হিমনম্র কুয়াশাময় রাত। আর ঠাণ্ডা ভেজা ন্যাকড়ার মতন চাঁদ যখন দ্বারকা-বেহুলা-বাঁকা নদীর পশ্চিম শিয়রে ঝুলছে, তখনও ফকিরচাঁদ খামরু বুড়ো নড়বড়ে গতরে খুরপী চালিয়েছে নরম অস্পষ্ট মাটিতে। শেষ রাতে দূর গোকরণের হাটুরেরা বেলডাঙার হাটের পথে যেতে যেতে চেঁচিয়ে ওকে বলেছিল—'হেই খামরু বুড়ো, রাত যে পুইয়ে গেল!' গেল তো গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই। কোথা দিন কোথা রাত কী গ্রীষ্মবর্ষা কী শরৎশীত ফকিরচাঁদ খামরু ক্ষেতে কাজ করে।...'শীতে মরে যাবে, বুড়োমানুষ!'...এইতে ফকিরচাঁদ হেসে বাঁচে না।...'তা অনেক শীত আমি দেখেছি। দেখতে দেখতে যাই।'...

ফকিরচাঁদ সেই স্বপ্ন দেখছিল। পলাশগাঁর মুকুন্দ কুনাই তাকে ডাকছিল—'চলো, চলো খামরু হে, মাঠের বাগে যাই।' 'আর এই সময় কোথাকার মধুপুরের লক্ষ্মীদাসী তাকে গুঁতোচ্ছে—'ও বাবা গো আমার পাতকুড়োটা কই?'

ক্রুদ্ধ ফকিরচাঁদ নড়বড় করতে করতে বলল—'কী জ্বালাতন! ছাখ গে না কোথা তোর হাতকুড়ো না কাতকুড়ো...'

লক্ষ্মীদাসী বুক চেপে ধরেছে দুহাতে। ওঠবার সাধ্য নেই। ওপরে বিষম গোলযোগ। কী সব চলছে, কে জানে।

'ওরে পাতকুড়ো রে মানিক আমার...'

ফকিরচাঁদ সামলে নিয়েছে। কোথায় বাবলতলীর মাঠ, কোথায় রূপপুর রেলস্টেশন! সে মাথা তুলে ওপরটা দেখল। স্টেশনের সিঁড়ির নিচে—অসংখ্য

দলপাকানো মোড়কআঁটা পাউরুটির দলা—আর তার উপরে আছে হাত পা ছড়িয়ে একটা ন্যাংটা ছেলে।

পাতকুড়ো ছাড়া কে হতে পারে! ইস্কুলের ছেলেরা তো পোশাক পরে থাকে। সুতরাং…

'মা, লক্ষ্মীদাসী, তোকে একটা কথা বলি। উতলা হবি না তো?'

'না, বাবা, না। বলো, কী দেখলে?'

'খাবলা খাবলা মানুষ।'

'আর, আর কী?'

'সবখানে হু হু আগুন জ্বলছে।'

'আর, আর কী দেখলে?'

'বেড়া ভেঙে একদল লোক ঢুকেছে ওই মাঠে।'

'ইস্কুলের ছেলেটাকে নিতে বুঝি?'

'হ্যাঁ। আর…' ফকিরচাঁদের থলথলে ফ্যাকাসে চোখ ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। আলোর হাত তার পাকা চুলের গোছা খামচে ধরেছে। তার চোখদুটি লক্ষ্মীদাসীর দিকে এগিয়ে আসছে।

'বাবা, অমন করে চেয়ো না। আর কী দেখলে?'

ফকিরচাঁদ স্তব্ধ।

লক্ষ্মীদাসী তাকে ঝাঁকুনি দ্যায়—'বলো, দোহায় তোমার!'

'উঁ!'

'পাতকুড়োকে দেখলে?'

'হুঁ।'

'দেখলে, সত্যিসত্যি দেখলে?' লক্ষ্মীদাসীর মাতৃজঠর থেকে আলো ছুটে এসে মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে।

'দেখলাম।'

'ও হতভাগা কী করছে ওখানে?'

'রুটি খাচ্ছে…' ব্যস্তভাবে ঝোলাঝুলি গোছাতে থাকে ফকিরচাঁদ। ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে কিংবা কাঁদে।

তখন লক্ষ্মীদাসী উঠল। খাদের উপর মুখ তুলল। পাউরুটির ওপর শুয়ে থাকা ছেলেকে দেখল। হাতে একটুকরো পাউরুটি, তার উপর রোদের আলো—রক্ত। 'কী দেখলাম কী দেখছি বাবা,…' লক্ষ্মীদাসী চিৎকার করে বাইরে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

আর ফকিরচাঁদ থামরুও উঠল। ঘণ্টা পল্টা তার দুপাশে খাড়া হয়েছে। লোভে মুখ চকচক করছে তাদের। কিছু একটা সুখকর ঘটেছে সম্ভবত। ঘুমন্ত মেয়ে চাঁপাকে কোলে তুলে নিয়ে খাদের পাড়ে উঠে গেল ফকিরচাঁদ। লক্ষ্মীদাসী হাত তুলে চিৎকার করে বলল—'খবরদার, এসো না এখেনে। ডাকাবুকো বুড়ো, সকল নাটের গুরু তুমি… ।'

বড়কর্তা আসবার আগেই ইস্কুলের ছেলের লাশে ফুলের মালা পরিয়ে শহর শান্ত হচ্ছিল। দীর্ঘ শোভাযাত্রা চলছিল জাতীয় মহাসভকে। ঘণ্টা-পল্টা চাঁপাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফকিরচাঁদ ফিরে আসছিল স্টেশনে পিপুলগাছের দিকে। গভীর দুঃখে সে আড়ষ্ট। পিছনে সারা শহর যেন তাকেই ষড়যন্ত্রকারী বলে ধিক্কার দিচ্ছে।

লক্ষ্মীদাসী তার ছেলেপুলেদের নিয়ে শোভাযাত্রার ভিড়ে এগিয়ে গেছে। শহর এতদিন পরে লক্ষ্মীদাসীকে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে—তাই সে অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে হাঁটছে। শোকের অহঙ্কারে শহরের মাথাও খুব উঁচু হয়ে গেছে।

এদিকে ভাঙা রেলিঙ গলিয়ে পার্কে নামল ফকিরচাঁদ। গাধাদুটি কি মালিকবিহীন? এখনও ঘাস খাচ্ছে। ফকিরচাঁদ দেখতে দেখতে ক্ষেপে গেল। তাড়া করল ইঁট তুলে। তারা নির্বিকার। মার খেলেও নড়ে না।

ঘাসের উপর রক্ত দেখবার সাধ হয়। ফকিরচাঁদ হাঁটু দুমড়ে বসে। ঘাসে রক্ত খোঁজে। তারপর নাক ঘষে। গন্ধ শোঁকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে গাধাদুটি যেন বিস্মিত। প্যাটপ্যাট করে তাকায়।

ঘাসে মানুষের রক্তের গন্ধ নেই। গন্ধ ধরা পড়ে না! তবু ফকিরচাঁদের মনে হয়, সারা জীবন এমনি করে মাটির উপর ঝুঁকে পড়ে সে কী একটা গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করেছে কেবল। মানুষের রক্তের গন্ধ—যা পাতকুড়োর ভুক্তাবশিষ্ট রুটিতে সে পেয়েছে—যা সে পেতে চেয়েছিল লুণ্ঠনাবশিষ্ট রুটিগুলিতে।

—

মালী

লোকটাকে একরকম পথ থেকে ধরে এনেছিলাম। কোমরে একফালি নোংরা ন্যাতা, একমাথা রুক্ষ চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, থ্যাবড়া নাক, হলুদ দাঁত—সে ছিল একজন সত্যিকার পথের লোক। সম্ভবত পথেই সে শুত ঘুমোত বসে থাকত খেত এবং হাঁটত। অন্তত তাকে দেখে সেই রকমই মনে হয়েছিল। অসম্ভব ঢ্যাঙা আধন্যাংটো একটা দেহ—নিতান্ত দেহ, যখন খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে হেঁটে যায়, সহজেই মনে হতে পারে যে সে থামতে পারে না। তার সামনে শুধু বাধাবিহীন পথ—যে পথে গাড়ি চলে না, লোকজন হাঁটে না—তাই সে একা। এবং এরকম পথ কদাপি তো জনপথ নয়; সবটাই তার ব্যক্তিগত। খুব ছেলেবেলা থেকে অশেষ পরিশ্রমে মাটি কুপিয়ে জঙ্গল সাফ করে জনপদ ভেঙে যেমন এ পথ সে তৈরি করেছে তার হাঁটবার জন্যে। আমৃত্যু সে শুধু হাঁটবে আর হাঁটবে।

শহরতলির দিকে থাকি। বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন থেকে নেমে তাড়াহুড়োয় রিকশোর সঙ্গে দরাদরি করছি। একগাদা জিনিসপত্তরের বোঝা আছে। রিকশোটা গড়াতেই হঠাৎ কোত্থেকে বিশাল ভূতের মতন লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। বড় বড় হলুদ দাঁত বের হাসল সে। তারপর আঙুল দিয়ে রিকশোর চাকার কাছটায় কী দেখাল।

আরে, তাই তো! একটু ঝুঁকে দেখি, নিনির জন্যে কেনা মস্তো পুতুলের প্যাকেটটা কখন পড়ে গেছে নিচে। রোখো, বলে চেঁচিয়ে লাফ দিয়ে নামতে যাচ্ছিলাম, লোকটা দৌড়ে এসে প্যাকেটটা কুড়িয়ে দিল। মুখে সেই অদ্ভুত হাসি—চমকে উঠলাম। এ কী হাসি! সারা মুখটা হাসছে। পুরু ভুরুর নিচে কোটরগত উজ্জ্বল আশ্চর্য একজোড়া চোখ! অবিশ্বাস্য—ভিখিরিদের এ চোখ আমি কখনও দেখিনি।

আমার মেয়ে নিনির জন্মদিনের এ পুতুল। ভিতরের দিকে খুব নরম জায়গায় টুং করে বাজল। কৃতজ্ঞতায় ওর হাতে একটা দশপয়সা গুঁজে দিতে গেলাম। নিল না—পিছিয়ে গেল। মুখ থেকে হাসিটা নিভে গেল হঠাৎ। সেই উজ্জ্বল আশ্চর্য চোখে দেখতে পেলাম কী যেন আকুতি। কপালের ভাঁজ-

গুলোকেও মনে হল ওরা সব বিষণ্ণতার বেখা। রিকশোওলা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, আদ্দেরে জামাই! ভাগ ব্যাটা।

আমি বললাম, ওহে রিকশোওলা, এক মিনিট ভাই।...পকেট থেকে আস্ত একটা আধুলি বের করলাম। হাসতে হাসতে বললাম, ঠিকই তো। দশ পয়সার আবার দাম আছে আজকাল? এই নাও ভাই...

রিকশোওলা বলল, আরে, ওকে ওসব কী দিচ্ছেন? ও নেবেই না দেখুন। ব্যাটা ভূত কোত্থেকে এসে উদয় হয়েছে—আস্ত বোবা। কথা বলতে পারে না। ওই দেখুন না কাণ্ড। বুঝতে পারছেন কী চায়?

লোকটা এবার একটা হাত মুঠো করে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল—সেই সঙ্গে আরেকটা হাতের ইশারায় তার সামনে পায়ের কাছে চারদিকে মাটির ওপর কী দেখাচ্ছিল। একটুও বুঝতে পারলাম না।

রিকশোওলা বলল, বুঝলেন না? পথের পাশে ওইসব জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছেন?

অবাক হলাম। - হ্যাঁ।

ব্যাটা সব সময় ওখানে বসে কাঠি দিয়ে মাটি খোঁড়ে। আস্ত শুওর।

কেন? মাটি খোঁড়ে কেন?

কে জানে কেন। পাগল ছাগলের কাণ্ড।

সে বুঝলাম। কিন্তু আমাকে কী চাচ্ছে ও?

রিকশোওলা প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, প্রথম প্রথম বুঝতাম না বাবু, এখন বুঝতে পারি। ও একটা খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়বে বলছে। তার মানে, ও মালীর কাজ জানে। মালীর কাজ চায় কোথাও। বুঝলেন?

সে তো ভালোই।...ওকে আমি কাছে ডাকলাম।

এবং এভাবেই সে আমার বাড়ি চলে এল। সামনে একটুখানি জমিতে সে মালীর কাজ করতে থাকল দিনের পর দিন। সে কথা বলে না। বলতে পারে না। কিন্তু তার নিষ্ঠার শেষ নেই। আমার ছেলেমেয়েদের সে ভালোবাসে। তাদের ঘোড়া হয়ে পিঠে বয়। তাদের সঙ্গে খেলাধুলোও করে। দৌড়ে বল কুড়িয়ে আনে। কখনও সখনও সংসারের ফাইফরমাসও খাটে। জানতে পারছিলাম, সে পাগল নয়—বোবা। এবং ভীষণ দুঃস্থ। হয়তো বেকায়দায় পড়ে বিনাদোষে কোন বড়লোকের বাগানের মালীর কাজটা তার চলে গিয়েছিল।

তারপর একদিন দেখি, আমাদের বাড়িটা যেন ওই লোকটির হাসির মতন আশ্চর্য সরল একটি হাসিকে ফুটিয়ে তুলছে। সামনের জমিতে ফুল ফুটেছে নানা রঙের। একফালি ফুলবাগিচা এসে বাড়িটাকে যেন উদ্দেশ্যময় করে তুলেছে। আর সে মাঝে মাঝে ফুলের গাছের নিচে থেকে মাথা তুলে হঠাৎ দাঁড়ায়। চার পাশটা দেখে নেয়। কী ভাবে। আবার হাঁটু দুমড়ে বসে নিজের কাজ করে যায়। কখনও সে বাগিচা থেকে একটু দূরে সরে এসে কী লক্ষ্য করে। ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবে। মাথা দোলায়। বড় অদ্ভুত তার আচরণ। আমি কিছু বুঝতে পারিনি।

কিন্তু তার এই কাজের মধ্যে দিয়ে আমার একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটছিল চুপিচুপি। জানালার বাইরে বাগানটুকুর দিকে তাকালেই হঠাৎ আমার মনে হচ্ছিল, জীবনে এতগুলো দিন যেন অকারণ ব্যস্ততায় কাটিয়ে দিয়েছি···এবার অবকাশের দিকে মাঝে মাঝে চোখ মেলা দরকার। এত বেশি কেজো মানুষ হবার সত্যি কোন লাভালাভ ছিল কি? এত হুটোপুটি ট্রেন ধরার জন্যে নাকে মুখে ভাত গুঁজে দৌড়নো, ফাইলপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি, বার বার নানা অছিলায় বড় সায়েব ছোট সায়েবের মুখ দেখে আসা—যেন 'এইতো স্যার, বান্দা সব সময় আপনার সেবার জন্য তৈরি' বলার প্রাণপণ প্রয়াস, দারুণ ধরনের দাসমনস্কতা, বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরার জন্যে আধঘণ্টা আগেই লিফটে মরণঝাঁপ—সব কুৎসিত মনে হতে লাগল। এক সার্বভৌম সত্তা আমার কেজো মানসিকতার বস্তা ফুঁড়ে গজিয়ে উঠছিল দিনে দিনে—বাজাব মতো দাম্ভিক তার আচরণ। সে এক ঋজু বৃক্ষের উদ্যমে আকাশভেদী। চাকরকে সে ঘৃণা করে।

হঠাৎ দেখেছি বুগানভেলিয়ার লাল ফুলের ঝাঁক, হঠাৎ মনে হয়েছে আমি কোনখানে এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর! ওই সবুজ পপি চারার ঝাঁকে সম্ভাবিত নক্ষত্রের প্রতীক দেখেছি—যে নক্ষত্র আকাশের কোন প্রান্তে জন্মের অপেক্ষায় ছটছট করছে। প্যান্সির সরু ডালের ডগায় হরিদ্বর্ণ প্রস্ফুটন দেখে মনে হয়েছে, কেন আজ আমার ছুটি নেই? ছুটি—হ্যাঁ, এই ছোট দু অক্ষরের শব্দটি কিন্তু এক বিশালতা বা পরিব্যাপ্তির দরজা খোলার ঘণ্টাধ্বনি। একেকটি প্রস্ফুটন এবং একেকটি নতুন নতুন দরজা খুলে যাওয়া। প্রতিদিন এর ফলে আমাকে নিপুণভাবে দাড়ি কামাতে হয়। সব সময় থাকতে ইচ্ছে করে পরিপাটি ফিটফাট

ফুলবাবুটি। দেহের মাংস সুগন্ধে ঢেকে রাখতে ব্যস্ত হই। স্নো-ক্রীম পাউডার পেন্টের খরচ বেড়ে যায়। স্ত্রী বলেন, তুমি বড় সুন্দর হচ্ছ দিনে দিনে। ব্যাপার কী? কোথাও লুকিয়ে প্রেমট্রেম করছ না তো?···আমি শুধু হাসি। কখনও বলি,—তার উদ্দেশ্যে নয়, নিজেকেই বলি—জীবনের বড় মায়া।

জীবন। হ্যাঁ, জীবনের দিকে চোখ দুটো ঘুরে গিয়েছিল। সেই বোবা লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে যখন দেখতাম, ভিজে মাটি থেকে বীজ ফাটিয়ে সূর্যোদয়ের মতো অঙ্কুরোদ্গম, মন ভরে যেত সৃষ্টির বিহ্বলতায়। তারপর আস্তে আস্তে তার রঙ সবুজ হয়েছে, নরম ডগা বাড়িয়ে দিয়েছে সে আকাশের দিকে, শিশুর মতন তার সরলতা এবং নিষ্পাপ ক্ষুধা, তার তৃষ্ণার ধ্যান পৃথিবীর গভীরে, তারপর চিরোল পাতার উদ্ভব, তার ছোট্ট ব্যাপ্তির আকুলতা···এসব কী অসাধারণ অবিশ্বাস্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ করছি আমি। কোথায় ছিল এরা? কেমন করে এল? কেন এল?···লোকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে —আঙুল তুলে দেখিয়েছে যেন সেই অলৌকিককে। আমার প্রশ্নময় বিস্ময়কে তার মূকত্ব যেন একটা লম্বা উঁচু দেয়াল দিয়ে রুখেছে। আমার মনে হয়েছে, কেন এল এই প্রাণ, কোথা থেকে এল—কোথায় বা সেই পরিব্যাপ্ত প্রাণময়তার বহতা ধারা—সবই ওর জানা। ও বোবা, তাই সে রহস্য প্রকাশ করতে পারছে না। জীবনের মূল যা কিছু, সবই ও এতদিন ধরে খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলেছে যেন। তাই প্রকৃতি ওর কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।

আমার ভিতরের পরিবর্তন বাইরে প্রকট হচ্ছিল। খুব ঢিলেঢালা আলস্যে এবং বেশ খানিকটা ভোগী হয়ে পড়ছিলাম। আপিসে লেট হত। ফাইলের কাজ জমে যেত। মাইনে কাটা যাচ্ছিল। তবু বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে—আসতে বা যেতে দূর থেকে বাগানটা দেখে আমার মনে হত আমি সুখী। আমার ছেলেমেয়েদের মনে হত আরও সুন্দর আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আমার স্ত্রীকে ওই বাগানের ধারে দেখলে মনে হত পরীদের কেউ না কেউ এসে গেছে আজ।

সেই লোকটাকে আমি আমার জীবনের অচ্ছেদ্য সত্তা ধরে নিচ্ছিলাম। ওকে এত ভাল লাগছিল। ওকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবার চেষ্টা করছিলাম যথা-সাধ্য! ভাল জামাকাপড় জুতো ভাল খাবারদাবার—এমনকি সিগ্রেটও কিনে দিতাম। কিন্তু ও ছুঁত না পোষাক-আসাক জুতো সিগ্রেট ভাল খাবার-দাবার। শুধু হাসত। আর বেছে নিত নিতান্ত একটা গামছা আর গেঞ্জি। ফুলগাছের

সীমানার বাইরে সে বড় একটা থাকতে চাইত না। শুধু রাত্রিবেলাটা সে তার খাটিয়াটা বাইরের বারান্দায় পেতে ঘুমোত কিংবা ঘুমোত না। কারণ, কতবার গভীর রাত্রে বাইরে তার নড়াচড়ার শব্দ শুনেছি। কতবার জ্যোৎস্নায় কিংবা অন্ধকারে তার বিশাল ঢ্যাঙা দেহটা নড়তে দেখেছি বেড়ার ধারে। সে কি বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম কিংবা ফুলের প্রস্ফুটন লক্ষ্য করতে চাইত? আমারই মতো?

আমারও ঘুম ভেঙেছে হঠাৎ মধ্যরাতে। জানালা দিয়ে হাওয়া এসেছে। তাই, ঘরের ভিতরটা মউমউ করছে হাসনুহানা কি রজনীগন্ধার মিঠে গন্ধে। এতক্ষণ ঘুম আসেনি। হয়ত গভীর সুখে হয়ত বা গভীর বিস্ময়ে।

হঠাৎ একদিন আমার ছোট ছেলে মিঠু দৌড়ে এসে বলল, বাবা বাবা! দেখে যাও—একটা গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে।

বেরিয়ে দেখি, সত্যি তাই। এত বড় হাসনুহানার ঝাড়টা, পাতাগুলো মিইয়ে গেছে। দৌড়ে গিয়ে কাছে দাঁড়ালাম। কোন রোগে ধরেছে? লোকটা নিজের মনে কাজ করছিল। একটা গোলাপের গোড়া খুরপি দিয়ে কোপাচ্ছিল। তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ব্যাপারটা দেখালাম। সে একবার তাকাল মাত্র গাছটার দিকে। ফের মাটি কোপাতে থাকল। দুঃখে আমার মনটা অস্থির। তার সামনে গিয়ে ধমক দিয়ে বললাম, গাছটার কী হয়েছে দেখবে, না কী?

জবাবে মুখ তুলে একবার দেখে নিল আমাকে। ঠোঁটের কোণটা একটু কুঁচকে গেল। কেমন সূক্ষ্ম একটু হাসি যেন। ফের সে খুরপি চালাল ঘাসের গোড়ায়।

পরদিন দেখি, প্রকাণ্ড বুগানভেলিয়া হেলে পড়েছে—মিয়নো পাতা। রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে গোড়াটা লক্ষ্য করলাম। মৃদু টান দিতেই ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল। কে মূলের দিকটা নিপুণভাবে মাটির ভিতরে কেটে দিয়েছে।

নির্ঘাত কোন প্রতিবেশী পরশ্রীকাতর মানুষের কীর্তি। কারণ, আমার তো কোন শত্রু আছে বলে মেনে নিতে পারছি না।

মালীকে ডেকে দেখালাম। সে শুধু আমার দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে সেই কুঞ্চনটা দেখতে পেলাম এবার। তারপর সে যখন খুরপি হাতে নিয়ে এগোচ্ছে, বললাম, তোমার কোন দুঃখ হচ্ছে না? রাগ হচ্ছে না?

বোবা মালী গ্রাহ্যই করল না কিছু।

তার পরদিন আমার সবচেয়ে প্রিয় মালতী লতাটার মৃত্যু হল।

পরের দিন গেল কামিনীচারাটা।

তারপর প্রতিটি সকাল মানেই একেকটি দুঃসংবাদ। একেকটি ভয়ংকর বিনাশ। একটি করে নিদারুণ দুঃখ।

তাকিয়ে দেখি, সাজানো বাগান শেষ হয়ে গেছে প্রায়। নষ্ট সৌন্দর্যের হাটে যে প্রজাপতিটা অভ্যাসের বশে উড়ে আসছে, তাকে বড় অলীক লাগে। আশ্চর্য, বোবা মালীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আগের মতো ইশারায় বীজ বা কলম আনতে বলে না নার্সারি থেকে। কী যেন ভাবে। আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায় শ্মশানের মাঝখানে, ঠোঁটের কোণে সেই সরু কাঁপনটা লক্ষ্য করে চমকে উঠি।

সেরাতে জেগে আছি কড়া পাহারায়। শত্রুকে আজ হাতে নাতে ধরবই ধরব। মধ্যরাত পেরোল। চাঁদ উঠল দিগন্তে। ক্ষয়ের চাঁদ। আবছা জ্যোৎস্না। হঠাৎ একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। চুপিচুপি বেরিয়ে গেলাম। বাগানে কে একজন কিছু করছে। টর্চ জ্বাললাম। চমকে উঠলাম। শরীর শিউরে উঠল! শেষ গাছটির তলায় ঘাসকাটা লম্বা ছুরি ফুঁড়ে বসে আছে আমার সেই বোবা মালীটা!

পরক্ষণে সে মুখ ফেরাল এদিকে। বড় বড় দাঁতের ও হাসি তো মানুষের নয়। আসলে ওটা হাসিই নয়। দিনের সেই সরল হাসির এ এক বিকৃত দর্পণবিম্ব।

চিৎকার করে উঠলাম, শয়তান!

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর আমাকে একটুও গ্রাহ্য না করে বেড়া ডিঙিয়ে বেশ আস্তেসুস্থে পা ফেলে জ্যোৎস্নাময় দুর্গমতায় মিশে গেল।

একটা পিস্তল ও ডুমুর গাছ

বোকা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, ছিরুদা যে গো! কখন এলে?

বললাম, রাত্তিরে। তুমি কেমন আছ, বোকা?

খুব ভাল না, খুব খারাপও না। বলে বোকা এসে বারান্দার ধারে পা ঝুলিয়ে বসল।

ওর মধ্যে একটা রূপান্তর চোখে পড়ল এবার। দুবছর আগেও গ্রামে এসে ওকে হাসিখুশি দেখেছি ছোটবেলার মতোই। এখন দেখছিলাম পোড়খাওয়া চেহারা, বসা চোখ, ঠেলেওঠা চোয়াল আর নাক। ওর পরনে আঁটোসাঁটো ছাইরঙা প্যান্ট, নীলচে হাতকাটা গেঞ্জি, পায়ে রবারের দুফিতের স্যাণ্ডেল। তাছাড়া ওর চোখের চাউনিতে শীতলতা, পাতা পড়ে না। কণ্ঠস্বরও মৃদু। ওর হাতে একটা গামছা, সেটা ছোট্ট পুঁটুলির মতো জড়ানো। জিগ্যেস করলাম, অসুখ হয়েছিল নাকি?

বোকা আস্তে মাথাটা নাড়ল।

গামছায় কী?

পিস্তল।

অন্তত আধমিনিট লেগে গেল শব্দটা বুঝতে। তারপর হেসে ফেললাম। 'পিস্তল' নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে এখন?

টার্গেট প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি।

আরও হেসে বললাম, কোথায় টার্গেট প্র্যাকটিস করবে?

বোকা ঘুরে পেছনদিকের ছোট্ট পানাপুকুরটা দেখিয়ে বলল, ঘাটের মাথায় ডুমুর গাছটা দেখছ, ওখানে।

আমাদের বাড়ির এদিকটায় মাঠ। এই চৈত্রে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের দরুন চোখে আঠার মতো মেখে যায় বিশাল একটা সবুজরঙের কোমলতা। বারান্দার উত্তরে পানাপুকুরের দিকটা সমসমস নিঝুম নিরিবিলি হয়ে থাকে। পুকুরের তলায় ঠেকেছে জলটা। তাই ঘাটটাও স্মৃতিচিহ্নে পরিণত। তার মাথায় ওই ডুমুরগাছ, বয়সে ঠাকুর্দারও ঠাকুর্দার মতো প্রাচীন এবং যথেষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ তার চেহারা। ঠাকুর্দা ছিলেন রেলের চাকুরে। ছুটিতে এসে এই বারান্দায় বসে বলতেন, এখানটাতেই যত শান্তি। ঘাটে বসে থাকোমণি বেওয়া, সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবতী ছিলেন তিনি, একটা ছোট্ট পেতলের ঘটি মাজতে সকালকে দুপুর এবং দুপুরকে বিকেল করে ছাড়তেন এবং আমাকে দেখামাত্র ঠাকুর্দা চোখ পাকিয়ে বলতেন, খেল গে যাও। সুতরাং আজও ওই ডুমুরগাছটার দিকে তাকালে হাস্যমুখী থাকোমণির দর্শন পাই, যিনি ঠাকুর্দার শাস্তি।

বোকার কথাগুলোকে বারকতক টিপে-টুপে পরীক্ষা করে দেখে আবার হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকলাম। তখন বোকা আলতো হাতে গামছার মোচড় ফাঁক করল। তারপর সত্যিসত্যি বেরিয়ে পড়ল অবিশ্বাস্য একটা পিস্তল।

আমার হাসি থেমে গেল। বোকা পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে বলল, ওরাসে মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম। পদ্মার বর্ডারে। তেরশো টাকায় কিনে এনেছি। বর্ডার এরিয়াতে মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে।

বলো কী?

বোকা একটু হাসল। গাঁসুদ্ধু শত্রু। বাঁচতে তো হবে।

হিম হয়ে বললাম, কেন? কী করেছ তুমি?

কিছু শোননি? বোকা একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, গতবছর বাবাকে নদীর ধারে বোম মেরে মারল। মাসতিনেক আগে দাদাকে স্ট্যাব করে মারল। এবার টার্গেট আমি। ব্যাঙামিত্তির বলেছে, পোদো ঘোষের বংশ ফিনিশ করবে।

মিত্তিরদের সঙ্গে ঘোষেদের বিবাদের কথা আবছা শুনে আসছি ছোটবেলা থেকে। গ্রামে তো এসব ব্যাপার ঘটেই থাকে। কখনও ওনিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু বোকার বাবা ও দাদাকে খুন করা হয়েছে, এবং বোকার হাতে পিস্তল—উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, বিবাদটা কী নিয়ে?

বোকা বলল, জানি না। বাবা জানত হয়তো।

নিশ্চয় জমিজমা নিয়ে?

বোকা মাথা নাড়ল। নাঃ! তাহলে তো আমি জানতে পারতাম। বলে সে কিছুক্ষণ পিস্তলটার নকশাকাটা বাঁট থেকে ময়লা খুঁটে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর মুখ তুলে একটু হাসল।...প্রথমে ঠিক করেছিলাম রিভলবার কিনব। কিন্তু ভেবে দেখলাম রিভলবারে মোটে ছটা গুলি থাকে। তাতে জনকে ফিনিশ করতে পারব। কিন্তু লোক তো আরও বেশি। পিস্তলে আঠারোটা পর্যন্ত গুলি থাকে। পঁচিশ ফুট থেকেও গুলি ছোঁড়া যায়। একবার ঘোড়ার টানছ, গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার একটা গুলি এসে জায়গামতো বসছে। কত সুবিধে তাহলে ভাবো ছিরুদা!

পিস্তলটা দেখে আমার ভীষণ লোভ হচ্ছিল। গা শিরশির করছিল উত্তেজনায়। জীবনে এই প্রথম হাতের নাগালে একটা সত্যিকার পিস্তল দেখছি। ইচ্ছে করলে ওটা হাতে নিতেও পারি। হাতে নিলেই যেন বা এই সসাগরা পৃথিবী আমার পদানত হবে। আসলে ক্ষমতার উৎস তো এইরকম ইস্পাতের নল। যদিও এই নলটা খুব ছোট, আমার মতো মানুষের পক্ষে একটা ছোট্ট পৃথিবীর শাসন ক্ষমতাই যথেষ্ট। আমার চোখে নিশ্চয়ই প্রচুর বিহ্বলতা এসে গিয়েছিল। কৈ, গুলি দেখি। বলে চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে গেলাম।

বোকা বলল, দেখাচ্ছি। প্যান্টের পকেটে ঢোকানো যায় না তাই গামছায় জড়িয়ে রাখি। তবে গুলি পকেটে রাখা যায়। এই ছাখো।

সে পা টানটান করে পকেট থেকে একটা গুলি বের করে দেখাল। ক্ষুদে রকেটের মাথার মতো ছুঁচলো গড়নের গুলি বোকা আমার হাতে দিচ্ছিল নিলাম না। বললাম, থাক।

বোকা গুলি পকেটে ঢুকিয়ে বলল, পরশু মাঠে বোরোধানে জল খাওয়াচ্ছিলাম। তখন ওরা বোম নিয়ে তাড়া করেছিল। পিস্তলটা এখনও তত প্র্যাকটিস হয়নি। তাই রিস্ক না নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। তুমি এখন কয়েকদিন আছ তো ছিরুদা?

না। কালই যেতে হবে।

বোকা উঠে দাঁড়াল।...থাকলে দেখতে পেতে। শিগগির একটা কিছু হয়ে যাবে এস্পার-ওস্পার। বলে সে হাল্কা পায়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে উঠল। কালকাসুন্দে আর নিশিন্দাঝোপের ভেতর দিয়ে ওপাশে তাকে ডুমুরতলা ঘাটের দিকে যেতে দেখছিলাম।

উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম। বোকা ডুমুরগাছটার তলায় গিয়ে সিগারেট ধরাল। তার হাতে একটা সত্যিকার পিস্তল, অথচ আমার সামনে সিগারেট টানেনি—একথা ভেবে আমার খুব ভাল লাগল ওকে। বোকা, তুমি জিতে যাও। ওদের ফিনিশ করে তুমি বেঁচে থাকো। মনে মনে ক্রমাগত ওকে বলতে থাকলাম। একটুতেই পেন্টুল খসে পড়া, নাকে ছিকনিঝরা তুলতুলে পুতুলের মতো ঘোষ বাড়ির সেই ছেলেটা, যে সবসময় খিটখিট করে হাসত, ঘুমিয়ে থাকলে আমার চুল টেনে দিয়ে পালাত, এই ঘাসজমিটায়—আমাদের এই বিপর্যস্ত বাগানে বিকেলে তাকে ডিগবাজি খেতে দেখেছি, একটা ছাগল ছানার মতো! ঘোষগিন্নি চেরা গলায় হাঁক দিতেন, অনিল রে, ও অনিল! ছেলেটা এসে লুটিয়ে পড়ত ঠাকুর্দার এই শান্তির ঘরে এবং ফিসফিসিয়ে বলত, বোলো না যেন ছিরুদা! মা মারবে!

সেই ছেলেটা পিস্তল নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে চায় নেহাতই বেঁচেবর্তে থাকার জন্য। আমার কষ্ট হচ্ছিল। বোকা, তুমি গুলি চালাও, আমি দেখি। ও ডুমুরগাছটা হোক তোমার শত্রুর প্রতীক। তুমি ওকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফ্যালো। ঝাঁঝরা করে দাও ওকে!

গাছেরা বুঝি সব বোঝে। মনে হল, স্থিতপ্রজ্ঞ বৃদ্ধ ডুমুর সিটিয়ে

হাসছে। আর বাপ, বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছি। হাত প্র্যাকটিস করে নে যত খুশি।

ডুমুরগাছটাকেও আমার খুব ভাল লেগে গেল। সে বোকাকে বাঁচতে সাহায্য করার জন্য তৈরি। গ্রামীণ বৃক্ষদের এই স্বভাব। ছায়া দেয়। ফল দেয়। সারাদিন অক্সিজেন দেয়। বুক পেতে টার্গেট হয়। নাও বোকা, এবার গুলি ছোঁড়ো, আমি দেখি।

বোকা গাছটার দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে তো টানছেই। আমি অস্থির। একটু পরে হঠাৎ দেখি, বোকা হনহন করে এগিয়ে নিশিন্দাজঙ্গলে ঢুকল। তারপর আর তাকে দেখতে পেলাম না।

তারপরই দাদা এসে গেল। ব্যস্তভাবে চাপা গলায় বলে উঠল, অ্যাই ছিরু! ভেতরে এসে বস শিগগির! আঃ, চলে আয় না!

দাদা আমাকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে এদিকের দরজা বন্ধ করে দিল। ফিসফিস করে বলল, পুলিশ ডেকে এনেছে ব্যাঙাদা। বোকা ডুমুরতলায় রোজ পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। বুঝলি না? হাত প্র্যাকটিস। তাই তাহের দারোগাকে নিয়ে এসেছে। ওই ছাখ!

জানালা দিয়ে দেখলাম, একদঙ্গল পুলিশ এসে ডুমুরতলায় দাঁড়াল। কিছু ভিড়ও জমছে। ব্যাঙা মিত্তির ডুমুরগাছটা দেখিয়ে কিছু বলছে। তারপর দেখলাম, দারোগাসায়েব গাছটার দিকে ঝুঁকে গেলেন। আঙুল দিয়ে গুঁড়িতে সম্ভবত গুলির দাগগুলো ঠাহর করতে থাকলেন। বুঝলুম, রীতিমতো একটা তদন্ত হবেই।

দাদা এবার জানালাটাও বন্ধ করে দিল। ভয়পাওয়া গলায় বলল, এ ঘরে থাকিসনে। ভেতরে চলে আয়। আমরা বাবা গ্রামের সাতে-পাঁচে থাকি না। তাহের দারোগা জিগ্যেস করলে বলব, গুলি-ফুলির শব্দ-টব্দ আমরা শুনিনি।...

বিকেলে আবার ঠাকুর্দার সেই শান্তিস্থলে চেয়ার পেতে বসে আছি, রাম মোহান্তের মেয়ে ঠুমরি এসে হাজির। আমার ছেলেবেলায় মোহান্ত কাঁধে খোল ঝুলিয়ে রোজ ভোরবেলা গাঁ চক্কর দিত। এতটুকু ফ্রকপরা মেয়েটা বাজাত খঞ্জনি। বাবা-মেয়ের গানের কলি এখনও খঞ্জনির হৃদয়ভেদী ধ্বনিসমেত। সেই ঠুমরি! কানের ভেতর সেঁটে আছে খোলের শব্দ। বললাম, ঠুমরি, তুমি কেমন আছ?

ঠুমরি আমার কথায় কানই করল না। চঞ্চল চাউনিতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে আনমনে বলল, বোকাদাকে দেখেছ গো ছিরুদা ?

না তো! কেন ?

ঠুমরি বলল, ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভীষণ দরকার। বাড়িতেও পাচ্ছি না। ভাবলাম ডুমুরতলায় আছে নাকি। সত্যি ছাখোনি ওকে ছিরুদা ?

ঠুমরি চলে গেলে বউদি এল গল্প করতে। হাতে দুকাপ চা। ধরিয়ে দিয়ে বলল, ঠুমরির গলা শুনলাম যেন। কৈ সে ?

চলে গেল। বোকাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বউদি চটুল হাসল। অ্যাদ্দিন এলে ডুমুরতলায় দুজনের যুগলমিলন দেখতে পেতে। আজকাল তো লাজ-লজ্জার বালাই নেই মানুষের। বউদি গলা চেপে বলল ফের, প্রকাশ্যে ডুমুরতলায় ওরা যা করে, দেখলে ভাবতে, কোথায় লাগে সিনেমার সিন! আমরা ঘরে বসেই দুবেলা সিনেমা দেখেছি, বুঝলে তো ঠাকুরপো ?

বুঝলাম। কিন্তু বোকা তো বরাবর গোবেচারা ছেলে ছিল।

বউদি চোখ পাকিয়ে বলল, থামো! নামে বোকা, ভেতরে যা আছে তা আছে।

আছেটা কী শুনি ?

বউদি গম্ভীর হয়ে বলল, বোকা ভীষণ ডেঞ্জারাস ছেলে। হাসিমুখে মানুষ খুন করতে পারে, জানো ?

করেছে কি ?

করেনি, এবার করবে। হাতে পিস্তল পেয়েছে। প্র্যাকটিস করছে রোজ। বলে বউদি বালিকার মতো চঞ্চল পায়ে শূন্য বাগানের ঘাসে টহল দিতে গেল এবং হাতে চায়ের কাপ। আর মেয়েরা এমন যে, যেখানে হাঁটে চারপাশে জেগে ওঠে ফুলের বন। প্রজাপতি ওড়ে। কোকিল-টোকিল খুব চ্যাচায়। এসবের ফলে বোকা, তার পিস্তল ও ডুমুরগাছটাকে ভুলে গেলাম সে-বেলার মতো।

রেরাতে ঘুম ভেঙে গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। ধুড়মুড় করে উঠে বসলাম। কোথাও মুহুর্মুহু বোমা ফাটছে এবং আবছা হল্লার শব্দ। বাইরে হুঁশিয়ারি শোনা গেল, বেরুসনে ছিরু। রোজ রাতে এইরকম। চুপচাপ শুয়ে থাক। আমরা কারুর পাঁচ-সাতে নেই!

বিস্ফোরণের শব্দ ক্রমশ থেমে এল। তারপরও কুকুরগুলো কতক্ষণ ধরে ডাকল। শেষদিকে শুধু একটা কুকুর ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে ফেলল। তার ডাকে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু জবাব দেবার কেউ নেই।

সকালে শুনলাম বোকাদের বাড়িতে হামলা হয়েছিল। বোকাকে 'ফিনিশ' করেছে। গাঁয়ে পুলিসের ক্যাম্প বসছে। তাহেরদারোগা ব্যাঙা মিত্তিরকে নিয়ে গেছেন। দাদার মতে, ওবেলা তাঁকে রেখে যাবেন দারোগাসায়েব। কেস লেখা হবে ডাকাতির।...

বোকার পিস্তল বোকাকে বাঁচাতে পারেনি। পরপর আঠারোটা গুলি ছোঁড়া যায়, তবুও। অবাক হয়ে বারান্দার সেই অংশটুকু দেখছিলাম, যেখানে কালই সকালে বোকা বসেছিল। তারপর মুখ তুলে দেখলাম পানাপুকুরের ঘাটের মাথায় ডুমুরগাছটাকে। সেই স্থিতপ্রজ্ঞ বৃদ্ধ বৃক্ষ নির্বিকার। বুড়ো, তুমি ব্যর্থ হয়েছ। বুক পেতে দিয়েছিলে, তবু কাজে লাগল না। আসলে দিনকাল খারাপ। তুমি কী করবে বলো?

গাছটাকে কাছ থেকে দেখতে গেলাম।

গিয়েই দেখতে পেলাম ঠুমরিকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। লাল চোখ, ফুলো-ফুলো গাল, মেয়েটা তাকিয়ে আছে গাছটার দিকে।

ক্রুদ্ধ প্রফেট যিশু ডুমুরগাছকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তুমি বন্ধ্যা হও।

রামলোচন মোহান্তের মেয়ে তাকে অভিশাপ দিল, তুমি মরো! তুমি মরো! তুমি মরো!

তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডুমুরগাছটা কি শিউরে উঠল? একটা হাওয়া এল মাঠ থেকে। একটা কাঠবেড়ালি পড়ি কী-মরি করে গাছটা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠল এক মাছরাঙা পাখি। আর দেখলাম, গুঁড়ির ওপর অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন চোখ হয়ে যাচ্ছে—অসংখ্য ভিজে চোখ দিয়ে বৃদ্ধ বৃক্ষ মোহান্তের মেয়েকে দেখছে। বৃক্ষেরা এত অসহায়!

তক্ষুনি সরে এলাম। কান্নাটান্না আমার একেবারে সয় না।.....

আরেক জন্মের জন্য

ছুটি নিয়ে গিয়েছিলুম প্রতাপগড়। ছোটনাগপুর পাহাড়ের একটেরে এই হিলস্টেশন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্যে প্রসিদ্ধ। সরকারের পর্যটন দপ্তরের কিছু কটেজ আছে। কিন্তু অত পয়সা কোথায়? আমার বন্ধু শিবনাথের মামার বাড়ি ওখানে। মামা-মামীর ছেলেপুলে নেই। একতালা সেকেলে একটা মস্তো বাড়ির মালিক। অনেকগুলো ঘর আছে। একটা ঘর পাওয়া এমনিতেই সহজ ছিল। তাতে ভাগ্নের বন্ধু। অতএব বিনিপয়সায় শুধু ঘর নয়, খাওয়াদাওয়াও জুটে গেল। স্নেহের অতিথি হয়ে থাকবার সুযোগ পেলুম।

আমি অবশ্যি এভাবে পরের ঘাড়ে চেপে বসার পক্ষপাতী নই। ভীষণ বাধে। কিন্তু ওঁরা ছাড়বেন না। অতএব আর ও নিয়ে মাথা ঘামালুম না।

নতুন কোন জায়গায় গেলে আমার বরাবর অভ্যেস, পায়ে হেঁটে ঘুরি। এভাবেই জায়গাটা পুরোপুরি নাড়ি নক্ষত্রসুদ্ধ চেনা হয়ে যায়। কতকিছু জানাও যায়। সেভাবেই জানতে পারলুম, নদীর ধারে একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে সেকালের বাঙালী বিপ্লবীরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাড়িটা তখন ছিল এক মুসলমান ব্যবসায়ীর। কলকাতায় ব্যবসা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভদ্রলোক ছিলেন কট্টর ইংরেজ বিরোধী এবং বিপ্লবীদের সমর্থক। পরে এই বাড়িতেই বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছিল। তিনজন বিপ্লবী মারা যান। আর বাড়ির মালিকও সে রাতে উপস্থিত ছিলেন। সাংঘাতিক আহত হন। তারপর তাঁকে কালাপানিতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। আর ফেরেন নি।

শিবনাথের মামা ব্রজেশ্বর আমাকে কথায় কথায় বিপ্লবীদের ওই কাহিনী বলেছিলেন। কিন্তু বাড়িটা খুঁজে বের করেছিলুম আমি নিজে। বিহার সরকার ওখানে একটা শহীদস্তম্ভ করে দিয়েছেন। বাড়িটা অবশ্য একটা জঙ্গুলে ঢিবি হয়ে গেছে এখন। শুধু নদীর দিকে মার্বেলপাথরে বাঁধানো ঘাটের খানিকটা টিকে আছে। মার্বেলগুলো নেই—তলার লাইমকংক্রিট অটুট রয়েছে।

ওই তিন বিপ্লবীর একজন মহিলা, হেমাঙ্গিনী দাশগুপ্তা। শহীদস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। মাত্র চব্বিশ বছর

বয়সে হেমাঙ্গিনী পুলিশের গুলিতে মারা যান। ভাবা যায় না উনিশশো আঠারো সালে এক বাঙালী যুবতী পিস্তল চালিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন—এত দূরে বিহারের এক নির্জন পাহাড়ী এলাকার বাগানবাড়িতে। কিন্তু তার চেয়েও অবাক কথা—এই শহীদস্তম্ভে লেখা তাঁর নাম!

শহীদস্তম্ভে সেই মুসলমান ভদ্রলোকের নামও রয়েছে। ফরিদউদ্দীন খান। জন্ম ও মৃত্যুর বছর খোদাই করা আছে। হিসেব করে বয়স পেলুম বত্রিশ বছর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই যুগে কতসব কাণ্ড ঘটেছে, ভাবলে এখন অবাক লাগে!

এখানে ফরিদউদ্দীনের বাড়ি—অর্থাৎ নদীর ধারে এমন একটা বাড়ি যখন ছিল, তখন নিশ্চয় ভদ্রলোক এখানকারই বাসিন্দা ছিলেন। আমার মাথায় কিছু ঢুকলে সহজে বেরোয় না। খোঁজ নিতে শুরু করলুম।

প্রতাপগড়ে মুসলিম এলাকায় ঘুরে ঘুরে হয়রান হলুম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না। হোটেল, দোকান, রাস্তার লোক—কেউ না। ফরিদউদ্দীন কেন, ওই বাড়ি কিংবা শহীদস্তম্ভ সম্পর্কেও সবাই অদ্ভুত নির্বিকার। এর একটাই কারণ হতে পারে, এরা স্বাধীনতার পরের যুগে এখানে এসে জুটেছে। তার আগে তো এখানে জাঁদলেন সাহেবসুবোরা থাকতেন। নিছক বেড়াবার জায়গা ছিল প্রতাপগড়—এবং সেই সুবাদে কিছু দোকানপাট নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল।

কদিন পরে এক সন্ধ্যায় রিকশোয় চেপেছি। অনেক ঘুরে ক্লান্ত, তাই পায়ে হেঁটে ব্রজেশ্বরের বাড়িতে ফেরার সাধ্য আর ছিল না। নদীর পাড় বরাবর সুন্দর পীচের পথ। ফরিদউদ্দীনের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ রিকশোওলা মুখ ঘুরিয়ে কেমন হাসল।—ওই টিবিটা কিসের জানেন কি স্যার?

আনমনে বললুম—হ্যাঁ, শুনেছি।

রিকশোওলা গতি কমিয়ে বলল—সবই নসিব স্যার। ওই বাড়িটা ছিল আমার নানার। ওই যে দেখছেন গভমেণ্ট্ থাম বানিয়ে দিয়েছে—ওতে ভি আমার নানার নাম লিখা আছে।

শুনে চমকে উঠলুম। ব্যস্ত হয়ে বললুম—রোখো, রোখো।

—কি হল স্যার? কিছু ফেলে এসেছেন নাকি?

—না এখানেই রোখো।

রিকশো দাঁড়াল। বললুম—আমি তোমাকেই কদিন ধরে খুঁজছিলাম।

চলো, রিকশো এখানে রেখে আমরা ওই বেঞ্চে গিয়ে বসি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকার—কিন্তু রাস্তার ধারে আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় রিকশোওলাকে দেখে নিলুম। রোগা ঢ্যাঙা আর একটু কুঁজো এই লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি মনে হচ্ছিল। তামাটে রঙ গায়ের। খাড়া নাক, দুভাগ করা মাকুন্দে চিবুক, পাতলা একটুখানি সূচলো গোঁফ আছে। খালিগায়ে ও রিকশো টানে। পরনে ছেঁড়া খাকি ফুলপ্যাণ্ট হাঁটু অব্দি গুটোনো। কোমরে বুঝি একটা ছেঁড়া নোংরা কামিজ জড়ানো রয়েছে। কানে আধপোড়া সিগারেট গোঁজা। পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল। ফরিদউদ্দীনের নাতি—তার মানে, মেয়ের ছেলে এই লোকটা।

সন্দিগ্ধভাবে ও বলল—কিছু গলতি হয়েছে স্যার?

—না না। এসো বসো এখানে। সিগারেট নাও।

মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে সে আমার পাশে—খানিকটা দূরত্ব রেখে বসল। সিগারেটটা ওকে ধরিয়ে দিলে দেখলুম আড়ষ্টতা বা বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছে। আরামে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল—জী হাঁ। আমি ওই ফরিদউদ্দীনের নাতি। নসীবের গুণে শয়তানের চাক্কা ঠেলে খাচ্ছি। এই তো দুনিয়ায় খোদার আইন স্যার। আমির ফকির হয়ে যায়। তবে এও ঠিক, আমার বাবা ওনার শ্বশুর ফরিদউদ্দীনের মতন আমির ছিল না! মক্তবের মৌলুবী ছিল! মাসে তিন টাকা মাইনে পেত! তার ছেলে এই মকবুল খানের মাথায় বিদ্যে ঢোকেনি! তাই রিকশো টেনে খাচ্ছে!

বললুম—ফরিদউদ্দীনের কথা আমি জানতে চাই, মকবুল।

মকবুল রিকশোওলা আবার হাসল!—নানাকে আমি দেখিনি, নানিকে দেখেছি। তাও বুড়ি অবস্থায়। শুনেছি, নানাকে কালাপানি পাঠিয়ে সরকার ওনার বাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছিল! নানি কী আর করে! আমার মায়ের বয়স তখন চার পাঁচ বছর। মেয়েকে কোলে নিয়ে নানি রহিমা বেগম স্টেশানের ধারে পিপুলতলায় ঝোপড়ি বানিয়ে থাকতে লাগল। বাঁচতে তো হবে। নানিরও তখন বয়স কম। ইচ্ছে করলে সাদি করতে পারত। কে জানে কেন করেনি! ঝোপড়িতে থাকত আর মেঠাই বানিয়ে বেচত। একদিন স্টেশানে এসে নামল আমার বাবা আকবর খান মৌলুবী। এখানে মক্তব খুলেছে সবে। মসজিদে আজান দেওয়া আর নামাজ পড়ানোর কাজও

পেয়েছে। পেয়ে ট্রেন থেকে নেমেছে। ভেষ্টা পেয়েছিল ওনার। পাদ্দি তো খালি খালি খাওয়া যায় না। এক পয়সার মিঠাই খেল। রহিমা বেগমের সঙ্গে আলাপ হল। আমার মায়ের তখন বিয়ের বয়স হয়েছে। আজবর খানও, স্যার, তখন বিশ বাইশ বছরের ছেলে। তারপর কী হল বুঝতেই পারছেন। নানির মনে ধরেছিল ছোকরা মৌলুবীকে। মেয়ে আয়েশার সঙ্গে সাদি দিয়ে জামাই করে নিল···।

শুনে বললুম—তুমি কি তোমার নানার কথা কিছুই জানো না মকবুল!

মকবুল একটু চুপ করে থেকে বলল—যা জানি, তা মায়ের কাছে শোনা, স্যার! সে এক কিস্‌সা। আমিও বিশ্বাস করি না—আপনিও করবেন না।

—তা হোক, তুমি বলো।

মকবুল খিক খিক করে হাসল। বলল—গতবছর এক বাঙালীবাবু এসে ছিলেন, ঠিক আপনারই মতো। কেতাব লিখবেন। বাঙালীবাবুদের—মানে ওই নামে যাদের নাম লেখা আছে, তারা কীভাবে এখানে মারা গেল, এইসব খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তো আমার সঙ্গেও ভি আলাপ হল। যা জানি, সব বললুম। শুনলেন বটে—কিন্তু মুখ দেখে বুঝলুম, বিশ্বাস হয়নি।

—আমি কেতাব লিখব না, মকবুল! এমনি জানতে ইচ্ছে করছে।

—কেন? বলে মকবুল সিগারেটটা ঘষটে নেভাল। অন্ধকারে গুঁজে রাখল।

—কী? বলবে না?

—বলছি।

এক মিনিট চুপ করে থাকার পর মকবুলের মুখের রেখা কেমন যেন বিকৃত হয়ে উঠল। তারপর একটু কেসে সে বলল—আমার নানা খুব সরল মানুষ ছিলেন। কলকাতায় ওনার শিশিবোতলের বড় ব্যবসা ছিল। ওনার বাবার আমলের ব্যবসা। নানিও ওখানে থাকত। চিৎপুর—না টেরেটি বাজার আছে, সেখানে। একদিন হল কি, আপনাদের এক বাঙালী ছোকরী দৌড়ে এসে ওনার বাসায় ঢুকে পড়ল। কী? না পুলিশ তাড়া করেছে। কোথায় কোন সায়েবকে গুলি মেরে পালাচ্ছিল নাকি। তো নানি তখন কচি বউ। ভয়ে ভয়ে সারা। দোকান বাসার নিচের তলায়। খবর পাঠালেন নানাকে। নানা এলে কী সব কথাবার্তা হল। বোরখা পরিয়ে শালী সাজিয়ে রাখলেন। পুলিশ এল, চলে গেল। ব্যাস, ওই নানার মনে বিষ ঢুকল।·····

মকবুল দম নিয়ে ফের বলতে থাকল—তারপর থেকে নানা ওই গুলি-

বাজদের দলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। প্রতাপগড়ে নানার বাবা এই বাড়িটা এক সায়েবের কাছে কিনেছিল। এই বাড়িতে তারপর বাঙালী পিস্তলওয়ালা বাবুরা এসে কখনও কখনও লুকিয়ে থাকে। তাদের সেবাযত্ন করার জন্যে নানিকে এখানে পাঠিয়েছিল নানা। কিন্তু নানির বরাবর এটা অপছন্দ ছিল। পুরুষমানুষগুলোকে সইতে পারতেন, কিন্তু ওই ঔরত পিস্তলওয়ালীকে দেখলে মনে মনে গুমরে মরতেন।

—কেন?

—কেন? মকবুল হাসল। মেয়েমানুষের মনের ব্যাপার স্যাপার ওই রকম, স্যার। তবে……

—তবে?

—পিস্তলওয়ালী ছোকরি ফরিদ খাঁয়ের সঙ্গে একরাতে ওই নদীর ঘাটে—যে ঘাটটা দেখছেন স্যার, ওই যে!

—হ্যাঁ, বলো।

—ঘাটে বসে কথা বলছিল। নানি এসে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন।

—বল কী! তারপর?

—সেই থেকে নানার সঙ্গে নানির খুব মনান্তর শুরু হল। কেউ কাকেও সইতে পারে না। শেষ অব্দি নানিই একদিন পুলিশে খবর দিলে। হামলা করল রাতের আঁধারে। তখন বিজলী বাতি ছিল না। খুব লড়াই হল। পিস্তলওয়ালী ছোকরিও মারা পড়ল। নানাকেও ধরল। আবার কী? ঔরতের মনে হিংসে ঢুকলে স্বামীর ভালমন্দ দেখে না।

—একটু চুপ করে থাকার পর বললুম—কিন্তু তোমার নানির ভুল হতেও পারে!

মকবুল হাসল। —ভুল, স্যার, মেয়েরা ওসব টের পায়। নিশ্চয় কিছু হয়েছিল নানা আর সেই ছোকরির মধ্যে। তা না হলে অমন সাদাসিদে মানুষটা, কোন সাতেপাঁচে যে থাকত না—ধর্ম নিয়েই থাকত ছোটবেলা থেকে, নামাজ রোজা, কোরান শরিফ পড়া আর ব্যবসা ছাড়া কিছু বুঝত না যে—সে কেন ওই ঝুটঝামেলায় জড়াতে যাবে, বলুন?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার বললুম—তুমি ভুল বলনি মকবুল।

মকবুল বলল,—হ্যাঁ স্যার। তাছাড়া কোন মানে হয় না এর। নানা ইংরেজি স্কুলেও পাস দেয়নি। মক্তবে পড়া মানুষ। একসময়ে সায়েবদের

নাকি নেমন্তন্ন করে খাওয়াত এই বাড়িতে। সে হঠাৎ সায়েব মারার ব্যাপারে অমন মদত দিতে যাবে কেন? বলুন!

উঠে দাঁড়ালুম।—চলো, মকবুল। ফেরা যাক্।

অনেক রাত অব্দি টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে আছি। ব্রজেশ্বরের বাড়িতে ফিরে কিছুক্ষণ গল্প করেছি অন্যদিনের মতো। কিন্তু সারাক্ষণ অন্যমনস্ক। ব্রজেশ্বর বলেছেন—শরীর খারাপ নাকি অমনি?

—হ্যাঁ মামাবাবু। বড় টায়ার্ড।

—তাহলে ঝটপট শুয়ে পড়ো। ওগো, আমাদের খাইয়ে দাও।

আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকেছি। তারপর দরজা বন্ধ করে টেবিল বাতি জ্বেলেছি। ব্যাগ থেকে একটা ষাট বছরের পুরনো জীর্ণ বই বের করেছি। বইয়ের পাতায় পাতায় লেখা ছোট্ট হরফে কালির লেখা—অস্পষ্ট, বিবর্ণ, আবার খুঁটিয়ে পড়ছি। থাকগে, যে জন্যে প্রতাপগড়ে আসা, তা চুকে গেল। আমি এতদিনে খুঁজে পেলুম লোকটাকে।

কিন্তু মোটেও জানতুম না বিহার সরকার হেমাঙ্গিনী এবং তাঁর সঙ্গীদের নামে এখানে একটা শহীদস্তম্ভ করে দিয়েছেন। শুধু এটুকু জানতুম, আমার বাবার এক পিসিমা হেমাঙ্গিনী দাশগুপ্তা বিহারে কোথায় ইংরেজ পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৯১৮ সালে। তাঁর লাশ ওখানেই পোড়ানো হয়। আত্মীয়রা ভয়ে কেউ যাননি।

হেমাঙ্গিনী যে প্রথম বাজে উপন্যাস 'অনন্তপুরের গুপ্তকথা' পড়তেন, সেটা আবিষ্কার করি দুমাস আগে। বাবার পুরনো বইয়ের মধ্যে এই বইটা দৈবাৎ পেয়ে যাই। হেমাঙ্গিনীর নাম লেখা আছে গোড়ার দিকে। পরে গোয়েন্দাগিরি নেশায় পেয়ে বসে। বইয়ের মধ্যে অনেক অক্ষরের মাথায় ফুটকি দেওয়া আছে সবগুলো মিলিয়ে আমি অবাক হয়েছিলুম। ওতে একটা গুপ্ত মেসেজ রয়েছে। 'পুলিশ কমিশনার ম্যাক্সওয়েল পাটনায় বদলি হয়েছে। কলকাতায় যে সুযোগ পাই নাই, তাহা পাটনায় পাইব। শরজিৎ মহীতোষ এবং তুমি পাটনা যাইবে। কাজ সারিয়া প্রতাপগড়ে যাইবে। সাবধান সরাসরি কলিকাতায় ফিরিবে না। প্রতাপগড়ে দেখা করিব।' প্রেরকের নাম নেই। বোঝা যায়, দলের নেতা এই মেসেজ বইয়ের সাহায্যে হেমাঙ্গিনীকে পাঠিয়ে ছিলেন।

কিন্তু ওই মেলেজ নয়, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বইয়ের পাতায় হেমাঙ্গিনীর লেখা কথাগুলো। সাধু ও চলতি ভাষায় মেশামেশি!

'.....আমি কি জাতিস্মর? কেন ওকে চিনিতে পারিলাম?'.....'আমার মনের জোর কমিয়া যাইতেছে। জন্মান্তরের দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। অদ্ভুত সব দৃশ্য।.....'ও আজ আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ছিল। এই প্রথম। বলিল, আপনাকে চেনা লাগে কেন বলুন তো? আমি অবাক। শিউরে উঠেছিলাম।'.....'ওর দ্বিধা অনেক কেটেছে। স্পষ্ট করে বলছে—আমার সঙ্গে জীবন দেবে। বলিলাম—তোমার সংসার? ও শুধু হাসিল।'..... জন্মান্তর আবছাভাবে মানিতাম। জানিতাম না আমার জীবনে তা সত্য হবে। নিজের মনকে বাগ মানাইতে পারি না।'..... 'ধর্ম মানুষের পথের কাঁটা। ধর্ম কেন আসিল পৃথিবীতে?'.....'ঈশ্বরের কোন ধর্ম?..... মহীতোষদা শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন বুড়ি, তুই ধর্ম নিয়া মাথা ঘামাস কেন?'.....'ঈশ্বর! এ কি আমার পাপ? খুব কষ্ট পাচ্ছি।'.....'বিশ্বাস করি, আবার জন্ম লইব। কিন্তু ও কি জন্ম লইবে? ওদের শাস্ত্র কী বলে জানি না। যদি বলে—না, এই জন্মেই শেষ। অসম্ভব। তা হয় না। তাহা হইলে দেখামাত্র কেন পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম?'.....

বইটা বুজিয়ে রেখে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হেমাঙ্গিনী কিছুতেই ঘুমোতে দিলেন না।

প্রকৃতির করতলে

সেচ দফতরের বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে রোদের আরাম নিচ্ছিলুম। রাতে হঠাৎ বৃষ্টি এসে শীতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাল এই লনের ঘাসগুলোকে পাঙটে দেখেছি। এখন সকালের রোদে দেখি ঝকমকে সবুজ হয়ে উঠেছে। গাছপালা কোপঝাড়েও চেকনাই ভাব। ধোঁয়াটে নীল সেই ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতা কেটে গেছে প্রকৃতির শরীর থেকে। তাকালে ভেতরে অনেক দূর অব্দি দেখা যায় এখন। আমার মতো প্রকৃতিবাদীর পক্ষে এইসব অভিজ্ঞতা বরাবর রোমাঞ্চকর।

তৃতীয় সিগারেটের টুকরো আঙুলের ডগা থেকে টস করার ভঙ্গীতে নিচের

খালে ছুঁড়ে ফেলার পরই একটা ফুটফুটে সাদা প্রজাপতি নীল কচুরিপানার ফুলগুলো ডিঙিয়ে ব্যস্তভাবে এসে পড়ল। আমার হাঁটুর কাছে ঘুরঘুর করে সেটা পেছনের দিকে কিচেনের বারান্দায় চলে গেল এবং চৌকিদারের বউয়ের ঝুলন্ত ডুরে শাড়িতে বসল। আমার মনে যত লাম্পট্যই থাক, বউটি আর তত যুবতী নয়। মাতৃভাবে আক্রান্ত এই মধ্যবয়সিনী নারী আমাকে অসংখ্যবার বাবা বলেছে। তবে মুর্গি রান্নায় তার যতটা খ্যাতি শুনেছিলুম, ততটা সত্যি নয়। আমার যৎসামান্য নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানগম্যি অনুসারে তার এথনোলজিকাল ডাটা তথাকথিত অস্ট্রিক গোত্রের সঙ্গে মিলে যায়। দু'তিন পুরুষ আগেও যাদের উৎকৃষ্ট রন্ধনপদ্ধতি ছিল স্রেফ রোস্ট্।

কথাটা এসে পড়ছে এজন্যে যে, যাঁদের আতিথ্যে আমি এখানে আছি, তাঁদের মুখপাত্র পশুপতিবাবুর সঙ্গে গতরাতে এলাকার পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে জব্বর আলোচনা হয়েছে। এখন প্রায় আটটা বাজে। আর আধঘণ্টার মধ্যে উনি এসে পড়বেন। বেশ স্বচ্ছন্দ ও সদানন্দ এই মানুষটি। সব সময় রসসিক্ত। মাথায় টাক ও মুখে প্রচুর দাড়ি আছে। বেঁটে নাদুসনুদুস চেহারা। কাল বিকেলের সাহিত্যসভায় সভাপতির ভাষণ পয়ারছন্দে পাঠ করে খুব সাড়া জাগিয়েছিলেন। গ্রাম থেকে এতদূরে বাংলো বলে চৌকিদার পরিবারের রান্নাই চলবে বলেছিলাম।

প্রজাপতিটা বসেই থাকল। নিচে একটা বালতির কিনারায় এবার একটা কাক এসে সাবধানে বসল এবং ঠোঁট ডুবিয়ে জল খেল। কেউ তাড়াল না তাকে। একঝাঁক চড়ুই এসে বেড়া ঘিরে চ্যাচামেচি জুড়ে দিলে কাকটা উড়ে গেল। শীতে কাকেরা কেন কে জানে খুব জেল্লা দেয়। কাকটা খাল পেরিয়ে জঙ্গলের গলা ঘেঁষে এগোচ্ছিল। কোথায় বসে দেখা যাক। ওপারে ওই জঙ্গলটাই নাকি কাঁকরগড়া রাজবাড়ি। এই খালটা আসলে পুরনো আমলের পরিখা। আমার সামনে একটা নড়বড়ে কাঠের সাঁকো দেখতে পাচ্ছি। সাঁকোর পরে একফালি রাস্তা ভেতরে ঢুকে গেছে। তার দুধারে বর্মী বাঁশের ঝোপ। কাঠবেড়ালি দৌড়চ্ছে। তাকে দেখতে গিয়ে কাকটাকে হারিয়ে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করে শিউরে উঠলাম, কাকটা নিঃসঙ্গ ছিল! এমন হওয়ার কথা নয়। কাকেরা দল বেঁধেই তো থাকে!

কারুর প্রতীক্ষায় থাকার সময় আমার এসব অভ্যাস আছে। খুঁটিয়ে এটা ওটা দেখতে দেখতে সময় দিব্যি কেটে যায়। কাঠবেড়ালিটা এখন কেয়াঝোপের

গায়ে গিয়ে বসেছে। চুলদাড়িওলা সান্তাক্লজের মতো একসার কেয়া। দেখলে দারুণ হাসিখুশি লাগে। তাদের পেছনে একটা মন্দিরের ছুঁচলো ডগা দেখা যাচ্ছে। শুনেছি প্রায় চারশো একর রাজবাড়ির এলাকায় আট-দশটা শিবমন্দির আছে। বারোটা ছোট বড় দীঘি আছে। পশুপতির আসার প্রতীক্ষা শুধু। সব দেখে আসা যাবে। মহাকালের ব্যাপার-স্যাপার।

আর রাণী কৃষ্ণভামিনীর প্রাসাদও। পশুপতিবাবুর লেখা একটা বই আছে 'কঙ্কগড়ের ইতিহাস'। ডিমাই ষোলপেজী দু' ফর্মার বই। নিজের প্রেসেই ছাপানো। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। আউট অফ প্রিণ্ট বইটার একটা মলাটছেঁড়া খণ্ড আমাকে উপহার দিয়েছেন। রাতেই পড়ে ফেলেছি। শেষ করার পর হঠাৎ বৃষ্টিটা এল। অদ্ভুতভাবে মনে হচ্ছিল, মোগলরা এসে পড়েছে এবং হাতি-ঘোড়ার হুলুস্থুল চলেছে। রাণী কৃষ্ণভামিনীর কামানগুলো অকেজো হয়ে গেল বৃষ্টিতে। বারুদ ভিজে কাদা। শেষরাতে ঘুম ও স্বপ্নের মাঝামাঝি একটা চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসক্লিষ্ট বিলাপ শুনলুম। একবার মনে হল রাণী কৃষ্ণভামিনী, একবার মনে হল চৌকিদারের বউ। ওর গলায় মাদুলি দেখেছি। নিশ্চয় হাঁপের অসুখ আছে। কিন্তু ঘুমটা কেটে গেলে আর কিছু শুনতে পাইনি। অভ্যাসবশে একবার ছোট-বাইরে করার দরকার হল। তার একটু পরে রাতের অবস্থা দেখতে জানলা খুলেছিলুম। কনকনে ঠাণ্ডা এসে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু বাইরে আর বৃষ্টি নেই। মনে হল, জ্যোৎস্না ফুটেছে। রাজবাড়ির জঙ্গলে একবার একঝলক টর্চের আলো দেখেছিলুম যেন। চোখের ভুল কিনা এখনও বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণভাবে বিশ্বাস করতে সাধ যায়। ওখানে ভূত থাকা স্বাভাবিক। এবং এখানে ভূত থাকার প্রয়োজনও আছে।

জানলা বন্ধ করার মুহূর্তে রাজবাড়ির জঙ্গলে একটা ক্ষীণ গোঙানির মতো শব্দ শুনেছিলুম। নিশ্চয় সাপের মুখে পড়া ব্যাঙের আর্তনাদ। আর পশুপতি বলেছিলেন, ওখানে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার আপনার চোখে পড়বে। ভড়কাবেন না।

কেয়াঝোপের ওপাশে শিবমন্দিরটার চূড়ায় ত্রিশূল আছে। আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে সেই নিঃসঙ্গ অর্থাৎ দলত্যাগী ও বিদ্রোহী কাকটা ত্রিশূলে এসে বসে পড়ল। তারপরই বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল।

আমার অনুমান ভুল হয়নি। কাকটা দলত্যাগীই বটে। বিরাট একটা ঝাঁক জঙ্গলের ওপরদিকটা কালো করে প্রচণ্ড হইচই করতে করতে ওকে ঘিরে

ফেলেছে। খুব হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেছে। খোলামেলা ঘাসে ঢাকা মাটি, ঝোপঝাড় ও মন্দিরের মাথা জুড়ে কালো কালো স্পন্দনশীল ছোপ এবং কানে তালা ধরার অবস্থা, এত দূরে থেকেও। সত্যি, কাক বড় নচ্ছার পাখি। ওরা ইতিহাসের সেই বর্গী বা মোগলদের মতো হঠকারী। ওদের জঘন্য উপদ্রব নিসর্গ বিষিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে বাকি ছিল।

হঠাৎ দেখি, কালো কালো স্পন্দনশীল ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটি মেয়ে। তার এক হাতে সাজির মতো কী একটা আছে। খালি হাতটা কপালের ওপর এবং সাজিসুদ্ধু হাতটা এদিকে ওদিকে জোরে নাড়াচ্ছে। আমি চমকে উঠলুম। কাকের হিংস্রতার একটা ঘটনাই আমার জানা। আলিপুর চিড়িয়াখানায় সেবার একটা হরিণকে ঠুকরে মেরে ফেলেছিল একঝাঁক রাগী কাক।

মেয়েটি বার-দুই আছাড়ও খেল এবং উঠে দাঁড়াল কোনরকমে। তারপর ফের তেমনি হাত নেড়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হল। আমার পক্ষে ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি কাঁকরগড়ার সাহিত্যসভার প্রধান অতিথি এবং দু'একটা দিনের জন্যে এই বাংলোয় প্রকৃতি-টকৃতির মধ্যে আদর খাচ্ছি। আমার পক্ষে দৌড়ে কাক তাড়াতে যাওয়া উচিত হবে কি না ভেবেই পেলুম না। অথচ বার বার চিড়িয়াখানার সেই হরিণটার কথা মনে আসছে।

শেষঅব্দি পুরুষোচিত সিভালরির আবেগ নিয়েই নড়বড়ে কাঠের সাঁকো পেরিয়ে গেলুম। আন্দাজ একশো গজ দূরে ব্যাপারটা ঘটছে। কাক তাড়ানোর জন্যে তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। ইটের টুকরো আছে অজস্র। কিন্তু সবই মাটিতে পোঁতা। একটা শুকনো ডালও পড়ে নেই। বিপদের সময় যা হয়।

কাছাকাছি যেতে না যেতে কাকগুলোর কী হল, নিজে থেকেই উড়ে চলে গেল। ক্রমশ জঙ্গলের মাথায় দূরের দিকে তাদের ডাক মিলিয়ে গেল। মন্দিরের পাশে গিয়ে দেখলুম, মেয়েটি আমার দিকে পেছন ঘুরে শাড়ি ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। সাজিটা পায়ের কাছে রাখা। ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঠুকরে রক্ত বের করেছে নাকি খুঁজছি। পাতাচাপের ঘাসের মতো ফিকে গায়ের রঙ, বেণীবাঁধা চুল ঝুলছে কোমর অব্দি, মেয়েটি কে হতে পারে? সাজিতে একটাও ফুল নেই। ঘাসের ওপর অনেকগুলো জবা ছড়িয়ে আছে। দেখতে পেলাম, মন্দিরের ওপাশে কয়েকটা জবাগাছ আছে। ফুলে ভেঙে পড়ছে।

চুল থেকে খড়কুটো মাকড়সার জাল ঝেড়ে ফেলে সে সাজিটা তুলে নিল।

তখনও আমার দিকে পেছন ফেরা। আমি কি বলব, ভেবে ঠিক করার আগেই সে বলল, কাকটা মারা গেল নাকি দেখুন তো!

দুটো কারণে চমক খেলুম। ওর মাথার পেছনে চোখ থাকায় এবং দলত্যাগী কাকটাকে বাঁচাতে গিয়েছিল ভেবে। ওর গলার স্বর কেমন খ্যানখেনে, ঈষৎ চেরা। রোগা বলেই এমন হতে পারে। তবে মোটামুটি আন্দাজ করছি, বয়স ষোল-সতেরোর বেশি হতেই পারে না। কাকটা মন্দিরের গায়ে একটা ঝোপের তলায় চিত হয়ে পড়ে আছে দেখতে পেলুম। কষায় রক্ত। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। কাছে গিয়ে জুতোর ডগায় নেড়ে দেখে বললাম, মারা গেছে। তুমি কি ওটাকে বাঁচাতে গিয়েছিলে?

সে কথার জবাব দিল না। বলল, আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন?

হ্যাঁ। তুমি···

আপনি কাল মিটিং করেছেন! শুনতে যাব ভেবেছিলাম।

গেলে না কেন?

কাজ ছিল।···এখনও সে উল্টোদিকে ঘুরে আছে। মুখের একটা পাশ, গালের অংশ ও কান দেখতে পাচ্ছি। কানে সোনার রিঙে রোদ ঠিকরে পড়ছে। মুখটা আকাশে তোলা। এমন করে কথা বলছে কেন সে? ফের বলল, আপনি ইরিগেশানে আছেন?

হ্যাঁ। তুমি কোথায় থাকো?

রাজবাড়িতে।

আমি কয়েক পা এগোলাম। বুঝতে পেরে সে আরও ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা অদ্ভুত। বললাম, নাম কী তোমার?

অপরূপা।

বাবার নাম?

ফের অন্য কথা বলল।···চৌকিদারের বউ বলছিল আপনি আজ থাকবেন। কাল সকালের বাসে কলকাতা চলে যাবেন।

বাবার নাম বললে না কিন্তু!

কাকেও জিজ্ঞেস করবেন, বলবে। আমি যাই।

শোন, শোন!

কী বলবেন বলুন। দেরি হয়ে গেল।

ফুল তুলছ কি পুজোর জন্যে?

হুঁউ।

কিন্তু তোমার সাজিতে তো ফুল নেই। সব পড়ে গেছে।

সে ঝটপট সাজিটা তুলে হাতড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি জানলুম, মেয়েটি অন্ধ। আমার মনটা তখুনি বদলে গেল। ছটফটে উজ্জ্বল এমন মেয়েটা অন্ধ! কাকের ঝাঁকের মধ্যে পড়াটা এতক্ষণে একশো করুণা বা মায়ামমতায় ভিজে আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলল। ডাকলাম, অপরূপা! তোমাকে ফুল তুলে দিই, এস। না, না। অমন লজ্জা করে আর ঘুরে দাঁড়াতে হবে না। আমি তোমার দাদার মতো।

এবার অপরূপা ঘুরল। একটু হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে চমক খেলুম আবার। এমন সৌন্দর্য ও বিকৃতির অদ্ভুত সহাবস্থান কখনও দেখিনি।

অন্ধদের প্রতি চক্ষুষ্মানদের আতঙ্কমিশ্রিত করুণা নিশ্চয় আছে। কিন্তু এই ছিপছিপে পলকাগড়নের গৌরবর্ণ সুশ্রী মেয়েটিকে এতক্ষণ কঙ্কগড় রাজবাড়ির বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন কীর্তির মধ্যে একটা চাপা অর্কেস্ট্রার মূর্তিমতী সঙ্গীত বলে মনে হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গীত হঠাৎ যেন থেমে গেল। চারপাশে গভীর স্তব্ধতা ছমছম করতে থাকল। মনে হল, যে-প্রকৃতি এমন অত্যদ্ভুত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাতে পারে, তাকে বিশ্বাস করা যায় না। এখন যেন তার মধ্যে কি এক ষড়যন্ত্র চলেছে। আমাকে ঢেকে ফেলার জন্য বুঝিবা প্রকৃতি হাত উপুড় করছে, তার বিশাল সবুজ হাতের কালো ছায়া নামছে।

অপরূপার বয়স পনের-ষোলর কম বা বেশি নয়। এই নির্জন জঙ্গলের পরিবেশে তাকে ফুল পেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে কি না, এটাই সমস্যা। বিশেষ করে আমি এক সজ্জন ও গণ্যমান্য অতিথি। হাজার হলেও এটা গ্রামাঞ্চল। কে কি ভেবে বসতে পারে, বলা যায় না।

অপরূপা বলল, কই! দিন না ফুল পেড়ে?

আমি ভীষণ বেঁচে গেলুম। ঝোপের ওদিক থেকে পশুপতিবাবুর গলা ভেসে এল—কী রে টেঁপি! ওখানে কি করছিস? যা—বাড়ি যা বলছি। তোকে খুঁজছে ছাখ্ গে ম্যানেজারবাবু।

অমনি অপরূপা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আড়ষ্টভাবে হেসে মন্দিরের পাশে জবাগাছগুলোর দিকে তরতর করে এগিয়ে গেল। বুঝলুম, রাজবাড়ি এলাকার প্রতি ইঞ্চি মাটি তার চেনা।

পশুপতি এসে বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না। আসুন।

একটা পায়েচলা সরু রাস্তায় গিয়ে পেছন ফিরে দেখি, অপরূপা ফুল তুলছে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। আমাকে ঘুরতে দেখে পশুপতি একটু হেসে বললেন, মেয়েটা কী বলছিল?

—কিছু না। বেচারী একঝাঁক কাকের পাল্লায় পড়েছিল। দৌড়ে এসে কাকগুলোকে তাড়ালুম।

—তাই বুঝি! পশুপতি সকৌতুকে হাসতে থাকলেন। তবে ওকে যতটা নিরীহ ভাবছেন, ততটা মোটেও না। ভয়ানক ধূর্ত। আর তেমনি হাড়ে-হাড়ে খচরামি বুদ্ধিও আছে।

চমকে উঠলুম—সে কী!

—হ্যাঁ। ওর কীর্তিকথা পরে বলব'খন।···বলে পশুপতি চুপ করে গেলেন।

একটা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘন পদ্মবনে জলটা ঢাকা। ভাঙা-চোরা পাথুরে ঘাট আছে। দুধারে স্তম্ভের ওপর দুটো যক্ষীমূর্তি। আগাছায় ঘিরে রেখেছে। মূর্তি দুটো ভাল করে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে বললুম—আচ্ছা পশুপতিবাবু, মেয়েটি রাজবাড়ির কোনও কর্মচারীর মেয়ে বুঝি?

পশুপতি গলার ভেতর জবাব দিলেন, না। তারপর একটু কেশে ফের বললেন, বলতে গেলে সেও এক ইতিহাস। পরে বিস্তারিত বলব। রাজা-বাহাদুরের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক কেলেঙ্কারি হয়েছিল। উনি রাজবাড়িরই এক আশ্রিতা বিধবাকে হঠাৎ বিয়ে করে বসেন। নিম্নবর্ণের মেয়ে। তারপর ওই টেঁপি—মানে অপরূপার জন্ম। আর বলবেন না। বড়ঘরের এমন বিস্তর কেলেঙ্কারি তো থাকেই।

অবাক হয়ে বললুম, তাহলে ও রীতিমত রাজকন্যা বলুন!

পশুপতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসলেন ফের। তারপর বললেন, তা বলতে আপত্তি কী? তবে সর্বনেশে রাজকন্যা মশাই!

—কেন বলুন তো?

—মায়ের লাইন ধরতে দেরি করেনি। এই বয়সেই···বলে চুপ করে গেলেন হঠাৎ।

সামনে এক ভদ্রলোক আসছিলেন। বেশ রাশভারি চেহারা। আমাদের

দেখে বললেন, কী হে পশুপতি, বেড়াতে বেরিয়েছ ওঁকে নিয়ে? হ্যাঁ, সব দেখাও-টেখাও। তবে দেখার মতো আর কীই বা আছে! বারোভূতে লুটে শেষ করে ফেলেছে!

ভদ্রলোক চলে গেলে পশুপতি বললেন, উনিই এখন এস্টেটের ম্যানেজার। খুব জাঁদরেল লোক। উনি না থাকলে রাজাবাহাদুরকে এখন পথে বসতে হত। জঙ্গল সাফ করিয়ে উনিই ভাগচাষ করাচ্ছেন। পুকুরগুলো নিজের ব্যবস্থা করেছেন। খুব মাছটাছ হয়। এসব থেকেই এখন রাজবাহাদুরের ভরণপোষণ চলেছে। প্রথম পক্ষের দুই ছেলে এক মেয়ে। তারা সব বাইরে—কেউ কলকাতা, কেউ আমেরিকায় আছে। আর কাউকে তো পিতৃদর্শনে আসতে দেখি না। আসলে সেই কেলেঙ্কারির পর চটে গেছে ওরা। তবে রাজা-বাহাদুর মারা গেলে দেখবেন, এসে সম্পত্তির ভাগ চাইবে। কিন্তু ততদিনে ম্যানেজার অহিভূষণ কি আর কিছু আস্ত রাখবেন?

পশুপতি গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ। সামনে একটু তাকাতে গাছপালার মধ্যে একটা উঁচু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। মন্দিরটা বিশাল বলে মনে হল। জিজ্ঞেস করলুম, ওটা কিসের মন্দির পশুপতিবাবু?'

পশুপতি বললেন, ওখানেই যাচ্ছি আমরা।

মন্দিরের ফটকের সামনে এসে পশুপতি বললেন, এবার একটু কষ্ট দেব। দয়া করে জুতোটা···

ধর্মস্থানে ঢুকতে গেলে এটাই নিয়ম কে না জানে! আসলে ভদ্রলোক বড্ড বিনয়ী। কাল আসা অব্দি দেখছি, কন্যাকর্তার মতো আমার আগে আগে কোমর ভেঙে হাত নাড়তে নাড়তে কেবলই পিছু হটে এগোচ্ছেন। এটা পুরনো আমলের দিশি প্রথা। তবে আমি কোনও বিরাট লোক নই। নিতান্ত এক লেখক। এবং যদি না জানতে পারতাম, এই পশুপতি পুরকায়স্থের লেখা সাড়ে তিনশো পাতার একটি অপ্রকাশিত উপন্যাস আছে, তাহলে ভাবতুম এই বিনয় আমূল ভণ্ডামি। অর্থাৎ মন্ত্রীটন্ত্রী এলেও উনি এমন করে থাকেন ধরে নিতুম। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। উনি সাহিত্যগত প্রাণ মানুষ।

সামনে ঝুঁকে জুতো খুলতে খুলতে ফের গলায় ভেতর বললেন, তবে যাই বলুন—ব্যাপারটায় কোনও যুক্তি খুঁজে পাই নে।

ফটকের মাথায় নহবতখানা দেখছিলুম। দুটো প্রকাণ্ড ঢোল দু পাশে রাখা আছে। লোকজন নেই। দেখলেই মনে হবে, হঠাৎ ঢোল ফেলে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছে। আমার মাথায় তখন ইতিহাস ঢুকে আছে। মোগল সৈন্যদের কোলাহল শুনতে পাচ্ছি পরিখার ওপারে। বললুম, কিসের যুক্তি পশুপতিবাবু?

এই জুতো খোলার। পশুপতি খিক করে হাসলেন। ভগবানের ঘরে ঢুকতে জামাকাপড় খুলতে হবে না, আর কিচ্ছু না, কেবল পায়ের জুতো! কেন বলুন তো? চামড়া কি অপবিত্র জিনিস?

হয় তো তাই।

মাথা নাড়লেন পশুপতি। কেন? কোমরে চামড়ার বেল্ট পরেও তো লোকেরা ঢোকে। তার বেলা? বলবেন, জুতোয় নোংরা লেগে থাকে তাই! তাহলে খালি পায়ে যারা ঘোরে, তারা তো স্যার, পা ধুয়ে ঢোকে না।

অগত্যা বললুম, পুরনো প্রথা আর কী!

পশুপতি তাঁর বিনয় ক্ষণিকের জন্যে ভুলে তর্কের সুরে বললেন, কেন এ প্রথা? এর জাস্টিফিকেশন কী? জুতোকে কেন নিকৃষ্ট অপবিত্র মনে করা হয়? ভেবে দেখুন, জুতো ভদ্রলোকের পক্ষে একটা এসেনসিয়াল বস্তু!

তখনও আমরা ফটকের তলায় দাঁড়িয়ে। এবার টের পেলুম, পশুপতির উপন্যাস-প্রতিভার নিটোল এবং না-ফোটা ডিমের চেকনাই ভাবটি ভাবুকতারই। ঈষৎ উদ্বিগ্নও হলুম। এই জনহীন বিশাল জঙ্গুলে এলাকার নৈসর্গিক সুখ-শান্তি পণ্ড করে উনি হয়তো ডিমটি ফাটাতে চাইবেন। এ বিষয়ে আমার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আছে। সেবার এমনি এক সাহিত্যসভা করতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ি অতি চমৎকার খাওয়াদাওয়ার পর যা ঘটেছিল তা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। পান চিবুতে চিবুতে তিনি ডেকেছিলেন—কেষ্ট! হেরিকেনটা জ্বেলে দে। বাড়িতে বিদ্যুতের আলো। হারিকেন কী হবে বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন—আমরা এবার পুকুরপাড়ে যাব। তারপর হেঁকে বলেছিলেন—কেষ্টা! খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা বের কর্ তো বাবা। তখন রাত প্রায় দশটা। বিকট আওয়াজ করে ট্রাঙ্ক বেরুল। সেটা মাথায় নিয়ে এবং হাতে হারিকেন ঝুলিয়ে কেষ্ট চলেছে আগে। মধ্যিখানে আমি, পেছনে উনি। বগলে মাদুর, হাতে পানজর্দার কৌটো আর দু বাক্স সিগারেট। তারপর পুকুরপাড়ে বসে ট্রাঙ্ক খোলা হলে বেরুল সচিত্র হিটলারবধ মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি। সচিত্র কেন, সেটা জিজ্ঞেস করব কী, আমি লেজ তুলে পালিয়ে যাবার ইচ্ছায় ওপরকার অনন্ত নক্ষত্রবীথির মধ্যে ঢু মেরে কোকর খুঁজছিলুম।…

তা পশুপতি কতদূর এগোবেন জানি নে, আপাতত উনি জুতো থেকে শুরু করেছেন। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফের বললেন, আমার ক্ষুদ্র ধারণা—এতে জাতিবর্ণভেদের একটা জঘন্য প্রকাশ ঘটেছে।

তাই বুঝি!

পশুপতি রহস্যময় হেসে এতক্ষণে পা বাড়ালেন উঠোনে। গলা চেপে বললেন, বুঝলেন না? মুচি! মুচি জুতো বানায়। মুচির হাতের কাজ বলেই জুতো অপবিত্র। অথচ ধুলোময়লা থেকে পা বাঁচাতে জুতো চাই-ই।

বলতে যাচ্ছিলুম, এও তো হতে পারে—জুতো তৈরির জন্যেই মুচিকে হীন গণ্য করা হয় —কিন্তু মুখ খুললাম না। প্রকৃতি-অধ্যুষিত নির্জন জায়গা, বিশেষ করে এমন এক ঐতিহাসিক মাটিতে দাঁড়িয়ে কী এক অসহায় ভাব আমাকে পেয়ে বসে, যা শান্তি বলে ভুল হতে পারে। চুপচাপ থাকাই ভাল মনে হয়।

পশুপতি হনহন করে এগিয়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠলেন এবং প্রণাম করলেন। তারপর ঘুরে আমাকে ডাকলেন, আসুন! বিগ্রহ দেখবেন না?

বললুম, থাক। ওই তো দেখতে পাচ্ছি।

পীড়াপীড়ি করলেন না, নেমে এলেন পশুপতি। একটু হেসে বললেন, অন্যায় হল হয়তো। আপনাদের ধর্মে বাধা আছে বটে!

বলতে পারতুম, আমি ধার্মিক-টার্মিক নই—আসলে যা দেখতে চেয়েছিলাম তা স্থাপত্য। পুরনো স্থাপত্য। বললাম না। তার বদলে বললাম, বাধা অন্য পক্ষেই থাকা স্বাভাবিক। আমি কিনা যবন। অশুচিতার প্রশ্ন উঠবে।

পশুপতি হাসির চোটে নির্জন মন্দির গমগম করে উঠল। পাগল, পাগল! আপনাদের মতো ইনটেলেকচুয়াল মনীষীদের আবার জাত! তবে নিজেকে যবন বললেন, এটা কিন্তু ভুল। যবন তো ইউনান কথা থেকে এসেছে। ইউনান হল গ্রীস। গ্রীকদের যবন বলা হত।...

এই রে! আবার শুরু হল। পাশ কাটাতে চেয়ে বললুম, এই মন্দিরটার বয়স পাঁচশো বছর বলছিলেন না? কোন্ রাণীর তৈরি যেন?

রাণী কৃষ্ণভামিনীর। মোগল পিরিয়ডের শুরুতে। পশুপতি গাইডের গলায় বললেন। চলুন, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে এসে আপনাকে ওনার প্রাসাদ দেখাব। এখন সব জঙ্গলে ঢেকে গেছে। তবে পাথরে তৈরি বাড়ি তো! দিব্যি খাড়া আছে। ঘরগুলো এখনও ব্যবহার করা যায়। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, বাড়িটা কলেজ করা যায় নাকি। রাজাবাহাদুর দিলেন না। মধ্যে

একটা প্রপোজাল এসেছিল সরকারী পুরাতত্ত্ব দফতর থেকে—মিউজিয়াম করার জন্যে। তাতেও রাজাবাহাদুর গা করেননি। এদিকে বাড়িটা খামোকা পড়ে আছে। আসলে ওনার ভয়, রাজবাড়ির সীমানায় বাইরের লোকেরা ঢুকে বসলেই পুরোটা ক্রমে হাতছাড়া হয়ে যাবে। জানেন? সামনের একটা ঘরে আমরা লাইব্রেরি করতে চেয়েছিলাম—জাস্ট অস্থায়ী ভাবে, দেননি! সেটা ক্লাডের বছর। লাইব্রেরি ঘরটা ভেঙে গিয়েছিল।

আমার চোখ ঘুরছিল চারদিকে। উঠোনের কোণায় ইঁদারার পাশে বড় একটা জবাগাছ। ঢ্যাঙা রাগী চেহারার একটা লোক আমাদের আড়চোখে দেখতে দেখতে ফুল পাড়ছে। হাতে সাজি ঝুলছে। নিশ্চয় পুরুত। দু'পাশে সারবন্দী একতলা ঘর। ঘরগুলোতে কয়েকটি পরিবার বাস করার চিহ্ন ছড়ানো। কিন্তু লোকজন দেখতে পাচ্ছি না। জলভরা একটা বালতির কিনারায় বসে একটা কাক ঠোঁট ডুবিয়ে জল খেল। একঝাঁক চড়ুই এসে একটা তোলা উনুন ঘিরে বসে পড়ল। দড়িতে ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি ঝুলছে। তার ওপর একটা প্রজাপতি। মন্দিরের পাশের ঘরে যা সাড়াশব্দ। কমিউনিটি উনুনের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মেঝেয় বড় বড় থালায় তরকারি কুটে রেখেছে। আন্দাজ করলাম, ভোগটোগের আয়োজন চলছে।

আর কী? চলুন!···বলে পশুপতি পা বাড়ালেন।

এই সময় ফটক দিয়ে একবোঝা শুকনো বাঁশ আর কাঠ নিয়ে একটা লোক ঢুকল। পশুপতি বললেন, মুকুন্দ যে! কেমন আছ? আর তো তোমায় দেখিটেখি না বিশেষ!

লোকটার মুখে স্বাভাবিক হাসি ফুটতে দেখলুম না। কেমন বেজার ভাব। বোঝাটা সেখানেই নামিয়ে ভারি গলায় বলল, দেখে আর কী করবেন মাইতি মশাই! দেখেও না-দেখা হয়ে থাকবেন। আমি চক্ষুশূল।

পশুপতি জিভ কেটে বললেন, আহা, তোমায় তো কেউ দোষী করেনি বাপু! তোমার ক্ষতিও কি কেউ করেছে? তোমার ভাগ্নে হারামজাদা অমন, তা তুমি কী করবে?

মুকুন্দ বলল, ভাগ্নের দোষ থাকতে পারে। তাকে আমি ধোয়া তুলসীপাতা বলছি না। তবে তালি খালি এক হাতে বাজে না—সেটা কেউ তো বলছেন না! অন্তপক্ষে যদি সায় না-ই থাকত, তাহলে কীভাবে সে অতখানি এগোলো বলুন? তাছাড়া ব্যাপারটা একদিনের নয়, সেই এতটুকুন থেকে দুজনে···

আমার দিকে তাকিয়ে সে থামল। পশুপতি মুচকি হেসে বললেন, যাক সে বাপু! তুমি বেঁচে গেছ। বন্দিন ছিল, তোমারও তো নানান হাঙ্গামায় জড়িয়েছে। থানাপুলিস কত রকম! দুটু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

মুকুন্দ কী বলতে যাচ্ছিল, পশুপতি বললেন, আসুন। ওদিকে দেরি হয়ে যাবে। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ওনার টাইম-জ্ঞান খুব টনটনে।

ফটকের সামনে জুতো পরতে পরতে দেখলুম, মুকুন্দ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে কী যেন কথা টলটল করছে। পা বাড়িয়ে পশুপতি চাপা গলায় বললেন, সে এক কেলেঙ্কারি। পরে বলব'খন।

আরেকবার ঘুরেও দেখি, মুকুন্দ একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকেই দেখছে যেন। কেন? একটু অস্বস্তি হল। বললাম, লোকটা কে পশুপতিবাবু?

মন্দির-স্টাফ। কয়েক পুরুষ ধরে আছে বলেই রাজাবাহাদুর ছাঁটাই করেন নি। পশুপতি জানালেন। মাসে গোটা তিরিশ টাকা পায়। একবেলা ভোগ হয়। তার ভাগও পায়। ছেলেপুলে নেই বলে এক গুণধর ভাগ্নেকে এনে রেখেছিল। পরে সব বলব'খন।

ঘড়ি দেখে নিলুম। কাঁটায় কাঁটায় নটা। মার্চের এই সকালটা এখনও স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি। রাতের বৃষ্টির পর ভোরে বনের মাথায় একটু কুয়াশা জমেছিল। এখন সেটুকুও সরে গেছে। চারদিকে গাছপালা ঝোপঝাড়। বাঁশবন আছে। টুকরো টুকরো চষা ক্ষেত আছে। আর আছে ছোট বড় অনেকগুলো পুকুর। পশুপতি অবশ্য দীঘি বলছিলেন। প্রায় চারশো একর জমি নিয়ে রাজবাড়ি এলাকা একটা দ্বীপের মতো। চারদিকে চওড়া ও গভীর পরিখা আছে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো ধ্বংসস্তূপ। কয়েকটা শিবমন্দির আছে। অজস্র ইঁদারা আছে। অবাবহার্য সবই। ঘাসের জঙ্গলে মরচেধরা লোহার কামান পড়ে আছে। এক সময় নাকি সবই ছিল সাজানোগোছানো। ফুলের বাগান ছিল অজস্র। এখন আর কিছুই মানুষের হাতে নেই। প্রকৃতি যা খুশি করছে।

একটা খালের ওপর সাঁকো দেখলুম কাঠের। সাঁকোর গড়নেও পুরনো আভিজাত্যের ছাপ। জানি এই আভিজাত্য কালের রক্ত ভবে গড়ে উঠেছিল—কিন্তু এসব মুহূর্তে মানুষের মৌলবোধ ও কারিগরী দক্ষতাই চোখের সামনে বড় হয়ে ধরা দেয়। সেই সব প্রাচীন দক্ষ স্থপতি আর ছুতার মিস্ত্রীদের মুখ ভেসে উঠছিল।

হোতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা নতুন রাজপ্রাসাদ। নির্মাণকাল বোধ হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। গেটের ফোকর দিয়ে ঢোকার পর দেখি, বারান্দায় সেই রাশভারি ম্যানেজার ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাদের দেখে বললেন, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল নাকি? তা তখন তো কিছু বললে না হে পশুপতি! এ বেলা তো দেখার চান্স আর নেই।

পশুপতি বললেন, সে কী? নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন উনি নিজেই?

অহিভূষণ তেতো মুখে চাপা গলায় বললেন, খামখেয়ালী ব্যাপার। এইমাত্র এসে শুনলুম, হরিবন্ধুকে বলতে বলেছেন—শরীর খুব খারাপ। এ বেলা দেখা হবে না। শুনে আমার খারাপ লাগল। আফটার অল একজন সাহিত্যিক দেখা করতে আসছেন! তিনিই বা কী ভাববেন? বরাবর…

কথা কেড়ে বললুম, কিচ্ছু ভাবব না। শরীর খারাপ যখন। ঠিক আছে, আমরা আসি।

—তা কি হয়? অন্তত একটু চা-ফা খেয়ে যান। আসুন।

গোঁ ধরে বললুম, না। থাক।

আমার আচরণে কি অভদ্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল? কে জানে! এভাবে যেন প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই অপমান আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। গতিক দেখে পশুপতি আমার সঙ্গ ধরলেন।

কিছুটা তফাতে গিয়ে পশুপতি বললেন, সব বদমাইসী ওই অহিভূষণের, বুঝলেন? ওই ব্যাটাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নষ্ট করেছে। রাজাবাহাদুর কক্ষনো কথা না রাখার পাত্র নন। অসম্ভব ভদ্রলোক সে ব্যাপারে। আমি বুঝতে পারছি, পাছে রাজাবাহাদুর নিজের দুঃখদুর্দশার কথা ফাঁস করে বসেন বাইরের লোককে—তাই অহিভূষণই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানচাল করে দিয়েছে। তার চেয়ে চলুন রাণী কৃষ্ণভামিনীর প্রাসাদটা দেখে আসবেন। না—না, ভেরি ইন্টারেস্টিং প্লেস! ঐতিহাসিক কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

অগত্যা বললুম, চলুন তাহলে।

পাথরের এই বিশাল প্রাসাদের তিনপাশে বন জঙ্গল; শুধু পূর্বদিকটা ফাঁকা। কারণ ওদিকে মস্ত একটা দীঘি আছে। পাড় থেকে সোজা উঠে গেছে

প্রাসাদের পাঁচিল। কিন্তু একটা অংশ ধসে পড়েছে। বাকি ঘরগুলোও প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। ভেতরে ঢুকতে ভয় করছিল। কিন্তু পশুপতি আশ্বাস দিয়ে বললেন, না, না। দক্ষিণ অংশটা পুরো অক্ষত। এদিকটায় আমরা লাইব্রেরি করতে চেয়েছিলুম। দেখলেই বুঝবেন।

ভাঙা বারান্দা সাবধানে পেরিয়ে কপাটহীন দরজায় পা বাড়াতে বুক কাঁপল। কিন্তু পশুপতি নাছোড়বান্দা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলুম তাঁর পেছনে পেছনে। সিঁড়িতে চামচিকের নাদি, মাকড়সার জাল, নোংরা যথেষ্টই। ওপরের একটা ঘরে ঢুকে মনে হল, এটা আদতে একটা দুর্গ।

কোনও ঘরেরই কপাট-জানলা নেই। সব ভেঙেচুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একখানে পশুপতি মোগল সৈন্যদের কামানের দাগ দেখাচ্ছিলেন, হঠাৎ পাশের ঘরে কোথায় পায়ের শব্দ হল। পশুপতি হেঁড়ে গলায় কে রে বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ওদিকে কে ধুপধাপ করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। পশুপতি হেসে বললেন, শেয়াল-টেয়াল হবে! তবে বাঘ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। জানেন একবার একটা বাঘ···

কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওঁর দৃষ্টিতে সন্দেহ ফুটে উঠল। পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন দ্রুত। পেছন পেছন গিয়ে উঁকি দিলুম। দেখলুম কোণার দিকে একটা ছেঁড়াখোঁড়া মাদুর পাতা রয়েছে। একটা বালিশও আছে। বালিশের পাশে একটা কাপড়ের ময়লা ব্যাগ। মেঝেয় পোড়া সিগারেটের আর দেশলাই-কাঠির টুকরো অজস্র। পশুপতি তীব্রদৃষ্টে দেখতে দেখতে আপন মনে বললেন —কী কাণ্ড!

—কী ব্যাপার পশুপতিবাবু?

—হারামজাদা ছেলেটা এখানেই লুকিয়ে থাকে দেখছি! নির্ঘাত এবার ধরা পড়বে অহিভূষণের হাতে। অত মার খেয়েও লজ্জা হয়নি মশাই, ফের এসেছে মরতে!

—কে?

—ওই যে মুকুন্দকে দেখলেন, তার ভাগ্নে সতু।

—কী করেছিল সতু?

পশুপতি ফ্যাঁচ করে হেসে বললেন, ওই নিয়েই তো উপন্যাস লিখছি। আপনাকে খানিকটা শোনাব। কেমন হয়েছে বলবেন। আসলে সেই [illegible] আসির কথা আর কী! [illegible] চলেছে। [illegible]

রাজপ্রাসাদের কেলেঙ্কারির শেষ নেই। এখন কবরে ঢুকে বসে আছে মশাই, তবু স্বভাব।

পশুপতিবাবুর হেঁয়ালিতে বিরক্ত হয়ে বললুম, খুলে বলুন না মশাই!

পশুপতি হাসলেন।—বুঝলেন না? মুকুন্দর ভাগ্নে এই সতু আপনার রাজকন্যা টেঁপির সঙ্গে প্রেম করছিল। একদিন দুপুরবেলা বৃষ্টির সময় এই প্রাসাদে দুটিতে এসে জুটেছে। তারপর পড়বি তো পড়, একেবারে অহিভূষণের চোখে। আর ব্যস—বাকিটা বুঝেই নিন।

বুঝলুম। সেই মুকুন্দের কথাগুলো মনে পড়ল। ছেলেটাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পশুপতি ফের ইতিহাসে গিয়ে ঢুকলেন।—এই দেখুন আরেকটা গোলার দাগ।...

দুপুরে খাওয়ার পর সেচ দফতরের বাংলোয় একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। উত্তরে জানলাটা খোলা আছে। উপুড় হয়ে খালের ওপারে রাজবাড়ির এলাকাটা দেখতে দেখতে চোখে পড়ল, অপরূপা আঁচলের আড়ালে কিছু লুকিয়ে নিয়ে চুপি চুপি ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে গুড়ি মেরে এগোচ্ছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। একটু পরে সে দীঘির পাড়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে একটু দাঁড়াল। তারপর সাঁৎ করে বনবেড়ালির মত রাণী কৃষ্ণভামিনীর প্রাসাদে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

বুঝতে পারলুম অপরূপা অভিসারে গেল। চাপা উত্তেজনা জেগেছিল আমার মধ্যে। এবং একটু অস্বস্তিকর আতঙ্কও। কতক্ষণ তীব্রদৃষ্টে এদিকে ওদিকে লোক খুঁজলুম—কেউ ব্যাপারটা আমার মতো লক্ষ্য করছে না তো?

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে অপরূপা তেমনি দ্রুত বেরিয়ে এল। তারপর ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাকে ফের দেখতে পেলুম এই বাংলোর নিচের খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে দিব্যি তরতর করে খালে নামল। এতক্ষণে দেখলুম, সে একটা এঁটো এনামেলের টিফিন কৌটা ধুচ্ছে। প্রেমিকের জন্যে খাবার নিয়ে গিয়েছিল তাহলে!

একবার ভাবলুম, বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলি। পরে মনে হল, এতে তাকে অকারণ ভয় পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। কী দরকার?

...অপরূপা টিফিন-কৌটোটা কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে চলে গেল। মানুষের

মতোই পাড়ে উঠল এবং চঞ্চলভাবে ঝোপজঙ্গলের ভেতর হাঁটতে থাকল। একটু পরে তাকে আর দেখতে পেলুম না।

তিনটে নাগাদ পশুপতি এলেন ব্যস্তভাবে। বললেন, আজ আপনার যাওয়া হচ্ছে না। না, কোনও ওজর-আপত্তি চলবে না। সন্ধ্যেবেলা শিশু লক্ষ থিয়েটার করবে। ওরা এক্ষুনি আসবে আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে। কিন্তু তেরি সরি স্যার, আমি ওদের অগ্রদূত হয়ে কথাটা জানিয়ে গেলুম। আমাকে হঠাৎ একবার শহরে যেতে হচ্ছে। মামার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সামান্যই। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। আমি সন্ধ্যে সাতটার বাসেই ফিরব।

পশুপতি চলে যাবার পর একদল ছেলেমেয়ে এল। তাদের নেমন্তন্ন নিলুম। কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে তারা চলে গেল। চৌকিদার চা আনল। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। লনে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ রাণী কৃষ্ণভামিনীর বাড়ির দিকে চোখ পড়ল।

বনভূমির শীর্ষে এখন হালকা রোদ, নিচে ঘন ধূসরতা। তার মধ্যে অপরূপাকে, চলতে দেখলুম। সেই দীঘির পোড়ো ঘাটে যক্ষীমূর্তির পাশে সে কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পাড় ঘুরে হনহন করে এগোল। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে অদৃশ্য হলে আমার একটু মজা করার ইচ্ছা হল। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে দীঘির ঘাটে গেলুম।

সবে যক্ষীমূর্তির কাছে পৌঁছেছি, আচমকা পাথরের ভাঙা প্রাসাদ থেকে অপরূপাকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখলুম। সে আছাড় খেয়ে পড়ল একবার। তারপর হন্তদন্ত হয়ে উঠল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। সেই সুন্দর মুখে এখন বীভৎস একটা বিকৃতির ছাপ। ঠোঁট কাঁপছে। গলার ভেতর চাপা কি একটা শব্দ উঠছে—অব্যক্ত গোঙানির মতো।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, অপরূপা! অপরূপা! কী হয়েছে?

অপরূপা চমকে উঠল। তারপর তাড়া-খাওয়া প্রাণীর মতো দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল এবং একটা কেয়াঝোপে ধাক্কা খেল। কাঁটায় কাপড় জড়িয়ে গেল। টানাটানিতে তার শরীর অনাবৃত হয়ে যাচ্ছে, একটা প্রচণ্ড ছটফটানি যেন রূপ নিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে তাকে ঝোপ থেকে মুক্ত করে বললুম, কী হয়েছে অপরূপা?

সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে সরে গেল এবং দিশেহারার মত ঝোপজঙ্গল ভেঙে চলতে শুরু করল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিশ্চয় কিছু আতঙ্কের ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু কী তা, [illegible]

পারলুম না। একবার ভাবলুম, বাড়িটার ভেতরে ঢুকে দেখে আসি, আবার ভাবলুম···

হ্যাঁ, সেই সন্ধ্যার পরিবেশে এই নির্জন জঙ্গুলে জায়গা আর ওই পোড়ো 'ক্ষুধিত পাষাণ' আমাকে হঠাৎ ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল। ভূত আমি কখনও দেখিনি। বিশ্বাসও করি নে। অথচ মনে হল, অপরূপা নিশ্চয় ভূতের ভয় পেয়েছে। আর সেই ভয়টা আমার অবচেতনা থেকে উঠে এসে মগজে ঢুকল।

রাণী কৃষ্ণভামিনীর ক্ষতবিক্ষত প্রাসাদ অসংখ্য কালো চোখ দিয়ে আমাকে যেন দেখছে। দরজা-জানলার ফোকরগুলো বিভীষিকার মুখব্যাদান যেন। ওর ভেতর ঢোকার সাহস হল না। এক মুহূর্ত দেরি না করে পালিয়ে এলুম খালের দিকে। এসময় আমাকে কেউ দেখলে ভাবত, লোকটা নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে!

রাতে শিশু সঙ্ঘর অনুষ্ঠানে গিয়ে পশুপতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁকে জনান্তিকে ব্যাপারটা বলেছিলুম। উনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ওই বাড়িটার বদনাম যথেষ্ট আছে। সতু ছেলেটা গোঁয়ারগোবিন্দ বলেই ওখানে লুকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, টেঁপি গিয়ে ওকে দেখতে পায়নি বলেই অমন ভয় পেয়ে পালিয়েছে। অমন ভয় আরও অনেকে পায়। সন্ধ্যাবেলা একাদোকা তাই কেউ ও বাড়ির আনাচেকানাচে পা বাড়ায় না। না ঢুকে ভালই করেছেন।

সকাল দশটায় আমার বাস। ফেরার তাড়ায় খুব সকাল সকাল উঠেছিলুম। লনে দাঁড়িয়ে দেখলুম, রাজবাড়ি এলাকায় সামান্য দূরে একদল লোক কী যেন করছে। চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, পুরনো ইঁদারা বুজিয়ে দিচ্ছে স্যার। অনেক ইঁদারা আছে দেখবেন রাজবাড়িতে। মাঝে মাঝে গরুছাগল পড়ে যায়। কাচ্চাবাচ্চারাও খেলতে গিয়ে পড়ে যায়। ম্যানেজারবাবু তাই ইঁদারাগুলো একটার পর একটা বুজিয়ে দিচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পরে লোকগুলো চলে গেল। আনমনে খাল পেরিয়ে রাজবাড়িতে গেলুম। বিদায় জানাবার ইচ্ছেয় ইতিহাসের এই গোরস্থানের শিয়রে যেন দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার চারপাশে প্রকৃতিকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সেই বুজিয়ে দেওয়া ইঁদারাটা দেখতে পেলুম। ওপরে ঘাসের চাপড়া দিয়ে চমৎকার কাজ করে গেছে ওরা। প্রকৃতি যা দেরিতে করেন, মানুষ তা দ্রুত করে ফেলে। ইতিহাস এভাবেই প্রকৃতির করতলে ঢাকা পড়ে যায়। চাপা পড়ে থাকে সব পাপ-পুণ্য, প্রেম ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ।···

একটু পরে দেখি, অপরূপা হনহন করে আসছে। সে ইঁদারাটার কাছে এসে দাঁড়াল। পা বাড়িয়ে ঘাসের চাপড়াগুলো এখানে ওখানে ছুঁয়ে পরখ করল। তারপর বসে পড়ল উবু হয়ে। দুটো হাত বাড়িয়ে ঘাসে রাখল। অবাক হয়ে দেখলুম, অন্ধ মেয়েটার ঠোঁট কাঁপছে। নিঃশব্দে কাঁদছে। কেন কাঁদছে? সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে হেঁয়ালি মনে হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, পশুপতির ডাক শুনলুম, চলে আসুন স্যার। বাসের সময় হয়ে এল।

পশুপতিবাবুর গলা পাওয়া মাত্র অপরূপা দ্রুত উঠে হনহন করে চলে গেল।

বাংলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে এতক্ষণে আমার গায়ে কাঁটা দিল। রক্ত হিম হয়ে গেল। উরু দুটো ভারি বোধ হল। কী সর্বনাশ! তাহলে কি আমি আসলে একটা গোপন হত্যাকাণ্ডের ঘটনাই দেখলুম রাজবাড়িতে? পশুপতিকে বললে হেসে উড়িয়ে দেবেন বলে চেপে গেলুম। কাল সন্ধ্যায় অপরূপা কী দেখে ভয় পেয়েছিল, বুঝতে পেরেছি।

বানকুড়ো

মৌগাঁয়ের শেতলের মেয়ে আলোপুরী ভোরবেলা বান কুড়োতে বেরিয়েছিল।

সারাবছর পক্ষীর মতো মাঠ কুড়িয়ে শস্যদানা খুঁটে খেয়ে তার মতো মেয়েদের বেঁচে থাকা। তারা মাঠকুড়ুনী। বানবন্যার সময় তারা বান কুড়োতে যায়। হাঁস-মুরগী ইস্তেক একটা ছাগলও বয়াতে থাকলে মিলে যায়। নয়তো কাঠ বাঁশ খড়, দু-একটা এনামেলের হাঁড়িকুড়ি তৈজসপত্তর, ভেসেযাওয়া গেরস্থালির বিবিধ জিনিস। চাই কি কদাচিৎ বাকসোপেঁটরা—যার ভেতর কাপড়-চোপড় গয়নাগাঁটি টাকাকড়িও থাকে।

সে কপাল করে আলোপুরী আসেনি। কারণ, সত্যি-সত্যি তার কপালটাই পোড়া। ছোটবেলায় জলন্ত উনুনে পড়ে ওই অবস্থা। তখন হয়তো ভাল নাম একটা ছিল। আলুপোড়া হয়েছিল বলে পাড়ার লোকে আলুপুড়ী নাম চালু করে দেয়। সেই মেয়ে 'বেরৎ ওদরের' গঞ্জনায় দু-দুটো পুরুষ ত্যাগ করে এবং তৃতীয়টির মাথা খেয়ে এখন রাঁড়। ক্ষেতমজুর বাপের বাড়িতে মাঠকুড়ুনী হয়ে কাটাচ্ছে। তাদের সমাজে ন্যাঙা বা আবার বিয়ের প্রচলন থাকলেও সে হয়তো নিজের বেরৎ ওদরের কথা সবসময়ই আর ওদিকে পা বাড়ায়নি।

কপালের ওই পোড়াটুকু পাতি করে চুল বাঁধলে লুকোনো যায় এবং তার নিটোল আঁটোসাটো গড়ন, কিছু কিঞ্চিৎ লাবণ্য এখনও বিস্তর মাঠচরা পুরুষের পক্ষে লোভনীয়। মৌগাঁয়ের ভোটারলিস্ট রিচেকিংয়ে পঞ্চায়েত অফিসার অবাক হয়ে বলেছিলেন, আলোপুরী বলছ? লেখা আছে তো আলুপুড়ী! শেতলের মেয়ে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, ভুল লেকেছে মুখপোড়ারা। লেকুন আলোপুরী। গাঁওয়ালারা হেসে খুন। আসলে হয়েছিল কী, ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ছোকরা ডাক্তারের পছন্দ হয়নি নামটা। তেনারই কীর্তি! তবে এই গুহ্য কথাটি পাড়ার জনাকতক বাদে আর কেউই জানে না। নিজের বৃহৎ উদর সম্পর্কে শঙ্কা-ঘেন্না-লজ্জা যে মেয়ের এবং যে কিনা পুরুষের পাশে আর এজীবনে শোবে না বলেই পণ করেছে, জঠরের 'ছেলেধরা নামক প্রকোষ্ঠের দরজা সিল করানোতে তার আপত্তি কিসের? দালালবাবুদেরও দুপয়সা হল, তারও হল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শাড়ি-ব্লাউজ কিনল, শখতো মরেনি রাঁড়মেয়ের। বাকি টাকায় ছাগল, এক দঙ্গল হাঁস-মুরগী। শেতলের ভাঙা হাট কলকলিয়ে উঠেছিল। শীতল তখন মেয়ের পাধোয়া জল খেতেও রাজি।

বছর যেতে যেতে আবার যে-কে সেই অবস্থা হল। আলোপুরী জানে, এই বেরৎ ওদরের হাত থেকে তার বাঁচোয়া নেই। পিথিমীসুদ্ধু গিলে না খেলে ক্ষিদে মিটবে না। এখন বুড়ো বাপের সঙ্গে বনিবনা নেই। উঠোনের কোনায় পাটকাঠির ঘর করেছে। দীঘির পাড় থেকে কোঙাপাতা এনে চাল বানিয়েছে। কাঁকড়া গুগলি চিংড়ী শাকপাতা পা ছড়িয়ে বসে কচরমচর করে 'ভুজোন' করে। তারপর ঢেকুর তুলে আঁচল বিছিয়ে শোয়।

শেষ রাতে একটা স্বপ্ন হয়েছিল।

এই মৌগাঁ হল ডাঙাদেশ। তার দক্ষিণ তল্লাটি পুরোটাই নাবাল। লোকে বলে ডুবোদেশ। সেখানে বান-বন্যা হলে সব ভাসানো জল এসে মৌগাঁয়ের পা ধুয়ে কলকলায়। পাটক্ষেতের বুক ডুবিয়ে ফেনার পুঞ্জ দোলে ছলছলাৎ। হিড়িক পড়ে যায় ডাঙাদেশে। কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষ মাস। বান কুড়োনোর চাপা ব্যস্ততা চলে রাতবিরেতে। গুপুর-গাপুর ফিসফিস চক্রান্ত। ফেলে আসা গেরস্থালি লুঠতে তালডোঙা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ে অনেকে। তাদের সবাই যে চোর-ডাকাত তাও নয়। এ এক চিরকালের রেওয়াজ এদেশে।

আর সেই হিড়িকে গরীব-গুরবো কাঠকুড়ুনীরাও চনমন হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের এত বড় বাড় বাড়ার সাহস নেই, জোরও নেই। অগত্যা চুপিচুপি কিংবা [illegible] ধান দেখার ছলে [illegible] মাঠের [illegible] পাটক্ষেতের [illegible] [illegible]

বেড়ায়। হাস-মুরগি, ইস্তেক একটা ছাগল ভাঙা চালের ওপর, নয়তো কাঠখড় বাঁশ, এনামেলের হাঁড়ি, যা পায়। আবার বরাতে থাকলে বাকসো-পেঁটরাও।...

আলোপুরীর শেষরাতে একটা সিন্দুকের স্বপ্ন হয়েছিল।

ভাঙাদেশেও সেই বাপপিতেমোর আমল-থেকে শোনা সিন্দুক, যার ভেতর থাকে নাকি সাত রাজার ধন। বানের জলে ভেসে আসে। যে পায়, সে রাজা হয়ে যায়। আলোপুরী আঁকুপাঁকু সাঁতার কাটছে। দম আটকে যাচ্ছে। এই ছোঁয় ওই ছোঁয়, কিংবদন্তীর সিন্দুক ভেসে যায়। তারপর আলোপুরী এ কী দেখল, সিন্দুক নয়—এ যে মড়া। পুরুষ মানুষের মড়া ভাসছে। চন্দনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর সেই মড়াপুরুষ হাসছে, বেরৎ মাছের মতো তরতরিয়ে চলেছে। আলোপুরী ডুকরে কাঁদে। কোন দুঃখে কাঁদে কে জানে।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে আলোপুরী কয়েক দণ্ড নিঃসাড়। তখনও নাকে চন্দনের গন্ধ ভুর-ভুর করে এসে লাগে।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। বাইরে টিপটিপানি চলেছে সেই সন্ধে থেকে। আকাশ মেঘে ঢাকা। সেই সন্ধেয় খবর শুনে এসেছিল, ডুবোদেশে বানবন্যার ডুগডুগি বাজিয়ে বাবুরা লুটিশ জারি করেছেন। এতক্ষণ সেখানে পিথিমী জলতল। অতএব হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়েছিল আলোপুরী। সঙ্গে নিয়েছিল ডগায় আঁকসবাঁধা কঞ্চি, আর একটা হেসো। বান কুড়োতে গেলে ও-দুটো নিতেই হয় সঙ্গে।

ধাপবন্দী মাঠে টিপ-টিপ বিষ্টি আর হাওয়ায় শিকারী ভুড়শেয়ালীর মতো দেখাচ্ছিল তাকে। তার মনে তখনও চন্দনের গন্ধটা ভুরভুর করছে।...

পাটক্ষেত্রে কোমর জল। হাওয়ার চোটে পাটগুলো জড়াজড়ি হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে বনচড়ুইয়ের ঝাঁক-ঝুপসি হয়ে বসে আছে। মানুষ দেখেও ফর-ফরায় না। কতরকম পোকামাকড় মনমরা হয়ে ঝিমোচ্ছে। সাবধানে চারপাশ দেখে নিয়ে আলোপুরী হেঁসোর কোপ চালায়। পাট কেটে-কেটে পথ সাফ করে। মালিক দেখলেই তাকে ডুবিয়ে মারবে। কিন্তু এই দুর্যোগে এত ভোরবেলায় এদিকটায় মানুষজন আসেনি। বানকুড়ুনীরা সম্ভবত রেলব্রিজের ওদিকে গেছে ভেসে যাওয়া কাঠগোলার মতো মতো কাঠ মিলতে পারে। আলোপুরীর আজ বানে এদিকটাই পছন্দ। গত বানে সে এইসব পাটক্ষেত্র ছুঁড়ে

তিনটে হাঁস পেয়েছিল। একটুকরো আস্ত খড়বাঁশের চাল পেয়েছিল। সে চঞ্চল চোখে খোঁজে। পাটক্ষেতের ভেতর এখন আবছা আঁধার ভরটা শুধু সাপের। তবে চোখে পড়লে সে কোপ ঝাড়তে দেরি করবে না। মৌগাঁয়ের মাঠে সে অনেক সাপ কেটেছে এই ছোট্ট ধারাল হেঁসোয়। একবার একটা নম্পটে পুরুষকেও কুপিয়ে ছিল। আলোপুরীর মনে বড় গিদের, সে রাঁড় বটে—খানকি লয়। এবার পাটক্ষেত ফুরোচ্ছে জলও বাড়ছে। বড় বড় ফেনার চাপ নিয়ে জল দুলছে। বুকের জল চিবুক নেড়ে মস্করা করছে। গালে দিচ্ছে ঠোনা। তারপর আর এগোনা যায় না। সামনে অপার উত্তরঙ্গ জল, যেন সমুদ্দর। কলকলানিতে কান পাতা দায়। হাওয়ার ঝাপটানি আর বিষ্টির খোঁচায় আলোপুরীর চোখ খুলতে কষ্ট।

তারপর ডাইনে তাকাতেই তার বুকের মধ্যিখানে একচিক্কুর ঝিলিক খেলে যায়। নুয়েপড়া পাটের ঝাঁকে কী একটা কালোপনা আটকে আছে। একটু-একটু ঘুরছে দুলছে। ওটা কি সিন্দুক, স্বপ্নের সিন্দুক? আলোপুরীরে তোর কপাল কি খুলল তবে ছারকপালীরে? তার মনে এই রকম কথার বুজকুড়ি ওঠে। আর সে কাঁপন্ত হাতে কঞ্চির আঁকসি বাড়ায়। হেই গো! এ যে দেখি বেরং মাটির গামলা। ওপরে একখানা কুলো চাপানো। সে আশায় লোভে চনমন করে এবং টানে। পাটগাছেরা বাধা দেয়। আলোপুরী মরীয়া হয়ে টানে। ওদিকে জলটা ডুব-সাঁতার।

হাওয়া শনশনাচ্ছে। বিষ্টি টিপটিপোচ্ছে। কলকলাচ্ছে বান-বন্যার জল। চাপ-চাপ ফেনার গোটা এসে নরম আদর দিচ্ছে। আলোপুরী নিঃসাড়। কত জন্ম কত বছর সে এই মেহনত করছে, বুঝতে পারে না। হেই রে বিধাতা. আলোপুরী কি বুড়ি হয়ে যাবে এই করতে করতে? এখানেই কি সে মড়া হয়ে ঢেউয়ে ভেসে আঘাটা-কুঘাটায় বুকে শকুন নিয়ে বেড়াবে? চোয়াল আঁটো করে আলোপুরী টানে। হেঁসোর কোপে পাট কেটে তছনছ করে। আর এতক্ষণে মেঘের খানিকটা গলানো সোনার ছোপ নিয়ে মৃদু জলজল করতে থাকে এবং জলে তার প্রতিফলন। আড়ালে সূর্য ওঠে।

তারপর গামলাটা হাতের নাগালে পায় আলোপুরী। কাঁপন্ত হাতে সরিয়েই সে থ।

গয়না না, গাঁটি না, টাকা লয় পয়সা লয়। কাপড় না চোপড় না। 'চাল রুল খদও লয়। কোন আবাগীর বেটি তার কোলের পুতকে ভাসিয়ে দিয়েছে

ন্যাকড়ায় জড়িয়ে। বাছা আমার দুলুনি খেয়ে সুখে ঘুমোচ্ছে। ঠোঁট দুখানি মাই চুষছে চুকচুক করে। আলোপুরী কোনদিন মা ছিল না, তার 'ছেলেধরা' বাবুরা সিল করে দিয়েছেন, তবু সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।...

বানকুড়োতে গিয়ে কে কী পেয়েছে, চাপাচুপো রাখলেও থাকে না। চাউর হয়ে যায়। মৌগাঁয়ের কুনাইপাড়ার মাঠকুড়ানীরা বরাবর যা পায়, পেয়েছে। মেঘার তিন মেয়ে অরি গোরি ভবি এবারও বাঁশ কাঠ খড়ের পাঁজা তুলেছে উঠোনে। অশ্বিনীর বউ নির্মলাও একটা গামলা পেয়েছে বটে তবে ছিল ধাড়ী মুরগি আর একদঙ্গল ক্ষুদে ছানা। হাটুর বোন মেনকা এনেছে একটা হাঁস। দলে গোটা পাঁচেক ছিল। একটা ধরতে পেরেছে বাকিগুলো ধরতে গিয়ে হাটু হদ্দ হয়েছে। শেষে ফিরে বলল, শালা কাপাসীর মেয়েগুলোর জ্বালায় আর পারা যায় না। তিনকোশ ভেঙে মৌগাঁয়ের মাঠে এসেছে বানকুড়োতে। শোনা গেল, হারু তিওর একটা আস্ত বলদ পেয়েছে। তবে চেপে দেওয়া কঠিনই হবে। শিগগির ডুবোদেশের লোকেরা তল্লাসে বেরুবে। তখন কাঠ বাঁশ খড় বা হাঁড়িকুড়ি বলো, হাঁস-মুরগি বলো কে কার সেটা তো গায়ে নাম লেখা থাকে না। কিন্তু বলদ অন্য জিনিস। এই বলদের গায়ে নাকি তিনটে পোড়ের দাগ আছে। দেগেছিল নিশ্চয় অলিপুরের গো-বদ্যি মৈনুদ্দি। সে সাক্ষী হবে। এইসব ফিসফিস চুপকথার ফাঁকে শেতলের মেয়ে আলোপুরীর গামলাটা নিয়ে দিনকতক কথাবার্তা হল। শেতল বার বার বলে, ইলিপের বাবুদিগে দিয়ে আয় বাছা! অন্যেরাও বলে। আলোপুরীর নিজে বেরং ওদরের কথা ভেবে দোনামনা করে। কিন্তু তার কী একটা ঘটে গেছে যেন। হেই-গো, যার ছেলেধরা বন্ধ, এবং এ জীবনে যাকে কেউ মা বলে ডাকবে না, তার ই কী যন্ত্রণা দেখ দিকি! ওই দেখ মাচানে লতাপাতা, ও দেখ আমড়া গাছটি, সবাই ফলটা আরটা দিয়ে মরে হেজে যাবে। আলোপুরী কী হবে বলে সেই ভেবে বুকের কোণায় চিনচিন করে বেথা বাজে। আর ওটা ট্যা করে কাঁদলেই আলোপুরী চনমনিয়ে সুর ধরে বলে, ও আমার বানকুড়ো রে! ও আমার স্বপন দেখা সেন্দুকের ধোন রে!

আরও দিনকতক পরে খুরিতে করে ছাগলের দুধ খাওয়াচ্ছে দু ঠ্যাং ছড়িয়ে এবং হাটুর কাছে সেই ছোট্ট বালিশ (গামলাতেই ছিল), পেটে কাতুকুতু দিয়ে

হাসাচ্ছেও, হেন সময়ে শেতল এক কুটুম্ব নিয়ে বাড়ি ঢোকে। অই গো আলো, এই দুঃখ তোর বানকুড়োর বাপ।

আলোপুরী অচেনা পুরুষ দেখে কপালের পোড়াটা চুলে ঢাকছিল। হঠাৎ বজ্রপাত। চেরা গলায় চেঁচিয়ে বলে, কে?

লোকটা আধবুড়ো। পোড়-খাওয়া চেহারা। দেখেই বোঝা যায়, খুব নাকানি-চোবানি খেয়েছিল। গামছার খুঁটে চোখ মুছে বানকুড়োকে দেখে বলে, হ্যাঁ। এই বটে। সেই গামলাটা কই?

শেতল গামলা বের করে আনে। আলোপুরী কটমটিয়ে তাকায় লোকটার দিকে। সে গামলা দেখে হেসে-কেঁদে বলতে থাকে, ত্যাখন অনেকটা রাত। সবাহ বললে আর কী। বেরিয়ে পড়ি। উঠোনে জল ঢুকেছে। কিন্তু নোবটা কী? মাথায় হলুদ্বুলুস মা-মরা খোকাটাকে হাসপাতাল থেকে এনে অব্দি সমিস্তে ছেল। ত্যাখন আরও সমিস্তে। তো হঠাৎ এই গামলাটা চোখে পড়ল। বিষ্টি বাঁচাতে কুলোখানাও চাপালাম। তারপর ঠেলতে ঠেলতে ভাঙাদেশের দিকে রওনা দিলাম। পথে তোড়ের মুখে ছাড়াছাড়ি। রাতটাও বেবম আঁধার।

শেতল বলে, বসো। বসো। গুড়জল খেয়ে গোস্থ হও বাছা! তারপর শুনব।

লোকটা আলোপুরীর পাশে বসে ছেলের দিকে তাকায়। আলোপুরী অসচেতন হাতে ঘোমটা টানে, কিন্তু সে রাঁড় মেয়ে। লোকটা হলুদ দাঁত বের করে বলে, মায়ের মন বলেই বাঁচিয়েছে। পুরুষ মানুষ হলে লাথি মেরে ডুবিয়ে দিত। কী দিয়ে এ নোল শুধি, এমন ক্ষ্যামতা নেই। কত জায়গায় ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে শেষে……

শেতল কথা কেড়ে বলে, বাবার নামধাম বেত্তান্ত?

নাম? শুনলে হাসবে লোক। সে দুঃখেও হা-হা করে হাসে। মা বাবুবাড়ি ধান ভেনে ঝিগিরি করে মানুষ করেছিল। পাত কুড়িয়ে খেতাম বলে নাম দিলে পাতকুড়ো।

ভাল, ভাল। বানকুড়োর বাবা পাতকুড়ো। শেতল খুশি হয়ে বলে। তা তোমরা কাদের বাছা।

পাতকুড়ো বলে, তা মনে হচ্ছে তোমাদের বাটি।

শেতল আরও খুশি হয়ে বিড়ি বের করে বলে, তাইলে আর কথা কী? তাহলে তো কথাই নেই।

আর ফের অসচেতন বিহ্বলতায় আলোপুরীর মাথায় ঘোমটাটা আরও একটু বেড়ে যায়। সে হেঁট হয়। বানকুড়োটার চোখে কাজল। এতক্ষণ প্যাটপ্যাট করে আকাশ দেখতে দেখতে হাসে। হেই গো, কী স্বপ্ন দেখছিল আলোপুরী—সেই স্বপ্নের চন্দনের গন্ধ এখন মনের ভেতর ভুরভুরায়।